মানিক-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২

মানিক-গ্রন্থাবলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৫৭

ব সু ম তী-সা হি ত্য-ম ন্দি র
কলিকাতা—১২

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সূচিপত্র

১।	জননী	১
২।	হলুদ পোড়া	৭৯
৩।	বোমা	৮৪
৪।	তোমরা সবাই ভালো	৮৬
৫।	চুরি চুরি খেলা	৯১
৬।	ধাক্কা	৯৫
৭।	ওমিলনাইন	১০৫
৮।	জন্মের ইতিহাস	১১১
৯।	ফাঁদ	১১৮
১০।	ভাঙা ঘর	১২৪
১১।	অন্ধ ও ধাঁধা	১২৮
১২।	চতুষ্কোণ	১৩২
১৩।	আজ কাল পরশুর গল্প	১৮৬
১৪।	দুঃশাসনীয়	১৯৩
১৫।	নমুনা	১৯৭
১৬।	বুড়ী	২০১
১৭।	গোপাল শাসমল	২০৩
১৮।	মঙ্গলা	২০৫
১৯।	নেশা	২০৮
২০।	বেড়া	২১০
২১।	তার পর ?	২১৩
২২।	স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই	২১৬
২৩।	শত্রুমিত্র	২২১
২৪।	রাঘব মালাকর	২২৩
২৫।	যাকে ঘুস দিতে হয়	২২৭
২৬।	কৃপাময় সামন্ত	২২৯
২৭।	নেড়ী	২৩১
২৮।	সামঞ্জস্য	২৩৩

মুদ্রাকর ও প্রকাশক
শ্রী.শশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা।

জননী

[উপন্যাস]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জননী

এক

সাত বছর বধূজীবন যাপন করিবার পর বাইশ বছর বয়সে শীতলের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী শ্যামা প্রথমবার মা হইল। এতকাল অনুর্বরা থাকিয়া সন্তানলাভের আশা সে একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। ব্যর্থ আশাকে মানুষ আর কতকাল পোষণ করিতে পারে। সাতবছর বন্ধ্যা হইয়া থাকা প্রায় বন্ধ্যাত্বের প্রমাণেরই সামিল। শ্যামাও তাই জানিয়া রাখিয়াছিল। সে তার মায়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান না হইয়া তার উপায় অবশ্য ছিল না, কারণ সে মাতৃগর্ভে থাকিতেই তার বাবা ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবি হইয়া মারা যায়। তারপর তার আর ভাইবোন হইলে সে বড় কলঙ্কের কথা হইত। শ্যামার যেন তাহা খেয়াল থাকে না। সে যেন ভুলিয়া যায় যে, তার বাবা বাঁচিয়া থাকিলে সাতভাই চম্পার একবোন পারুলই হয়ত সে হইত, বোনও যে তাহার দুপাঁচটি থাকিত না, তাই বা কে বলিতে পারে? তবু, একটা যুক্তিহীন ছেলেমানুষী ধারণা সে করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে নিজে যখন একমা'র একমেয়ে, দুটি একটির বেশী ছেলেমেয়ে তারও হইবে না।—বড় জোর তিনটি। গোড়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এরা আসিয়া পড়িবে, এই ছিল শ্যামার বিশ্বাস। তৃতীয় বছরেও মাতৃত্বলাভ না করিয়া সে তাই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তার পরের চারটা বছর সে পূজা, মানত, জলপড়া, কবচ প্রভৃতি দৈব উপায়ে নিজেকে উর্বরা করিয়া তুলিতেই একরকম ব্যয় করিয়াছে। শেষে, সময়মত মা না হওয়ার জন্য এবং দৈব উপায়ে মা হইবার চেষ্টা করার জন্য নানাবিধ মানসিক বিপর্যয়ের পর তার যখন প্রায় হিষ্টিরিয়া জন্মিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তখন ফাল্গুনের এক দুপুরবেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শীতলপাটিতে গা ঢালিয়া ঘুমের আয়োজন করিবার সময় সহসা বিনাভূমিকায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিল সন্দেহ। বাড়িতে তখন কেহ ছিল না। দুপুরে বাড়িতে কেহ কোনদিনই প্রায় থাকিত না, থাকিবার কেহ ছিল না—আত্মীয় অথবা বন্ধু। সন্দেহ করিয়াই শ্যামার এমন বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, তার ভয় হইল হঠাৎ বুঝি তার ভয়ানক অসুখ করিয়াছে। সারাটা দুপুর সে ক্রমান্বয়ে শীত ও গ্রীষ্ম এবং রোমাঞ্চ অনুভব করিয়া কাটাইয়া দিল। সন্দেহ প্রত্যয় হইল একমাসে। কড়া শীতের সঙ্গে শ্যামার অজ্ঞাতে যাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সে জন্ম লইল শরৎকালে। জগজ্জননী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাতদিনের পুরাতন জননী হিসাবে দেখিলেন।

শ্যামার বধূজীবনের সমস্ত বিস্ময় ও রহস্য, প্রত্যাশা ও উত্তেজনা তখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। নিঃশেষ হইবার আগে ওসব যে তাহার খুব বেশি পরিমাণে ছিল তা বলা যায় না। জীবনে শ্যামার যদি কোনদিন কোন অসাধারণত্ব থাকিয়া থাকে, সে তাহার আত্মীয়স্বজনের একান্ত অভাব। জন্মের পর জগতে শ্যামার আপনার বলিতে ছিল মা আর এক মামা। এগার বছর বয়সে সে মাকে হারায়। মামাকে হারায় বিবাহের এক বছরের মধ্যে। মামার কিছু সম্পত্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরাধিকারীবিহীন এই মামাটির কিছু সম্পত্তি না থাকিলে শীতল শ্যামাকে বিবাহ করিত কিনা সন্দেহ।

মৃত্যুর মধ্যে মামাকে হারাইলে সম্পত্তি শ্যামা পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্যামার বিবাহের পর একা থাকিতে থাকিতে মামার মাথার কি যে গোলমাল হইয়া গেল, নিজের যা-কিছু ছিল, চুপিচুপি জলের দামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া একদিন তিনি উধাও হইয়া গেলেন। একা গেলেন না। শ্যামার মামাবাড়ির গ্রামে আজীবন সন্ন্যাসী-ঘেঁষা প্রৌঢ়বয়সী ব্রহ্মচারী মামাটির কীর্তি এখনো প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এইজন্য যে, শ্যামার মামা সামান্যলোক হইলেও আসল কলঙ্ক যাদের, তাদের চেয়ে বনেদী ঘর আশে-পাশে দশটা গ্রামে আর নাই। এই গেল শ্যামার দিকের হিসাব। স্বামীর দিকের হিসাব ধরিতে বিবাহের পর শ্যামা পাইয়াছিল শুধু একটি বিবাহিতা রুগ্না ননদকে।

সে মন্দাকিনী।

প্রথমবার স্বামিগৃহে আসিয়া শ্যামা কোন দিকে তাকানোর অবসর পায় নাই। মন্দাকিনী তখন সুস্থ ছিল। নিজের নানাপ্রকার বিচিত্র অনুভূতি, প্রতিবেশিনীদের ভিড়, বৌভাতের গোলমাল সব মিলিয়া তাহাকে একটু উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মামার কাছে ফিরিয়া যাওয়ার সময় সে শুধু সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল কয়েকটা হৈ-চৈ-ভরা দিনের স্মৃতি। ছ'মাস পরে এক আসন্ন-সন্ধ্যায় আবার এ বাড়িতে পা দিয়া চোখে সে দেখিয়াছিল অন্ধকার। একি অবস্থা বাড়ি-ঘরের? বাড়িতে মানুষ কই? লণ্ঠন দু'টা ধোঁয়া ছাড়িতেছে, উঠানে পোড়া কয়লা, ছাই ও হাজার রকম

জঞ্জালের গাদা, দেয়ালে দেয়ালে ঝুল, পায়ের তলে ধূলাবালির স্তর। আর একঘরে মরমর একটা মানুষ।

সে মন্দাকিনী।

শীতল বলিয়াছিল, সব দেখে শুনে নাও। এবার থেকে সব ভার তোমার।

বলিয়া সে উধাও হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় খাবার কিনিতে।—এ বাড়িতে রান্নার কোনো ব্যবস্থা আছে, শ্যামা তাহা ভাবিতে পারে নাই। সেইখানে, ভিতরের রোয়াকে তাহার ট্রাঙ্কটার উপর বসিয়া, ভয়ে ও বিষাদে শ্যামার কান্না আসিতেছে, এমন সময় সদরের খোলা দরজা দিয়া বাড়িতে ঢুকিয়াছিল লম্বা-চওড়া যোয়ান একটা মানুষ।

সে রাখাল। মন্দাকিনীর স্বামী।

এই রাখালের সাহায্য না পাইলে শ্যামা তাহার নূতন জীবনের সঙ্গে নিজেকে কিভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইত, জানিবার উপায় নাই, কারণ রাখালের সাহায্য সে পাইয়াছিল। শুধু সাহায্য নয়, দরদ ও সহানুভূতি। এতদিন রাখাল যে সব ব্যবস্থা করিতে পারিত কিন্তু করে নাই, এবার শ্যামার সঙ্গে সমস্তই সে করিয়া ফেলিল। প্রথমে বাড়িঘর সাফ হইল। তারপর আসিল কুকারের বদলে পাচক, ঠিকা ঝির বদলে দিবারাত্রির পরিচারিকা। হাট-বাজার রান্না-খাওয়া সব অনেকটা নিয়মিত হইয়া আসিল।

মন্দার চিকিৎসার জন্য রাখাল আরও পাঁচ-ছয় মাস এখানে ছিল। সে সময়টা শ্যামার বড় সুখে কাটিয়াছিল। সে সময়মত স্নানাহার করে কি না রাখাল সেদিকে নজর রাখিত, হাসি-তামাসায় তাহার বিষণ্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিত, শ্যামার বয়সোচিত ছেলেমানুষীগুলি সমর্থন পাইত তারই কাছে। শীতলের মাথায় যে একটু ছিট আছে এটা শ্যামা গোড়াতেই টের পাইয়াছিল। শীতলকে সে বড় ভয় করিত, পুরানো হইয়া আসিলেও এখন পর্য্যন্ত সে ভয় তাহার রহিয়া গিয়াছে। শীতলের না ছিল নেশার সময়-অসময়, না ছিল খেয়ালের অন্ত ও মেজারের ঠিক-ঠিকানা। প্রথম ছেলেকে কোলে পাইয়া শ্যামা পূর্ব্ববর্ত্তী সাতটা বছরের ইতিহাস খুঁতুড়েই অনেকবার স্মরণ করিয়াছে—যে সব দোষের জন্য শীতল তাহাকে শাস্তি দিয়াছিল তাহা মনে করিয়া ভুলিবার নয়—শীতল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল নিজের এমন একটিমাত্র লঘু অপরাধের কথা যদি মনে পড়িয়া যায়, এই আশায়। শীতলের কাছে তাহার কোন ত্রুটির মার্জনা না থাকাটা ছিল এত বড় নিরেট সত্য! কেবল রাখালের কাছেই শ্যামার অপরাধও ছিল না, ত্রুটিও ছিল না। রাখালের এই সহিষ্ণুতা শ্যামার কাছে আরও পূজ্য হইয়া উঠিবার অন্য একটি কারণ ছিল। সে মন্দার গালাগালি। মন্দার অসুখটা ছিল মারাত্মক। স্বভাবও তাহার হইয়া উঠিয়াছিল মারাত্মক। মন্দার পান হইতে চুনটি শ্যামা কখনো খসাইত না বটে—পান মন্দা খাইত না, কারণ পান খাওয়ার ক্ষমতা তাহার ছিল না—অনুরূপ তুচ্ছ অপরাধে চিঁ চিঁ করিয়া সে এত এবং এমন সব খারাপ কথা বলিত যে, শ্যামার মন তিক্ত হইয়া যাইত। শীতলের কোলে গরম চা ফেলিয়া (ভয়ে) গালে একটা চড় খাওয়ার পরক্ষণেই বার্লি দিতে পাঁচ মিনিট দেরি করার জন্য (গালে চড় খাইলে মিনিট পাঁচেক না কাঁদিয়া সে পারিত না) মন্দার গাল খাইয়া নিজেকে যখন শ্যামার বিনামূল্যে কেনা দাসীর চেয়ে কম দামী মনে হইত, রাখাল তখন তাহাকে কিনিয়া লইত দু'টি মিষ্টি কথা দিয়া।

শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতি নয়, রাখাল তাহার অনেক লাঞ্ছনাও বাঁচাইয়া চলিত। কতদিন গভীর রাত্রিতে শীতল বাড়ি ফিরিলে (বন্ধুরা ফিরাইয়া দিয়া যাইত) রাখাল তাহাকে বাহিরে আটকাইয়া রাখিয়াছে, শ্যামার কত অপরাধের শাস্তি দিতে আসিয়া শীতল দেখিয়াছে রাখাল সে অপরাধের অংশীদার, শ্যামাকে শাসন করিবার উপায় নাই। শীতলের কত অসম্ভব সেবার আদেশ রাখাল যাচিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে এভাবে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা বিপজ্জনক, বিশেষ স্ত্রীটির যদি বয়স বেশী না হয়। স্বামী নানারকম সন্দেহ করিয়া বসে। কিন্তু রাখাল ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চালাকিতে সংসারে শ্যামা তার জুড়ি দেখে নাই। যেসব আশ্চর্য্য কৌশলে শীতলকে সে সামলাইয়া চলিত, শ্যামাকে আড়াল করিয়া রাখিত, আজও মাঝে মাঝে অবাক হইয়া শ্যামা সে সব ভাবে। মন্দা সুস্থ হইয়া উঠিলে রাখাল তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিল বনগাঁ। কলিকাতায় এত আপিস থাকিতে বনগাঁয়ে তাহার চাকরী করিতে যাওয়া শ্যামা পছন্দ করে নাই। একদিন, রাখালদের চলিয়া যাওয়ার আগের দিন, ওই কথা লইয়া রাগারাগিও সে করিয়াছিল। বয়স তো শ্যামার বেশি ছিল না। জগতে কারো স্নেহে যে কারো দাবী জন্মে না এটা সে জানিত না। আকুল আগ্রহে বিনা দাবীতেই স্বামীর চেয়ে আপনার লোকটিকে সে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। রাখাল চলিয়া গেলে সে দু'-চার দিন চোখের জল ফেলিয়াছিল কি না, আজ, প্রথম সন্তানের মা হওয়ার পর, শ্যামার আর তাহা স্মরণ নাই। সমস্ত নালিশ সে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলিকে হয়ত সে রহস্যে ঢাকিয়া রাখিতে ভালবাসে, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। যতই আপনার হইয়া উঠুক, রাখালকে শ্যামা একফোঁটা বুঝিত না, লোকটার প্রকাণ্ড শরীরে যে মনটি ছিল তাহা শিশুর না সয়তানের কোনদিন তাহা সঠিক জানিবার ভরসা শ্যামা রাখে না। তখন দ্বিপ্রহরে গৃহ থাকিত নির্জন, সন্ধ্যার পর দু'টি ভাঙ্গা লণ্ঠনের আলোয় বাড়ির অর্দ্ধেকও আলো হইত না। শীতল যেদিন রাত্রে দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিত,

দাওয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে করিতে নিয়মাধীন জীবনযাপন স্বভাবতই শ্যামার কাছে অবাস্তব হইয়া উঠিত,—বয়স তো তাহার বেশি ছিল না। সুতরাং রাখালকেও তাহার মনে হইত নির্মম, মনে হইত লোকটা স্নেহ করে, কিন্তু স্নেহের প্রত্যাশা মিটায় না।

শীতলের তখন নিজের একটা প্রেস ছিল, মন্দ আয় হইত না। তবু অভাব তাহার লাগিয়াই থাকিত। শীতলের মাথায় ছিট ছিল রকমারি, অর্থ সম্বন্ধে একটা বিকৃত উদাসীনতা ছিল তার মধ্যে সেরা। তাহার মনকে বিশ্লেষণ করিলে যোগাযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কেবল, সে চেষ্টা করিবার মত অসাধারণ মানসিক বৈশিষ্ট ইহা নয়। টাকার প্রতি মমতার অভাবটা অনেকেই নানা উপায়ে ঘোষণা করিয়া থাকে। শীতলের উপায়টা ছিল বিকারগ্রস্ত—তাহা ভীরুতার ও দুর্বলতার বিষে বিষাক্ত। যেসব বেকার দল চিরকাল বুদ্ধিমানদের ভোজ দিয়া আসিয়াছে, সে ছিল তাদের রাজা। বন্ধুরা পিঠ চাপড়াইয়া তাহার মনকে গড়ের মাঠের সঙ্গে তুলনা করিত, তাই পাছে কেহ টের পায় যে, মন তাহার আসলে বড়বাজারের গলি, এই ভয়ে সর্বদা সে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ফেরত পাইবে না জানিয়া টাকা ধার দিত সে, থিয়েটারের বক্স ভাড়া করিত সে, মদ ও আনুষঙ্গিকের টাকা আসিত তাহারই পকেট হইতে। বিকালের দিকে প্রেসের ছোট আপিসটিতে হাসিমুখে সিগারেট টানিতে টানিতে দু'-চার জন বন্ধুর আবির্ভাব হইলে ভয়ে তাহার মুখ কালো হইয়া যাইত। পাগলামি ছিল তার এইখানে। সে জানিত বোকা পাইয়া সকলে তাহার ঘাড় ভাঙ্গে, তবু ঘাড় ভাঙিতে না দিয়াও সে পারিত না।

শেষে, শ্যামার বিবাহের প্রায় চার বছর পরে, শীতলের প্রেস বিক্রয় হইয়া গেল। আবোল-তাবোল যেমনি খরচ করুক, আয় ভাল থাকায় এতকাল মোটামুটি একরকম চলিয়া যাইত, প্রেস বিক্রয় হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের কষ্টের সীমা ছিল না। বাড়িটা পৈত্রিক না হইলে মাঝখানে কিছুদিনের জন্য হয়ত তাহাদের গাছতলাই সার করিতে হইত। এই অভাবের সময় শ্যামার মামার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার শোক শীতলের উথলিয়া উঠিয়াছিল, সব সময় শ্যামাকে কথার খোঁচা দিয়াই তাহার সাধ মিটিত না। শ্যামার গায়ে তাহার প্রমাণ আছে। প্রথম মা হওয়ার সময় শ্যামার কোমরের কাছে যে মস্ত ক্ষতের দাগটা দেখিয়া বুড়ী দাই আপশোষ করিয়াছিল এবং শ্যামা বলিয়াছিল ওটা ফোঁড়ার দাগ, ছুড়ির ডগাতেও সেটা সৃষ্টি হয় নাই, ছাতির ডগাতেও নয়। ওটা বঁটিতে কাটার দাগ। বঁটি দিয়া শীতল অবশ্য তাহাকে খোঁচায় নাই, পা দিয়া পিঠে একটা ঠেলা মারিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, শ্যামা তখন কুটিতেছিল তরকারী।

তরকারী সে আজো কোটে। সুখে-দুঃখে জীবনটা অমনি হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধ করিবার চাল ও কুটিবার তরকারী থাকার মত চলনসই। অনেকদিন প্রেসের মালিক হইয়া থাকার গুণে একটা প্রেসের ম্যানেজারির চাকরী শীতল মাসছয়েক চেষ্টা করিয়াই পাইয়াছিল। শ্যামা প্রথমবার মা হওয়ার সময় শীতল এই চাকরীই করিতেছিল।

বিবাহের সাত বছর পরে প্রথম ছেলে হওয়াটা খুব বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। অমন বিলম্বিত উর্বরতা বহু নারীর জীবনেই আসিয়া থাকে। শ্যামার যেন সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। প্রথম ছেলেকে প্রসব করিতে সে সময় লইল দুদিনের বেশি এবং এই দুটি দিন ভরিয়া বারবার মূর্ছা গেল।

শেষ মূর্ছা ভাঙ্গিবার পর শ্যামা এক মহামুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল। দেহে যেন তাহার উত্তাপ নাই, স্পন্দন নাই, সবগুলি ইন্দ্রিয় অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে। সে বাতাসের মত হাল্কা। শীতকালের পুঞ্জীভূত কুয়াশার মত সে যেন আলগোছে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার সমগ্র বিস্ময়কর অস্তিত্ব ব্যাপিয়া এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা, মৃদু অথচ অসহ্য, দুর্জ্ঞেয় অথচ চেতনাময়। একবার তাহার মনে হইল, সে বুঝি মরিয়া গিয়াছে, ব্যথা দিয়া ফাঁপানো এই শূন্যময় অবস্থাটি তাহার মৃত্যুরই পরবর্তী জীবন। ভোঁতা ক্লান্তিকর যাতনা তাহার অশরীরী আত্মার দুর্ভোগ।

তারপর চোখ মেলিয়া প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। চোখের সামনে সাদা দেয়ালে একটি শায়িত মানুষের ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার হাতখানেক উপরে জানালার একটা পাট অল্প একটু ফাঁক করা। ফাঁক দিয়া খানিকটা কালো আকাশ ও কতগুলি তারা দেখা যাইতেছে। একটা গরম ধোঁয়াটে গন্ধ শ্যামার নাকে লাগিয়াছিল। কাছেই কাদের কথা বলিবার মৃদু শব্দ। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর দেয়ালের ছায়াটা তাহার নিজের বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। এমনভাবে সে শুইয়া আছে কেন? তাহার কি হইয়াছে? কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ কিসের? কথা বলিতেছে কারা?

হঠাৎ সব কথাই শ্যামার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পাশ ফিরিতে গিয়া সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের মত তীব্র একটা ব্যথা সঞ্চারিত হইয়া যাওয়ায় সে আবার দেহ শিথিল করিয়া নিয়াছিল। মনের প্রশ্নকে বিহ্বলের মত উচ্চারণ করিয়াছিল এই অর্থহীন ভাষায়: কোথায় গেল, কই? কে যেন জবাব দিয়াছিল: এই যে বৌ এই যে, মুখ ফিরিয়ে তাকা হতভাগি।

কাছে বসিয়াও অনেক দূর হইতে যে কথা বলিয়াছিল, সেই বোধ হয় শ্যামার একখানা হাত তুলিয়া একটি কোমল স্পন্দনের উপর রাখিয়াছিল। জাগিয়া থাকিবার শক্তিটুকু শ্যামার তখন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। সে অতিকষ্টে একটু পাশ ফিরিয়াছিল।

দেখবি বৌ? এই ত্যাখ,—

এবার স্বর চিনিতে পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে শ্যামা বলিয়াছিল, ঠাকুরঝি?

মন্দাকিনী আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, আর ভাবনা কি বৌ? ভালয় ভালয় সব উৎরে গিয়েছে। খোকা লো, ঘর আলো করা খোকা হয়েছে তোর।

মাথা তুলিয়া একবার মাত্র খানিকটা রক্তিম আভা ও দুটি নিমীলত চোখ দেখিয়া শ্যামা বালিশে মাথা নামাইয়া চোখ বুজিয়াছিল।

শ্যামার যে সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। পরদিন সকালেই সে তাহার প্রথম ছেলেকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিয়া নিজেকে শ্যামার অনেকটা সুস্থ মনে হইয়াছিল। ঘরে তখন কেহ ছিল না। কাত হইয়া শুইয়া পাশে শায়িত শিশুর মুখের দিকে এক-মিনিট চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল, ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখখানা তাহার চোখে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। কতটুকু মুখ, কী পেলবতা মুখের! মাথা ও ভুরুতে চুলের শুধু আভাষ আছে। বেদানার জমানো রসের মত টুলটুলে আশ্চর্য দুটি ঠোট। একি তার ছেলে? এই ছেলে তার? গভীর ঔৎসুক্য সন্তর্পণে শ্যামা হাত বাড়াইয়া ছেলের চিবুক ও গাল ছুঁইয়াছিল, বুকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন কোথা হইতে আসিল? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমাঞ্চ। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রসবের পর নাড়ীসংযোগ-বিচ্ছিন্ন সন্তানের জন্য একি কাণ্ড ঘটিতে থাকে মানুষের মধ্যে? আশ্বিনের প্রভাতটি ছিল উজ্জ্বল। দুদিন দুরাত্রির মরণাধিক যন্ত্রণা শ্যামা দুঃস্বপ্নের মত ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে তাহার আনন্দের সীমা নাই।

তখন ঘটিয়াছিল এক কাণ্ড।

ঘুম ভাঙিয়া হঠাৎ শিশু যেন কি-রকম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। টানিয়া টানিয়া শ্বাস নেয়, চঞ্চলভাবে হাত পা নাড়ে, চোখ কপালে তুলিয়া দেয়। ভয়ে শ্যামা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাকিয়াছিল, ঠাকুরঝি গো, ও ঠাকুরঝি!

রান্না ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া মন্দা হইয়াছিল রাগিয়া আগুন!

চোখ নেই বৌ? সরো তুমি, সরো। গলা শুকিয়ে এমন করছে গো, আহা। মধুর বাটি গেল কোথা? মিছরির জল? দিয়েছো উল্টে? আশ্চর্যি!

তাকের উপর শিশিতে মধু ছিল। ছোট একটি বাটিতে মধু ঢালিয়া আঙ্গুলে করিয়া ছেলের মুখ ভিজাইয়া চোখের পলকে মন্দা তাহাকে শান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। বিড় বিড় করিয়া বলিয়াছিল, আনাড়ি বলে আনাড়ি, এমন আনাড়ি জন্মে চোখে দেখিনি মা। কচি ছেলে, পলকে পলকে গলা শুকোবে, তাও যদি না টের পাও, তবে মা হওয়া কেন? দাইমাগীও মানুষ কেমন? তামাকপাতা আনতে গিয়ে বুড়ী হ'ল।

এই তুচ্ছ ঘটনাটি শ্যামার মনে গাঁথা হইয়া আছে, প্রথম সন্তানকে সে যে বারোদিনের বেশি বাঁচাইতে পারে নাই, তার সবটুকু অপরাধ চিরকাল শ্যামা নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সন্তান পরিচর্যার কিছুই সে যে তখন জানিত না, এই ঘটনাটি শ্যামার কাছে হইয়া আছে তাহার আদিম প্রমাণের মত। তখন অবশ্য সে জানিত না, বারোদিন পরে পেট ফুটিয়া ছেলে তাহার মরিয়া যাইবে। মন্দা চলিয়া গেলে ছেলের দিকে চোখ রাখিয়া সে শক্তভাবেই শুইয়া ছিল, গলা শুকানোর লক্ষণ দেখা গেলে মুখে মধু দিবে। অন্যমনে সে অনেক কথা ভাবিয়াছিল। দরজা দিয়া দুটি চড়াই পাখী ঘরে ঢুকিয়া খানিক এদিক ওদিক ফড়ফড় করিয়া উড়িয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, জানালা দিয়াই রোদ আসিয়া পড়িয়াছিল শ্যামার শিয়রে। জীবনমৃত্যুর কথা শ্যামার তখন মনে পড়ে নাই, ভগবানের কাণ্ডকারখানা বুঝিতে না পারিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বুকে তাহার দুদিন দুধ আসিবে না। নবজাত শিশুর জন্য ভগবান দুদিনের উপবাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দার হুকুম স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে ছেলের মুখে সে শুষ্ক স্তন দিয়াছিল। সন্তানের ক্ষুধার আকর্ষণ অনুভব করিয়া ভাবিয়াছিল, হয়ত এ ব্যবস্থা ভগবানের নয়। বুকে তাহার যথেষ্ট মমতার সঞ্চার হয় নাই, তা হওয়ার আগে দুধ আসিবে না।

তবু, কোন্ মা সন্তানের জীবনকে অস্থায়ী মনে না করিয়া পারে? বেলা বাড়িলে পাড়ার কয়েকবাড়ির মেয়েরা শ্যামার ছেলেকে দেখিতে আসিয়া যখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিল, শ্যামার তখন যেমন গর্ব হইয়াছিল, তেমনি হইয়াছিল ভয়। ভয় হইয়াছিল এইজন্য, দেবতারা গোপনে শোনেন। গোপনে শুনিয়া কোন্ দেবতার হাসিবার সাধ হয়, কে বলিতে পারে? তাই বিনয় প্রকাশের জন্য নয়, দেবতার গোপন কানকে ফাঁকি দিবার জন্য শ্যামা বলিয়াছিল: কাণাখোড়া যে হয়নি মাসিমা, তাই ঢের। বলিয়া তাহার এমনি আবেগ আসিয়াছিল যে ঘর খালি হওয়া মাত্র ছেলেকে সে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

ছেলের গলা শুকানোর স্মৃতি মনে পুষিয়া রাখিবার আরেকটি কারণ ঘটিয়াছিল সেদিন রাত্রে। গভীর রাত্রে।

সারাদুপুর ঘুমানোর মত স্বাভাবিক কারণেও নিশীথ জাগরণ মানুষের মনে অস্বাভাবিক উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দূরে কোথায় পেটা ঘড়িতে তখন বারোটা বাজিয়াছে। শ্যামার কল্পনা একটু উদ্ভ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। ঘরের একদিকে বুড়ী দাই অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কোণে জ্বলিতেছিল প্রদীপ। এগারটি দিবারাত্রি এই প্রদীপ

অনির্বাণ জ্বলিবে, জাতকের এই প্রদীপ্ত প্রহরী। শিয়রের কাছে মেঝেতে খড়ি দিয়া মন্দা দুর্গানাম লিখিয়া রাখিয়াছে। সকালে আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, কেহ না মাড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যায় আবার দুর্গানামের রক্ষাকবচ লিখিয়া রাখিবে। আঁতুড়ের রহস্য ভয়ে পরিপূর্ণ: এমনি কত তাহার প্রতিবিধান। হঠাৎ শ্যামার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হইয়াছিল। একটা অদৃশ্য জনতা যেন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চারিপাশে যেন তাহার অলক্ষ্য উপস্থিতি, অশ্রুত কলরব। সকলেই যেন খুসি, সকলের অনুচ্চারিত আশীর্বাদে ঘর যেন ভরিয়া গিয়াছিল। শ্যামার বুঝিতে বাকী থাকে নাই, এঁরা তাহার সন্তানেরই পূর্ব্বপুরুষ, ভিড় করিয়া সকলে বংশধরকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু একি? বংশধরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার দিকে এমন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সকলে চাহিতেছেন কেন? ভয়ে শ্যামার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। হাতজোড় করিয়া সে ক্ষমা চাহিয়াছিল সকলের কাছে। মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, আর কখনো সে মা হয় নাই, সকালে ছেলে যে তাহার গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছিল, এ অপরাধ যেন তাঁহারা না নেন, আর কখনো এরকম হইবে না। জননীর সমস্ত কর্তব্য সে তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলিবে।

তারপর ছেলে মানুষ করার বিপুল কর্তব্য আঁতুড়েই নিখুঁতভাবে সুরু করিয়া দিতে শ্যামার আগ্রহের সীমা ছিল না। নিজে সে বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া বসিতে গেলে মাথা ঘুরিত। শুইয়া শুইয়া সে খুঁতখুঁত করিত, এটা হ'ল না ওটা হ'ল না,—মন্দা বিরক্ত হইত, মাঝে মাঝে রাগিয়াও উঠিত। কিন্তু শ্যামার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। ছেলের অফুরন্ত সেবার এতটুকু ত্রুটি ঘটিলে সে শুধু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে বাকি রাখিত। ছেলেকে খাওয়ানো হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল না, কাঁদিলে মুখে স্তন তুলিয়া দিলে চুক্‌চুক্ করিয়া টানিয়া পেট ভরিয়া আসিলে সে আপনি ঘুমাইয়া পড়িত। খুঁটিনাটি সেবাই ছিল অনন্ত। স্নান করাইয়া চোখে কাজল দিলেই শুধু চলিত না, কি কারণে ছেলের চোখে বড় পিঁচুটি পড়িতেছিল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিষ্কার ভিজা ন্যাকড়ায় তাহা মুছিয়া লইতে হইত। মিনিটে মিনিটে আবিষ্কার করিতে হইত কাঁথা বদলানোর প্রয়োজনকে। ছেলের বুকে একটু সর্দি বসিয়াছিল, ব্যাপারটা সামান্য বলিয়া কেহ তেমন গ্রাহ্য করে নাই, কেবল শ্যামার তাগিদে লণ্ঠনের উপর গরম তেলের বাটি বসাইয়া বার বার বুকে মালিশ করিয়া দিতে হইত। এমনি আরও কত কি। নাড়ী কাটিবার দোষেই সম্ভবত ছেলের নাভিমূল চার দিনের দিন পাকিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল। শ্যামা নিজে এবং মন্দা ও বুড়ী দাই এই তিনজনে ক্রমাগত ছেলের নাভিতে সেক দিয়াছিল।

দিনের বেলাটা একরকম কাটিয়া যাইত, শ্যামার ভয় করিত রাত্রে। পূর্বপুরুষদের আবির্ভাবের ভয় নয়, তাঁরা একদিনের বেশি আসেন নাই, —অসম্ভব কাল্পনিক সব ভয়। শ্যামা যেন কার কাছে গল্প শুনিয়াছিল এক ঘুম-কাতুরে মার, ঘুমের ঘোরে যে একদিন আঁতুড়ে নিজের ছেলেকে চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। নিজের ঘুমন্ত অবস্থাকে শ্যামা বিশ্বাস করিতে পারিত না। নাকে মুখে পাতলা কাপড় এক মুহূর্তের জন্য চাপা পড়িলে যে ক্ষীণ অসহায় প্রাণীটি দম আটকাইয়া মরিতে বসে, ঘুমের মধ্যে একখানা হাতও যদিও সে তাহার উপর তুলিয়া দেয়, সে কি আর তবে বাঁচিবে? শ্যামা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিত না। পাশ ফিরিলেই ছেলেকে পিষিয়া ফেলিয়াছে, ভাবিয়া চমকিয়া জাগিয়া যাইত। কান পাতিয়া সে ছেলের নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে চেষ্টা করিত। মনে হইত, নিশ্বাস যেন পড়িতেছে। কানকে বিশ্বাস করিয়া তবু সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। মাথা উঁচু করিয়া ছেলেকে দেখিত, নাকের নিচে গাল পাতিয়া নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করিত। তারপর ছেলের বুকে হাত রাখিয়া স্পন্দন গুণিত—ধুক্ ধুক্। হঠাৎ তাহার নিজের হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিত। একি, ছেলের হৃৎস্পন্দন যেন মৃদু হইয়া আসিয়াছে!

নিশীথ স্তব্ধতায় এই আশঙ্কা শ্যামাকে পাইয়া বসিত। সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, এতটুকু একটা জীব নিজস্ব জীবনীশক্তির জোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। শ্যামার কেবলি মনে লইত, এই বুঝি দুর্বল কলকব্জাগুলি থামিয়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একদিন এমনি ক্ষুদ্র এমনি ক্ষীণপ্রাণ ছিল, দিনের বেলা এ যুক্তি শ্যামার কাজে লাগিত, রাত্রে তাহার চিন্তাধারা কোন যুক্তির বালাই মানিত না, ভয়ে ভাবনায় সে আকুল হইয়া থাকিত। সৃষ্টির রহস্যময় স্রোতে যে ভাসিয়া আসিয়াছে, নিঃশব্দ নির্বিকার রাত্রির অজানা বিপদের কোলে সে মিশিয়া যাইবে, শ্যামার ইহা স্বতঃসিদ্ধের মত মনে হইত। ছেলে কোলে সে জাগিয়া বসিয়া থাকত। দুর্বলতায় তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিত। প্রত্যাহত নিদ্রা চোখের সামনে নাচাইত ছায়া। প্রদীপের নিষ্কম্প শিখাটি তাহাকে আলো দিত, ভরসা দিত না।

এই আশঙ্কা ও দুর্ভাবনার ভাগ শ্যামা কাহাকেও দিত না। ভাগ লইবার কেহ ছিলও না। এক ছিল শীতল, আঁতুড়ের ধারে-কাছেও সে ভিড়িত না। ষষ্ঠীপূজার রাত্রে সে কেবল একবার নেশার আবেশে কি মনে করিয়া আঁতুড়ে ঢুকিয়াছিল। ছেলের শিয়রের কাছে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল এবং অকারণে হাসিয়াছিল!

শ্যামা বলিয়াছিল, তুমি কি গো? বিছানা ছুঁয়ে দিলে?

শীতল বলিয়াছিল, খোকাকে একটু কোলে নিই।······ বলিয়া ছেলের বগলের নিচে হাত দিয়া তুলিতে

গিয়াছিল। শ্যামা ঝট্‌কা দিয়া তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল. কি কর? ঘাড় ভেঙে যাবে যে!

ঘাড় শক্ত হয়নি?

নাকে গন্ধ লাগায় এতক্ষণে শ্যামা টের পাইয়াছিল। গিলেছ বুঝি? তুমি যাও বাবু এখান থেকে, যাও।

নেশা করিলে শীতলের মেজাজ জল হইয়া করুণ রসে মন থমথম করে। সে ছলছল চোখে বলিয়াছিল, আর করব না শ্যামা। যদি করি তো খোকার মাথা খাই!

শ্যামা বলিয়াছিল, কথার কি ছিরি। যাও না বাবু এখান থেকে!

শীতল বড় দমিয়া গিয়াছিল। যেন কাঁদিয়াই ফেলিবে। খানিক পরে শ্যামার বালিশটাকে শোনাইয়া বলিয়াছিল, একবার কোলে নেব না বুঝি!

শ্যামা বলিয়াছিল, কোলে নেবে তো আসনপিঁড়ি হয়ে বোসো। তুলবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

শীতল আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলে শ্যামা সন্তর্পণে ছেলেকে তাহার কোলে শোয়াইয়া দিয়াছিল। লোকে যে ভাবে অচল দুয়ানি দ্যাখে ঝুঁকিয়া তেমনিভাবে ছেলের মুখ দেখিয়া শীতল বলিয়াছিল, যমজ নাকি, এঁ্যা?

নেশার সময় মাঝে মাঝে শীতলের চোখের সামনে একটা জিনিস দু'টা হইয়া যাইত।

শুধু সেই একদিন। ছেলে কোলে করার সাধ শীতলের আর কখনো আসে নাই। যে ক'দিন ছেলে বাঁচিয়াছিল আনন্দ ও ভয় উপভোগ করিয়াছিল শ্যামা একা। পাড়ায় শ্যামার সখী কেহ ছিল না। ছেলে হওয়ার খবর পাইয়া কয়েক বাড়ির কৌতূহলী মেয়েরা একবার দেখিয়া গিয়াছিল এই পর্যন্ত। শ্যামা মন খুলিয়া কথা বলিতে পারে এমন কেহ আসে নাই। একজন, যে কখনো এ বাড়িতে পা দেয় নাই, শ্যামার সঙ্গে ভাব করিতে চাহিয়াছিল। সে পাড়ার মহিম তালুকদারের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। পাড়ায় মহিম তালুকদারের চেয়ে বড়লোক কেহ ছিল না। ভাব করা দূরে থাক শ্যামাকে দেখিতে আসাটাই বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষে এমন অসাধারণ ব্যাপার যে শ্যামা শুধু বিনয় করিয়াছিল, ভাব করিতে পারে নাই।

তখন শীতল ছাপাখানায় গিয়াছে, মন্দা রান্না শেষ করিয়া শ্যামার ছেলেকে স্নান করানোর আয়োজন করিতেছে। কে জানিত এমন অসময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বেড়াইতে আসিবে—গয়না-পরা দাসীকে সঙ্গে করিয়া?

শ্যামা বলিয়াছিল, ও ঠাকুরঝি, ওঘর থেকে কার্পেটের আসনটা এনে বসতে দাও।

মন্দা বলিয়াছিল, কার্পেটের আসন তো বাইরে নেই বৌ, তোরঙ্গে তোলা আছে।

মন্দার বুদ্ধির অভাবে শ্যামা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। একটা তুচ্ছ কার্পেটের আসন তাও যে তাহারা তোরঙ্গে তুলিয়া রাখে বিষ্ণুপ্রিয়াকে এ কথাটা কি না শোনাইলেই চলিত না!

খুলে আন না?

দাদা চাবি নিয়ে ছাপাখানায় চলে গেছে বৌ।

অগত্যা একটা মাদুর পাতিয়াই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসিতে দিতে হইয়াছিল। মাদুরে বসিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনই অসুবিধা হয় নাই, কেবল শ্যামার মনের মধ্যে এই কথাটা খচ খচ করিয়া বিঁধিয়াছিল যে এত বড়লোকের বৌ যদি বা বাড়ি আসিল তাহাকে বসিতে দিতে হইল ছেঁড়া মাদুরে।

গরম জল কি হবে ঠাকুরঝি?—বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

ছেলেকে নাওয়াবো।

নাওয়ান, দেখি বসে বসে।

মন্দা হাসিয়া বলিয়াছিল, দেখাও হবে শেখাও হবে, না? আপনার দিনও তো ঘনিয়ে এল।—বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় মুক্তার মালা আর কানে হীরার দুল চোখে পড়ায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মন্দা আবার বলিয়াছিল, তবে আপনি কি আর নিজে ছেলে নাওয়াবেন, ছেলে নাওয়াবার ক'টা দাই থাকবে আপনার!

বিষ্ণুপ্রিয়া এ ধরণের কত মন্তব্য শুনিয়াছে। মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ঠাকুরঝি?

মেয়ে নেই, তিনটি ছেলে, দু'টি যমজ। কোলেরটিকে সঙ্গে এনেছি, বড় দুটি শাশুড়ীর কাছে আছে।

স্নানের জলে পাঁচটি দূর্বা ছাড়িয়া মন্দা জানালা বন্ধ করিয়াছিল। শ্যামা উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিয়াছিল, জল বেশী গরম নয় তো ঠাকুরঝি?

মন্দা বলিয়াছিল, আমি কি পাগল বৌ, গরম জলে তোমার ছেলেকে পুড়িয়ে মারব?

শ্যামা বলিয়াছিল, নরম চামড়া যে ঠাকুরঝি, একটু গরম হলেই সইবে না।—জলে হাত দিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল, জল যে দিব্যি গরম গো।

জল বুঝি ঠাণ্ডা হতে জানে না বৌ?

ইহার পরেই বিষ্ণুপ্রিয়ার বসিবার ভঙ্গি অত্যন্ত শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। শ্যামার মধ্যে সে যেন হঠাৎ কি আবিষ্কার করিয়াছে। সে সহজে শ্যামার সঙ্গ ছাড়িবে না। বাড়ি হইতে বার বার তাগিদ আসিয়াছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ি যায় নাই। বসিয়া বসিয়া শ্যামার সঙ্গে রাজ্যের গল্প করিয়াছিল।

কয়েকদিন পরে বিষ্ণুপ্রিয়া আবার আসিয়াছিল। কেহ টের পায় নাই যে সান্ত্বনা দিতে নয়, সে ছেলের জন্য শ্যামার শোক দেখিতে আসিয়াছিল। শ্যামার প্রথম সন্তান বাঁচিয়াছিল বারো দিন।

দুই

দু'বছরের মধ্যে শ্যামার কোলে আবার ছেলে আসিল। সেই বাড়িতে, সেই ছোট ঘরে শরৎকালের তেমনি এক গভীর নিশীথে। কিন্তু মানুষের জীবনের অভাবের পূরণ আছে ক্ষতির পূরণ নাই বলিয়া প্রথম সন্তানকে শ্যামা ভুলিতে পারে নাই। ছেলে মরিয়া যাওয়ার পর কয়েকমাস সে মুহ্যমানা হইয়াছিল, এই অবস্থাটি অতিক্রম করিতে তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল এখনো তাহা স্থায়ী হইয়া আছে। সন্তানের আবির্ভাবে এবার আর তাহার সেই অসংযত উল্লাস আসে নাই, উদ্দাম কল্পনা জাগে নাই। সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। সংসারধর্ম করিলে ছেলেমেয়ে হয়, ছেলেমেয়ে হইলে মানুষ সুখী হয়, এবারের ছেলে হওয়াটা তাহার কাছে শুধু এই। এতে না আছে বিস্ময়, না আছে উন্মত্ততা;— চোখের পলকে একটা বিরাট ভবিষ্যতকে গড়িয়া তুলিয়া বহিয়া বেড়ানো, ক্ষণে ক্ষণে নব নব কল্পনার তুলি দিয়া এই ভবিষ্যতের গায়ে রঙ মাখানো, আর সর্বদা ভয়ে ও আনন্দে মশগুল হইয়া থাকা, এসবই কিছুই নাই। এবারও আঁতুড়ে এগারোটি দিবারাত্রি অনির্বাণ দীপ জ্বলিয়াছিল, কিন্তু শ্যামার এবার একেবারেই ভয় ছিল না, শুধু ছিল গভীর বিষণ্ণতা। এবার পূর্বপুরুষেরা গভীর রাত্রে শ্যামার ছেলেকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসেন নাই। ছেলের ক্ষীণ বক্ষস্পন্দন হঠাৎ একসময় থামিয়া যাইতে পারে শ্যামার এ আশঙ্কা ছিল, কিন্তু আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সে জাগিয়া রাত কাটায় নাই। ও বিষয়ে তাহার কেমন একটা উদাসীনতা আসিয়াছে। ভাবিয়া লাভ নাই, উতলা হইয়া লাভ নাই, ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবে না। যিনি দেন তিনিই নেন। তাঁর দেওয়াকে যখন ঠেকানো যায় না, নেওয়াকে ঠেকাইবে কে

সে শীতলকে স্পষ্ট বলিয়াছে: এবার আর যত্নটত্ন করব না বাবু।

অযত্ন করা কি ভাল হবে?

অযত্ন করব না তো। নাওয়াবো, খাওয়াবো, যেমন দরকার সব করব। তার বেশি কিছু নয়। কি হবে করে?

শীতল কিছু বলে নাই। কি বলিবে?

শ্যামা আবার বলিয়াছে, সেবার আমার দোষেই তো গেল।

শীতল একটু ভাবিয়া বলিয়াছে, এবার কিন্তু পয় আছে শ্যামা। হতে না হতে কমল প্রেসের চাকরিটা পেলাম।

বোলো না বাবু ওসব। পয় না ছাই। আগে বাঁচুক।

কিন্তু কথাটা তুচ্ছ করিবার মত নয়। পয়মন্ত ছেলে? হয় তো তাই। সব অকল্যাণ ও নিরানন্দের অন্ত করিতে আসিয়াছে হয় তো। শ্যামা হয় তো আর দুঃখ পাইবে না।

এরা সময় মত মাইনে দেবে?

দেবে না? কমল প্রেস কত বড় প্রেস জানো।

এবার ছেলে তাহার বাঁচিবে শ্যামা যে এ আশা করে না এমন নয়। মানুষের আশা এমন ভঙ্গুর নয় যে একবার ঘা খাইলে চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবু আশাতেই আশঙ্কা বাড়ে। সব শিশুই যদি মরিয়া যাইত পৃথিবীতে এতদিনে তবে আর মানুষ থাকিত না, শ্যামার এই পুরানো যুক্তিটাও এবার হইয়া গিয়াছে বাতিল। সংসারে এমন কত নারী আছে যাদের সন্তান বাঁচে না। সেও যে তাদের মত নয় কে তাহা বলিতে পারে? একে একে পৃথিবীতে আসিয়া তাহার ছেলেমেয়েরা কেউ বারোদিন কেউ ছ'মাস বাঁচিয়া যদি মরিয়া যাইতে থাকে? বলা তো যায় না। এমনি যাদের অদৃষ্ট তাদের এক একটি সন্তান দশ-বারো বছর টিকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন মরিয়া যায় এরকমও অনেক দেখা গিয়াছে। হালদার বাড়ির বড়বৌ দু'বার মৃতসন্তান প্রসব করিয়াছিল, তার পরের সন্তান দুটি বাঁচিয়া ছিল বছরখানেক। শেষে যে মেয়েটা আসিয়াছিল তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। কি আদরেই মেয়েটা বড় হইয়াছিল! তবু তো বাঁচিল না।

নৈসর্গিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা এবার কম করা হয় নাই। শ্যামা গোটা পাঁচেক মাদুলি ধারণ করিয়াছে, কালীঘাট ও তারকেশ্বরে মানত করিয়াছে পূজা। মাদুলিগুলির মধ্যে তিনটি বড় দুর্লভ মাদুলি। সংগ্রহ করিতে শ্যামাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। মাদুলি তিনটির একটি প্রসাদী ফুল, একটিতে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত ভস্ম ও অপরটিতে স্বপ্নাদ্য শিকড় আছে। শ্যামার নির্ভর এই তিনটি মাদুলিতেই বেশি। নিজে সে প্রত্যেক দিন মাদুলি-ধোয়া জল খায়, একটি একটি করিয়া মাদুলিগুলি ছেলের কপালে ছোঁয়ায়। তারপর খানিকক্ষণ সে সত্যসত্যই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।

এবারও মন্দাকিনী আসিয়াছে। সঙ্গে আনিয়াছে তিনটি ছেলেকেই। শ্যামার সেবা করিতে আসিয়া নিজের ছেলের সেবা করিয়াই তাহার দিন-কাটে। এমন আব্দারে ছেলে শ্যামা আর ত্বাখে নাই। ঠাকুরমার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে যমজ ছেলে দুটি বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, এখনো তাহারা এখানে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। বায়না ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে না মিটিলে ঠাকুরমার জন্যই তাহাদের শোক উথলিয়া ওঠে। দিবারাত্রি বায়নারও তাহাদের শেষ নাই। অপরিচিত আবেষ্টনীতে কিছুই বোধ হয় তাহাদের ভাল লাগে না, সর্বদা খুঁতখুঁত করে। কারণে-অকারণে রাগিয়া কাঁদিয়া সকলকে মারিয়া অনর্থ বাধাইয়া দেয়। মন্দা প্রাণপণে তাহাদের তোয়াজ করিয়া চলে। সে যেন দাসী, রাজার ছেলে দুটি দুদিনের জন্য তাহার অতিথি হইয়া সৌভাগ্য ও সম্মানে তাহাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, ওদের তুষ্টির জন্য প্রাণ না দিয়া সে ক্ষান্ত হইবে না। শ্যামা প্রথমে বুঝিতে

পারে নাই, পরে টের পাইয়াছে, এমনি ভাবে মাতিয়া থাকিবার জন্যই মন্দা এবার ছেলে দুটিকে সঙ্গে আনিয়াছে। সেখানে শাশুড়ীকে অতিক্রম করিয়া ওদের সে নাগাল পায় না। সাধ মিটাইয়া ওদের ভালবাসিবার জন্য, আদর যত্ন করিবার জন্য, সেই যে ওদের আসল মা, এটুকু ওদের বুঝাইয়া দিবার জন্য, মন্দা এবার ওদের সঙ্গে আনিয়াছে।

আনিয়াছে চুরি করিয়া।

মন্দাই সবিস্তারে শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিয়াছে। কথা ছিল, শুধু কোলের ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া মন্দা আসিবে, শাশুড়ীর দুচোখের দুটি মণি যমজ ছেলে দুটি, কানু আর কালু, শাশুড়ীর কাছেই থাকিবে। কিন্তু এদিকে কাঁদাকাটা করিয়া স্বামীর সঙ্গে যে গভীর ও গোপন পরামর্শ মন্দা করিয়া রাখিয়াছে, শাশুড়ী তার কি জানেন? মন্দাকে আনিতে গিয়াছিল শীতল, কানু ও কালু ষ্টেশনে আসিয়াছিল বেড়াইতে, রাখাল সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাদের ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য। গাড়ি ছাড়িবার সময় রাখাল একাই নামিয়া গিয়াছিল। কানু ও কালু তখন নিশ্চিন্ত মনে রসগোল্লা খাইতেছে।

শীতল বলিয়াছিল, গাড়ি ছাড়ার সময় হ'ল, ওদের নামিয়ে নাও হে রাখাল।

রাখাল বলিয়াছিল, যাক্ না যাক; মামাবাড়ি থেকে ক'দিন বেড়িয়ে আসুক।

মন্দা বলিয়াছিল, ওরাও যাবে যে দাদা। উনি টিকিট কেটেছেন, এই নাও।

শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিবার সময় মন্দা এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটুকু উদ্ধৃত করিতেও ছাড়ে নাই, বলিয়াছে, দাদা কিছু টের পায় নি বৌ, ভেবেছিল শাশুড়ী বুঝি সত্যি সত্যি শেষে মত দিয়েছে। ফিরে গেলে যা কাণ্ডটা হবে! পেটের ছেলে চুরি করার জন্য আমায় না শেষে জেলে দেয়।

এদিক দিয়া শ্যামার বরাবর সুবিধা ছিল, স্বামীর জননীর খেয়াল মত কখনো তাহাকে পুতুল নাচ নাচিতে হয় নাই। তবু, মাঝে মাঝে শাশুড়ীর অভাবে তাহার কি কম ক্ষোভ হইয়াছে! আর কিছু না হোক, বিপদে আপদে মুখ চাহিয়া ভরসা করিবার সুযোগ তো সে পাইত। মন্দা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না, কেবল কাজ চালাইয়া দেয়। সেবার যে শ্যামার ছেলে মরিয়া গেল সে যদি কাহারো দোষে গিয়া থাকে অপরাধিনী শ্যামা, মন্দার কোন ক্রটি ছিল না। কিন্তু শাশুড়ী থাকিলে তিনিই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, শুধু আঁতুড়ে তাহাকে এবং বাহিরে তাহার সংসারকে সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া ছেলেকে বাঁচাইয়া রাখার ভারও থাকিত তাঁহারই। যে সব ব্যবস্থার দোষে ছেলে তাহার মরিয়া গিয়াছিল সে তাহা বুঝিতে না পারুক শাশুড়ীর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে অবশ্যই ধরা পড়িত। তা ছাড়া, স্বামীর মা তো পর নয় যে ছেলেকে সব দিক দিয়া ঘেরিয়া থাকিলে তাহাকে কোন মায়ের হিংসা করা চলে। মন্দাকে শ্যামা সমর্থন করিতে পারে না।

বলে, ওদের না আনলেই ভাল করতে ঠাকুরঝি।

মন্দা বলে, ভাল দিয়ে আমার কাজ নেই বাবু—সে ডাইনি মাগীর ভাল। আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খাচ্ছেন আর দিনরাত জপাচ্ছেন আমাকে ঘেন্না করতে,—বড় হলে ওরা কেউ আমাকে মানবে? এখনি কেমন ধারা করে দ্যাখো না?

কিন্তু এ'কটা দিনে ওদের তুমি কি করতে পারবে ঠাকুরঝি? ফিরে গেলেই তো যে কে সেই। মাঝ থেকে শাশুড়ীর কতগুলো গালমন্দ খেয়ে মরবে।

মন্দার এসব হিসাব করাই আছে।

একটু চেনা হয়ে রইল। একেবারে কাছে ঘেঁষত না, এবার ডাকলে টাকলে একবার দুবার আসবে।

একদিন বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়াছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি মেয়ে হইয়াছে। মেয়ের জন্মের সময় সেও শ্যামার মত কষ্ট পাইয়াছিল, শ্যামার ভাগ্যের সঙ্গে তাহার ভাগ্যের পার্থক্য কিন্তু সব দিক দিয়াই আকাশ পাতাল, মেয়েটি তাহার মরে নাই, সোনার চামচে দুধ খাইয়া বড় হইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার শরীর খুব খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, কোথায় হাওয়া বদলাইতে গিয়া সারিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনো তাহার চোখ দেখিলে মনে হয় রোগযন্ত্রণার মতই কি একটা অস্থিরতা যেন সে ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াছে। তা ছাড়া, তাহার সাজসজ্জার অভাবটা অবাক করিয়া দেয়। এমন একদিন ছিল সে যখন বসনভূষণে, কেশরচনা ও দেহমার্জনার অতুল উপাদানে নিজেকে সব সময় ঝকঝকে করিয়া রাখিত। ত্বকে থাকিত জ্যোতি, কেশে থাকিত পালিশ, বসনে থাকিত বর্ণ ও ভূষণে থাকিত হীরার চমক। এখন সে সব কিছুই তাহার নাই। অলঙ্কার প্রায় সবই সে খুলিয়া ফেলিয়াছে, বিন্যস্ত কেশরাজিতে ধরিয়াছে কতগুলি ফাটল, সে কাছে থাকিলে সাবান ছাড়া আর কোন সুগন্ধির ইঙ্গিত মেলে না। তাও মাঝে মাঝে নিশ্বাসের দুর্গন্ধে চাপা পড়িয়া যায়।

ঘনিষ্ঠতার বালাই না থাকিলেও মন্দা চিরকাল ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন করিয়া থাকে।

সাজগোজ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন দেখছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাসিয়া বলে, এবার মেয়ে ওসব করবে।

একটি মেয়ে বিইয়েই সন্ন্যেসিনী হয়ে গেলেন?

একটি দু'টির কথা নয় ঠাকুরঝি। নিজে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গেলে ও একটিই থাক আর দু'টিই থাক ফিটফাট থাকা আর পোষায় না। মেয়ে এই এটা করছে এই ওটা করছে—নোংরামির চূড়ান্ত, তার সঙ্গে কি এসেন্স মানায়? মেয়ে একটু বড় হলে হয়ত আবার সুরু করব। তা করব

ঠাকুরঝি, এ বয়সে কি আর বুড়ি হয়ে থাকব সত্যি সত্যি!

শ্যামা বলে, মেয়ে বড় হতে হতে আর একটি আসবে যে!

বিষ্ণুপ্রিয়া জোর দিয়া বলে, না, আর আসবে না।

মন্দা খিলখিল করিয়া হাসে: বললেন বটে একটা হাসির কথা! এখুনি রেহাই পাবেন? আরও কত আসবে, ভগবান দিলে কারো সাধ্যি আছে ঠেকিয়ে রাখে।

শ্যামা বলে, ঠাকুরঝি আপনাকে জব্দ করে দিলে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলে, আমাকে জব্দ করা আর শক্ত কি?

যে বিষ্ণুপ্রিয়ার এমনি পরিবর্তন হইয়াছে একদিন সকালে সে শ্যামাকে দেখিতে আসিল। মেয়েকে সে সঙ্গে আনিল না। মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কোথাও যায় না, কারো বাড়ি মেয়েকে যাইতেও দেয় না, ঘরের কোণে লুকাইয়া রাখে। বাড়ির পুরানো ঝি ছাড়া আর কারো কোলে সে মেয়েকে যাইতে দেয় না। মেয়ের সম্বন্ধে তাহার একটা সন্দেহজনক গোপনতা আছে, পাড়ার মেয়েরা এমনি একটা আভাস পাইয়া কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সকলেই জানিয়াছে। জানিয়াছে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার মেয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছে পাপের ছাপ লইয়া, মহিম তালুকদার ভীষণ পাপী।

এবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে কার্পেটের আসনটাতেই বসিতে দেওয়া হইল। মন্দা ভদ্রতা করিয়া জিজ্ঞাসাও করিল, আপনাকে এক কাপ চা করে দি?

চা? বিষ্ণুপ্রিয়া চা খায় না।

খান না? মন্দা সুন্দর অবাক হইতে জানে, কি আশ্চর্যি!—তা, চা আমার মেজননদও খায় না। তার বিয়ে হয়েছে চিলপাহাড়ীর জমিদার বাড়ি, মস্ত বড়লোক তারা, চালচলন সব সাহেবি। বিয়ের আগে আমার ননদ খুব চা খেত, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ছেড়ে দিলে। বললে চা খেলে গায়ের চামড়া কর্কশ হয়। আমার মেজননদ খুব সুন্দরী কিনা, রঙ প্রায় গিয়ে মেমদের মত কটা, রঙ খারাপ হবার ভয়ে মরে থাকে। আমার কর্তাটিকে দেখেন নি? ওদের হল ফর্সার গুষ্টি, তাদের মধ্যে ওনার রঙ সবচেয়ে মাজা, তারপরেই আমার মেজননদ।

ছেলেদের জন্ত বসিয়া কারো সঙ্গে কথা বলিবার অবসর মন্দা পায় না। উঠানে দুই ছেলে চৌবাচ্চার জল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া সে উঠিয়া গেল! বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, আপনার ননদটি বেশ। খুব সরল।

মুখ্যু!

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিবাদ করিল না। আঁচলে মুখ মুছিয়া শ্যামার চোখোচোখি হওয়ায় একটু হাসিল। বাহিরে ঝকঝকে রোদ উঠিয়াছিল। শহরতলীর বাড়ি, জানালা দিয়া পুকুরও চোখে পড়ে, গাছপালাও দেখা যায়। আর পাখি। শরৎকালে পথ ভুলিয়া কতকগুলি পাখি শহরের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, তোমার ছেলের জন্যে দুটো একটা জামাটামা পাঠালে কিছু মনে করবে ভাই? মনে যদি কর তো স্পষ্ট বলো, মনে এক মুখে আর এক কোরো না।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বলার ভঙ্গিতে শ্যামা একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল, জামার দরকার তো নেই।

দরকার নাই বা রইল, বেশিই না হয় হবে।—পাঠাবো?

শ্যামা একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা।

আনকোরা নতুন জামা, দর্জিবাড়ি থেকে সোজা তোমায় দিয়ে যাবে,—আমার মেয়ের জামাটামার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হবে না ভাই।

হলই বা ছোঁয়াছুঁয়ি?

বিকালে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপহার আসিল। কচি ছেলের দরকারী কয়েকটা জিনিস। গালিচার মত পুরু ও নরম ফ্লানেলের কয়েকটি কাঁথা, ছেলেকে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া কোলে নেওয়ার জন্য ধবধবে সাদা কোমল তিনটি তোয়ালে আর আধ ডজন সেমিজের মত পাতলা লম্বা জামা। শেষোক্ত পদার্থগুলি মন্দাকে বিস্মিত করে।

এগুলো কি বৌ? আলখাল্লা নাকি?

শ্যামা হাসে: ঠাকুরঝি যেন কি! সায়েবদের ছেলেরা পরে দ্যাখেনি?

তুমি যেন কত দেখেছ!

দেখিনি! গড়ের মাঠে চিড়িয়াখানায় কত দেখেছি!

ও, কত তুমি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ গড়ের মাঠে চিড়িয়াখানায়!

না ঠাকুরঝি, ঠাট্টা নয়, আগে সত্যি নিয়ে যেত, চার পাঁচবার গিয়েছি যে। সায়েবদের কচি কচি ছেলেদের এমনি জামা পরিয়ে ঠেলা গাড়িতে করে আয়ারা বেড়াতে আনত। এমন সুন্দর ছেলেগুলি, চুরি করে আনতে সাধ হত আমার।

পুরানো কাঁথার উপর শ্যামা নুতন কাঁথা বিছায়, ছেলের তৈলাক্ত পেনিটি খুলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওয়া আলখাল্লা পরায়, তারপর একখানা তোয়ালে জড়াইয়া শোয়াইয়া দেয়। আনন্দে অভিভূতা হইয়া বলে, কি রকম দেখাচ্ছে দ্যাখো ঠাকুরঝি!

মন্দা হাসিমুখে সায় দিয়া বলে, খাসা দেখাচ্ছে বৌ। ওমা, মুখ বাঁকায় যে!

ছেলেকে শ্যামা সত্যসত্যই পুঁটুলি করিয়াছে। হাত পা নাড়িতে না পারিয়া সে হাঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। তোয়ালেটা শ্যামা তাড়াতাড়ি খুলিয়া লয়। মন্দা শিশুকে কোলে লইয়া বলিতে থাকে, অ সোনা, অ মাণিক—তোমায় বেঁধেছিল, শক্ত করে বেঁধেছিল, মরে যাই। শ্যামার গায়ে কাঁটা দেয়, মাথা দুলাইয়া ঝোঁক দিয়া দিয়া মন্দা বলিতে থাকে, মেরেছে? আমার ধনকে মেরেছে? কে মেরেছে রে! আ লো আ লো—ন ন ন···

শ্যামা উত্তেজিত হইয়া বলে, ও ঠাকুরঝি, ও যে হাসলো।

মন্দা দেখিতে পায় নাই। তবু সে সায় দিয়া বলে, পিসীর আদরে হাসবে না?

কি আশ্চর্য কাণ্ড ঠাকুরঝি! ওইটুকু ছেলে হাসে!

এরকম আশ্চর্য কাণ্ড দিবারাত্রিই ঘটিতে থাকে। খোকার সম্বন্ধে এবার সে কিনা অনেক বিষয়েই উদাসীন থাকিবে ঠিক করিয়াছে, খোকার আশ্চর্য কাণ্ডগুলিতে অনেক সময় শ্যামা শুধু তাই মনে মনে আশ্চর্য হয়, বাহিরে কিছু প্রকাশ করে না। খোকার হাত পা নাড়িয়া খেলা করা দেখিয়া মনে যখন তাহার দোলা লাগে, খেলার অর্থহীন হাত-নাড়া আর ক্ষুধার সময় স্তন খুঁজিয়া হাত-নাড়ার পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া তাহার যখন সকলকে ডাকিয়া এ ব্যাপার দেখাইতে ইচ্ছা হয়, শ্যামা তখন নিজেকে সতর্ক করিয়া দেয়। স্মরণ করে যে সন্তানকে উপলক্ষ করিয়া জননীর অসংযত উল্লাস অমঙ্গল-জনক। আনন্দের একটা সীমা ভগবান মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, মানুষ তাহা লঙ্ঘন করিলে তিনি রাগ করেন। তবু সব সময় শ্যামা কি আর নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পারে? অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ একসময় ঝাঁ করিয়া খোকাকে সে কোলে তুলিয়া লয়। তাহার পাঁজরে একদিকে থাকে হৃৎপিণ্ড আরেক দিকে থাকে খোকা, খোকার লালিম পা দু'টি হইতে কেশ-বিরল মাথাটি পর্যন্ত শ্যামা অসংখ্য চুম্বন করে, দীর্ঘনিশ্বাসে খোকার দেহের আঘ্রাণ লয়। তারপর সে অনুতাপ করে। বাড়াবাড়ি করিয়া একবার তাহার সর্বনাশ হইয়াছে, তবু কি শিক্ষা হইল না?

শীতলের মিশ্র খাপছাড়া প্রকৃতিতেও বাৎসল্যের আবির্ভাব হইয়াছে। বাৎসল্যের রসে তাহার ভীরু উগ্রতাও যেন একটু নরম হইয়া আসিয়াছে। পিতৃত্বের অধিকার খাটাইয়া ছেলের সঙ্গে সে একটু মাখামাখি করিতে চায়, শ্যামা সভয়ে বাধা দিলে রাগ করার বদলে ক্ষুণ্ণই যেন হয়,—প্রকৃত-পক্ষে, রাগ করার বদলে ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই তাহার বিপজ্জনক আদরের হাত হইতে ছেলেকে বাঁচাইয়া চলিবার সাহস শ্যামার হয়। সে উপস্থিত না থাকিলে ছেলেকে কোলে তুলিতে শীতলকে সে বারণ করিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে দু'চার মিনিটের জন্য ছেলেকে স্বামীর কোলে সে দেয়, কিন্তু নিজে কাছে দাঁড়াইয়া থাকে, পুলিসের মত সতর্ক পাহারা দেয়।

মাঝে মাঝে শীতল তাহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। রাত্রে হয়ত সে জাগিয়া আছে, খোকা কাঁদিল। চুপি চুপি চৌকি হইতে নামিয়া মেঝেতে পাতা বিছানায় ঘুমন্ত শ্যামার পাশ হইতে খোকাকে সে সন্তর্পণে তুলিয়া লয়—চোরের মত। অনভ্যস্ত অপটু হাতে খোকাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়া নিজে সামনে পিছনে দুলিয়া তাহাকে সে দোলা দেয়, মৃদু গুনগুনানো সুরে ঘুমপাড়ানো ছড়া কাটে। বলে, 'আয় রে পাড়ার ছেলেরা মাছ ধরতে যাই, মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে, দোলায় চড়ে যাই।' রাতদুপুরে নিজের মুখে ঘুম-পাড়ানো ছড়া শুনিয়া মুখখানা তাহার হাসিতে ভরিয়া যায়। এ ছেলে কার?—তার! শ্যামা মানুষ করিতেছে করুক, ছেলে শ্যামার নয়, তার।

এদিকে শ্যামার ঘুম ভাঙ্গে। কচি ছেলের বুড়ি মা কি আর ঘুমায়? লোক দেখানো চোখ বুজিয়া থাকে মাত্র। উঠিয়া বসিয়া শীতলের কাণ্ড চাহিয়া দেখিতে শ্যামার মন্দ লাগে না। কিন্তু মনকে সে অবিলম্বে শক্ত করিয়া ফেলে।

বলে, কি হচ্ছে?

শীতল চমকাইয়া খোকাকে প্রায় ফেলিয়া দেয়।

শ্যামা বলে, ঘাড়টা বেঁকে আছে। ওর কত লাগছে বুঝতে পারছ?

লাগলে কাঁদত।—শীতল বলে।

কাঁদবে কি? যে ঝাঁকানি ঝাঁকছ, আঁৎকে ওর কান্না বন্ধ হয়েছে।—শ্যামা বলে।

শীতল প্রথমে ছেলে ফিরাইয়া দেয়। তারপর বলে, বেশ করছি! অত তুমি লম্বা লম্বা কথা বলবে না বলে দিচ্ছি, খপর্দার! শীতল শুইয়া পড়ে। সে সত্যসত্যই রাগ করিয়াছে অথবা এটা তার ফাঁকা গর্জন শ্যামা ঠিক তাহা বুঝিতে পারে না। খানিক পরে সে বলে, আমি কি বারণ করেছি ছেলে দেব না! একটু বড় হোক, নিও না তখন, যত খুসি নিও। ওকে ধরতে বলে আমারি এখন ভয় করে! কত সাবধানে নাড়াচাড়া করি, তবু কালকে হাতটা মুচড়ে গেল—

শীতল বলে, আরে বাপরে, বাপ! রাত দুপুরে বকর বকর করে এ যে দেখছি ঘুমোতেও দেবে না!

শীতলের মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই। রাগ সে করে না, বিরক্ত হয়। মন যে তাহার নরম হইয়া আসিয়াছে অনেক সময় এটুকু গোপন করিবার জন্যই সে যেন রাগের ভান করে, কিন্তু আগের মত জমাইতে পারে না।

মন্দাকে নেওয়ার জন্য তাহার শাশুড়ী বারবার পত্র লিখিতেছিলেন, মন্দা বারবার জবাব লিখিতেছিল যে পড়িয়া গিয়া তাহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, উঠিতে পারে না, এখন যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত শাশুড়ী বোধ হয় সন্দেহ করিলেন। এক শনিবার রাখালকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন কলিকাতায়। রাখালের স্নেহ শ্যামা ভুলিতে পারে নাই, সে আসিয়াছে শুনিয়াই আনন্দে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আনন্দ তাহার টিঁকিল না। রাখালের ভাব দেখিয়া সে বড় দমিয়া গেল। এতকাল পরে তার দেখা পাইয়া রাখাল খুসি হইল মামুলি ধরণে, কথা বলিল অন্যমনে, সংক্ষেপে। শ্যামার ছেলের সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র কৌতূহল দেখা গেল না।

সারাদিন পরে বিকালে ব্যাপার বুঝিয়া মন্দা স্বামীকে বলিল, তুমি কি গো? বৌ কতবার ছেলে কোলে কাছে এল, একবার তাকিয়ে দেখলে না?

রাখাল বলিল, দেখলাম না? ওই যে বললাম তুমি রোগা হয়ে গেছ বৌঠান?

মন্দা বলিল, দাদার ছেলে হয়েছে জানো? জানো আমার মাথা! ছেলেকে একবার কোলে নিয়ে একটু আদর করতে পারলে না? দাদা কি ভাববে!

রাখাল বলিল, তোমায় আদর করে সময় পেলাম কই?

মন্দা রাগ করিয়া বলিল, না বাবু, তোমার কি যেন হয়েছে। তামাসাগুলি পর্যন্ত আজকাল রসালো হয় না।

তোমার কাছে হয় না। বৌঠানকে ডেকে আনো হবে।

মন্দার অনুযোগের যে ফল ফলিল শ্যামার তাহাতে মনে হইল একটু গাল টিপিয়া আদর করিয়া রাখাল বুঝি ছেলেকে তাহার অপমান করিয়াছে। শ্যামার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া রহিল। জীবন-যুদ্ধে সন্তানের প্রত্যেকটি পরাজয়ে যার মনে যে ক্ষুদ্ধ বেদনার সঞ্চার হয়, এ অসন্তোষ তাহারই অনুরূপ। শ্যামার ছেলে এই প্রথমবার হার মানিয়াছে।

পরদিন বিকালে রাখাল একাই ফিরিয়া গেল। মন্দা যাইতে রাজি হইল না, রাখালও বেশি পীড়াপীড়ি করিল না। যাওয়ার কথা মন্দাকে সে একবারের বেশি দু'বার বলিল কি না সন্দেহ। পথ ভুলিয়া আসার মত যেমন অন্যমনে সে আসিয়াছিল, তেমনি অন্যমনে চলিয়া গেল। কি জন্য আসিয়াছিল তাও যেন ভাল রকম বোঝা গেল না।

শীতল গোপনে শ্যামাকে বলিল, রাখাল আবার বিয়ে করেছে শ্যামা।

বলিল রাত্রে, শ্যামার যখন ঘুম আসিতেছে। শ্যামা সজাগ হইয়া বলিল, কেন ঠাট্টা করছ?

কিসের ঠাট্টা? ও মাসের সাতাশে বিয়ে হয়েছে। মন্দাকে এখন কিছু বোলো না। রাখাল বলে গেছে সেই গিয়ে সব কথা খুলে ওকে চিঠি লিখবে। মুখে বলতে এসেছিল, পারল না। আমিও ভেবে দেখলাম, চিঠি লিখে জানানই ভাল।

উত্তেজনার সময় শ্যামার মুখে কথা যোগায় না। রাখালের ভাবভঙ্গি মনে করিয়া সে আরও মূক হইয়া রহিল। একদিন যে তাহার পরমাত্মীয়ের চেয়ে আপন হইয়া উঠিয়াছিল, গভীর রাত্রে বারান্দায় টিমটিমে আলোয় যার কাছে বসিয়া দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সে নিঃসঙ্কোচে চোখ মুছিতে পারিত,—শুধু তাই নয়, যে চঞ্চল হইয়া উসখুস করিতে আরম্ভ করিলেও যার কাছে তাহার ভয় ছিল না, এবার সে তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। একটা কিছু করিয়া না আসিলে কি মানুষ এমন হয়?

কোথায় বিয়ে হল কি বৃত্তান্ত বল তো আমায়, গুছিয়ে বলো।—শ্যামা যখন এ অনুরোধ জানাইল, শীতলের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিয়াছে।

অঁ? বলিয়া সজাগ হইয়া সে যা জানিত গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল। তারপর বলিল, বড় ঘুম পাচ্ছে গো। বাকি সব জিজ্ঞেস কোরো কাল।

জিজ্ঞাসা করিবার কিছু বাকি ছিল না, এবার শুধু আলোচনা। শ্যামার সে উৎসাহ ছিল না, সে জাগিয়া শুইয়া রহিল নীরবে। এক আশ্চর্য ব্যাপার যে রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে? স্ত্রী যে তাহার তিনটি সন্তানের জননী, একি সে ভুলিয়া গিয়াছিল? অবস্থা-বিশেষে পুরুষমানুষের দুবার বিবাহ করাটা শ্যামার কাছে অপরাধ নয়। ধর, এখন পর্যন্ত তার যদি ছেলে না হইত, শীতল আবার বিবাহ করিলে তাহা একেবারেই অসঙ্গত হইত না। কিন্তু এখন কি শীতল আর একটা বিবাহ করিতে পারে? কোন্ যুক্তিতে করিবে!—রাখাল একি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে? মন্দার কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? রাখালকে শ্যামা চিরকাল শ্রদ্ধা করিয়াছে, কোনদিন বুঝিতে পারে নাই। এবারও রাখালের এই কীর্তির কোন অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না। এমন যদি হইত যে মন্দার স্বভাব ভাল নয়, সে দেখিতে কুৎসিত, তাহাকে লইয়া রাখাল সুখী হইতে পারে নাই,—আবার বিবাহ করিবার কারণটা তাহার শ্যামা বুঝিতে পারিত। মনের মিল তো দুজনের কম হয় নাই? এ বাড়িতে পা দিয়া অসুস্থা মন্দার যে সেবাটাই রাখালকে সে করিতে দেখিয়াছিল তাও শ্যামার মনে আছে।

এমন কাজ তবে সে কেন করিল? শ্যামা ভাবে, ঘুমাইতে পারে না। চৌকির উপর শীতল নাক ডাকায়, ঘুমন্ত সন্তানের মুখ হইতে স্তন আলগা হইয়া খসিয়া আসে, জননী শ্যামা আহত উত্তেজিত বিষণ্ণ মনে আর একটি জননীর দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া যায়। রাখালের অপকার্যের একটা কারণ খুঁজিয়া পাইলে সে যেন স্বস্তি পাইত। কে বলিতে পারে এরকম বিপদ তারও জীবনে ঘটিবে কি না? শীতল তো রাখালের চেয়ে ভাল লোক নয়। কিসের যোগাযোগে স্ত্রী ও জননীর কপাল ভাঙ্গে মন্দার দৃষ্টান্ত হইতে সেটুকু বোঝা গেলে মন্দ হইত না। তারপর একটা কথা ভাবিয়া হঠাৎ শ্যামার হাত পা অবশ হইয়া আসে। মন্দা জননী বলিয়াই হয় তো রাখালের স্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছে? ছেলের জন্য মন্দা স্বামীকে অবহেলা করিয়াছিল, স্ত্রী বর্তমানে রাখাল স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়াছিল, হয়ত তাই সে আবার বিবাহ করিয়াছে?

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া শীতল দেখিল, বুকের উপর ঝুঁকিয়া মুখের কাছে হাসিভরা মুখখানা আনিয়া শ্যামা তাহাকে ডাকিতেছে। শ্যামা যে রাত্রেই বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ছেলের জন্য কখনো সে স্বামীকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবে না, শীতল তো তাহা জানিত না, এও সে জানিত না যে প্রতিজ্ঞা-পালনে স্বামীর ঘুম ভাঙিবার নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত সবুর শ্যামার সহে নাই। শীতল তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল। বলিল, হয়েছে কি?

বেলা-হল উঠবে না?

শীতল পাশ ফিরিয়া শুইল। বিড়বিড় করিয়া সে যা বলিল তা গালাগালি।

তখন শ্যামা বুঝিতে পারিল সে ভুল করিয়াছে। ছেলের জন্য স্বামীকে অবহেলা না করিবার প্রক্রিয়া এটা নয়। স্বামী যতটুকু চাহিবে দিতে হইবে ততটুকু, গায়ে পড়িয়া সোহাগ করিতে গেলে জুটিবে গালাগালি।

মন্দার কোন পরিবর্তন নাই। সে তো এখনো জানে না। ছেলেদের লইয়া সে ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া রহিল। আড়চোখে তাহার সানন্দ চলাফেরা দেখিতে দেখিতে শ্যামার বড় মমতা হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, অ পোড়াকপালী! বেশ হেসে খেলে সময় কাটাচ্ছ, ওদিকে তোমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। যখন জানবে তুমি করবে কি?—একটা বিড়ালছানার জন্য মারামারি করিয়া কানু ও কালু কাঁদিতেছিল। দেখাদেখি কোলের ছেলেটিও কান্না জুড়িয়াছিল। শ্যামা সাহায্য করিতে গেলে মন্দা তাহাকে হটাইয়া দিল। তিনজনকে সে সামলাইল একা।

শ্যামার চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, কার ছেলেদের এত ভালবাসছ ঠাকুরঝি? সে তো তোমার মান রাখে নি!

মন্দার সমস্যা শ্যামাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। রাখালের প্রতি সে যেন ক্রমে ক্রমে বিদ্বেষ বোধ করিতে আরম্ভ করে। সংসারে স্ত্রীলোকের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজের কাছে সে অপদস্থ হইয়া যায়। যে আশ্রয় তাহাদের সবচেয়ে স্থায়ী কত সহজে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যে লোকটির উপর সব দিক দিয়া নির্ভর করিতে হয়, কত সহজে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে?

মন্দা অবশ্যই এবার অনেক দিন এখানে থাকিবে। এ আরেক সমস্যার কথা। আর্থিক অবস্থা তাহাদের স্বচ্ছল নয়, নূতন চাকরীতে শীতল নিয়মিত মাহিনা পায় বটে, টাকার অঙ্কটা কিন্তু ছোট। শীতলের কিছু ধার আছে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু শুধিতে হয়, সুদও দিতে হয়। খরচ চালতে চায় না। তিনটি ছেলে লইয়া মন্দা বেশি দিন এখানে থাকিলে বড়ই তাহারা অসুবিধায় পড়িবে। শ্যামা অবশ্য এসব অসুবিধার কথা ভাবতে বসিত না। অত ছোট মন তাহার নয়,—যদি তাহার খোকাটি না আসিত। মন্দার জন্য তাহারা স্বামী-স্ত্রী না-হয় কিছুদিন কষ্টই ভোগ করিল, কারো খাতিরে খোকাকে তো তাহারা কষ্ট দিতে পারিবে না। ওর যে ভাল জামাটি জুটিবে না, দুধ কম পড়িবে, অসুখে বিসুখে উপযুক্ত চিকিৎসা হইবে না, শ্যামা তাহা সহিবে কি করিয়া? নিজের ছেলের কাছে নাকি ননদ ও তাহার ছেলে-মেয়ে! যতদিন সম্ভব, ঠিক ততদিনই মন্দাকে সে এখানে থাকিতে দিবে। তারপর মুখ ফুটিয়া বলিবে, আমাদের খরচ চলছে না ঠাকুরঝি। বলিবে, অভিমান চলবে কেন ভাই? মেয়েমানুষের এমনি কপাল। এবার তুমি ফিরে যাও ঠাকুরজামায়ের কাছে।

হিসাবে শ্যামার একটু ভুল হইয়াছিল। কয়েকদিন পরে রাখালের পত্র আসিবামাত্র বনগাঁ যাওয়ার জন্য মন্দা উতলা হইয়া উঠিল। সে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে। বারবার সে বলিতে লাগিল, সব মিছে কথা। সে বনগাঁ যায় নাই বলিয়া রাগিয়া রাখাল এরকম চিঠি লিখিয়াছে। একথা কখনো সত্যি হয়? তবু এরকম অবস্থায় তাহার অবিলম্বে বনগাঁ যাওয়া দরকার। আমায় আজকেই রেখে এসো দাদা, পায়ে পড়ি তোমার।

এদিকে, সেদিন আরেক মুস্কিল হইয়াছে। রাত্রে শ্যামার ছেলের হইয়াছিল জ্বর, সকালে থার্মোমিটার দিয়া দেখা গিয়াছে জ্বর একশ দুইএর একটু নিচে। ছেলে কোলে করিয়া শেষরাত্রি হইতে শ্যামা ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া সে বাহির করিয়াছে যে, বারোকে চার দিয়া গুণ করিলে যত হয়, ছেলের বয়স এখন তাহার ঠিক ততদিন। আগের খোকাটি তাহার ঠিক বারোদিন বাঁচিয়াছিল। বনগাঁ অনেক দূর, শীতলকে শ্যামা ছাপাখানায় পর্য্যন্ত যাইতে দিতে রাজি নয়।

শীতল বলিল, দুদিন পরেই যাস মন্দা। চিঠিপত্র লেখা হোক, একটা খবর দিয়ে যাওয়াও তো দরকার। খোকার জ্বরটাও ইতিমধ্যে হয়ত কমবে।

মন্দা শুনিল না। বাড়িটা হঠাৎ তাহার কাছে জেলখানা হইয়া উঠিয়াছে। সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, আজ না পার, কাল আমাকে তুমি রেখে এসো দাদা। সকালে রওনা হলে বিকেলের গাড়িতে ফিরে আসতে পারবে তুমি।

শীতল বলিল, ব্যস্ত হোস কেন মন্দা, দেখাই যাক না কাল সকাল পর্যন্ত, খোকার জ্বর আজকের দিনের মধ্যে কমে যেতেও পারে তো।

বিকালে খোকার জ্বর কমিল, শেষরাত্রে আবার বাড়িয়া গেল। সকালে মন্দা বলিল, আমার তবে কি উপায় হবে বৌ? আমি তো থাকতে পারি না আর। দাদা যদি নাই যেতে পারে, আমায় গাড়িতে তুলে দিক, ওদের নিয়ে আমি একাই যেতে পারব।

শ্যামা রাত্রে ভাবিয়া দেখিয়াছিল, মন্দাকে আটকাইয়া রাখা সঙ্গত নয়। উদ্বেগে ও আশঙ্কায় সে এখন বনগাঁ যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, পরে হয়ত মত পরিবর্তন করিয়া বসিবে, আর যাইতেই চাইবে না। বলিবে, অমন স্বামীর মুখ দেখার চেয়ে ভাইএর বাড়ি পড়িয়া থাকাও ভাল। বোনকে পুষিবার ক্ষমতা যে শীতলের নাই, এতো আর সে হিসাব করিবে না। তার চেয়ে ও যখন যাইতে চায়, ওকে যাইতে দেওয়াই ভাল। একদিনে তাহার খোকার কি হইবে? শীতল তো ফিরিয়া আসিবে রাত্রেই।

এই সব ভাবিয়া শ্যামা শীতলকে বনগাঁ যাইতে বাধা দিল না। জিনিস-পত্র মন্দা আগের দিনই বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। একচড়া আলুভাতে ফুটাইয়া কালু ও কানুকে খাওয়াইয়া, কোলের ছেলেটির জন্য বোতলে দুধ ভরিয়া লইয়া শীতলের সঙ্গে সে রওনা হইয়া গেল। গাড়িতে ওঠার সময় মন্দা একটু কাঁদিল, শ্যামাও কয়েকবার চোখ মুছিল।

গাড়ি যেন চোখের আড়াল হইল না, শ্যামার ছেলের জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিল। ঝিকে দিয়া কই মাছ আনাইয়া শ্যামা এবেলা শুধু ঝোল-ভাত রাঁধিবার আয়োজন করিয়াছিল, সব ফেলিয়া রাখিয়া দুরুদুরু বুকে অবিচলিত মুখে সে ছেলেকে কোলে করিয়া বসিল। নিয়তির খেলা শ্যামা বোঝে বৈ কি! মন্দার ভার এড়াইবার লোভে শীতলকে যাইতে দেওয়ার দুর্মতি নতুবা তাহার হইবে কেন? স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া মন্দা চিরকাল ভাইয়ের সংসারে পড়িয়া থাকিত, এ আশঙ্কা শ্যামার কাছে একটা অর্থহীন মনে হইল। কাঁধে শনি ভর না করিলে মানুষ ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক অসুবিধার কথা ভাবিয়া ছেলের রোগকে অগ্রাহ্য করে? ছেলে যত ছটফট করিয়া কাঁদিতে লাগিল, অনুতাপে শ্যামার মন ততই পুড়িয়া যাইতে লাগিল। যেমন ছোট তাহার মন, তেমনি উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। তার মত স্বার্থপর হীনচেতা স্ত্রীলোকের ছেলে যদি না মরে তো মরিবে কার? একা সে এখন কি করে!

ঠিকা ঝি বাসন মাজিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া শ্যামা বলিল, খোকার বড় জ্বর হয়েছে সত্যভামা, বাবু বনগাঁ গেলেন, কি হবে এখন?

ঝি শতমুখে আশ্বাস দিয়া বলিল, কমে যাবে মা, কমে যাবে।—ছেলেপিলের এমন জ্বর জ্বালা কত হয়, ভেবোনি।

তুমি আজ কোথাও যেয়ো না সত্যভামা।

কিন্তু না গিয়া সত্যভামার উপায় নাই। সে ধরিতে গেলে স্বামীহীনা, কিন্তু তাহার চারটি ছেলেমেয়ে আছে। তিন বাড়ি কাজ করিয়া সে ইহাদের আহার যোগায়, শ্যামার কাছে বসিয়া থাকিলে তাহার চলিবে কেন? সত্য-ভামার বড় মেয়ে রাণীর বয়স দশ বছর, তাহাকে আনিয়া শ্যামার কাছে থাকিতে বলিয়া সে সরকারদের কাজ করিতে চলিয়া গেল। রাণীর একটা চোখে আঞ্জিনা হইয়াছিল, চোখ দিয়া তাহার এত জল পড়িতেছিল, যেন কার জন্য শোক করিতেছে। শ্যামা এবার একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া গেল। এমন যোগাযোগ, এত সব অমঙ্গলের চিহ্ন, একি ব্যর্থ যায়? আজ দিনটা মেঘলা করিয়া আছে। শীত পড়িয়াছে কনকনে। খোকার জ্বরের তাপে শ্যামার কোল যত গরম হইয়া ওঠে, হাত পা হইয়া আসে তেমনি ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে শ্যামার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। বেলা বারোটার সময় খোকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কান্না থামিল। ভয়ে ভাবনায় শ্যামা আধমরা হইয়া গিয়াছিল, তবু, তাহার প্রথম ছেলেকে হারানোর শিক্ষা সে ভোলে নাই,—তাড়াতাড়ি নয়, বাড়াবাড়ি নয়। এরকম উত্তেজনার সময় ধীরতা বজায় রাখা অনভ্যস্ত অভিনয়ের সামিল, শ্যামার চিন্তা ও কার্য দুই অত্যন্ত শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। তিনবার থার্মোমিটার দিয়া সে ছেলের সঠিক টেম্পারেচার ধরিতে পারিল। একশ তিন উঠিয়াছে। জ্বর এখনো বাড়িতেছে বুঝিতে পারিয়া রাণীকে সে ওপাড়ার হারান ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। এতক্ষণে সে টের পাইয়াছে জ্বরের বৃদ্ধি স্থগিত হওয়ায় প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ডাক্তার ডাকিতে না পাঠানো তাহার উচিত হয় নাই। হারান ডাক্তার যেমন গম্ভীর তেমনি মন্থর। আজ যদি রোগী দেখিয়া ফিরিতে তাহার বেলা হইয়া থাকে, স্নান করিয়া খাইয়া ব্যাপার দেখিতে আসিবে সে তিন ঘণ্টা পরে। রাণী কি রোগীর অবস্থাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবে? সামান্য জ্বর মনে করিয়া হারান ডাক্তার যদি বিকালে দেখিতে আসা স্থির করে? ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা সদর দরজায় গিয়া পথের দিকে তাকায়। রাণীকে দেখিতে পাইলে ডাকিয়া ফিরাইয়া একটি কাগজে হারান ডাক্তারকে কয়েকটি কথা লিখিয়া দিবে। রাণীকে সে দেখিতে পায় না। শুধু পাড়ার ছেলে বিনু ছাড়া পথে কেহ নাই।

শ্যামা ডাকে, অ বিনু, অ ভাই বিনু শুনছ?

কি?

খোকার বড্ড জ্বর হয়েছে ভাই, কেমন অজ্ঞানের মত হয়ে গেছে, লক্ষ্মী দাদাটি, একবার ছুটে হারান ডাক্তারকে গিয়ে বল গে—

আমি পারব না।—বিনু বলে।

শ্যামা বলে, ও ভাই বিনু শোন ভাই একবার—

বাড়াবাড়ি? সে উতলা হইয়াছে? ঘরে গিয়া শ্যামা কাঁদে। দেখো, ছেলে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। চোখ বুজিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে ওকি আর চোখ মেলিবে?

হারান ডাক্তার দেরি না করিয়াই আসিল। হারান যত মন্থর হোক, তার পুরানো নড়বড়ে ফোর্ড গাড়িটা এখনো ঘণ্টায় বিশ মাইল যাইতে পারে। ভাত খাইয়া সে ধীরে ধীরে পান চিবাইতেছিল, ঘরে ঢুকিয়া সে প্রথমে চিকিৎসা করিল শ্যামার। বলিল, কেঁদো না বাছা। রোগ নির্ণয় হবে না

কেমন তাহার রোগ নির্ণয় কে জানে, খোকার গায়ে একবার হাত দিয়াই হুকুম দিল, এক গামলা ঠাণ্ডা জল, কলসী থেকে এনো।

শ্যামা গামলায় জল আনিলে হারান ডাক্তার ধীরে ধীরে খোকাকে তুলিয়া গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া দিল, এক হাতে সেই অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া অন্য হাতে ভিজাইয়া দিতে লাগিল তাহার মাথা। খোকার মার অনুমতি চাহিল না, এরকম বিপজ্জনক চিকিৎসার কোন কৈফিয়ৎও দিল না।

শ্যামা বলিল, একি করলেন?

হারান ডাক্তার বলিল, শুকনো তোয়ালে থাকলে দাও, না থাকলে শুকনো কাপড়েও চলবে।

শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওয়া একটি তোয়ালে আনিয়া দিলে জল হইতে তুলিয়া তোয়ালে জড়াইয়া খোকাকে হারান শোয়াইয়া দিল। নাড়ী দেখিয়া চৌকির পাশের দিকে সরিয়া গিয়া ঠেস দিল দেয়ালে। পান সে আজ আগাগোড়া জাবর কাটিতেছিল, এবার বুজিল চোখ।

শ্যামা বলিল, আমার কি হবে ডাক্তারবাবু?

হারান রাগ করিয়া বলিল, এই তো, এই তো তোমাদের দোষ! কাঁদবার কারণটা কি হল? ওর আরেকটা বাথ দিতে হবে বলে বসে আছি বাছা, তোমাদের দিয়ে তো কিছু হবার যো নেই,-খালি কাঁদতে জানো।

হারান বুড়া হইয়াছে, তাহাকে ডাক্তারবাবু বলিতে শ্যামার কেমন বাধিতেছিল। রোগীর বাড়িতে ডাক্তারের চেয়ে পর কেহ নাই, সে মানুষ নয়, সে শুধু একটা প্রয়োজন, তিতো ওষুধের মত সে একটা হিতৈষী বন্ধু। হারানকে পর মনে করা কঠিন। তাঁহাকে দেখিয়া এতখানি আশ্বাস মেলে, অথচ এমনি সে অভদ্র যে আত্মীয় ভিন্ন তাহাকে আর কিছু মনে করিতে কষ্ট হয়।

শ্যামা তাই হঠাৎ বলিল, আপনি একটু শোবেন বাবা?—দেয়ালে ঠেস দিয়ে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

কষ্ট? হাসিতে গিয়া হারান ডাক্তারের মুখের চামড়া অনভ্যস্ত ব্যায়ামে কুঁচকাইয়া গেল, এতক্ষণে শ্যামার দিকে সে যেন একটু বিশেষ ভাবে চাহিয়া দেখিল, না মা, কষ্ট নেই, শোব—একেবারে বাড়ি গিয়ে শোব। দুটো পান দিতে পার, বেশ করে দোক্তা দিয়ে?

শ্যামা পান সাজিয়া আনিয়া দিল। এটুকু সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে খোকার অবস্থা বিপজ্জনক, নহিলে ডাক্তার মানুষ যাচিয়া বসিয়া থাকিবে কেন? এত জ্বরের উপর জলে ডুবাইয়া চিকিৎসাও কি মানুষ সহজে করে? তবু শ্যামা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সে তো ডাক্তারি বিদ্যার পরিচয় রাখে না, সে জানে ডাক্তারকে। জীবনমরণের ভার যে ডাক্তার পান চিবাইতে চিবাইতে লইতে পারে, সেই তো ডাক্তার,—মরণাপন্ন ছেলেকে ফেলিয়া এমন ডাক্তারকে পান সাজিয়া দিতে শ্যামা খুসিই হয়। পান আর এক খাবলা দোক্তা মুখে দিয়া হারান শীতলের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আধ ঘণ্টা পরে খোকার তাপ লইয়া বলিল, জ্বর বাড়েনি। তবু গাটা একবার মুছে দিই, কি বল মা?

না, হারান ডাক্তার গম্ভীর নয়। রোগীর আত্মীয়স্বজনকে সে শুধু গ্রাহ্য করে না, ওর মধ্যে যে তার সঙ্গে ভাব জমাইতে পারে, বুড়া তার সঙ্গে কথা বড় কম বলে না। বাবা বলিয়া ডাকিয়া শ্যামা তাহার মুখ খুলিয়া দিয়াছে, রাজ্যের কথার মধ্যে খোকার যে কত বড় ফাঁড়া কাটিয়াছে, তাও সে শ্যামাকে শোনাইয়া দিল। বলিল, বিকাল পর্যন্ত তাহাকে না ডাকিলে আর দেখিতে হইত না। জ্বর বাড়িতে বাড়িতে এক সময়—

গিয়ে একটা ওষুদ পাঠিয়ে দিচ্চি রাণীর হাতে, পাঁচ ফোঁটা করে খাইয়ে দিও দুধের সঙ্গে মিশিয়ে চামচেয়,—গরুর দুধ নয় মা, সে ভুল যেন করে বোসো না। আধ ঘণ্টা পর পর তাপ নিয়ে যদি ছাখো জ্বর কমছে না, গা মুছে দিও।

সন্ধ্যাবেলা আপনি আর একবার আসবেন বাবা।

হারান দরজার কাছে গিয়া একবার দাঁড়াইল। বলিল, ভয় পেয়ো না মা, এবার জ্বর কমতে আরম্ভ করবে।

শ্যামা ভাবিল, সাহস দিবার জন্য নয়, হারান হয়ত ভিজিটের টাকার জন্য দাঁড়াইয়াছে। কত টাকা দিবে, যাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিয়াছে, দুটো একটা টাকা কেমন করিয়া হাতে দিবে, শ্যামা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সে বলিল, উনি বাড়ি নেই—

এলে পাঠিয়ে দিও।—বলিয়া হারান চলিয়া গেল। স্বয়ং শীতলকে অথবা ভিজিটের টাকা, কি যে সে পাঠাইতে বলিয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

শীতলের ফিরিবার কথা ছিল রাত্রি আটটায়। সে আসিল পরদিন বেলা বারটার সময়। বিষ্ণুপ্রিয়া কার কাছে খবর পাইয়া এবেলা শ্যামাকে ভাত পাঠাইয়া দিয়াছিল, শীতল যখন আসিয়া পৌঁছিল সে তখন অনেক ব্যঞ্জনের মধ্যে শুধু মাছ দিয়া ভাত খাইয়া উঠিয়াছে এবং নিজেকে তাহার মনে হইতেছে রোগমুক্তার মত।

শীতল জিজ্ঞাসা করিল, খোকা কেমন?

ভাল আছে।

কাল গাড়ি ফেল করে বসলাম, এমন ভাবনা হচ্চিল তোমাদের জন্যে!

শ্যামার মুখে অনুযোগ নাই, সে গম্ভীর ও রহস্যময়ী। কাল বিপদে পড়িয়া কারো উপর নির্ভর করিবার জন্য সে মরিয়া যাইতেছিল, আজ বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর কিছু আত্মমর্যাদার প্রয়োজন হইয়াছে।

তিন

কয়েক বৎসর কাটিয়াছে।

শ্যামা এখন তিনটি সন্তানের জননী। বড়খোকার দু'বছর বয়সের সময় তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে, তার তিন বছর পরে আর একটি ছেলে। নামকরণ হইয়াছে তিনজনেরই—বিধানচন্দ্র, বকুলমালা ও বিমানবিহারী। এগুলি পোষাকি নাম। এ ছাড়া তিনজনের তিনটি ডাকনামও আছে, খোকা, বুকু ও মণি।

ওদের মধ্যে বকুলের স্বাস্থ্যই আশ্চর্য রকমে ভাল। জন্মিয়া অবধি একদিনের জন্য সে অসুখে ভোগে নাই, মোটা মোটা হাত পা, ফোলা ফোলা গাল,—দুরন্তের একশেষ। শ্যামা তাহার মাথার চুলগুলি বাব্‌রি করিয়া দিয়াছে। খাটো জাঙ্গিয়া-পরা মেয়েটি যখন একমুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁকড়া চুলের ফাঁক দিয়া মিটমিট করিয়া তাকায়, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। বকুর রঙও হইয়াছে বেশ মাজা। রৌদ্রোজ্জল প্রভাতে তাহার মুখখানা জল্‌জল্‌ করে, ধূসর সন্ধ্যায় স্তিমিত হইয়া আসে—সারাদিনের বিনিদ্র দুরন্তপনার পর নিদ্রাতুর চোখ দুটির সঙ্গে বেশ মানায়। কিন্তু দেখিবার কেহ থাকে না। শ্যামা রান্না করে, শ্যামার কোল জুড়িয়া থাকে ছোট খোকামণি। বকু পিছন হইতে মার পিঠে বুকের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মার কাঁধের উপর দিয়া ডিবরির শিখাটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ বুজিয়া যায়।

শ্যামা পিছনে হাত চালাইয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া ডাকে, খোকা অ খোকা!

বিধান আসিলে বলে, ভাইকে কোলে নিয়ে বোসো তো বাবা, বকুকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

বিধানের হাতে খড়ি হইয়া গিয়াছে, এখন সে প্রথমভাগের পাঠক! ছেলেবেলা হইতে লিভার খারাপ হইয়া শরীরটা তাহার শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে অসুখে ভোগে। মুখখানি অপরিপুষ্ট ফুলের মত কোমল। শরীর ভাল না হোক, ছেলেটার মাথা হইয়াছে খুব সাফ। বুলি ফুটিবার পর হইতেই প্রশ্নে প্রশ্নে সকলকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, জগতের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া তাহার শিশু-চিত্তে যে সহস্র প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, প্রত্যেকটির জবাব পাওয়া চাই। মনোজগতে সে দুর্জ্ঞেয় রহস্য থাকিতে দিবে না, তাহার জিজ্ঞাসার তাই সীমা নাই। সবজান্তা হইবার জন্য তাহার এই ব্যাকুল প্রয়াসে সবজান্তারা কখনো হাসে, কখনো বিরক্ত হয়। বিরক্ত বেশি হয় শীতল, বিধানের গোটা দশেক কেনর জবাব দিয়া পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে সে ধমক লাগায়। শ্যামার ধৈর্য অনেকক্ষণ বজায় থাকে। অনেক সময় হাতের কাজ করিতে করিতে যা মনে আসে জবাব দিয়া যায়, সব সময় খেয়ালও থাকে না, কি বলিতেছে। বিধানের চিন্তাজগত মিথ্যায় ভরিয়া ওঠে, মনে তাহার বহু অসত্যের ছাপ লাগে।

দিনের মধ্যে এমন কতগুলি প্রহর আছে, শ্যামাকে যখন যাচিয়া ছেলের মুখে মুখরতা আনিতে হয়। বিধান মাঝে মাঝে গম্ভীর হইয়া থাকে। গম্ভীর অন্যমনস্কতায় ডুবিয়া গিয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, চোখ দুটি উদাসীন হইয়া যায়! স্প্রিংএর মোটরটি পাশে পড়িয়া থাকে, ছবির বইটির পাতা বাতাসে উল্টাইয়া যায়, সে চাহিয়া দেখে না। ছেলের মুখ দেখিয়া শ্যামার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে। যেন ঘুমন্ত ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতেছে এমনিভাবে সে ডাকে, খোকা, এই খোকা!

উঁ?

আয় তো আমার কাছে। ন্যাখ তোর জন্যে কেমন জামা করছি।

বিধান কাছেও আসে, জামাও ন্যাখে কিন্তু তাহার কোন রকম উৎসাহ দেখা যায় না।

শ্যামা উদ্বিগ্ন হইয়া বলে, কি ভাবছিস রে তুই? কার কথা ভাবছিস?

কিচ্ছু ভাবছি না তো!

মোটরটা চালা না খোকা, মণি কেমন হাসবে দেখিস্।

বিধান মোটরে চাবি দিয়া ছাড়িয়া দেয়। মোটরটা চক্রাকারে ঘুরিয়া ওদিকের দেয়ালে ঠোক্কর খায়। শ্যামা নিজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে, যাঃ, তোর মোটরের কলিশন হয়ে গেল। বিধান বসিয়া থাকে, খেলনাটিকে উঠাইয়া আনিবার স্পৃহা তাহার দেখা যায় না। সেলাই বন্ধ করিয়া শ্যামা ছুঁচটি কাপড়ে বিঁধাইয়া রাখে। বিধানের হঠাৎ এমন মনমরা হইয়া যাওয়ার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পায় না। বুড়ো মানুষের মত একি উদাস গাম্ভীর্য এতটুকু ছেলের?

খিদে পেয়েছে তোর?

বিধান মাথা নাড়ে।

তবে তোর ঘুম পেয়েছে খোকা। আয় আমরা শুই।

ঘুম পায় নি তো!

ওরে দুর্জ্ঞেয়, তবে তোর হইয়াছে কি!

তবে চল, ছাদ থেকে কাপড় তুলে আনি।

সিঁড়িতে ছাদে শ্যামা অনর্গল কথা বলে। বিধানের জীবনে যত কিছু কাম্য আছে, জ্ঞানপিপাসার যত কিছু বিষয়বস্তু আছে, সব সে তাহার মনে পড়াইয়া দিতে চায়। ছেলের এই সাময়িক ও মানসিক সন্ন্যাসে শচীমাতার মতই তাহার ব্যাকুলতা জাগে। কাপড় তুলিয়া কুঁচাইয়া সে বিধানের হাতে দেয়। বিধান কাপড়গুলি নিজের দুই কাঁধে জমা করে। কাপড় তোলা শেষ হইলে শ্যামা আলিসায় ভর দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বলে, কুল্পিবরফ খাবি খোকা?

এমনি ভাবে কথা দিয়া পূজা করিয়া, কুল্পিবরফ ঘুষ দিয়া শ্যামা ছেলের নীরবতা ভঙ্গ করে।

বিধান জিজ্ঞাসা করে, কুল্পিবরফ কি করে তৈরি করে মা?

শ্যামা বলে, হাতল ঘোরায় দেখিস নি? বরফ বেটে চিনি মিশিয়ে ওর ওই যন্ত্রটার মধ্যে রেখে হাতল ঘোরায়, তাইতে কুল্পিবরফ হয়।

চিনি তো সাদা, রঙ কি করে হয়?

একটু রঙ মিশিয়ে দেয়।

কি রঙ দেয় মা? আলতার রঙ?

দূর! আলতার রঙ বুঝি খেতে আছে? অন্য রঙ দেয়।

কি রঙ?

গোলাপ ফুলের রঙ বার করে নেয়।

গোলাপ ফুলের রঙ কি করে বার করে মা?

শিউলী বোঁটার রঙ কি করে বার করে দেখিস নি? সেদ্ধ করে, না?

হ্যাঁ।

তুমি আলতা পর কেন মা?

পরতে হয় রে, নইলে লোকে নিন্দে করে যে। কেন?

এ কেনর অন্ত থাকে না।

বিধানের প্রকৃতির আর একটা অদ্ভুত দিক আছে, পশুপাখির প্রতি তার মমতা ও নির্মমতার সমন্বয়। কুকুর বিড়াল আর পাখির ছানা পুষিতে সে যেমন ভালবাসে, এক এক সময় পোষা জীবগুলিকে সে তেমনি অকথ্য যন্ত্রণা দেয়। একবার সন্ধ্যার সময় ঝড় উঠিলে একটি বাচ্চা শালিখ পাখি বাড়ির বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল, বিধান ছানাটিকে কুড়াইয়া আনিয়াছিল, আঁচল দিয়া পালক মুছিয়া লণ্ঠনের তাপে সেঁক দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল শ্যামা। পরদিন খাঁচা আসিল। বিধান নাওয়া খাওয়া ভুলিয়া গেল। ক্ষুদ্র বন্দী জীবটি যেন তাহারই সম্মানীয় অতিথি। হরদম ছাতু ও জল সরবরাহ করা হইতেছে, বিধানের দিন কাটিতেছে খাঁচার সামনে। কি তাহার গভীর মনোযোগ, কি ভালবাসা। অথচ কয়েকদিন পরে, এক দুপুরবেলা পাখিটিকে সে ঘাড় মটকাইয়া মারিয়া রাখিল। শ্যামা আসিয়া দেখে, মরা পাখির ছানাটিকে আগলাইয়া বিধান যেন পুত্রশোকেই আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

ও খোকা, কি করে মরল বাবা, কে মারলে?

বিধান কথা বলে না, শুধু কাঁদে।

সত্যভামা আজও এ বাড়িতে কাজ করে, সে উঠানে বাসন মাজিতেছিল, বলিল, নিজে গলা টিপে মেরে ফেললে মা, এমন দুরন্ত ছেলে জন্মে দেখিনি, —স্বন্দোর ছ্যানাটি গো!

তুই মেরেছিস? কেন মেরেছিস খোকা? শ্যামা বারবার জিজ্ঞাসা করিল, বিধান কথা বলিল না, আরও বেশি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে শ্যামা রাগিয়া বলিল, কাঁদিস নে মুখপোড়া ছেলে, নিজে মেরে আবার কান্না কিসের?

মরা পাখিটাকে সে প্রাচীর ডিঙাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

রাত্রে শ্যামা শীতলকে ব্যাপারটা বলিল। বলিল, এসব দেখিয়া শুনিয়া তাহার বড় ভাবনা হয়। কেমন যেন মন ছেলেটার, এত মায়া ছিল পাখির বাচ্চাটার উপর! ছেলের এই দুর্বোধ্য কীর্তি লইয়া খানিকক্ষণ আলোচনা করিয়া তাহারা দুজনেই ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিধান তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এরকম রহস্যময় প্রকৃতি ছেলেটা পাইল কোথা হইতে? ওর দেহ-মন তাদের দুজনের দেওয়া, তাদের চোখের সামনে হাসিয়া কাঁদিয়া খেলা করিয়া ও বড় হইয়াছে, ওর মধ্যে এই দুর্বোধ্যতা কোথা হইতে আসিল?

শ্যামা বলে, তোমায় এ্যাদ্দিন বলিনি, মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে ও কি যেন ভাবে, ডেকে সাড়া পাইনে।

শীতল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, সাধারণ ছেলের মত হয়নি।

শ্যামা সায় দেয়, কত বাড়ির কত ছেলে তো দেখি, আপন মনে খেলাধূলো করে, খায় দায় ঘুমোয়, এ যে কি ছেলে হয়েছে, কারো সঙ্গে মিল নেই। কী বুদ্ধি দেখেছ?

শীতল বলে, কাল কি হয়েছে জান, জিগ্যেস করেছিলাম, দশ টাকা মণ হলে আড়াই সেরের দাম কত, সঙ্গে সঙ্গে বললে দশ আনা। কতদিন আগে বলে দিয়েছিলাম, যত টাকা মণ আড়াই সের তত আনা, ঠিক মনে রেখেছে।

বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল ছিল, রাণী। একদিন দুপুরবেলা গলায় দড়ি বাঁধিয়া জানালার শিকের সঙ্গে ঝুলাইয়া দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিধান তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিতেছিল। দেখিয়া শ্যামা সেদিন ভয়ানক রাগিয়া গেল। রাণীকে ছাড়িয়া দিয়া ছেলেকে সে বেদম মার মারিল। বিধানের স্বভাব কিন্তু বদলাইল না। পিঁপড়ে দেখিলে সে টিপিয়া মারে, ফড়িঙ ধরিয়া পাখা ছিঁড়িয়া দেয়, বিড়ালছানা কুকুরছানা পুষিয়া হঠাৎ একদিন যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলে। বারো তেরো বছর বয়স হওয়ার আগে তাহার এ স্বভাব শোধরায় নাই।

এখন শীতলের আয় কিছু বাড়িয়াছে। পিতার আমল হইতে তাহাদের নিজেদের প্রেস ছিল, প্রেসের কাজ সে ভাল বোঝে, তার তত্ত্বাবধানে কমল প্রেসের অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রেসের সমস্ত ভার এখন তাহার, মাহিনার উপর সে লাভের কমিশন পায়, উপরি আয়ও কিছু কিছু হয়। সেটা এই রকম। ব্যবসায়ে অনেক কিছুই চলে, অনেক কোম্পানীর যে কর্মচারীর উপর ছাপার কাজের ভার থাকে, ফর্মা পিছু আট টাকা দিয়া সে প্রেসের দশ টাকার বিল দাবী করে, এরকম বিল দিতে হয়, প্রেসের মালিক কমল ঘোষ তাহা জানে। তাই খাতাপত্রে দশ টাকা পাওনা লেখা থাকিলেও আট অথবা দশ কত টাকা ঘরে আসিয়াছে, সব সময় জানিবার উপায় থাকে না। জানে শুধু সে, প্রেসের ভার থাকে যাহার উপর। শীতল অনায়াসে অনেক দশ টাকা পাওনাকে আট টাকায় দাঁড় করাইয়া দেয়। প্রেসের মালিক কমল ঘোষ হয়ত মাঝে মাঝে সন্দেহ করে, কিন্তু প্রেসের ক্রমোন্নতি দেখিয়া কিছু বলে না।

শীতলের খুব পরিবর্তন হইয়াছে। কমল প্রেসে চাকরী পাওয়ার আগে সে দেড় বছর বেকার বসিয়াছিল, যেমন হয়,

এই দুঃখের সময় সুসময়ের বন্ধুদের চিনিতে তাহার বাকি থাকে নাই, এবার তাদের সে আর আমল দেয় না, সোজাসুজি ওদের ত্যাগ করিবার সাহস তো তার নাই, এখন সে ওদের কাছে দারিদ্র্যের ভান করে, দেড় বছর গরীব হইয়া থাকিবার পর এটা সে সহজেই করিতে পারে। তার মধ্যে ভারি একটা অস্থিরতা আসিয়াছে, কিছুদিন খুব স্ফূর্তি করিয়া কাটানোর পর শ্রান্ত মানুষের যে রকম আসে, কিছু ভাল লাগে না, কি করিবে ঠিক পায় না। শ্যামার সঙ্গে গোড়া হইতে মনের মিল করিয়া রাখিলে এখন সে বাড়িতেই একটি সুখ-দুঃখের সঙ্গী পাইত, আর তাহা হইবার উপায় নাই—সংসারিক ব্যাপারে ও ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে শ্যামার সঙ্গে তাহার কতগুলি মত ও অনুভূতি খাপ খায় মাত্র, শ্যামার কাছে বেশী আর কিছু আশা করা যায় না। অথচ এদিকে বাহিরে মদ খাইয়া একা একা স্ফূর্তিও জমে না, সব কি রকম নিরানন্দ অসার মনে হয়। অনেক প্রত্যাশা করিয়া হয়ত সে তাহার পরিচিত কোন মেয়ের বাড়ি যায়, কিন্তু নিজের মনে আনন্দ না থাকিলে পরে কেন আনন্দ দিতে পারিবে, তাও টাকার বিনিময়ে? আজকাল হাজার মদ গিলিয়াও নেশা পর্যন্ত যেন জমিতে চায় না, কেবল কান্না আসে। কত কি দুঃখ উথলিয়া উঠে।

এক-একদিন সে করে কি, সকাল সকাল প্রেস হইতে বাড়ি ফেরে। শ্যামার রান্নার সময় সে ছেলেমেয়েদের সামলায়, বারান্দায় পায়চারি করিয়া ছোট খোকামণিকে ঘুম পাড়ায়, মুখের কাছে বাটি ধরিয়া বুকুকে খাওয়ায় দুধ। বুকুকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয় না, সে বিছানায় শুইয়াই ঘুমায়, ঘুমাইয়া পড়িবার আগে একজনকে শুধু তাহার পিঠে আস্তে আস্তে চুলকাইয়া দিতে হয়। তারপর বাকি থাকে বিধান, সে খানিকক্ষণ পড়ে, তারপর তাহাকে গল্প বলিয়া রান্না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখিতে হয়। এসব শীতল অনেকটা নিখুঁতভাবেই করে। সকলের খাওয়া শেষ হইলে গর্বিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে শ্যামার কি বলিবার আছে, শুনিবার প্রতীক্ষা করে। শ্যামার কাছে সে কিছু প্রশংসার আশা করে বৈকি! শ্যামা কিন্তু কিছু বলে না। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে রান্না করিয়াছে শীতল ছেলে রাখিয়াছে, কোন পক্ষেরই এতে কিছু বাহাদুরি নাই

শেষে শীতল বলে, কি দুষ্টুই যে ওরা হয়েছে শ্যামা, সামলাতে হয়রাণ হয়ে গেছি,—ওদের নিয়ে তুমি রান্না কর কি করে?

শ্যামা বলে, মণিকে ঘুম পাড়িয়ে নি, বুকুকে খোকা রাখে।

এত সহজ? শীতল বড় দমিয়া যায়, সন্ধ্যা হইতে ওদের সামলাইতে সে হিমসিম খাইয়া গেল, শ্যামা এমন অবলীলাক্রমে তাহাদের ব্যবস্থা করে?

শ্যামা হাই তুলিয়া বলে, এক একদিন কিন্তু ভারি মুস্কিলে পড়ি বাবু, মণি ঘুমোয় না, বুকুটা ঘ্যান ঘ্যান করে, সবাই মিলে আমাকে ওরা খেয়ে ফেলতে চায়,—মরেও তেমনি মার খেয়ে। তুমি বাড়ি থাকলে বাঁচি, ফিরো দিকি একটু সকাল সকাল রোজ? শ্যামা আঁচল বিছাইয়া শ্রান্ত দেহ মেঝেতে এলাইয়া দেয়, বলে, তুমি থাকলে ওদেরও ভাল লাগে, সন্ধ্যাবেলা তোমায় দেখতে না পেলে বুকু তো আগে কেঁদেই অস্থির হ'ত।

শীতল আগ্রহ গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করে, আজকাল কাঁদে না?

আজকাল ভুলে গেছে। হ্যাগো, মুদী দোকানে টাকা দাও নি?

দিয়েছি।

মুদী আজ সত্যভামাকে তাগিদ দিয়েছে। তামাক পুড়ে গেছে, এবার রাখো,—দেব আরেক-ছিলিম সেজে?

শীতল বলে, না থাক।

আবোল তাবোল খরচ করে কেন যে টাকাগুলো নষ্ট কর, দোতলায় একখানা ঘর তুলতে পারলে একটা কাজের মত কাজ হ'ত, টাকা উড়িয়ে লাভ কি?

তারপর তাহারা ঘরে যায়, মণি আর বুকুর মাঝখানে শ্যামা শুইয়া পড়ে। বিধান একটা স্বতন্ত্র ছোট চৌকীতে শোয়, শোয়ার আগে একটি বিড়ি খাইবার জন্য শীতল সে চৌকীতে বসিবামাত্র বিধান চীৎকার করিয়া জাগিয়া যায়। শীতল তাড়াতাড়ি বলে, আমি রে খোকা, আমি, ভয় কি?—বিধান কিন্তু শীতলকে চায় না, সে কাঁদতে থাকে।

শ্যামা বলে, আয় খোকা, আমার কাছে আয়।

সে রাত্রে ব্যবস্থা উল্টাইয়া যায়। শীতলের বিছানায় শোয় বিধান, বিধানের ছোট্ট চৌকাটিতে শীতল পা মেলিতে পারে না। একটা অদ্ভুত ঈর্ষার জ্বালা বোধ করিতে করিতে সে মা ও ছেলের আলাপ শোনে।

স্বপন দেখেছিলি, না রে খোকা?

কিসের স্বপন রে?

ভুলে গেছি মা।

খুকীর গায়ে তুমি যেন পা তুলে দিও না বাবা।

কি করে দেব? পাশ বালিশ আছে যে?

তুই যে পাশ বালিশ ডিঙিয়ে আসিস। বালিশের তলে কি হাতড়াচ্ছিস?

টর্চটা একটু দাও না মা।

কি করবি টর্চ দিয়ে রাত দুপুরে? এমনি জ্বেলে খরচ করে ফ্যাল্যে, শেষে দরকারের সময় মরব এখন অন্ধকারে।

একটু পরেই ঘরে টর্চের আলো বারকয়েক জ্বলিয়া নিবিয়া যায়, দেয়ালের গায়ে টিকটিকির ডাক শুনিয়া বিধান তাকে খুঁজিয়া বাহির করে।

নে হয়েছে, দে এবার।

জল খাব মা।

জল খাইয়া বিধান মত বদলায়।

আমি এখানে শোব না মা, যা গন্ধ!

শ্যামা হাসে, তোর বিছানায় বুঝি গন্ধ নেই খোকা? ভারি সাধু হয়েছিস, না?

বড়দিনের সময় রাখালের সঙ্গে মন্দা কলিকাতায় বেড়াইতে আসিল, পর পর তাহার দুটি মেয়ে হইয়াছে, মেয়ে দুটিকে সে সঙ্গে আনিল, ছেলেরা রহিল বনগাঁয়ে। মন্দার বড় মেয়েটি একটি খোড়া পা লইয়া জন্মিয়াছিল, এখন প্রায় চার বছর বয়স হইয়াছে, কথা বলিতে শেখে নাই, মুখ দিয়া সর্ব্বদা লালা পড়ে। মেয়েটাকে দেখিয়া শ্যামা বড় মমতা বোধ করিল। কত কষ্টই পাইবে জীবনে! এখন অবশ্য মমতা করিয়া সকলেই আহা বলিবে, বড় হইয়া ও যখন সকলের গলগ্রহ হইয়া উঠিবে, ফেলাও চলিবে না, রাখিতেও গা জালা করিবে, লাঞ্ছনা সুরু হইবে তখন। মন্দা মেয়ের নাম রাখিয়াছে শোভা। শুনিলে মনটা কেমন করিয়া ওঠে। এমন মেয়ের ও-রকম নাম রাখা কেন?

মন্দা বলিল, ওকে ডাকি বাচ্চু বলে।

শ্যামা ভাবিয়াছিল, সতীন আসিবার পর মন্দার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মন্দাকে এতটুকু অসুখী মনে হইল না। সে খুব মোটা হইয়াছে, স্থানে অস্থানে মাংস থলথল করে, চলাফেরা কথাবার্তায় কেমন থিয়েটারি ধরণের গিন্নি-গিন্নি ভাব। স্বভাবে আর তাহার তেমন ঝাঁঝ নাই, সে বেশ অমায়িক ও মিশুক হইয়া উঠিয়াছে। আর বছর মন্দার শাশুড়ী মরিয়াছে, গৃহিণীর পদটা বোধ হয় পাইয়াছে সেই, শাশুড়ীর অভাবে ননদদের সে হয়ত আর গ্রাহ্য করে না। রাখালের উপর তাহার অসীম প্রতিপত্তি দেখা গেল। কথা তো বলে না, যেন হুকুম দেয়, আর যা সে বলে, তাই রাখাল শোনে।

সতীন? হ্যাঁ, সে এখানেই থাকে বৌ, বড্ড গরীবের মেয়ে, বাপের নেই চালচুলো, এখানে না থেকে আর কোথায় যাবে বল, যাবার জায়গা থাকলে তো যাবে,—বাপ-ব্যাটা ডেকেও জিগ্যেস করে না। চামারের হদ্দ সে মানুষটা, ওই করে তো মেয়ে গছালে, ছল করে বাড়ি ডেকে নিয়ে যেত, আজ নেমন্তন্ন, কাল মেয়ের অসুখ,—মন্দা হাসিল, পাড়ার মেয়ে ভাই, ছুঁড়িকে এইটুকু দেখেছি, হ্যাংলার মত ঠিক খাবার সময়টিতে লোকের বাড়ি গিয়ে হাজির হত,—কে জানত বাবা, ও শেষে বড় হয়ে আমারি ঘাড় ভাঙ্গবে!

মন্দার মেয়ে দুটিকে শ্যামা খুব আদর করিল, আর শ্যামার ছেলেকে আদর করিল মন্দা; রেষারেষি করিয়া পরস্পরের সন্তানদের তাহারা আদর করিল। মন্দার মেয়েদের জন্য শ্যামা আনাইল খেলনা, শ্যামার ছেলেদের মন্দা জামা কিনিয়া দিল। একদিন তাহারা দেখিতে গেল থিয়েটার, টিকিটের দাম দিল মন্দা, গাড়ি ভাড়া ও পান লেমনেডের খরচ দিল শ্যামা। দুজনের এবার মনের মিলের অন্ত রহিল না, হাসিগল্পে আমোদ-আহ্লাদে দশ-বারোটা দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। মন্দা আসলে লোক মন্দ নয়, শাশুড়ীর অতিরিক্ত শাসনে মেজাজটা আগে কেবল তাহার বিগড়াইয়া থাকিত। শ্যামা জীবনে কারো সঙ্গে এ-রকম আত্মীয়তা করার সুযোগ পায় নাই, মন্দার যাওয়ার দিন সে কাঁদিয়া ফেলিল, সারাদিন বাচ্চুকে কোল হইতে নামাইল না, বাচ্চুর লালায় তাহার গা ভিজিয়া গেল। মন্দাও গাড়িতে উঠিল চোখ মুছিতে মুছিতে।

শুধু রাখালকে এবার শ্যামার ভাল লাগিল না। জেলে না গিয়াও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় মানুষের কয়েদীর মত স্বভাব হয়, সব সময় একটা গোপন করা ছোটলোকামির আভাস পাওয়া যাইতে থাকে। রাখালেরও যেন তেমনি বিকার আসিয়াছে। যে কয়দিন এখানে ছিল সে যেন কেমন ভয়ে ভয়ে থাকিত, কেমন একটা অপরাধীর ভাব, লোকে যেন তাহার সম্বন্ধে কি জানিয়া ফেলিয়া মনে মনে তাহাকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। সে যেন তাই জ্বালা বোধ করিত, প্রতিবাদ করিতে চাহিত অথচ সব তাহার নিজেরই কল্পনা বলিয়া চোরের মত, যে চোরকে কেহ চোর বলিয়া জানে না, সব সময় অত্যন্ত হীন একটা লজ্জাবোধ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত।

পরের মাসে শীতল মাহিনা ও কমিশনের টাকা আনিয়া দিল অর্ধেক, প্রথমে সে কিছু স্বীকার করিতে চাহিল না, তারপর কারণটা খুলিয়া বলিল। কমল ঘোষের কাছে শীতল সাতশো টাকা ধার করিয়াছে, সুদ দিতে হইবে না, কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে টাকাটা শোধ করিতে হইবে। সাতশো টাকা! এত টাকা শীতল ধার করিতে গেল কেন?

রাখালকে দিয়েছি।

ঠাকুরজামাইকে ধার করে সাতশো টাকা দিয়েছ? তোমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে কিনা বুঝিনে বাবু, কেন দিলে?

শীতল ভয়ে ভয়ে বলিছ, ছ'সাত মাস রাখালের চাকরী ছিল না শ্যামা, আশ্বিন মাসে বোনের বিয়েতে বড্ড দেনায় জড়িয়ে পড়েছে, হাত ধরে এমন করে টাকাটা চাইলে –

শ্যামার মাথা ঘুরতেছিল! সাতশো টাকা! রাখাল যে এবার চোরের মত বাস করিয়া গিয়াছে তাহার কারণ তবে এই? সে সত্যই তাহাদের টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে? টাকা সম্বন্ধে শীতলের দুর্বলতা রাখালের অজানা নয়, এবার সে তাহা কাজে লাগাইয়াছে। মন্দাকেও শ্যামা এবার চিনিতে পারে, অত যে মেলামেশা আমোদ-আহ্লাদ সব তাহার ছল। ওদিকে রাখাল যখন শীতলকে টাকার জন্য ভজাইতেছিল, মন্দা এদিকে তাহাকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল সে যাহাতে টের পাইয়া বারণ করিতে না পারে। এতো জানা কথা যে শীতল আর সে শীতল নাই, সে বারণ করিলে টাকা শীতল কখনো রাখালকে দিত না।

রাগে দুঃখে সারাদিন শ্যামা ছটফট করিল, যতবার রাখাল ও মন্দার হীন ষড়যন্ত্রের কথা আর টাকার অঙ্কটা সে মনে করিল গা যেন তাহার জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কত কষ্টের টাকা তাহার, শীতল তো পাগল, কবে তাহার কমল প্রেসের চাকরী ঘুচিয়া যায় ঠিক নাই, ওটো টাকা জমানো না থাকিলে ছেলেদের লইয়া তখন সে করিবে কি? শীতলকে সে অনেক জেরা করিল,—কবে টাকা দিয়েছে? রাখাল কবে টাকা ফেরত দেবে বলেছে? টাকার পরিমাণটা সত্যই সাতশো না আরও বেশি? এমনি সব অসংখ্য প্রশ্ন। শীতলও এখন অনুতাপ করিতেছিল, প্রত্যেকবার জেরা শেষ করিয়া শ্যামা যখন তাহাকে রাগের মাথায় যা মুখে আসিল বলিয়া গেল, সে কথাটি বলিল না।

শুধু যে কথা বলিল না তা নয়, তাহার বর্তমান বিষণ্ন মানসিক অবস্থায় এ ব্যাপারটা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে সে আরও মনমরা হইয়া গেল এবং কয়েকদিন পরেই শ্যামাকে শোনাইয়া আবোল-তাবোল কি যে সব কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল শ্যামা কিছুই বুঝিল না। শীতল কাজলামি আরম্ভ করিয়াছে ভাবিয়া সে রাগিয়া গেল। শীতল অনুতপ্ত বিষণ্ন ও নম্র হইয়া না থাকিলে এতটা বাড়াবাড়ি করিবার সাহস হয়ত শ্যামার হইত না, এবার শীতলও রাগিয়া উঠিত অনেকদিন পরে শ্যামাকে একটা চড় বসাইয়া দিল, তারপর সেই যেন মার খাইয়াছে এমনি মুখ করিয়া শ্যামার আশেপাশে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ি ফিরিল একদিন পরে।

এতকাল পরে আবার মার খাইয়া শ্যামাও নম্র হইয়া গিয়াছিল, শীতল বাড়ি ফিরিলে সে যেভাবে সবিনয় আনুগত্য জানাইল, প্রহৃতা স্ত্রীরাই শুধু তাহা জানে এবং পারে। তবু অশান্তির অন্ত হইল না। পরস্পরকে ভয় করিয়া চলার জন্য দারুণ অস্বস্তির মধ্যে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

শ্যামা বলে, বেশ ভদ্রতা করিয়াই বলে, তুমি এমন মন খারাপ করে আছ কেন?

শীতলও ভদ্রতা করিয়া বলে, টাকাটা যদ্দিন না শোধ হচ্ছে শ্যামা—

হঠাৎ মাসিক উপার্জন একেবারে অর্ধেক হইয়া গেলে চারিদিকে তাহার যে ফলাফল ফুটিয়া ওঠে, চোখ বুজিয়া থাকিলেও খেয়াল না করিয়া চলে না। স্বামিস্ত্রীর মধ্যে যেন একটা শত্রুতার সৃষ্টি হইতে থাকে।

শেষে শ্যামা একদিন বুক বাঁধিয়া টাকা তুলিবার ফর্মে নাম সই করিয়া তাহার সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাখানা শীতলের হাতে দিল। খাতায় শুধু জমার অঙ্কপাত করা আছে. সত্যভামাকে দিয়া পাঁচটি সাতটি করিয়া টাকা জমা দিয়া শ্যামা শ' পাঁচেক টাকা করিয়াছে, একটি টাকা কোনদিন তোলে নাই।

টাকাটা তুলে কমলবাবুকে দাও গে, ধারটা শোধ হয়ে যাক, টাকা থাকতে মনের শান্তি নষ্ট করে কি হবে? আস্তে আস্তে আবার জমবে'খন।

খাতাখানা লইয়া শীতল সেই যে গেল, সাতদিনের মধ্যে আর সে বাড়ি ফিরিল না। শ্যামা যে বুঝিতে পারিল না তা নয়, তবু একি বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় যে তার অত কষ্টের জমানো টাকাগুলি লইয়া শীতল উধাও হইয়া গিয়াছে? একদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি গিয়া শ্যামা কমল প্রেসে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করিয়া আসিল। সে আসিয়া খবর দিল প্রেসে শীতল যায় নাই। শীতল গাড়ি চাপা পড়িয়াছে অথবা তাহার কোন বিপদ হইয়াছে শ্যামা একবার তাহা ভাবে নাই, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া শীতলকে ভালরকম চিনিত না বলিয়া হাসপাতালে থানায় আর খবরের কাগজের আপিসে খোঁজ করাইল। গাড়িটাড়ি চাপা পড়িয়া থাকিলে শীতলের একটা সংবাদ অবশ্যই পাওয়া যাইত শ্যামাকে এই সান্ত্বনা দিতে আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অবাক হইয়া বাড়ি গেল। শ্যামা যেভাবে তার কাছে স্বামীনিন্দা করিল, ছোটজাতের স্ত্রীলোকের মুখেও বিষ্ণুপ্রিয়া কোনদিন সে সব কথা শোনে নাই।

বিধান জিজ্ঞাসা ক'রে বাবা কোথায় গেছে মা?

শ্যামা বলে চুলোয়।

শ্যামা রাঁধে বাড়ে, ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়, নিজে খায়, কিন্তু বাঘিনীর মত সব সময় সে যেন কাহাকে খুন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে। জ্বালা তাহার কে বুঝিবে? তিনটি সন্তানের জননী, স্বামীর উপর তাহার নির্ভর অনিশ্চিত। একজন পরম বন্ধু তাহার ছিল,—রাখাল। সে তাহাকে ঠকাইয়া গিয়াছে, স্বামী আজ তাহার সঞ্চয় লইয়া পলাতক। বোকার মত কেন যে সে সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাখানা শীতলকে দিতে গিয়াছিল। রাত্রে শ্যামার ঘুম হয় না। শীতের রাত্রি, ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়, শ্যামা একটা লণ্ঠন কমাইয়া রাখে, ঘরের বাতাস দূষিত হইয়া ওঠে। শ্যামা বারবার মশারি ঝাড়ে বিধানের গায়ে লেপ তুলিয়া দেয় বুকুর কাঁথা বদলায়, মণিকে তুলিয়া ঘরের জল বাহির হওয়ার নালিটার কাছে বসায়, আরও কত কি করে। চোখে তাহার জলও আসে।

এমনি সাতটা রাত্রি কাটাইবার পর অষ্টম রাত্রে-পাগলের মত চেহারা লইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, খেয়ে এসেছ?

শীতল বলিল, না।

সেই রাত্রে শ্যামা কাঠের উনানে ভাত চাপাইয়া দিল। রান্না শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। শীতল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া তুলিয়া তাহাকে খাইতে বসাইয়া শ্যামা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কাছে বসিয়া শীতলকে খাওয়ানোর প্রবৃত্তি হইল না বলিয়া শুধু নয়, ঘুমে তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল।

পরদিন শীতল শ্যামাকে একশত টাকা ফেরত দিল।

আর কই? বাকি টাকা কি করেছ?

আর তুলি নি তো?

তোলো নি? খাতা কই আমার?

খাতাটা হারিয়ে গেছে শ্যামা, কোনখানে যে ফেললাম—

শ্যামা কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সব টাকা নষ্ট করে এসে আবার তুমি মিছে কথা বলছ, আমি পাঁচশো টাকা সই করে দিলাম একশো টাকা তুমি কি করে তুললে, মিছে কথাগুলো একটু আটকালো না তোমার মুখে,—দোতলায় ঘর তুলব বলে আমি যে টাকা জমাচ্ছিলাম গো!

শীতল আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

এবছর প্রথম স্কুল খুলিলেই বিধানকে শ্যামা স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এইসব টাকার গোলমালে ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িল বিধানকে স্কুলে দেওয়া হইল না। শহরতলীর এখানে কাছাকাছি স্কুল নাই, আনন্দমোহিনী মেমোরিয়াল হাই স্কুল কাশীপুরে, প্রায় এক মাইল তফাতে। এতখানি পথ হাঁটিয়া বিধান প্রত্যহ স্কুল করিবে, শ্যামার তাহা পছন্দ হইতেছিল না। কলিকাতার স্কুলে ভর্তি করিলে বিধানকে ট্রামে বাসে যাইতে হইবে, শ্যামার সে সাহস নাই। প্রেসে যাওয়ার সময় শীতল যে বিধানকে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিবে তাহাও সম্ভব নয়, শীতল কোনদিন প্রেসে যায় দশটায়, কোনদিন একটায়। শ্যামা মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছিল। অথচ ছেলেকে এবার স্কুলে না দিলেই নয়, বাড়িতে ওর পড়াশোনা হইতেছে না। শীতলকে বলিয়া লাভ হয় না, কথাগুলি সে গ্রাহ্য করে না। শ্যামা শেষে একদিন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, এক কাজ কর না? আমাদের শঙ্কর যেখানে পড়ে তোমার ছেলেকে সেইখানে ভর্তি করে দাও, শঙ্কর তো গাড়িতে যায়, তোমার ছেলেও ওর সঙ্গে যাবে। তবে ওখানে মাইনে বেশি, বড়লোকের ছেলেরাই বেশির ভাগ পড়ে ওখানে, আর,—ওখানে ভর্তি করলে ছেলেকে ভাল ভাল কাপড় জামা কিনে দিতে হবে,—একদিন যে একটু ময়লা জামা পরিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠাবে তা পারবে না। হেডমাষ্টার সায়েব কি না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালবাসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া আজও শ্যামার উপকার করিতে ভালবাসে কিন্তু আসিলে বসিতে বলে না, কথা বলে অনুগ্রহ করার সুরে। বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই মেয়েটির বয়স এখন প্রায় এগারো, বেণী দুলাইয়া সেও স্কুলে যায়, দেখিয়া এখন আর বুঝিবার উপায় নাই কদর্য পাপের ছাপ লইয়া সে জন্মাইয়াছিল, শুধু মনে হয় মেয়েটা বড় রোগা। বিষ্ণুপ্রিয়ার আর একটি মেয়ে হইয়াছে, বছর তিনেক বয়স। বিষ্ণুপ্রিয়া এখন আবার সাজগোজ করে, তবে আগের মত দেহের চাকচিক্য তাহার নাই, এখন চকচক করে শুধু গহনা,—অনেকগুলি।

ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্যামা বিধানকে শঙ্করের স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিল। শঙ্কর বিষ্ণুপ্রিয়ার খুড়তুতো বোনের ছেলে, এবার সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিয়াছে। বয়সের আন্দাজে ছেলেটা বাড়ে নাই, বিধানের চেয়ে মাথায় সে সামান্য একটু উঁচু, ভারি মুখচোরা লাজুক ছেলে, গায়ের রংটি টুকটুকে। যত ছোট দেখাক সে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে, স্কুলের অভিজ্ঞতাও তাহার আছে, বিধানকে শ্যামা তাহার জিম্মা করিয়া দিল, চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া ছেলেকে দেখাশোনা করার জন্য শ্যামা তাহাকে এমন করিয়াই বলিল যে লজ্জায় শঙ্করের মুখ রাঙা হইয়া গেল।

সারাদিন শ্যামা অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। ভাবিবার চেষ্টা করিল, বিধান স্কুলে কি করিতেছে। শ্যামার একটা ভয় ছিল স্কুলে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিধান মানাইয়া চলিতে পারিবে কিনা, গরীবের ছেলে বলিয়া ওকে সকলে তুচ্ছ করিবে না তো? একটা ভরসার কথা, শঙ্করের সঙ্গে ওর ভাব হইয়াছে, শঙ্করের বন্ধু বলিয়া সকলে ওকে সমানভাবেই হয়ত গ্রহণ করিবে, হাসি-তামাসা করিবে না। ফাল্গুনের দিনটি আজ শ্যামার বড় দীর্ঘ মনে হয়। একদিনের জন্য ছেলে তাহার বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও গিয়া থাকে নাই, অপরিচিত স্থানে অচেনা ছেলেদের মধ্যে দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত সে কি করিয়া কাটাইবে কে জানে!

বিকালে বিধান ফিরিয়া আসিলে শ্যামা তাহার মুখখানা ভারি শুকনো দেখিল। টিফিনের সময় খাবার কিনিয়া খাওয়ার জন্য শ্যামা তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়াছিল, বিধান লজ্জায় কিছু খাইতে পারে নাই ভাবিয়া বলিল, ও খোকা, মুখ শুকিয়ে গেছে কেন রে? খাসনি কিছু কিনে টিফিনের সময়?

বিধান বলিল খেয়েছি তো, পেট ব্যথা করছে মা।

শ্যামা বলিল, কেন খোকা, পেট ব্যথা করছে কেন বাবা? কি খেয়েছিলি কিনে?

পেটের ব্যথায় বিধান নানারকম মুখভঙ্গি করে। চোখে জল দেখা দেয়।

শ্যামা ধমক দিয়া বলে, কি খেয়েছিলি বল।

ফুলুরি।

আর কি?

আর ঝালবড়া।

তাহলে হবে না তোমার পেট ব্যথা, মুখপোড়া ছেলে! ভাল খাবার থাকতে তুমি খেতে গেলে কিনা ফুলুরি আর ঝালবড়া! কেন খেতে গেলি ওসব—?

শঙ্কর খাওয়ালে মা। শঙ্কর বলে, বাড়িতে ওসব তো খেতে দেয় না, শুধু দুধ আর সন্দেশ খেয়ে মর, তাই—

শঙ্কর ছেলেটা তো তবে কম দুষ্টু নয়? বাড়িতে যা নিষেধ করিয়া দেয়, চুরি করিয়া তাই করে? ওর সঙ্গে মেলামেশা করিয়া বিধানের স্বভাব খারাপ হইয়া যাইবে না

তো? শ্যামার প্রথমে ভারি ভাবনা হয়, তারপর সে ভাবিয়া দেখে যে, লুকাইয়া ফুলুরি আর ঝালবড়া খাওয়াটা খুব বেশি খারাপ অপরাধ নয়, এরকম দুষ্টামি ছেলেরা করেই। তবু মনটা শ্যামার খুঁত খুঁত করে। ছেলেকে সে নানারকম উপদেশ দেয়, অসংখ্য নিষেধ জানায়। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কাছে ডাকিয়া বলে, এ যেন তুমি কখনো কোরো না বাবা, কখ্খনো নয়।

কেন মা?—বিধান বলে। প্রত্যেকবার।

একদিন মন্দার একখানা পত্র আসিল, খুব দরদ দিয়া অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়া লিখিয়াছে। চিঠি পড়িয়া শ্যামা মুখ বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল, বসে থাক তুমি জবাবের জন্যে হা-পিত্যেশ করে, তোমার চিঠির জবাব আমি দিচ্ছিনে।—কদিন পরে শীতলের কাছে রাখালের একখানা পোষ্টকার্ড আসিল, শ্যামা চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলিল, শীতলকে কিছু বলিল না। জবাব না পাইয়া একটু অপমান বোধ করুক লোকটা। ফাঁকি দিয়া টাকা বাগাইয়া লওয়ার জন্য শীতল তাহাকে এমন ঘৃণাই করিতেছে যে, চিঠির উত্তর দেয় না।

ফাল্গুন মাস কাবার হইয়া আসিল। শীত একেবারে কমিয়া গিয়াছে। একদিন রোদ খাওয়াইয়া লেপগুলি শ্যামা তুলিয়া রাখিল। শ্যামার শরীরটা আজকাল ভাল আছে, তিন ছেলের মার আবার শরীর—তবু, সানন্দে মনে আরেকটি সন্তানের সখ যেন উঁকি মারিয়া যায়, একা থাকিবার সময় অবাক হইয়া শ্যামা হাসে, কি কাণ্ড মেয়েমানুষের, মাগো। বিধান দশটার সময় ভাত খাইয়া জুতা মোজা হাফপ্যান্ট আর সার্ট পরিয়া স্কুলে যায়, শ্যামা তাহার চুল আঁচড়াইয়া দেয়, আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া দেয়,—প্রথম প্রথম ছেলের মুখে সে একটু পাউডার মাখিয়াও দিত, বড়লোকের ছেলেদের মাঝখানে গিয়া বসিবে, একটু পাউডার না মারিলে কি চলে? স্কুলে ছেলেরা ঠাট্টা করায় বিধান এখন আর পাওডার মাখাইতে দেয় না। বলে, তুমি কিচ্ছু জানো না মা, পাউডার দেখলে ওরা সবাই হাসে, সার শুদ্ধু। কি বলে জান?—বলে চুণ তো মেখেই এসেছিস, এবার একটু কালি মাখ্, বেশ মানাবে তোকে, মাইরি ভাই, মাইরি।

মাইরি বলে? বিধানের স্কুলে বড়লোকের সোনার চাঁদ অভিজাত ছেলেদের মুখে এই কথাটির উচ্চারণ শ্যামার বড় খাপছাড়া মনে হয়। এমনি কত কথা বিধান শিখিয়া আসে, মাইরির চেয়েও ঢের বেশি খারাপ কথা। অনেক বড় বড় শব্দও সে শিখিয়া আসে, আর সঙ্কেত, শ্যামা যার মানেও বুঝিতে পারে না। তাহার অজানা এক জগতের সঙ্গে বিধান পরিচিত হইতেছে, অল্প অল্প একটু যা আভাস পায়, তাতেই শ্যামা অবাক হইয়া থাকে। সে একটা বিচিত্র গর্ব ও দুঃখ বোধ করে। বাড়িতে এখন বিধানের জিজ্ঞাসা কমিয়া গিয়াছে, প্রশ্নে প্রশ্নে আর সে শ্যামাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে না। ছাদে উঠিয়া, খানিকদূরে বাঁধের উপর দিয়া যে রেলগাড়ি চলিয়া যায়, ছেলেকে তাহা দেখানোর সাধ শ্যামার কিন্তু কমে নাই, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ছেলে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে বলিয়া গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে শ্যামার দুঃখ এইটুকু।

বকুল আছে।

সে কিন্তু মেয়ে। ছেলের মত শ্যামার কাছে মেয়ের অত খাতির নাই। ছ বছরের মেয়ে, সে তো বুড়ী। শ্যামা তাহাকে দিয়া দুটি একটি সংসারের কাজ করায়, মণিকে খেলা দিতে বলে, সময় পাইলে প্রথম ভাগ খুলিয়া একটু একটু পড়ায়। মেয়েটা যেমন দুরন্ত হইয়াছে, সেরকম মাথা নাই, কিছু শিখিতে পারে না। তাহাকে অক্ষর চিনাইতেই শ্যামার একমাস সময় লাগিয়াছে, কতদিনে কর খল শিখিবে, কে জানে। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া শ্যামা মেয়ের পিঠে একটা চড় বসাইয়া দেয়। বিধানও মারে। প্রথম-ভাগের পড়া যে শিখিতে পারে না, তার প্রতি বিধানের অবজ্ঞা অসীম। এক একদিন সকালবেলা হঠাৎ সে তাহার ক্লাশ-মাষ্টার অমূল্যবাবুর মত গম্ভীর মুখ করিয়া হুকুম দেয়, এই বুকু, নিয়ে আয় তো বই তোর,—বুকু ভয়ে ভয়ে বই লইয়া আসে, তাহার ছেঁড়া ময়লা প্রথম ভাগ খানি। ভয় পাইলে বোঝা যায়, কি বড় বড় আশ্চর্য দুটি চোখ বকুলের। পড়া ধরিয়া বোনের অজ্ঞতায় বিধান খানিকক্ষণ শ্যামার সঙ্গে হাসাহাসি করে, তারপর কখন যে সে অমূল্যবাবুর মত ধাঁ করিয়া চাঁটি মারিয়া বসে আগে কারো, টের পাইবার যো থাকে না। শ্যামা শুধু বলে, আহা খোকা, মারিস্ নে বাবা।

বকুল বড় অভিমানী মেয়ে, কারো সামনে সে কখনো কাঁদে না; ছাদে চিলে কুঠির দেয়াল আর আলিসার মাঝখানে তাহার একটি হাতখানেক ফাঁক গোসাঘর আছে, সেইখানে নিজেকে গুঁজিয়া দিয়া সে কাঁদে। তারপর গোসাঘরখানাকে পুতুলের ঘর বানাইয়া সে খেলা করে। যে পুতুলটি তাহার ছেলের বৌ তার সঙ্গে বকুলের বড় ভাব, দুজনে যেন সই। তাকে শোনাইয়া সে সব মনের কথা বলে। বলে, বাবাকে সব বলে দেব, বাবা দাদাকে মারবে, মাকেও মারবে, মারবে না ভাই বৌমা? এ্যাঁ করে জিব বের করে দাদা মরে যাবে—মা কেঁদে মরবে, হুঁ।

শীতলের কি হইয়াছে শ্যামা বুঝিতে পারে না, লোকটা কেমন যেন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, স্ফূর্তি ও নাই। দুঃখও নাই। সময়মত আপিসে যায়, সময়মত ফিরিয়া আসে, কোনদিন পাড়ার অখিল দত্তের বাড়ি দাবা খেলিতে যায়, কোনদিন বাড়িতেই থাকে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, রাগারাগিও করে না, দীনদুঃখীর মত মুখের ভাবও করিয়া রাখে না, স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সঙ্গে তাহার কথা ও ব্যবহার

সহজ ও স্বাভাবিক হয়, অথচ তার কাজে কারো যেন মূল্য নাই কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না। শ্যামার টাকা লইয়া পালানোর পর হইতে তাহার এই পাগলামি-না-করার পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে। ধার করিয়া রাখালকে টাকা দেওয়ার অপরাধ, শ্যামার জমানো টাকাগুলি নষ্ট করার অপরাধ, তাহার কাছে অবশ্যই পুরানো হইয়া গিয়াছে, মনে আছে কিনা তাও সন্দেহ। মাস গেলে আগের টাকার অর্ধেক পরিমাণ টাকা আনিয়া সে শ্যামাকে দেয়, আগে হইলে এই লইয়া কত কাণ্ড করিত, হয় অনুতাপে সারা হইত, না হয় নিজে নিজে কলহ বাধাইয়া শ্যামাকে গাল দিয়া বলিত, যা সে আনিয়া দেয় তাই যেন শ্যামা সোনামুখ করিয়া গ্রহণ করে, ঘরে বসিয়া গেলা যাহার একমাত্র কর্ম অত তাহার টাকার খাঁকতি কেন?—এখন টেরও পাওয়া যায় না কম টাকা আনিয়াছে এটা সে খেয়াল করিয়াছে। শ্যামা যদি নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কি করে যে মাস চালাব,—সে অমনি অমায়িক ভাবে বলিয়া বসে, ওতেই হবে গো, খুব চলে যাবে, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, ইয়ে করতে হয় না, কি কর অত টাকা?

কমল ঘোষের টাকাটা মাসে মাসে কিছু কম করিয়া দিলে হয়ত চলে, শীতলকে এ কথা বলিতে শ্যামার বাধে। ঋণ যত শীঘ্র শোধ হইয়া যায় ততই ভাল। এদিকে খরচ চলিতে চাহে না। বিধানকে স্কুলে দেওয়ার পর খরচ বাড়িয়াছে, বই খাতা,স্কুলের মাহিনা, পোষাক, জলখাবারের পয়সা এ সব মিলিয়া অনেকগুলি টাকা বাহির হইয়া যায়। যেমন তেমন করিয়া ছেলেকে শ্যামা স্কুলে পাঠাইতে পারে না, ছেলের পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বিষ্ণুপ্রিয়া যে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, নিতান্ত অভাবের সময়েও শ্যামা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। খরচ সে কমাইয়াছে অন্য দিকে। সত্যভামার এতকালের চাকুরিটি গিয়াছে। নিজের জন্য সেমিজ ও কাপড় কেনা শ্যামা বন্ধ করিয়াছে, এ সব বেশি পরিমাণে তাহার কোন দিনই ছিল না, চিরকাল জোড়াতালি দিয়া কাজ চালাইয়া আসিয়াছে, এখন বড় অসুবিধা হয়। স্বামীপুত্র ছাড়া বাড়িতে কেহ থাকে না তাই রক্ষা, নতুবা লজ্জা বাঁচিত না। শীতল আর বিধান বাহিরে যায়, ওদের জামা কাপড় ছাড়া শ্যামা আর কিছু ধোপাবাড়ি পাঠায় না, বাড়িতে কাচিয়া লয়। ছেলেমেয়েদের দুধ সে কমাইতে পারে নাই, কমাইয়াছে মাছের পরিমাণ। মাঝে মাঝে ফল ও মিষ্টি আনাইয়া সকলকে খাওয়ানোর সাধ সে ত্যাগ করিয়াছে। এই ত্যাগটাই সব চেয়ে কষ্টকর। শ্যামার ছেলেমেয়েরা ভাল জিনিস খাইতে বড় ভালবাসে।

তবু, এই সব অভাব অনটনের মধ্যেও শ্যামার দিনগুলি সুখে কাটিয়া যায়। ছেলেমেয়েদের অসুখ বিসুখ নাই। শীতলের যাহাই হইয়া থাক, তাহাকে সামলাইয়া চলা সহজ। নিজের শরীরটাও শ্যামার এত ভাল আছে যে, একা সংসারের সমস্ত খাটুনি খাটিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না, কাজ করিতে যেন ভালই লাগে।

চৈত্র শেষ হইয়া আসিল। ছাদে দাঁড়াইলে বগাকদের বাড়ির পাশ দিয়া রেলের উঁচু বাঁধটার ধারে প্রকাণ্ড শিমুল গাছটা হইতে তুলা উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। পুবে খানিকটা ফাঁক মাঠের পরে টিনের বেড়ার ওপাশে ধানকলের প্রকাণ্ড পাকা অঙ্গন, কুলি মেয়েরা প্রত্যহ ধান মেলিয়া শুকাইতে দেয়, ধান খাইতে ঝাঁক বাঁধিয়া পায়রা নামিয়া আসে। পায়রার ঝাঁকের ওড়া দেখিতে শ্যামা বড় ভালবাসে, অতগুলি পাখি আকাশে বারবার দিক পরিবর্তন করে এক সঙ্গে, সকাল ও বিকাল হইলে উড়িবার সময় একসঙ্গে সবগুলি পায়রার পাখার নিচে রোদ লাগিয়া ঝকঝক করিয়া উঠে, শ্যামা অবাক হইয়া ভাবে, কখন কোন্ দিক বাঁকিতে হইবে, সবগুলি পাখি একসঙ্গে টের পায় কি করিয়া? ধানকলের এক কোণায় ছোট একটি পুকুর, ইঞ্জিন-ঘরের ওদিকে আরও একটা বড় পুকুর আছে, বয়লারের ছাই ফেলিয়া ছোট পুকুরটির একটি তীরকে ওরা ধীরে ধীরে পুকুরের মধ্যে ঠেলিয়া আনিয়াছে, পুকুরটা বুজাইয়া ফেলিবে বোধ হয়। ছাই ফেলিবার সময় বাতাসে রাশি রাশি ছাই সাদা মেঘের মত টিনের প্রচীর ডিঙ্গাইয়া, রেলের বাঁধ পার হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। আজকাল এসব শ্যামা যেমন ভাবে চাহিয়া দেখে কতকাল তেমনি ভাবে সে তা দেখে নাই। বিকালে ছাদে গিয়া সে মণিকে ছাড়িয়া দেয়, মণি বকুলের সঙ্গে ছাদময় ছুটাছুটি করে। আলিসায় ভর দিয়া শ্যামা কাছে ও দূরে যেখানে যা কিছু দেখিবার আছে, দেখিতে থাকে, বোধ করে কেমন একটা উদাস উদাস ভাব, একটা অজানা ঔৎসুক্য। পর পর অনেকগুলি গাড়ি রেললাইন দিয়া দুদিকে ছুটিয়া যায়, তিনটি সিগনেলের পাখা বারবার ওঠে নামে। ধানকলের অঙ্গনে কুলি মেয়েরা ছড়ানো ধান জড়ো করিয়া নৈবিদ্যের মত অনেকগুলি স্তূপ করে, তারপর হোগলার টুপি দিয়া ঢাকিয়া দেয়। ছোট পুকুরটিতে ধানকলের বাবু জাল ফেলান, মাছ বেশি পড়ে না, এতটুকু পুকুরে মাছ কোথায়?—জাল ফেলাই সার। শ্যামার হাসি পায়। তাহার মামাবাড়ির পুকুরে ও-জাল ফেলিলে আর দেখিতে হইতে না, মাছের লেজের ঝাপ্‌টায় জল খান্ খান্ হইয়া যাইত। পারিপার্শ্বিক জগতের দৃশ্য ও ঘটনা শ্যামা এমনিভাবে খুঁটিয়া খুঁটিয়া উপভোগ করে, বাড়িঘর, ধানকল, রেললাইন, রাস্তার মানুষ, এসব আর কবে তাহার এত ভাল লাগিয়াছিল?—অথচ মনে মনে আকরণ উদ্বেগ, দেহে যেন একটা শিথিল ভারবোধ,—হাইতোলা আলস্য। বিধান আজকাল বিকালের দিকে শঙ্করদের বাড়ি খেলিতে যায়, ছেলেকে না দেখিয়া তার কি ভাবনা হইয়াছে?

শীতল বলে, বুড়ো বয়সে তোমার যে চেহারার খোলতাই হচ্ছে গো, বয়েস কমছে নাকি দিনকে দিন?

শ্যামা বলে, দূর দূর! কি সব বলে ছেলের সামনে!

শীতলের নজর পড়িয়াছে, শ্যামার ছেঁড়া কাপড় দেখিয়া তাহার চোখ টাটায়, শ্যামার জন্য সে রঙীন কাপড় কিনিয়া আনে। শ্যামা প্রথমে জিজ্ঞাসা করে, ক'টাকা নিলে? টাকা পেলে কোথা?

হুঁ, কটা টাকা আর পাইনে আমি,—উপরি পেয়েছি কাল। একটি পয়সা তো দেও না, আমার খরচ চলে কিসে উপরি না পেলে?

খরচ চলে? শীতল তাহা হইলে আরও উপরি টাকা পায়, খুসিমত খরচ করে, তাহাকে যে-টাকা আনিয়া দেয়, তাই সব নয়? শ্যামা রাগিয়া বলে, কি রকম উপরি পাও শুনি?

দশ বিশ টাকা, আর কত?

নিশ্চয় আরও বেশি, মিথ্যে বলছ বাবু তুমি,—নিজে নিজে খরচ কর তো সব? আমার এদিকে খরচ চলে না, ছেঁড়া কাপড় পরে আমি দিন কাটাই।

আরে মুস্কিল, তাই তো কাপড় কিনে আনলাম!—আচ্ছা তো নেমকহারাম তুমি।

শ্যামা রঙীন কাপড়খানা নাড়াচাড়া করে, মিষ্টি করিয়া বলে, কি টানাটানি চলেছে বোঝ না তো কিছু, কি কষ্টে যে মাস চালাই ভাবনায় রাতে ঘুম হয় না—দুচারটে টাকা যদি পাও কেন নষ্ট কর?—এনে দিলে সুসার হয়। তোমার খরচ কি? বাজে খরচ করে নষ্ট কর বৈত নয়, যা স্বভাব তোমার জানি তো! হাতে টাকা এলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। এবার থেকে আমায় এনে দিও, তোমার যা দরকার হবে চেয়ে নিও,—আর কটা মাস মোটে, ধারটা শোধ হয়ে গেলে তখন কি আর টানাটানি থাকবে, না তুমি দশ বিশ টাকা বাজে খরচ করলে এসে যাবে?

শ্যামা বলে, শীতল শোনে। শ্যামাকে বোধ হয় সে আর একজনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে, যে এমনি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিয়া বুঝাইয়া টাকা আদায় করিত, বলিত, আমার দু'খানা গয়না গড়িয়ে দে, টাকাটা তা'হলে আটকা থাকবে, নইলে তুই তো সব খরচ ক'রে ফেলবি!—দরকারের সময় তুই তোর গয়না বেচে নিস্, আমি যদি একটি কথা কই—

সে এসব বলিত মদের মুখে। শ্যামা কি?

তারপর শ্যামা বলে, এ কাপড় তো পরতে পারব না আমি ছেলের সামনে,—ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, আমার লজ্জা করবে বাবু।

না পরতে পার, ওই নর্দমা রয়েছে, ওখানে ফেলে দাও!—শীতল বলে।

রাত্রে ছেলেমেয়েরা সব ঘুমাইয়া পড়িলে শ্যামা আস্তে আস্তে শীতলকে ডাকে, বলে, হ্যাগা ঘুমুলে নাকি? ফুটফুটে জ্যোছনা উঠেছে দিব্যি, ছাতে যাবে একবারটি?

শীতল বলে, আবার ছাতে কি জন্যে?—কিন্তু সে বিছানা ছাড়িয়া ওঠে।

শ্যামা বলে, গিয়ে একটা বিড়ি ধরাও, আমি আসছি।

রঙীন কাপড়খানা পরিয়া শ্যামা ছাদে যায়। বড় লজ্জা করে শ্যামার,—শীতলকে নয়, বিধানকে। ঘুম ভাঙিয়া রাত দুপুরে তার পরণে রঙীন কাপড় দেখিলে, ও যা ছেলে, ওর কি আর বুঝিতে বাকি থাকিবে, শীতলের মন ভুলানোর জন্যে সে সাজগোজ করিয়াছে? অথচ শীতল সখ করিয়া কাপড়খানা আনিয়া দিয়াছে, একবার না পরিলেই বা চলিবে কেন?

শ্যামা মাদুর লইয়া যায়, মাদুর পাতিয়া দুজনে বসে: চাঁদের আলোয় বসিয়া দুজনে দুটো একটা সাংসারিক কথা বলে, বেশি সময় থাকে চুপ করিয়া। বলার কি আর কথা আছে ছাই এ বয়সে! হ্যাঁ, শীতল শ্যামাকে একটু আদর করে, শীতলের স্পর্শ আর তেমন মোলায়েম নয়, কখনো যেন স্ত্রীলোকের সঙ্গ পায় নাই, এমনি আনাড়ির মত আদর করে। শ্যামা দোষ দিবে কাকে? সেও তো কম মোটা হয় নাই!

তারপর একদিন শ্যামা সলজ্জ ভাবে বলে, কি কাণ্ড হয়েছে জান?

শীতল শুনিয়া বলে, বটে নাকি!

শ্যামা বলে, হ্যাঁ গো, চোখ নেই তোমার?—কি হবে বলত এবার, ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে।

উঁহুঁ, ছেলে!—বুকু বেঁচে থাক, আমার আর মেয়েতে কাজ নেই বাবু।

বলিয়া শ্যামা হাসে। মধুর পরিপূর্ণ হাসি, দেখিয়া কে বলিবে, শীতলের মত অপদার্থ মানুষ তাহার মুখে এ হাসি যোগাইয়াছে।

চার

মাঝখানে একটা শীত চলিয়া গেল, পরের শীতের গোড়ার দিকে, শ্যামার নূতন ছেলেটির বয়স যখন প্রায় আট মাস, হঠাৎ একদিন সকালবেলা মামা আসিয়া হাজির।

শ্যামার সেই পলাতক মামা তারাশঙ্কর।

ছোট খাট বেঁটে লোকটা, হাত পা মোটা, প্রকাণ্ড চওড়া বুক। একদিন ভয়ঙ্কর বলবান ছিল, এখন মাংসপেশীগুলি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। শেষবার শ্যামা যখন তাহাকে দেখিয়াছিল মাথার চুলে তাহার পাক ধরে নাই, এবার দেখা গেল প্রায় সব চুল পাকিয়া গিয়াছে। সে তো আজকের কথা নয়। শ্যামার বিবাহের কিছুদিন পরে জমিজমা বেচিয়া গ্রামের সব চেয়ে বনেদী ঘরের

বিধবা মেয়েটিকে সাথী করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল,—শ্যামার বিবাহ হইয়াছে আজ একুশ বাইশ বছর। বিবাহের সাত বছর পরে তার সেই প্রথম ছেলেটি হইয়া মারা যায়, তার দু'বছর পরে বিধানের জন্ম। গত আশ্বিনে বিধানের এগার বছর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

মামার বয়স ষাট হইয়াছে বৈকি! কিন্তু যে লোহার মত শরীর তাহার ছিল. এতটা বয়সের ছাপ পড়ে নাই, শুধু চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে, দুটো একটা দাঁত বোধ হয় পড়িয়া গিয়াছিল মামা সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছে, কথা বলিবার সময় ঝিকমিক করে। এখনো সে আগের মতই সোজা হইয়া দাঁড়ায়, মেরুদণ্ডটা আজো এতটুকু বাঁকে নাই। চোখ দুটো মনে হয় একটু স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, তা সে চোখের দোষ অথবা মানসিক শ্রান্তি বুঝা যায় না। শ্যামার বিবাহের সময় মামা ছিল সন্ন্যাসী, গেরুয়া পরিত, লম্বা আলখাল্লা ঝুলাইয়া সযত্নে বাবরি আঁচড়াইয়া ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে দিয়া যখন গ্রামের পথে বেড়াইতে যাইত, মনে হইত মস্ত সাধু, বড় ভক্তি করিত গ্রামের লোক। এবার মামার পরনে সরু কালপাড় ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী, পায়ে চকচকে জুতো,—একেবারে বাবুর বাবু!

শীতল চিনিতে পারে নাই। শ্যামা প্রণাম করিয়া বলিল, ও মাগো, কোথায় যাবো, এ যে মামা! কোথা থেকে এলে মামা তুমি?

মামা হাসিয়া বলিল, একযাগা থেকে কি আর এসেছি মা যে নাম করব, চরকি বাজির মত ঘুরতে ঘুরতে একবার তোকে দেখতে এলাম, আপনার জন কেউ তো আর নেই, বুড়ো হয়েছি, কোন দিন চোখ বুজি তার আগে ভাগ্নিটাকে একবার দেখে যাই, এইসব, ভাবলাম আর কি,—এরা তোর ছেলেমেয়ে না? ক'টি রে?

শ্যামাকে মামা বড় ভালবাসিত, সে তো জানিত মামা কবে কোন্ বিদেশে দেহ রাখিয়াছে, এতকাল পরে মামাকে পাইয়া শ্যামার আনন্দের সীমা রহিল না। কি দিয়া সে যে মামার অভ্যর্থনা করিবে! বাইশ বছর পরে যে আত্মীয় ফিরিয়া আসে তাকে কি বলিতে হয়, কি করিতে হয় তার জন্য? মামাকে সে নানারকম খাবার করিয়া দিল, বাজার হইতে ভাল মাছ তরকারি আনিয়া রান্না করিল, বেশি দুধ আনাইয়া তৈরি করিল পায়স। মামা বড় ভালবাসিত পায়স। এখনো তেমনি ভালবাসে কিনা কে জানে?

মামার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করিয়া শীতল কোথায় পলাইয়াছিল মামা ইতিমধ্যে শ্যামার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে,—ভারি মজার লোক, এমন আর শ্যামার ছেলেরা দেখে নাই। রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা হাসমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, আর তোমাকে পালিয়ে যেতে দেব না মামা, এবার থেকে আমার কাছে থাকবে। তোমার জিনিস পত্তর কই?

মামা বলে, সে এক হোটেলে রেখে এসেছি, কে জানত বাবু তোরা আছিস এখানে?

শ্যামা বলে, ওবেলা গিয়ে তবে জিনিষ-পত্তর সব নিয়ে এসো,—কলকাতা এসেছ কবে?

মামা বলে, এই তো এলাম কাল না পরশু,—পরশু বিকেলে।

বিধান আজ স্কুলে গেল না। মামা আসিয়াছে বলিয়া শুধু নয়, বাড়িতে আজ নানারকম রান্না হইতেছে, মামা কি একাই সব খাইবে? এগারোটা পর্যন্ত কোথায় আড্ডা দিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া স্নানাহার সারিয়া শীতল প্রেসে চলিয়া গেল, মামার সঙ্গে একদণ্ড বসিয়া কথা বলারও সময় পাইল না। আজ তাহার এত তাড়াতাড়ি কিসের সেই জানে, বাড়িতে একটা মানুষ আসিলে শীতল যেন কি রকম করে. সে যেন চোর, পুলিস তাহার খোঁজ করিতে আসিয়াছে।

রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা কত কি যে ভাবিতে লাগিল। সঙ্গিনীটির কি হইয়াছে? হয়ত মরিয়া গিয়াছে, নয়ত মামার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে অনেকদিন আগেই। ও সব সম্পর্ক আর কতকাল টেঁকে? মরুক, ওসব দিয়া তার কি দরকার? কেলেঙ্কারি ব্যাপার চুকাইয়া দিয়া মামা ফিরিয়া আসিয়াছে, এই তার ঢের। আচ্ছা, এতকাল মামা কি করিতেছিল? টাকা-পয়সা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে নাকি? তা যদি করিয়া আসিয়া থাকে তবে মন্দ হয় না। মামার সম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় শীতলের মনে বড় লাগিয়াছিল, মামা হয়ত এবার সুদে-আসলে সে পাওনা মিটাইয়া দিবে? পুরুষ-মানুষের ভাগ্য—বিদেশে ধূলিমুঠা ধরিয়া মামার হয়ত সোনামুঠা হইয়াছে, মামার কাপড়জামা দেখিলেও তাই মনে হয়। মামার তো আর কেউ নাই, যদি কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে শ্যামাই তাহা পাইবে। এই বয়সে আর একজন সঙ্গিনী জুটাইয়া মামা আর তাহার দেশান্তরী হইতে যাইবে না।

মামাকে সে ঘরবাড় দেখায়। পিছনে খিড়কির দিকে খানিকটা খালি জায়গা আছে, কয়েক হাজার ইট কিনিয়া শ্যামা সেখানে জমা করিয়া রাখিয়াছে, রান্নাঘরের পাশে সিঁড়ির নিচে, চুন আর সুরাক রাখিয়াছে,—আর বছর শ্যামা যে টাকা জমাইয়াছিল এসব কিনিতেই তা খরচ হইয়া গিয়াছিল. এ-বছর কিছু টাকা জমিয়াছে, ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে আগামী মাঘে দোতলায় শ্যামা একখানা ঘর তুলিবে।

এইটুকু বাড়ি, দুখানা মোটে শোবার ঘর, কেউ এলে কোথায় থাকতে দেব ভেবে পাইনে মামা, দোতালায় ঘরটা তুলতে পারলে বাঁচি, ও আমা অনেকদিন সাধ। খোকার বিয়ে দিয়ে ছেলে-বৌকে ও-ঘরে শুতে দেব। পাশ দিতে খোকার আর চার বছর বাকি, পোষ মাসে কেলাসে উঠলে তিন বছর, নারে খোকা?

মামা গম্ভীর হইয়া বলে, বড় বুদ্ধি তোর ছেলের শ্যামা, মস্ত বিদ্বান্ হবে বড় হয়ে। তামাকের ব্যবস্থা বুঝি রাখিস না, এঁ্যা? খায় না, শীতল খায় না তামাক?

আগে খেত, কিন্তু কে অত দেবে মিনিটে মিনিটে তামাক সেজে? যা ঝি আমার, বাসন মাজতেই বেলা কাবার—আর আমার তো দেখছই মামা, নিশ্বাস ফেলবার সময় পাইনে সারাদিন—খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল। এদিকে বাবু তো কম নন, নিজে তামাক সেজে খাবার মুরোদ নেই, এখন বিড়ি-টিড়ি খায়। মরেও তেমনি খুকুর খুকুর কেসে!

দে তবে আমাকে দুটো বিড়ি-টিড়িই আনিয়ে দে বাবু।

শ্যামা উৎসাহিতা হইয়া বলে, দেব মামা, হুঁকো তামাক টামাক সব আনিয়ে দেব? এই তো কাছে বাজার, যাবে আর নিয়ে আসবে। রাণী, একবার শোন্ দিকি মা।

শ্যামার ঝি সত্যভামা শ্যামার ছোট ছেলেটার জন্মের কয়েক ঘণ্টা আগে মরিয়া গিয়াছিল, ছেলে যদি শ্যামার না হইত, হইত মেয়ে, কারো তবে আর বুঝিতে বাকি থাকিত না যে বাড়ির ঝি পেটের ঝি হইয়া আসিয়াছে। সত্যভামার মেয়ে রাণী এখন শ্যামার বাড়িতে কাজ করে। রাণীর বিবাহ হইয়াছে, জামাই ভুষণ থাকে শ্বশুরবাড়িতেই, শীতল তাহাকে কমল প্রেসে একটা চাকরী জুটাইয়া দিয়াছে। রাণী বাজার হইতে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম আনিয়া তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল ভরিয়া দিল, মামা আরামের সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে বলিল, তোর ঝিটা তো বড় ছেলেমানুষ শ্যামা, কাজকর্ম পারে?

ছাই পারে, আলসের একশেষ, আবার বাবুয়ানির সীমে নেই, ছুঁড়ির চলন দেখছ না মামা? ওর মা আমার কাছে অনেকদিন কাজ করেছিল তাই রাখা, নইলে মাইনে দিয়ে অমন ঝি কে রাখে?

খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে দুটা বাজিল। শ্যামা সবে পান সাজিয়া মুখে দিয়াছে, শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা অবাক হইয়া বলিল, এত শীগ্গির ফিরলে যে?

মামার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব, প্রেসে কাজকর্মও নেই—

বেশ করেছ। যেমন করে আফিসে চলে গেলে, মামা না জানি কি ভেবেছিল!

শীতল ইতস্তত করে, কি যেন সে বলিবে মনে করিয়াছে। সে একটা পান খায়। শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে কি সব হিসাব করে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মামা ক'দিন থাকবেন এখন, না?

শ্যামা বলিল, ক'দিন কেন? বরাবর থাকবেন,—আমরা থাকতে বুড়ো বয়সে হোটেলের ভাত খেয়ে মরবেন কি জন্যে?

আমিও তাই বলছিলাম।—পয়সা কড়ি কিছু করেছেন মনে হয়, এঁ্যা?

মনে তো হয়, এখন আমাদের অদেষ্ট!

মামা একটা ঘুম দিয়া উঠিলে বিকালে তাহারা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া গল্প শুনিতে লাগিল, শহর গ্রাম অরণ্য পর্বতের গল্প, রাজা-মহারাজা সাধু-সন্ন্যাসী চোর-ডাকাতের গল্প, রোমাঞ্চকর বিপদ-আপদের গল্প। মামা কি কম দেশ ঘুরিয়াছে, কম মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছে! সুদূর একটা তীর্থের নাম কর, যার নামটি মাত্র শ্যামা ও শীতল শুনিয়াছে, যেমন রামেশ্বর সেতুবন্ধ, নাসিক, বদরীনাথ—মামা সঙ্গে সঙ্গে পথের বর্ণনা দেয়, তীর্থের বর্ণনা দেয়, সব যেন রূপ ধরিয়া চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে। সেই বিধবা সঙ্গিনীটি কতকাল মামার সঙ্গে ছিল, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, মামার যাযাবর জীবনের ইতিবৃত্ত শুনিয়া কিন্তু মনে হয়, চিরকাল সে দেশে দেশে ঘুরিয়াছে একা, সাথী যদি কখনো পাওয়া গিয়া থাকে, সে পথের সাথী, পুরুষ। শ্যামা একবার সুকৌশলে জিজ্ঞাসা করে, গ্রাম হইতে বাহির হইয়া প্রথমে মামা কোথায় গিয়াছিল, মামা সোজাসুজি জবাব দেয়, কাশী,—কাশীতে ছিলাম পাঁচ-ছ'টা মাস, ভুলে-টুলে গিয়েছি সে সব বাপু, সে কি আজকের কথা!

শ্যামা বলে, একা একা ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগত মামা?

মামা বলে, একা ঘুরেই তো সুখ রে, ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, যখন যেখানে খুসি পড়ে থাক, যেখানে খুসি চলে যাও, কারো তোয়াক্কা নেই, জুটলো খেলে না জুটলো উপোস করলে—চিরকাল ঘরের কোণে কাটালি, সে আনন্দ তোরা কি বুঝবি? একবার কি হল,—নীলগিরি পাহাড়ের গোড়ায় একটা গ্রামে গিয়েছি এক সাধুর সঙ্গে, গ্রামটার নাম বুঝি তুড়িগোড়িয়া, পাহাড়ের সার চলে গিয়েছে গ্রামের ধার দিয়ে। পাহাড়ে উঠে দেখতে ইচ্ছা হল। গাঁ থেকে উড়িয়া মেয়েরা পাহাড়ের বনে কাঠ কাটতে যায়, তাদের সঙ্গে গেলাম। সে কি জঙ্গল রে শ্যামা, এইটুকু সরু পথ, দুপাশে এক পা সরবার যো নেই, যেন গাছপালার দেয়াল গাঁথা। ফিরবার সময় পথে হাতীর পাল পড়ল, আর নামবার যো নেই। চারদিন হাতীর পাল পথ আটকে রইল, চারদিন আমরা নামতে পারলাম না। কি সাহস মেয়েগুলোর বলিহরি যাই, চারদিন টুঁ শব্দটি করলে না, রাত্রে আমাকে বলত ঘুমোতে, আর নিজেরা কাঠকাটা দা বাগিয়ে ধরে পাহারা দিয়ে জেগে থাকত। আর একদিন—

সেদিন আর মামার জিনিসপত্র আনা হইল না, পরদিন গিয়া লইয়া আসিল।

শ্যামা ভাবিয়াছিল, মামা কত জিনিষ না জানি আনিবে, হয়ত আঁটিবেই না ঘরে! মামা কিন্তু আনিল ক্যাম্বিশের একটা ব্যাগ, কম্বলে জড়ানো একটা বিছানা,—লেপ, তোষক

নয়, দুটো ব্যাগ, খানতিনেক সুতির চাদর আর এই এতটুকু একটা বালিশ।

শ্যামা অবাক হইয়া বলিল, এই নাকি তোমার জিনিস মামা?

মামা একগাল হাসিল, ভবঘুরের কি আর রাশ রাশ জিনিস থাকে মা? ব্যাগটা হাতে করি, বিছানা বগলে নিই, চলো এবার কোথায় যাবে দিল্লী না বোম্বাই।—ব্যাগটা হাতে তুলিয়া বিছানা বগলে করিয়া মামা যাওয়ার অভিনয় করিয়া দেখাইল।

তাই হইবে বোধ হয়। আজ এখানে কাল সেখানে করিয়া যে বেড়ায়, বাক্স প্যাটরার হাঙ্গামা থাকিলে তাহার চলিবে কেন? কিন্তু এমন ভবঘুরেই যদি মামা হইয়া থাকে, তবে তো টাকাকড়ি কিছুই সে করিতে পারে নাই? শ্যামা ভাবিতে ভাবিতে কাজ করে। প্রথমে সে যে ভাবিয়াছিল, বিদেশে মামা অর্থোপার্জন করিয়াছে, বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে শুধু ছুটি-ছাটা সুযোগ-সুবিধা মত, হয়ত তা সত্য নয়। মামার হয়ত কিছুই নাই। দেশে দেশে সম্পদ কুড়াইয়া বেড়ানোর বদলে হয়ত শুধু বাউল সন্ন্যাসীর মত উদ্দেশ্যহীনভাবেই সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু এমন যে দুঃসাহসী, কত রাজা-রাজড়ার সঙ্গে যে খাতির জমাইয়াছে, পার্থিব সম্পদ লাভের সুযোগ কি সে কখনো পায় নাই? পথে ঘাটে লোকে তো হীরাও কুড়াইয়া পায়। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাবা পশ্চিমে গিয়াছিলেন কপর্দকহীন অবস্থায়, কোথাকার রাজার সুনজরে প'ড়য়া বিশ বছর দেওয়ানী করিলেন, দেশে ফিরিয়া দশ বছর ধরিয়া পেন্সনই পাইলেন বছরে দশ হাজার টাকার। মামার জীবনে ওরকম কিছুই কি ঘটে নাই? কোনো দেশের রাজার ছেলের প্রাণ-টান বাঁচাইয়া লাখ টাকা দামের পান্না মরকত একটা কিছু উপহার?

মামা নিঃস্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্যামার ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। একবার তাহাদের গ্রামে এক সন্ন্যাসী গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া ছিল, সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিল পুরু কাঠের ছোট্ট একটি জল-চৌকী, তার ভিতরটা ছিল ফাঁপা, পুলিশ নাকি স্ক্রুর মত ঘুরাইয়া ছোট ছোট পায়া চারিটি খুলিয়া তক্তার ভিতরে একগাদা নোট পাইয়াছিল। মামার ব্যাগের মধ্যে, কোমরের থলিতে হয়ত তেমনি কিছু আছে? নোট না হোক, দামী কোন পাথর টাথর?

মামা স্থায়ী ভাবে রহিয়া গেল। ভারি আমুদে মিশুকে লোক, কদিনের মধ্যে পাড়ার ছেলে বুড়ো'র সঙ্গে পর্যন্ত তাহার খাতির জমিয়া গেল, এ-বাড়িতে দাবার আড্ডায়, ও-বাড়িতে তাসের আড্ডায় মামার পশারের অন্ত রহিল না। মামার প্রতি এখন শীতলের ভক্তি অসীম, মামার মুখে দেশ বিদেশের কথা শুনিতে তাহার আগ্রহ যেন দিন দিন বাড়িয়া চলে, মামাকে সে চুপ করিতে দেয় না। মামা আসিবার পর হইতে সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, চোখে কেমন উদাস চাউনি। শ্যামা একটু ভয় পায়। ভাবে, এবার আবার মাথায় কি গোলমাল হয় দ্যাখো!

ঠিক শীতলের জন্য যে শ্যামার ভাবনা হয় তা নয়, শীতলের সম্বন্ধে ভাবিবার তাহার সময় নাই। তার গুছানো সংসারে শীতল কবে কি বিপর্যয় আনে, এই তার আশঙ্কা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহাদের। সংসার শ্যামার, ছেলেমেয়ে শ্যামার—ওর মধ্যে শীতলের স্থান নাই,—নিজের গৃহে নিজের সংসারের সঙ্গে শীতলের সম্পর্ক শ্যামার মধ্যস্থতায়, গৃহে শীতল শ্যামার আড়ালে পড়িয়া থাকে, স্বাধীনতা-বিহীন স্বাতন্ত্র্যবিহীন জড় পদার্থের মত। একদিন শীতল মদ খাইত, শ্যামাকে মারিত, কিন্তু শীতল ছাড়া শ্যামার তখন কেহ ছিল না। আজ শীতলের মদ খাইতে ভাল লাগে না, শ্যামাকে মারা দূরে থাক ধমক দিতেও তাহার ভয় করে। শ্যামা আজ কত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে! কোন দিকে কোন বিষয়ে খুঁত নাই শ্যামার, সেবায় যত্নে, বিধি-ব্যবস্থায়, বুদ্ধি-বিবেচনায়, ত্যাগে, কর্তব্যপালনে সে কলের মত নিখুঁত—শ্যামার সঙ্গে তুলনা করিয়া সব সময় শীতলের যেন নিজেকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়, এবং সে যে অপদার্থ ছিটগ্রস্ত মানুষ, এ তো জানে সকলেই, অন্তত শ্যামা যে জানে, শীতলের তাহাতে সন্দেহ নাই। সব সময় শীতলের মনে হয়, শ্যামা মনে মনে তাহার সমালোচনা করিতেছে, তাহাকে ছোট ভাবিতেছে, ঘৃণা করিতেছে—কেবল মাস গেলে সে টাকা আনিয়া দেয় বলিয়া মনের ভাব রাখিয়াছে চাপিয়া, বাহিরে প্রকাশ করিতেছে না। বাহিরের জীবনে বিতৃষ্ণা আসিয়া শীতলের মন নীড়ের দিকে ফিরিয়াছিল, চাহিয়াছিল শ্যামাকে—কিন্তু সাত বৎসরের বন্ধ্যাজীবন-যাপিনী লাঞ্ছিতা পত্নী যখন জননী হয়, তখন কে কবে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছে? বৌয়ের বয়স যখন কাঁচা থাকে, তখন তাহার সহিত না মিলিলে আর তো মিলন হয় না! মন পাকিবার পর কোন নারীর হয় না নূতন বন্ধু, নূতন প্রেমিক। দুঃখ মুছিয়া লইবার, আনন্দ দিবার, শান্তি আনিবার ভার শ্যামাকে শীতল কোনদিন দেয় নাই, শীতলের মনে দুঃখ নিরানন্দ ও অশান্তি আছে কিনা শ্যামা তাহা বুঝিতেও জানে না। শীতল ছিল রুক্ষ উদ্ধত কঠোর, শ্যামাকে সে কবে জানিতে দিয়াছিল যে, তার মধ্যেও এমন কোমল একটা অংশ আছে, যেখানে প্রত্যহ প্রেম ও সহানুভূতির প্রলেপ না পড়িলে যন্ত্রণা হয়? শ্যামা জানে, ওসব প্রয়োজন শীতলের নাই, ওসব শীতল বোঝেও না। তাই ছেলেমেয়েদের লইয়া নিজের জন্য যে জীবন শ্যামা রচনা করিয়াছে, তার মধ্যে শীতল আশ্রয়ের মত, জীবিকার উপায়ের মত তুচ্ছ একটা পার্থিব প্রয়োজন মাত্র। আপনার প্রতিভায় সৃজিত সংসারে শ্যামা ডুবিয়া গিয়াছে। শীতল সেখানে ঢুকিবার রাস্তা না খুঁজিলেই সে বাঁচে।

মামা বলে, শীতলের ভাব যেন কেমন কেমন দেখি শ্যামা?

শ্যামা বলে, ওমনি মানুষ মামা—ওমনি গা-ছাড়া

গা-ছাড়া ভাব। কি এল কি গেল, কোথায় কি হচ্ছে, কিচ্ছু তাকিয়ে দেখে না,—খেয়াল নিয়েই আছে নিজের। ভগ্নীপতি চাইলে, দিয়ে দিলে তাকে হাজারখানেক টাকা ধার করে—না একবার জিজ্ঞেস করা, না একটা পরামর্শ চাওয়া! তাও মেনে নিলাম মামা, ভাবলাম, দিয়ে যখন ফেলেছে আর তো উপায় নেই—যে মানুষ ওর ভগ্নীপতি ও টাকা ফিরে পাওয়ার আশা নিমাই!—কি আর হবে? এই সব ভেবে জমানো যে কটা টকা ছিল,—কি কষ্টে যে টাকা কটা জমিয়েছিলাম মামা, ভাবলে গা এলিয়ে আসে—দিলাম একদিন সবগুলি টাকা হাতে তুলে, বললাম, যাও ধার শুধে এসো, ঋণী হয়ে থেকে কেন ভেবে ভেবে গায়ের রক্ত জল করা? টাকা নিয়ে সেই যে গেল, ফিরে এল সাদ্দিন পরে। ধারের মনে ধার রইল, টাকাগুলো দিয়ে বাবু সাদ্দিন ফূর্তি করে এলেন! সেই থেকে কেমন যেন দমে গেছি মামা, কোন দিকে উৎসাহ পাইনে। ভাবি, এই মানুষকে নিয়ে তো সংসার, এত যে করি আমি, কি দাম তার, কেন মিথ্যে মরছি খেটে খেটে,—সুখ কোথা অদেষ্টে?

মামা সান্ত্বনা দিয়া বলে, পুরুষমানুষ অমন একটু আধটু করে শ্যামা—নিজেই আবার সব ঠিক করে আনে। আনছে তো বাবু রোজগার করে, বসে তো নেই!

শ্যামা বলে, আমি আছি বলে, আর কেউ হলে এ সংসার কবে ভেসে যেত মামা।

মামা একদিন কোথা হইতে শ্যামাকে কুড়িটা টাকা আনিয়া দেয়। শ্যামা বলে, একি মামা?

মামা বলে, রাখ না, রাখ—খরচ করিস্। টাকাটা পেলাম, আমি আর কি করব ও দিয়ে?

সত্যই তো, টাকা দিয়া মামা কি করিবে? শ্যামা সুখী হইল। মামা যদি মাঝে মাঝে এরকম দশবিশটা টাকা আনিয়া দেয়, তবে মন্দ হয় না। মামাকে শ্যামা ভক্তি করে, কাছে রাখিয়া শেষ বয়সে তাহার সেবাযত্ন করার ইচ্ছাটাও আন্তরিক। তবে, তাহার কিনা টানাটানির সংসার, ইঁটসুরকি কিনিয়া রাখিয়া টাকার অভাবে সে কিনা দোতালায় ঘর তোলা আরম্ভ করিতে পারে নাই, মেয়ে কিনা তাহার বড় হইতেছে, টাকার কথাটা সে তাই আগে ভাবে। কি করিবে সে? তার তো জমিদারি নাই। মামা থাক, হাজার দশ হাজার যদি নাই পাওয়া যায়, মামার জন্য যে বাড়তি খরচ হইবে, অন্তত সেটা আসুক, শ্যামা আর কিছু চায় না।

দিন পনের পরে মামা একদিন বর্ধমানে গেল, সেখানে তাহার পরিচিত কোন সাধুর আশ্রম আছে, তার সঙ্গে দেখা করিবে। বলিয়া গেল, দিন তিনেক পরে ফিরিয়া আসিবে। শ্যামা ভাবিল, মামা বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিবে না, এমনি ভাবে ফাঁকি দিয়া বিদায় লইয়াছে। শীতল ক্ষুণ্ন হইল সব চেয়ে বেশি। বন্ধনহীন নির্বান্ধব ভ্রাম্যমাণ লোকটির প্রতি সে প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। মামা যখন যায়, শীতল বাড়ি ছিল না। মামা চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া সে বারবার বলিতে লাগল, কেন যেতে দিলে? তোমার ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই, মামার স্বভাব জানো ভাল করে, আটকাতে পারলে না? বোকা হাঁদারাম তুমি—মুখ্যুর একশেষ!

কচি খোকা নাকি ধরে রাখব?

ধরে আবার রাখতে হয় নাকি মানুষকে? কি বলেছ কি করেছ তুমিই জান, যা ছোট মন তোমার, আত্মীয়স্বজন দুদিন এসে থাকলে খরচের ভয়ে মাথার তোমার টনক নড়ে যায়,—ছেলেমেয়ে ছাড়া জগতে যেন পোষ্য থাকে না মানুষের।—ছেলে তোমার কি করে দেখো, তোমার কাছেই তো সব শিখছে, তোমার কপালে ঢের দুঃখ আছে!

পাগল হলে নাকি তুমি? কি বকছ?

শীতল যেন কেমন করিয়া শ্যামার দিকে তাকায়। খুব রাগিলে আগে যেমন করিয়া তাকাইত সেরকম নয়।—পাগল আমি হইনি শ্যামা, হয়েছ তুমি। ছেলে ছেলে করে তুমি এমন হয়ে গেছ, তোমার সঙ্গে মানুষে বাস করতে পারে না,—ছেলে না ছাই, সব তোমার টাকার খাঁকতি, কি করে বড়লোক হবে দিনরাত শুধু তাই ভাবছ, কারো দিকে তাকাবার তোমার সময় নেই। জন্তুর মত হয়েছ তুমি, তোমার সঙ্গে একদণ্ড কথা কইলে মানুষের ঘেন্না জন্মে যায় এমনি বিশ্রী স্বভাব হয়েছে তোমার, লোকে মরুক, বাঁচুক, তোমার কি? সময়ে মানুষ টাকা পয়সার কথা ভাবে আবার সময়ে দশজনের দিকে তাকায়, তোমার তা নেই,—আমি বুঝিনে কিছু! টাকার কথা ছাড়া এক মিনিট আমার সঙ্গে অন্য কথা কইতে তোমার গায়ে জ্বর আসে, মন খুলে স্বামীর সঙ্গে মেশার স্বভাব পর্যন্ত তোমার ঘুচে গেছে, বসে বসে খালি মতলব আঁটছ কি করে টাকা জমাবে, বাড়ি তুলবে, ঘর তুলবে, টাকার গদিতে শুয়ে থাকবে: বাজারের বেশ্যা মাগীগুলো তোমার চেয়ে ভাল, তারা হাসিখুসি জানে, ফূর্তি করতে জানে: রক্তমাংসের মানুষ তুমি নও, লোভ করার যন্তর!

বাস্ রে!—শীতল এমন করিয়া বলিতে পারে? সমালোচনা করার পাগলামি এবার তাহার আসিয়াছে নাকি? এসব সে বলিতেছে কি? শ্যামার সঙ্গে মানুষ বাস করিতে পারে না? মানুষের সঙ্গে অনুভূতির আদান-প্রদান সে ভুলিয়া গিয়াছে—একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে?

সে জন্তু, যন্ত্র, বেশ্যার চেয়ে অধম? কেন, টাকা পয়সা বাড়িঘর সে নিজের জন্য চায় নাকি! শীতল দেখিতে পায় না নিজে সে কত কষ্ট করিয়া থাকে, ভাল কাপড়টি পরে না,

ভাল জিনিসটি খায় না? শ্যামা শীতলকে এই সব বলে, বুঝাইয়া বলে।

শীতল বলে, ভাল খাবে পরবে কি, মানুষ ভাল খায় ভাল পরে ভাল মানুষ। তুমি তো টাকা জমানো যন্তর!

ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়।—শ্যামা বলে।

শীতল বলে, তাই তো বলছি, টাকা আর ভবিষ্যত হয়েছে তোমার সব, ভবিষ্যত করে করে জন্ম কেটে গেল,—অত ভবিষ্যত কারো সয় না। ভবিষ্যতের ভাবনা মানুষের থাকে, অল্প-বিস্তর থাকে, তোমার ও ছাড়া কিছু নেই, ওই তোমার সর্বস্ব—বড় বেখাপ্পা মানুষ তুমি, মহাপাপী!

শোন একবার শীতলের কথা! কিসে মহাপাপী শ্যামা? কোনো দিন চোখ খুলিয়া পরপুরুষের দিকে চাহিয়াছে? অসৎ চিন্তা করিয়াছে? দেবদ্বিজে ভক্তি রাখে নাই? শ্যামা আহত, উত্তেজিত ও বিস্মিত হইয়া থাকে। শীতল তাহাকে বকে? যার সংসার সে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে? যার ছেলেমেয়ের সেবা করিয়া তাহার হাতে কড়া পড়িয়া গেল, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গেল ভারবহা বাঁকের মত? ধন্য সংসার! ধন্য মানুষের কৃতজ্ঞতা!

মামা কিন্তু ফিরিয়া আসিল,—সাতদিন পরে।

সাতদিন পরে মামা ফিরিয়া আসিল, আরও দিন দশেক পরে শ্যামা দোতালায় ঘর তোলা আরম্ভ করিল, বলিল, জানো মামা, উনি বলেন আমি নাকি কেপ্পনের একশেষ, নিজে তো ডাইনে-বাঁয়ে টাকা ছড়ান,—আমি মরে বেঁচে কটা রেখেছি বলে না ঘরখানা উঠছে? সংসারে ওনার মন নেই, উড়ু উড়ু কচ্ছেন। আমিও যদি তেমনি হই সব ভেসে যাবে না, ছারখার হয়ে যাবে না সব? টাকা রাখব আমি, ইঁট-সুরকি কিনব আমি, মিস্ত্রি ডাকব আমি,—তারপর ঘর হলে শোবেন কে? উনি তো? আমি তাই জন্তু জানোয়ার,—যন্তর! কথা কইনে সাধে? কইতে ঘেন্না হয়!

মামা বলিল, সেকি মা, কথা বলিসনে কি?

শ্যামা বলিল, বলি, দরকার মত বলি।—পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হল আজে বাজে কথা আর মুখে আসে না,—দোষ বল দোষ, গুণ বল গুণ, যা পারিনে তা পারিই নে।

ঘর তুলিবার হিড়কে শ্যামা, আমাদের ছেলে-পাগলা শ্যামা, ছেলেমেয়েদের যেন ভুলিয়া গিয়াছে। কত আর পারে মানুষ? সংসারে উদয়াস্ত খাটিয়া আগেই তাহার অবসর থাকিত না, এখন মিস্ত্রির কাজ দেখিতে হয়, এটা ওটা আনাইয়া দিতে হয়, ঘর তোলার হাঙ্গামা কি কম! শ্যামা পারেও বটে! এক হাতে ছোট ছেলেটাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখে, সে ঝুলিতে ঝুলিতে প্রাণপণে স্তন চোষে, শ্যামা সেই অবস্থাতে চরকির মত ঘুরিয়া বেড়ায়, ভাতের হাঁড়ি নামায়, তরকারি চড়ায়, ছাদে গিয়া মিস্ত্রির দেয়াল গাঁথা দেখিয়া আসে, ভাঙা কড়াইয়ে করিয়া চুন নেওয়ার সময় উঠানে এক খাবলা ফেলিয়া দেওয়ার জন্য কুলিকে বকে, শীতলকে আপিসের ও বিধানকে স্কুলের ভাত দেয়, মাসকাবারি কয়লা আসিলে আড়তদারের বিলে নাম সই করে, খরচের হিসাব লেখে, ছোট খোকার কাঁথা কাচে (রাণী এ কাজটা করে না, তার বয়স অল্প এবং সে একটু সৌখিন) আবার মামার সঙ্গে, প্রতিবেশী নকুড়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পও করে। চোখের দিকে তাকাও, বাৎসল্য নাই, স্নেহ মমতা নাই, শ্রান্তি নাই,—কিছুই নাই! শ্যামা সত্যই যন্ত্র নাকি?

মামা বলে, খেটে খেটে মরবি নাকি শ্যামা? যা যা তুই যা, মিস্ত্রির কাজ আমি দেখব'খন।

শ্যামা বলে, না মামা, তুমি বুড়ো মানুষ, তোমার কেন এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াবে? যা সব বজ্জাত মিস্ত্রি, বজ্জাতি করে মালমশলা নষ্ট করবে, তুমি ওদের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া, নিজের চোখে না দেখে আমার স্বস্তি নেই কাজ কতদুর এগুলো,—ঘর তোলার সাধ কি আমার আজকের! তুমি ঘরে গিয়ে বোসো মামা,—পিঠে কোথায় ব্যথা বলছিলে না? রাণী বরং একটু তেল মালিশ করে দিক।

শীতল কোন দিকে নজর দেয় না, কেবল সে যে পুরুষ মানুষ এবং বাড়ির কর্তা, এটুকু দেখাইবার জন্য বলা নাই কওয়া নাই মাঝে মাঝে কর্তৃত্ব ফলাইতে যায়। গম্ভীর মুখে বলে, এখানে জানালা হবে বুঝি, দেয়ালের যেখানে ফাঁক রাখছ?

মিস্ত্রিরা মুখ টিপিয়া হাসে। শ্যামা বলে জানালা হবে না ত কি দেয়ালে ফাঁক থাকবে?

তাই বলছি—শীতল বলে,—জানালা হবে কটা? তিনটে মোটে? না না, তিনটে জানালায় আলো বাতাস খেলবে না ভাল,—ওহে মিস্ত্রি এইখানে আরেকটা জানালা ফুটিয়ে দাও,—এদিকে একটাও জানালা করনি দেখছি।

শ্যামা বলে, ওদিকে জানালা হবে না, ওদিকে নকুড়বাবুর বাড়ি দেখছ না? আর বছর ওরাও দোতালায় ঘর তুলবে, আমাদের ঘেঁষে ওদের দেয়াল উঠবে,—জানালা দিয়ে তখন করবে কি? জান না বোঝ না ফোঁপরদালালি কোরো না বাবু তুমি।

শীতল অপমান বোধ করে, কিন্তু যেন অপমান বোধ করে নাই এমনি ভাবে বলে, তা কে জানে ওরা আবার ঘর তুলবে!—হাঁ হাঁ, ওখানে আস্ত ইঁট দিও না মিস্ত্রি দেখছ না বসছে না, কতখানি ফাঁক রয়ে গেল ভেতরে? দুখানা আদ্ধেক ইঁট দাও, দিয়ে মাঝখানে একটা সিকি ইঁট দাও।

মিস্ত্রিরা কথা বলে না, মাঝখানের ফাঁকটাতে কয়েকটা ইঁটের কুচি দিয়া মশলা ঢালিয়া দেয়, শীতল আড়চোখে চাহিয়া দেখে শ্যামা ক্রুর চোখে চাহিয়া আছে। শীতল এদিকে ওদিকে তাকায়, হঠাৎ শ্যামার দিকে চাহিয়া একটু হাসে, পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া নিচে নামিয়া

আসে। দাঁড়াইয়া বিধানের একটু পড়া দেখে,—পড়িবার জন্য ছেলেকে শ্যামা গত বৈশাখ মাসে নূতন টেবিল চেয়ার কিনিয়া দিয়াছে,—পড়া দেখিতে দেখিতে শীতল টের পায় শ্যামা ঘরে আসিয়াছে।। তখন সে বিধানের বইএর পাতায় একস্থানে আঙ্গুল দিয়া বলে : এখানটা ভাল করে বুঝে পড়িস খোকা, পরীক্ষায় মাঝে মাঝে দেয়। তারপর বিধান জিজ্ঞাসা করে : Circumlocutory মানে কি বাবা? শীতল বলে, দেখ, না দেখ, মানের বই দেখ,। বিধান তখন খিল খিল করিয়া হাসে। শ্যামা বলে : পড়ার সময় কেন ওকে বিরক্ত করছ বলত?

শীতল বলে, হাসলি যে খোকা?—শীতলের মুখ মেঘের মত অন্ধকার হইয়া আসে, বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? হারামজাদা ছেলে কোথাকার! বলিয়া ছেলেকে সে আথালি পাথালি মারিতে আরম্ভ করে। বিধান চেঁচায়, বুকু চেঁচায়, শ্যামা চেঁচায়, বাড়িতে একেবারে হৈ চৈ বাধিয়া যায়। শ্যামা দুই হাতে বিধানকে বুকের মধ্যে আড়াল করে, শীতল গায়ের ঝাল ঝাড়িতেই শ্যামার গায়ে দুচারটা মার বসাইয়া দেয় অথবা সেগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শ্যামার গায়ে লাগে বুঝিবার উপায় থাকে না। শ্যামা তো আজ গৃহিণী, মোটাসোটা রাজরাণীর মত তাহার চেহারা, শীতল কি এখন তাহাকে ইচ্ছা করিয়া মারিবে?

এমনিভাবে দিন যায়, ঠাণ্ডায় শীতের দিনগুলি হ্রস্ব হইয়া আসে। মামা সেই যে একবার শ্যামাকে কুড়িটি টাকা দিয়াছিল আজ পর্যন্ত সে আর একটি পয়সাও আনিয়া দেয় নাই, শ্যামা তবু শীতলের চেয়ে মামাকেই খাতির করে বেশি : মামার সঙ্গে শ্যামার বনে, শ্যামার ছেলেদের মামা বড় ভালবাসে, শীতলের চেয়েও বুঝি বেশি। নিজের বাড়িতে শীতল কেমন পরের মত থাকে, যে সব খাপছাড়া তাহার কাণ্ড, কে তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা করিবে? শীতলকে ভালবাসে শুধু বকুল। মেয়েটার মন বড় বিচিত্র, যা কিছু খাপছাড়া যা কিছু অসাধারণ তাই সে ভালবাসে! শীতলও বোধ হয় খোঁড়া কুকুর, লোম-ওঠা ঘা-ওলা বিড়াল, ভাঙা পুতুল এই সবের পর্যায়ে পড়ে, বকুল তাই শ্যামার ভাষায় বাবা বলিতে অজ্ঞান। ছেলেবেলা হইতে বকুলের স্বাস্থ্যটি বড় ভাল, চলাফেরা হাসি খেলা স্বাভাবিক নিয়মে সবই তার সুন্দর, কত প্রাণ, কত ভঙ্গি। সকলে তাহাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে কথা বলিতে সকলেই উৎসুক, সে কিন্তু যাকে, তাকে ধরা দেয় না, নির্মমভাবে উপেক্ষা করিয়া চলে! খেলনা ও খাবার দিয়া, তোষামোদের কথা বলিয়া তাহাকে জয় করা যায় না। মামা কত চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই। শ্যামার তিন ছেলেই মামার ভক্ত, বকুল কিন্তু তাহার ধারে কাছেও ঘেঁসে না! শ্যামার সঙ্গেও বকুলের তেমন ভাব নাই, শ্যামাকে সে স্পষ্টই অবহেলা করে। বাড়িতে সে ভালবাসে শুধু বাবাকে, শীতল যতক্ষণ বাড়ি থাকে, পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, শীতলের চুল তোলে, ঘামাচি মারে, মুখে বিড়ি দিয়া দেশলাই ধরাইয়া দেয়, আর অনর্গল কথা বলে। শীতল বাড়ি না থাকিলে ছাদে গিয়া তাহার গোসাঘরে পুতুল খেলে, মিস্ত্রিদের কাজ দেখে, আর শ্যামার ফরমাস খাটে। শীতল না থাকিলে মেয়েটার মুখের কথা যেন ফুরাইয়া যায়!

একদিন শ্যামা নূতন গুড়ের পায়স করিয়াছে, সকলে পরিতোষ করিয়া খাইল, বকুল কিছুতে খাইবে না, কেবলি বলিতে লাগিল, দাঁড়াও, বাবা আসুক, বাবাকে দাও?

শ্যামা বলিল, সে তো আসবে রাত্তিরে, ওই ছাখ, বড় জাম-বাটিতে তার জন্যে তুলে রেখেছি, এসে খাবে। তোরটা তুই খা!

বকুল বলিল, বাবা পায়েস খেতে আসবে দু'টোর সময়।

শ্যামা বলিল, কি করে জানলি তুই আসবে?

বকুল বলিল, আমি বললাম যে আসতে? বাবা বললে দুটোর সময় ঠিক আসবে,—আমি বাবার সঙ্গে খাব।

শ্যামা বলিল, দেখলে মামা মেয়ের আব্দার? বুড়ো ঢেঁকি মেয়ে বাবাকে পায়েস খাবার নেমন্তন্ন করেছেন, আপিস থেকে তিনি পায়েস খেতে বাড়ি আসবেন।···খা বুকু, খেয়ে বাটি খালি করে দে। তিনি যখন আসবেন খাবেন এখন, তুই বরং আদর করে খাইয়ে দিস, এখন নিজে খেয়ে আমায় রেহাই দে তো।

বকুল কিছুতে খাইবে না, শ্যামারও জিদ চাপিয়া গেল, সেও খাওয়াবেই। পিঠে জোরে দুটো চড় মারিয়া কোন ফল হইল না, বকুল একটু কাঁদিল না পর্যন্ত। আরো জোরে মারিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু যতই হোক শ্যামার তো মায়ের মন, কতবার কত জোরে আর মায়ের মন লইয়া মেয়েকে মারা যায়? এক খাবলা পায়স তুলিয়া শ্যামা মেয়ের মুখে গুঁজিয়া দিতে গেল, বকুল দাঁত কামড়াইয়া রহিল, তার মুখ শুধু মাখা হইয়া গেল পায়সে।

হার মানিয়া শ্যামা অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, উঃ, কি জিদ মেয়ের! কিছুতে পারলাম না খাওয়াতে?

দু'টোর আগে শীতল সত্য সত্যই ফিরিয়া আসিল। শ্যামা আসন পাতিয়া গেলাসে জল ভরিয়া দিল। ভাবিল, শীতল খাইতে বসিলে সবিস্তারে বকুলের জিদের গল্প করিবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাপ-বেটিতে কি পরামর্শই যে দু'জনে তাহারা করিল, খানিক পরে মেয়ের হাত ধরিয়া শীতল বাড়ির বাহির হইয়া গেল। যাওয়ার আগে শ্যামার সঙ্গে তাহাদের যে কথা হইল, তাহা এই।

শ্যামা বলিল, কোথায় যাচ্ছ শুনি?

শীতল বলিল, চুলোয়।

শ্যামা বলিল, পায়েস খেয়ে যাও।

বকুল বলিল, তোমার পায়েস আমরা খাইনে।

শ্যামা বলিল, দেখো, ভাল করছ না কিন্তু তুমি। আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের তো মাথা খেলে।

এর জবাবে শীতল বা বকুল কেহই কিছু বলিল না। পা দিয়া পায়সের বাটি উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া শ্যামা ফেলিল কাঁদিয়া।

রাত প্রায় ন'টার সময় দু'জনে ফিরিয়া আসিল। বকুলের গায়ে নতুন জামা, পরণে নতুন কাপড়, দু-হাত বোঝাই খেলনা, আনন্দে বকুল প্রায় পাগল। আজ কিছুক্ষণের জন্য সকলের সঙ্গেই সে ভাব করিল, শ্যামার অপরাধও মনে রাখিল না, মহোৎসাহে সকলকে সে তাহার সম্পত্তি দেখাইল, বাবার সঙ্গে কোথায় কোথায় গিয়াছিল, গল গল করিয়া বলিয়া গেল।

শীতল উৎসাহ দিয়া বলিল, কি খেয়েছিস বললি না বুকু?

পরদিন রাত্রে প্রেস হইতে ফিরিয়া বকুলকে শীতল দেখিতে পাইল না। শ্যামা বলিল, মামার সঙ্গে সে বনগাঁয়ে পিসির কাছে বেড়াইতে গিয়াছে।

আমায় না বলে পাঠালে কেন?

বললে কি আর তুমি যেতে দিতে? যাবার জন্য কাঁদাকাটা করতে লাগল, তাই পাঠিয়ে দিলাম।

হঠাৎ বনগাঁ যাবার জন্য ও কাঁদাকাটা করল কেন?

কাল পরশু ফিরে আসবে।

ঝোঁকের মাথায় কাজটা করিয়া ফেলিয়া শ্যামার বড় ভয় আর অনুতাপ হইতেছিল, সে আবার বলিল, পাঠিয়ে অন্যায় করেছি। আর করব না।

শীতলের কাছে ত্রুটি স্বীকার করিতে আজকাল শ্যামার এমন বাধ বাধ ঠেকে! নিজে চারিদিকে সব ব্যবস্থা করিয়া করিয়া স্বভাবটা কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে, কোন বিষয়ে কারো কাছে যেন আর নত হওয়া যায় না। আর বকুলকে এমন ভাবে হঠাৎ বনগাঁয়ে পাঠাইয়াও দিয়াছে তো এই কারণে, মেয়ের উপর অধিকার জাহির করিতে। কাজটা যে বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, ওরা রওনা হইয়া যাওয়ার পরেই শ্যামার তাহা খেয়াল হইয়াছে।

শীতল কিন্তু আজ চেঁচামেচি গালাগালি করিল না, করিলে ভাল হইত, ছড়ি দিয়া শ্যামাকে অমন করিয়া হয়ত সে তাহা হইলে মারিত না। মাথায় ছিটওলা মানুষ, যখন যা করে একেবারে চরম করিয়া ছাড়ে। শ্যামার গায়ে ছড়ির দাগ কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল।

মারিয়া শীতল বলিল, বজ্জাত মাগী, তোকে আমি শাস্তি দিই দেখ্। এই গেল এক নম্বর। দু' নম্বর শাস্তি তুই জন্মে ভুলবি না।

শাস্তি? আবার কি শাস্তি শীতল তাহাকে দিবে? তাহার স্বামী?

বিবাহের পরেই শ্যামা টের পাইয়াছিল শীতলের মাথায় ছিট আছে। পাগলের কাণ্ডকারখানা কিছু বুঝিবার উপায় নাই। পরদিন দশটার সময় নিয়মিতভাবে স্নানাহার শেষ করিয়া শীতল আপিসে গেল। বারটা একটার সময় ফিরিয়া আসিল। শ্যামাকে আড়ালে ডাকিয়া তাহার হাতে দিল একতাড়া নোট। শ্যামা গুণিয়া দেখিল, এক হাজার টাকা। এ কেমন শাস্তি? শীতল কি করিয়াছে, কি করিতে চায়?

এ কিসের টাকা?—শ্যামা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল।

শীতল বলিল, বাবু বোনাস দিয়েছেন। পরশু লাভের হিসাব হ'ল কিনা, ঢের টাকা লাভ হয়েছে এবছর,—আমার জন্যেই তো সব? তাই আমাকে এটা বোনাস দিয়েছেন।

এত টাকা! হাজার! আনন্দে শ্যামার নাচিতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে বলিল, বাবু তো লোক বড় ভাল?—হ্যাগা, কাল বড্ড রেগেছিলে না? বড় মেরেছিলে বাবু কাল—পাষাণের মত। ভাগ্যে কেউ টের পায়নি, নইলে কি ভাবত?—আপিস যাবে নাকি আবার?

যাই, কাজ পড়ে আছে। সাবধানে রেখো টাকা।

এই বলিয়া সেই যে শীতল গেল, আর আসিল না। দুদিন পরে মামা বনগাঁ হইতে একা ফিরিয়া আসিল।

বুকু কই মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল।

মামা বলিল, কেন, শীতলের সঙ্গে আসেনি? শীতল যে তাকে নিয়ে এল?

তখন সমস্ত বুঝিতে পারিয়া শ্যামা কপাল চাপড়াইয়া বলিল, আমার সর্বনাশ হয়েছে মামা।

কে জানিত, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চারটি সন্তানের জননী শ্যামার জীবনে এমন নাটকীয় ব্যাপার ঘটিবে?

পাঁচ

বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল চলিয়া গিয়াছে।

ফিরিয়া যদি সে না আসে, এ শাস্তি শ্যামা সত্যই জীবনে কখনো ভুলিবে না।

মামা বলিল, অত ভাবছিস কেন বল দিকি শ্যামা, রাগের মাথায় গেছে, রাগ পড়লে ফিরে আসবে। সংসারী মানুষ চাকরি-বাকরি ছেড়ে যাবে কোথা? আর ও-মেয়ে সামলানো কি তার কম্মো? দু'দিনে হয়রাণ হয়ে ফিরতে পথ পাবে না।

শ্যামা বলিল, কি কাণ্ড সে করে গেছে মামা, সেই জানে। কাল অসময়ে আপিস থেকে ফিরে আমায় হাজার টাকার নোট দিয়ে গেল। বললে, আপিস থেকে বোনাস দিয়েছে। কাল তো বুঝতে পারিনি মামা, হঠাৎ অত টাকা বোনাস দিতে যাবে কেন,—লাভের যা কমিশন পাবার সে তো ও পায়?

শ্যামার কিছু ভাল লাগে না, বুকের মধ্যে কি রকম করিতে থাকে, কিসে যেন চাপিয়া ধরিয়াছে বুকটা। কাজ করিয়া করিয়া এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে অন্য মনে

কলের মত তাহা করিয়া ফেলা যায় তাই, না হইলে শ্যামা আজ শুইয়া থাকিত, সংসার হইত অচল। ন'টার সময় মিস্ত্রিরা কাজ করিতে আসিল, ঘর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর সাত দিনের মধ্যে ঘর ব্যবহার করা চলিবে। বিধান খাইয়া স্কুলে গেল। মামাও সকাল সকাল খাইয়া, দেখি একটু খোঁজ করে, বলিয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল শুধু শ্যামা আর তাহার দুই শিশুপুত্র, মণি ও ছোটখোকা,—যার নাম ফণীন্দ্র রাখা ঠিক হইয়াছে।

দুপুর বেলা প্রেসের একজন কর্মচারীর সঙ্গে শীতলের মনিব কমলবাবু আসিলেন। রাণীকে দিয়া পরিচয় পাঠাইয়া শ্যামার সঙ্গে দরকারি কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছা জানাইলেন। তারপর নিজেই হাঁকিয়া শ্যামাকে শুনাইয়া বলিলেন, তিনি বুড়ো মানুষ, শীতলকে ছেলের মত মনে করিতেন, তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে শ্যামার কোন লজ্জা নাই। লজ্জা শ্যামা এমনিই করিত না, ঘোমটা টানিয়া সে বাহিরের ঘরে গেল। রাণী সঙ্গে গিয়াছিল, কমলবাবু বলিলেন, তোমার ঝিকে যেতে বল মা।

রাণী চলিয়া গেলে বলিলেন, শীতল ক'দিন বাড়ি আসেনি মা?

শ্যামা বলিল, বুধবার আপিসে গেলেন, তারপর আর ফেরেন নি।

ওইদিন একটার সময় শীতল যে বাড়ি ফিরিয়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছিল, শ্যামা সে কথা গোপন করিল।

একবারও আসেনি, দু' এক ঘণ্টার জন্য?

না।

তোমায় টাকাকড়ি কিছু দিয়ে যায় নি?

না।

কমলবাবুর গলাটি বড় মিষ্টি, ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া শ্যামা দেখিল মুখের ভাবও তাঁহার শান্ত, নিস্পৃহ। শ্যামা সাহস পাইয়া বলিল, কোন খবর না পেয়ে আমরা বড় ভাবনায় পড়েছি, আপনি যদি কিছু জানেন—কমল বাবু বলিলেন, না বাছা, আমরা কিছুই জানিনে। জানলে তোমায় শুধোতে আসব কেন?

মনে হয় আর কিছু বুঝি তাহার বলিবার নাই, এইবার বিদায় হইবেন, কিন্তু কমলবাবু লোক বড় পাকা, কলিকাতায় ব্যবসা করিয়া খান। কথা না বলিয়া খানিকক্ষণ শ্যামাকে তিনি দেখেন, মনে যাদের পাপ থাকে এমনিভাবে দেখিলে তারা বড় অস্বস্তি বোধ করে, কাবু হইয়া আসে। তারপর তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অকস্মাৎ ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন, এটি শীতলের ছেলে বুঝি? বেশ ছেলেটি, কি বল বীরেন?—এসো তো বাবা আমার কাছে, এসো।—নাম বলত বাবা? বল ভয় কি?—মণি? সোনামণি তুমি, না?—মণিকে এই সব বলেন আর আড়চোখে কমলবাবু শ্যামার দিকে তাকান। শ্যামা কাবু হইয়া আসে। ভাবে, হাজার টাকার কথাটা স্বীকার করিয়া কমলবাবুর পা জড়াইয়া ধরিবে নাকি?

কমলবাবু বলেন, বাবা কোথায় গেছে মণি? আপিস গেছে? বাবা খালি আপিস যায়, ভারি দুষ্টু তো তোমার বাবা,—কাল বাড়ি আসেন বাবা? আসেনি? বড় পাজি বাবাটা, এলে মেরে দিও।—বাবা তবে তোমার বাড়ি এসেছিল কবে? আসেনি? এক দিনও আসেনি? দিদিকে নিয়ে বাবা পালিয়ে গেছে?—

শ্যামা বলে, মেয়েকে নিয়ে বনগাঁ বোনের বাড়ি যাবেন বলেছিলেন, বোধ হয় তাই গেছেন।

কমলবাবু বনগাঁয়ে রাখালের ঠিকানাটা লিখিয়া লইলেন, মণির সম্বন্ধে আর তাঁহার কোনরূপ মোহ দেখা গেল না। এবার কড়া সুরেই কথা বলিলেন। বলিলেন, স্বামী তোমার লোক ভাল নয় মা, সব জেনে শুনে তুমি ভান করছ কিনা আমরা জানিনে, তোমার স্বামী চোর,—সংসারে মানুষকে বিশ্বাস করে বরাবর ঠকেছি তবু যে কেন তাকে বিশ্বাস করলাম! আমারি বোকামি, ভাবলাম, মাইনেতে কমিশনে মাসে দুশো আড়াইশ টাকা রোজগার করছে, সে কি আর সামান্য ক'হাজার টাকার জন্যে এমন কাজ করবে, মেশিন কেনার টাকাগুলো তাই দিলাম বিশ্বাস করে, তেমনি শিক্ষা আমায় দিয়েছে, চোরের স্বভাব যাবে কোথা? তোমায় বলে যাই বাছা, এ ইংরেজ রাজত্ব, ক'দিন লুকিয়ে থাকবে? পুলিসে এখনো খবর দিইনি, বোলো তোমার স্বামীকে, কালকের মধ্যে টাকাটা যদি ফিরিয়ে দেয় এবারের মত ক্ষমা করব,—লোভে পড়ে কত ভাল লোক হঠাৎ অমন কাজ করে বসে, তাছাড়া এতকাল কাজ করে প্রেসের উন্নতি করেছে, পুলিসে টুলসে দেবার আমার ইচ্ছা নেই,—বোলো এই কথা। কালকের দিনটা দেখে পরশু বাধ্য হয়েই পুলিসে খবর দিতে হবে।—কমলবাবু আবার শ্রান্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন, টাকাটা যদি তোমার কাছে দিয়ে গিয়ে থাকে? —

শ্যামা নীরবে মাথা নাড়ে।

বিকালে মামা বাড়ি ফিরিলে শ্যামা তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল, বাইশ বছর আগেকার কথা তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, খুঁজে পেতে এক পাগলের হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিলে মামা, সারাটা জীবন আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি, কত দুঃখ কষ্ট সয়ে কত চেষ্টায় সুখে সংসার গড়ে তুলেছিলাম, এবার তাও সে ভেঙে খান খান করে দিয়ে গেল, যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে তো মারছেই, আমাদেরও উপায় নেই, না খেয়ে মরতে হবে এবার, ছেলে নিয়ে কি করব আমি এখন, কি করে ওদের মানুষ করব?

বলিল, পালিয়ে পালিয়ে আর বেড়াবে ক'দিন, ধরা পড়বেই। মেয়েটার তখন কি উপায় হবে মামা, সঙ্গে থাকার জন্য ওকেও দেবে না তো জেল টেল?

মামা বলিল, পাগল, ওইটুকু মেয়ের কখনো জেল হয়? শীতলকে যদি পুলিসে ধরেই, বকুলকে তারাই বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

সমস্ত বাড়িতে বিপদের ছায়া পড়িয়াছে, বিধান সব বুঝিতে পারে, মুখখানা তাহার শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মণি কিছু বোঝে না, সেও অজানা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া আছে। মিস্ত্রিরা বিদায় হইয়া যাওয়ার পর সকলের কাছে চারিদিক থমথম করিতে লাগিল। ছেলেদের খাইতে দেওয়া হইল না, উনানে আঁচ পড়িল না, সন্ধ্যার সময় একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়া রাণী বাড়ি চলিয়া গেল। লণ্ঠনের সামনে বিপন্ন পরিবারটি ম্লান মুখে বসিয়া রহিল নীরবে, ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইলে শ্যামা বাটিতে করিয়া তাহাদের সামনে কতগুলি মুড়ি দিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিল। তাহার সমস্ত সাধ আহ্লাদ আশা আনন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কত বড় ভবিষ্যতকে সে মনে মনে গড়িয়া রাখিয়াছিল শ্যামা ভিন্ন কে তাহার খবর রাখে? পাগলের মত উদয়াস্ত সে খাটিয়া গিয়াছে, শীতল তো শুধু টাকা আনিয়া দিয়া খালাস, কোন দিন একটি পরামর্শ দেয় নাই, এতটুকু সাহায্য করিতে আসে নাই,—সংসার চালাইয়াছে সে, ছেলেমেয়ে মানুষ করিয়াছে সে, বাড়িতে ঘর তুলিতেছে সে, বিপদে আপদে বুক দিয়া পড়িয়া তাহার বুকের নীড়কে বাঁচাইয়াছে সে। এবার কি হইবে? বিধবা হইলে বুঝিতে পারিত ভগবান মারিয়াছেন, উপায় নাই। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অকারণে একি হইয়া গেল? একটু কলহের জন্য মারিয়া সর্বাঙ্গে কালশিরা ফেলিয়াও শীতলের সাধ মিটিল না, সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়া দিয়া গেল?

মামা ঘন ঘন তামাক টানে। ঘন ঘন বলে, এমন উন্মাদ সংসারে থাকে? মামা বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামা ও তাহার ছেলেদের ভারটা এবার মামার উপরেই পড়িবে বৈকি? হায়, সে সন্ন্যাসী বিবাগী মানুষ, বাইশ বছর সংসারের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই, হতভাগাটা তাহাকে একি দুরবস্থায় ফেলিয়া গেল? বুড়া বয়সে এই সবই তাহার অদৃষ্টে ছিল নাকি? মামা এই সব ভাবে, অরণ্যে প্রান্তরে জনপদে তাহার দীর্ঘ যাযাবর জীবনের স্মৃতি মনে আসে, একটা গেরুয়া কাপড় পর, গায়ে একটা গেরুয়া আলখাল্লা চাপাও, গলায় ঝুলাইয়া দাও কতগুলি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, তারপর যেখানে খুসি যাও, আতিথ্য মিলিবে, অর্থ মিলিবে, ভক্তি মিলিবে, কত নারী দেহ দিয়া সেবা করিয়া পুণ্য অর্জন করিবে: ধার্মিকের অভাব কিসের? আজ ধনীর অতিথিশালায় শ্বেতপাথরের মেঝেতে খড়ম খটাখট করিয়া হাঁটা, কাল সম্মুখে অফুরন্ত পথ, ভুট্টা ক্ষেতের পাশ দিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া, বনের নিবিড় ছায়া ভেদ করিয়া, পাহাড় ডিঙাইয়া মরুভূমির নিশ্চিহ্নতায়; সন্ধ্যায় গভীর ইঁদারার শীতল জল, সদ্য দোয়া ঈষদুষ্ণ দুধ, ঘিয়ে ভিজানো চাপাটি, আর ভীরু সলজ্জ গ্রাম্য কন্যাদের প্রণাম— একজনকে বাছিয়া বেশি কথা বলা বেশি অনুগ্রহ দেখানো,— কে বলিতে পারে? মামা ভাবে, বুড়ো বয়সে দেশে ফিরিবার বাসনা তাহার কেন হইয়াছিল? আসিতে না আসিতে কি বিপদেই জড়াইয়া পড়িল। মুখে কিন্তু মামা অন্য কথা বলে, বলে, এমন উন্মাদ সংসারে থাকে? আমি এসেছিলাম বলে তো, নইলে তুই স্ত্রীপুত্রকে কার কাছে ফেলে যেতি রে হতভাগা? একেবারে কাণ্ডজ্ঞান নেই? স্ত্রীপুত্রকে পরের ঘাড়ে ফেলে আপিসের টাকা চুরি করে মেয়ে নিয়ে তুই পালিয়ে গেলি?

শ্যামাই শেষে বিরক্ত হইয়া বলে, এখন আর ও কথা বলে লাভ কি হবে মামা? কি করতে হবে না হবে পরামর্শ করি এসো।

অনেক রকম পরামর্শই তাহারা করে। মামা একবার প্রস্তাব করে যে শ্যামার কাছে কিছু যদি টাকা থাকে, হাজার দুই তিন, ওই টাকাটা কমলবাবুকে দিয়া এখনকার মত ঠাণ্ডা করা যায়, পরে শীতল ফিরিয়া আসিলে যাহা হয় হইবে। শ্যামা বলে, তাহার টাকা নাই, টাকা সে কোথায় পাইবে? তা ছাড়া শীতল যে ফিরিয়া আসিবে তার কি মানে আছে? তখন মামা বলে, বাড়িটা বিক্রি করিয়া কমলবাবুকে টাকাটা দিয়া দিলে কেমন হয়? শীতল তাহা হইলে পুলিসের হাত হইতে বাঁচে। শ্যামা বলে যে শীতল যদি ফাঁসিও যায় বাড়ি সে বিক্রয় করিতে দিবে না। এই কথা বলিয়া তাহার খেয়াল হয় যে ইচ্ছা থাকলেও বাড়ি সে বিক্রয় করিতে পারিবে না, বাড়ি শীতলের নামে। শুনিয়া মামা একেবারে হতাশ হইয়া বলে যে তা হলেই সর্বনাশ, টাকাগুলি খরচ করিয়া শীতল ফিরিয়া আসিয়াই বাড়িটা বিক্রয় করিয়া নিশ্চয় কমলবাবুর টাকাটা দিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। শ্যামার মুখ শুকাইয়া যায়, সে কাঁদিতে থাকে।

পরামর্শ করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না, বেশির ভাগ আরো বেশি বেশি বিপদের সম্ভাবনাগুলি আবিষ্কৃত হইতে থাকে।

শেষে মামা এক সময় বলে, শ্যামা, সর্বনাশ করেছিস!— আপিসের টাকা থেকে শীতল তোকে দিয়ে যায় নি হাজার টাকা?

শ্যামা বলে, একথা জিজ্ঞেস করছ কেন মামা?

মামা বলে, কেন করছি তুই তার কি বুঝবি, পুলিসে বাড়ি সার্চ করবে না? নোট টোট যদি দিয়ে গিয়ে থাকে তা বেরিয়ে পড়বে না? তোকে ধরে তখন যে টানাটানি করবে রে?

শুনিয়া শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া যায়, বলে, কি হবে মামা তবে?

এবার মামা সুপরামর্শ দেয়, বলে, দে দে, আমায় এনে দে টাকাগুলো, দেখ দিকি কি সর্বনাশ করেছিলি? ওরে

নোটের যে নম্বর থাকে, দেখা মাত্র ধরা পড়বে ও টাকা কমলবাবুর! ছি ছি, তোর একেবারে বুদ্ধি নেই শ্যামা, দে নোটগুলো আমি নিয়ে যাই, কলকাতায় মেসে হোটেলে ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকিগে। আস্তে আস্তে পারি তো নোটগুলো বদলে ফেলব, নয়ত দু'এক বছর এখন লুকানো থাক, পরে একটি দুটি করে বার করলেই হবে।

সেই রাত্রেই নোটের তাড়া লইয়া মামা চলিয়া গেল। শ্যামা বলিল, মাঝে মাঝে তুমি এলে কি ক্ষতি হবে মামা, পুলিস তোমায় সন্দেহ করবে?

মামা বলিল, আমায় কেন সন্দেহ করবে?—আসব শ্যামা, মাঝে মাঝে আমি আসব।

রাত্রি প্রভাত হইল, শ্যামার ঘরের ছাদ পিটানোর শব্দে দিনটা মুখর হইয়া রহিল, দুদিন দুরাত্রি গেল পার হইয়া, না আসিল পুলিস, না আসিল মামা, না আসিল শীতল। শ্যামার চোখে জল পুরিয়া আসিতে লাগিল। কতকাল আগে তাহার বার দিনের ছেলেটি মরিয়া গিয়াছিল, তারপর আর তো কোন দিন সে ভয়ঙ্কর দুঃখ পায় নাই, ছোটখাট দুঃখ দুর্দশা যা আসিয়াছে স্মৃতিতে এতটুকু দাগ পর্যন্ত রাখিয়া যায় নাই, সুখ ও আনন্দের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে। জীবনে তাহার গতি ছিল, কোলাহল ছিল, আজ কি স্তব্ধতার মধ্যে সেই গতি রুদ্ধ হইয়া গেল দেখো। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ভাবে। বকুল? কোথায় কি অবস্থায় মেয়েটা কি করিতেছে কে জানে! শীতলের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সময়ে হয় তো খাইতে পায় না, নরম বালিশ ছাড়া মেয়ে তাহার মাথায় দিতে পারিত না, কোথায় কি ভাবে পড়িয়া হয়ত এখন সে ঘুমায়, শীতল হয়ত বকে চুপি চুপি অভিমানিনী লুকাইয়া কাঁদে? বিষ্ণুপ্রিয়ার মেয়ের দেখাদেখি বকুলের কত বায়নানি ছিল, ময়লা ফ্রকটি গায়ে দিত না, মুখে সর মাখিত, লাল ফিতা দিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে হইত, আঁচলে এক ফোঁটা অগুরু দিবার জন্য মার পিছনে পিছনে আব্দার করিয়া ঘুরিত। কে এখন জামায় তাহার সাবান দিয়া দেয়? কে চুলের বিনুনি করে? বকুলের মুখে কত ধুলা না জানি লাগে, আঁচল দিয়া সে শুধু মুখটি মুছিয়া ফেলে, কে দিবে দুধের সর।

দিন তিনেক পরে মামা আসিল। বলিল, সার্চ করে গেছে? করে নি? ব্যাপার তবে কিছু বোঝা গেল না শ্যামা, কি মতলব যেন করেছে কমলবাবু, আঁচ করে উঠতে পারছি না।

শ্যামা বলিল, টাকাটার কোন ব্যবস্থা করে তুমি এসে থাকতে পার না মামা এখানে? এই পুলিস আসে, এই পুলিস আসে করে ভয়ে ভয়ে থাকি, এসে তারা কি করবে কি বলবে কে জানে, মার-ধোর করে যদি, জিনিসপত্র যদি নিয়ে চলে যায়?

মামা একগাল হাসিয়া বলিল, থাকব বলেই তো টাকার ব্যবস্থা করে এলাম রে।

কোথায় রেখেছ?

তুই চিনবিনে, মস্ত জমিদার। নতুন কাপড়ের পুলিন্দে করে সিলমোহর এঁটে জমা দিয়েছি, বলেছি গাঁয়ে আমার বাড়ি ঘর আছে না, তার দলিলপত্র,—ঘুরে ঘুরে বেড়াই হারিয়ে টারিয়ে ফেলব, আমার সিন্দুকে যদি রেখে দাও বাবা? বড় ভক্তি করে আমায়, বলে, যোগ-তপস্যা সব ছেড়ে দিলেন নইলে আপনি তো মহাপুরুষ ছিলেন, দীক্ষা নেব ভেবেছিলাম আপনার কাছে।...জানিস মা, পিঠের ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে, ব্যথায় কাল ঘুম হয় নি।

রাণী একটু মালিশ করে দিক?—শ্যামা বলিল।

দশ বার দিন কাটিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া একদিন শ্যামাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, রাগারাগি করিয়া মেয়ে লইয়া শীতল চলিয়া গিয়াছে এই পর্যন্ত শ্যামা তাহাকে বলিয়াছে, টাকা চুরির কথাটা উল্লেখ করে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া সমবেদনা দেখাইয়াছে খুব, বলিয়াছে, ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেলে যে, ভেবো না, ফিরে আসবে। বাড়ি-ঘর ছেড়ে ক'দিন আর থাকবে পালিয়ে? তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়াছে, সংসার খরচের টাকাকড়ি রেখে গেছে তো? শ্যামা জবাবে বলিয়াছে, কি কুক্ষণে যে দোতালায় ঘর তোলা আরম্ভ করেছিলাম দিদি, যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে পেতে সব ওতেই ঢেলেছি, কাল কুলি মিস্ত্রির মজুরি দেব কি করে ভগবান জানে।—বলিয়া সজল চোখে সে নিশ্বাস ফেলিয়াছে। তারপর বিষ্ণুপ্রিয়া খানিক্ষণ ভাবিয়াছে, ভ্রূকুঁচকাইয়া একটু যেন বিরক্ত এবং রুষ্টও হইয়াছে, শেষে উঠিয়া গিয়া হাতের মুঠায় কি যেন আনিয়া শ্যামার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়াছে। কি লজ্জা তখন এ দুটি জননীর: চোখ তুলিয়া কেহ আর কারো মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই।

বেশি কিছু নয়, পঁচিশটা টাকা। বাড়ি গিয়া শ্যামা ভাবিয়াছে, এ টাকা সে লইল কেমন করিয়া? কেন লইল? এখনি এমন কি অভাব তাহার হইয়াছে? ভবিষ্যতে আর কি তাহার সাহায্য দরকার হইবে না যে এখনি মাত্র পঁচিশটা টাকা লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিরক্ত করিয়া রাখিল? তারপর শ্যামার মনে পড়িয়াছে টাকাটা সে নিজে চাহে নাই, বিষ্ণুপ্রিয়া যাচিয়া দিয়াছে। নেওয়াটা তবে বোধ হয় দোষের হয় নাই বেশি। বনগাঁয়ে মন্দাকে শ্যামা একদিন একখানা চিঠি লিখিল, সেই যে রাখাল সাতশ টাকা লইয়াছিল তার জন্য তাগিদ দিয়া। সে যে কত বড় বিপদে পড়িয়াছে এক পাতায় তা লিখিয়া, আরেকটা পাতা সে ভরিয়া দিল টাকা পাঠাইবার অনুরোধে। সব না পারুক, কিছু টাকা অন্তত রাখাল যেন ফেরত দেয়।—

আমি কি যন্ত্রণায় আছি বুঝতে পারছ তো ঠাকুরঝি ভাই? আমার যখন ছিল তোমাদের দিইছি, এখন তোমরা আমায় না দিলে হাত পাতব কার কাছে? দিন সাতেক পরে মন্দার চিঠি আসিল, অশ্রু সজল এত কথা সে চিঠিতে ছিল যে চাপ দিলে বুঝি ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িত। দাদা কোথায় গেল, কেন গেল, শ্যামা কেন আগে লেখে নাই, কাগজে কাগজে, বিজ্ঞাপন কেন দেয় নাই, দেশে দেশে খোঁজ করিতে কেন লোক ছুটায় নাই, এমন করিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় ছোট বোনটির কথা দাদার কি একবারও মনে পড়িল না? যাই হোক, সামনের রবিবার রাখাল কলিকাতা আসিতেছে, দাদাকে খোঁজ করার যা যা ব্যবস্থা দরকার সেই করিবে, শ্যামার কোন চিন্তা নাই। টাকার কথা মন্দা কিছু লেখে নাই।

রবিবার সকালে রাখাল ভারি ব্যস্ত সমস্ত অবস্থায় আসিয়া পড়িল, যেন শীতলের পালানোর পর প্রায় একমাস কাটিয়া যায় নাই. যা কিছু ব্যবস্থা সে করিতে আসিয়াছে, এক ঘণ্টার মধ্যে সে সব না করিলেই নয়। বাড়িতে পা দিয়াই বলিল, কি বৃত্তান্ত সব বল তো বৌঠান।

শ্যামা বলিল, বসুন, জিরোন, সব বলছি।

জিরোব?—জিরোবার কি সময় আছে।

মন্দার কাছে চিঠিতে শ্যামা শীতলের তহবিল তছরূপের বিষয়ে কিছু লেখে নাই, রাখালকে বলিতে হইল। রাখাল বলিল, শীতলবাবু, এমন কাজ করবেন, এ যে বিশ্বাস হতে চায় না বৌঠান! রাগ করে চলে যাওয়া,—হ্যাঁ সেটা সম্ভব, মানুষটা রাগী, কিন্তু—

অনেক কথাই হইল, অনেক অর্থহীন, কতক অবান্তর, কতক নিছক ব্যক্তিগত সমালোচনা ও মন্তব্য। আসল কথাটা আর ওঠেই না। শ্যামা রাখালের কথা তুলিবার অপেক্ষা করে, রাখাল ভাবে শ্যামাই কথাটা পাড়ুক; সারাটা সকাল তাহারা ঝোপের এদিক ওদিক লাঠি পিটাইল, ঝোপ হইতে বাঘ বাহির হইবে না প্রথম তোলা ময়ূর বাহির হইবে, সকাল বেলা সেটা আর ঠাহর করা গেল না। বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে, শ্যামা রাঁধিতে গেল; রাখাল গল্প জুড়িল মামার সঙ্গে। শ্যামা ভাবিল, কি আশ্চর্য পরিবর্তন আসে মানুষের জীবনে? খোলা মাঠে কি ভাবে হিংস্র শ্বাপদ-ভরা জঙ্গল গড়িয়া ওঠে কয়েকটা বছরে? মুখোমুখি বসিয়া আজ রাখালের মন ও তাহার মনের মুখ দেখাদেখি নাই: দুজনের খোলা মনে যে জঙ্গল গিজ গিজ করিতেছে, তার মধ্যে দুজনে লুকোচুরি খেলিতেছে। না, ঠিক এভাবে শ্যামা ভাবে নাই? সে সোজাসুজি সাধারণ ভাবেই ভাবিল যে রাখাল কি স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে! জঙ্গলের রূপকটা তাহার অনুভূত।

হ্যাঁ, মানুষ বদলায়। বদলায় না বাড়িঘর, বদলায় না জগৎ। এমনি শীতকালে একদিন রাত্রে বারান্দায় শীতলের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় শীতে তাহাকে কাঁপিতে দেখিয়া রাখাল নিজের গায়ের আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া দিয়াছিল, হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া বসাইয়াছিল, বৌঠান তুমি শোও, আমি দরজা খুলে দেব। শ্যামার সব মনে আছে. সে সব ভুলিবার কথা নয়। রাখাল তাকে যেন দামি পুতুল মনে করিত, এতটুকু আঘাত লাগিলে সে যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে এমনি যত্ন ছিল রাখালের. অসুখ হইলে কপালে হাত বুলানোর আর তো কেহ ছিল না তাহার রাখাল ছাড়া!

টাকার কথাটা দুপুরে উঠিয়া পড়িল, রাখাল মাথা নীচু করিয়া বলিল, জানতো বৌঠান আমার রোজকার? পঁচাত্তরটি টাকা মাইনে পাই, দুটো সংসার ছেলেমেয়ে, কোন মাসে ধার হয়। একটা বোনের বিয়ে দিয়েছি, এখনও একটা বাকি, তারও বয়স হল, দু'এক বছরের মধ্যে তার বিয়ে না দিলেও চলবে না,—এখন কি করে তোমার টাকা দিই বৌঠান?—তোমার অবস্থা বুঝি, আমার অবস্থা বুঝে দেখো।

সুতরাং তাহাদের কলহ বাধিয়া গেল খানিক পরেই; এমন শীতের দিনে জলে হাত ভিজাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া হঠাৎ পরস্পরের গায়ে দিয়া একদিন তাহারা হাসাহাসি করিত, টাকার জন্য তাহাদের কলহ? এক আশ্চর্য্য কথা যে সেদিনের স্মৃতি তাহারা ভুলিয়া গেল, সংসারে রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে যে ইতিহাস স্মরণ করা মাত্র দুদিন আগেও যাহারা অবাস্তব স্বপ্ন দেখিতে পারিত? শ্যামা কড়া কড়া অপমানজনক কথা বলিল, সেই সাত শত টাকার উল্লেখ করিয়া রাখালকে সে একরকম জুয়াচোর প্রতিপন্ন করিয়া দিল। রাখাল জবাবে বলিল, শ্যামা যদি মনে করিয়া থাকে নিজের হকের ধন ছাড়া শীতলের কাছে কোন দিন সে একটি পয়সা নিয়াছে, শীতল জেল হইতে ফিরিলে শ্যামা যেন আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখে। শ্যামা বলিল, হকের ধন কিসে? রাখাল বলিল, শ্যামা তার কি জানিবে? মন্দার বিবাহ দিবার সময় শীতল যে জুয়াচুরি করিয়াছিল, রাখাল বলিয়াই সেদিন তাহার জাত বাঁচিয়াছিল, আর কেহ হইলে বিবাহসভা হইতে উঠিয়া যাইত: শীতল অর্দ্ধেক গয়না দেয় নাই, পণের টাকা দেয় নাই একটি পয়সা। তারপর সেই গোড়ার দিকে প্রেসের কি সব কিনিবার জন্য ভুলাইয়া সে যে রাখালের পাঁচশত টাকা লইয়া এক পয়সা কোনদিন ফেরত দেয় নাই শ্যামা কি তা জানে? সংসারে কে কেমন লোক জানিতে রাখালের আর বাকি নাই।

এই সব কথার আদান-প্রদান করিবার পর দুজনে বড় বিষণ্ণ হইয়া রহিল। রাখাল বিদায় হইল বিকালে।

শ্যামা বলিল, ঠাকুরজামাই! ভাবনায় চিন্তায় মাথা আমার খারাপ হয়ে গেছে, রাগের সময় দুটো মন্দ কথা বলেছি বলে আপনিও আমায় এই বিপদের মধ্যে ফেলে চললেন?

রাখাল বলিল, না না, সে কি কথা বৌঠান, রাগ কেন করব? তুমিও দুটো কথা বলেছ, আমিও দুটো কথা বলেছি, ওইখানেই ত মিটে গেছে—রাগারাগির কি আছে?

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আপনারাই এখন আমার বল ভরসা, আপনারা না দেখলে কে আমায় দেখবে? ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি ভেসে যাব ঠাকুরজামাই।

বড়দিনের ছুটিতে আবার আসব বৌঠান।—রাখাল বলিল।

গতবার বড়দিনের ছুটিতে সে আসিয়াছিল—এবারও আসিবে বলিয়া গেল। রাখাল? সেই রাখাল? একদিন যে ছিল তাহার বন্ধুর চেয়েও বড়?

শীতের হ্রস্ব দিনগুলি শ্যামার কাছে দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ রাত্রিগুলি হইয়াছে অন্তহীন। শীতলের বিছানা খালি, বকুলের বিছানা খালি। কি ভঙ্গি করিয়া মেয়েটা শুইত, ফুলের মত দেখাইত না তাহাকে? গায়ে লেপ থাকিত না, শীতে মেয়েটা কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইত, শুইতে আসিয়া রোজ শ্যামা তাহার গায়ে লেপ তুলিয়া দিত! জাগিয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে। আর তো মেয়ে নাই শ্যামার, ওই একটি মেয়ে ছিল। আর কী সে মেয়ে! শ্যামার এই ছোট বাড়িতে অতটুকু মেয়ের প্রাণ যেন আঁটিত না, ও যেন ছিল আলো, ঘরের চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িত। সে অত প্রচুর ছিল বলিয়া শ্যামা বুঝি তাকে তেমন আদর করিত না? বকুল, ও বকুল, কোথায় গেলি তুই বকুল?

একদিন রাত্রে কে যেন পথের দিকের জানালায় টোকা দিতে লাগিল। শ্যামা জানালার খড়খড়ি ফাঁক করিয়া বলিল কে?

মৃদুস্বরে উত্তর আসিল, আমি শ্যামা আমি, দরজা খোলো।

জানালা খুলিয়া শ্যামা দেখিল, শীতল একা নয়, সঙ্গে বকুল আছে। দরজা খুলিয়া ওদের সে ভিতরে আনিল, বকুলকে আনিল কোলে করিয়া। বকুলের গায়ে একটা আলোয়ান জড়ানো, এই শীতে কি আলোয়ানে কিছু হয়, শ্যামার কোলে বকুল থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শ্যামার মনে হইল মেয়ে যেন তাহার হাল্কা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আসিয়া আলোতে বকুলের মুখ দেখিয়া শ্যামা শিহরিয়া উঠিল, ঠোঁট ফাটিয়া, গাল ফাটিয়া, মরা চামড়া উঠিয়া কি হইয়া গিয়াছে বকুলের মুখ? শ্যামা কথা কহিল না, লেপ কাঁথা যা হাতের কাছে পাইল তাই দিয়া জড়াইয়া মেয়েকে কোলে করিয়া বসিল, গায়ের গরমে একটু তো গরম পাইবে?

বকুল তো এমন হইয়াছে, শীতল? মাথায় মুখে কম্ফার্টার জড়াইয়া আসিয়াছিল, সেটা খুলিয়া ফেলিতে শ্যামা দেখল তার চেহারা তেমনি আছে, পুলিসের তাড়ায় পথে বিপথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গায়ে তাহার দামি নূতন গরম কোট, চাদরটাও নূতন। না, শীতলের কিছু হয় নাই। মেয়েটার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, সেই শুধু আধ-মরা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

ওর জ্বর হয়েছিল।—শীতল বলিল।

জ্বর? তাই বটে, অসুখ না হইলে মেয়ে কেন এত রোগা হইয়া যাইবে? শ্যামা শীতলের মুখের দিকে চাহিলে, চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল, ধরা গলায় বলিল, জন্মে থেকে ওর একদিনের জন্য গা গরম হয় নি!

শীতল কি তাহা জানে না? এ তাহাকে অনর্থক লজ্জা দেওয়া। শ্যামা এবার তাহার প্রতিকারহীন অপকীর্তির কথা তুলুক, তাহা হইলেই গৃহে প্রত্যাবর্তন তাহার সফল হয়। পরস্পরের দিকে চাহিয়া তাহারা যেন শত্রুতার পরিমাপ করিতে লাগিল। শ্যামার কি করিয়াছে শীতল? প্রেসের টাকা যদি সে চুরি করিয়া থাকে, সেজন্য জেলে যাইবে সে: সে স্বাধীন মানুষ নয়? শ্যামার তো সে কোন ক্ষতি করে নাই! বরং বাইশ বছর মাসে মাসে ওকে সে টাকা আনিয়া দিয়াছে। এবার যদি সে ছুটিই নেয়, কি বলিবার আছে শ্যামার? এমন সব কথা ভাবিতে গিয়া শীতলের বুঝি চোখ পড়িল ঘুমন্ত ছেলে ছুটির দিকে, মণি আর ছোট খোকা, যার নাম ফণীন্দ্র, বকুলের গায়ে জড়ানোর জন্য ওদের গা হইতে লেপটা শ্যামা ছিনাইয়া লইয়াছে। ওদের দেখিয়া শুধু নয়, কবে শীতল ভুলিতে পারিয়াছিল তার চেয়ে পরাধীন কেহ নাই, সৃষ্টিতত্ত্বের সে গোলাম, জেলে যাওয়ায়, মরিয়া যাওয়ায় অধিকার তাহার নাই, সে পাগল বলিয়াই না এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিল? জানালা বন্ধ ঘরে শীতলের স্তব্ধ রাত্রি, এই ঘরে দায়ে পড়া স্নেহ মমতার সঙ্গে সুখ-শান্তির বিরাট সমন্বয়টা দিনে আসিলে বোঝা যাইত না। এই ঘরে এমনি শীতের রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া সে কতকাল ঘুমাইয়াছে। তুচ্ছ তুলার তোষকে, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘুম আজ কত দুর্লভ!

ধীরে ধীরে তাহারা কথা বলিতে লাগিল, দুজনের মাঝে যেন দুস্তর ব্যবধান, একজন কথা বলিলে এতটা দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আরেকজনের কাছে পৌঁছিতে যেন সময় লাগে।

শ্যামা বলিল, টাকা কি সব খরচ করে ফেলেছ?

শীতল বলিল, না, দুচার'শ বোধ হয় গেছে মোটে।

শ্যামা বলিল, তাহলে কালকেই তুমি যাও, কমলবাবুর হাতে পায়ে ধরে পড় গিয়ে, টাকা ফিরে পেলে তিনি বোধ হয় আর গোলমাল করবেন না।

শীতল বলিল, যদি করেন গোলমাল? তাহলে টাকাও যাবে, জেলও খাটব। তার চেয়ে আমার পালানোই ভাল। তোমায় যে টাকা দিয়ে গেছি তাইতেই এখন চলবে, আমি পশ্চিমে চলে যাই, সেখানে দোকান টোকান দিয়ে যা করে হোক রোজগারের একটা পথ করে নিতে পারব, মাঝে মাঝে দেশে এসে এমনি রাত দুপুরে তোমার

সঙ্গে দেখা করে টাকা পয়সা দিয়ে যাব। তারপর দু'চার বছর কেটে গেলে বাড়িটা বিক্রি করে তোমরা এদিক ওদিক কিছু দিন ঘুরে ফি'রে আমি যেখানে থাকব সেইখানে চলে যাবে। দু' হাজার টাকার তো মামলা, কে আর অতাদন মনে করে রাখবে, কমলবাবুও ভুলে যাবে, পুলিসেও খোঁজটোঁজ আর নেবে না।

শ্যামা বলিল, বাড়ি বিক্রি করব কি করে? বাড়ি তো তোমার নামে।

এতক্ষণে শীতল একটু হাসিল, বলিল, সে আমি তোমায় কবে দান করে দিয়েছি, খুকি হবার সময় আমার একবার অসুখ হয়েছিল না?—সেইবার। আমার বাড়ি হলে কমলবাবু এতক্ষণ বাড়ি বিক্রি করে টাকা আদায় করে নিত।

শ্যামার মনে হয়, শীতলকে সে চিনিতে পারে নাই। মাথায় একটু ছিট আছে, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যা তা করিয়া বসে, কিন্তু বুকখানা স্নেহ-মমতায় ভরপুর।

ঘণ্টা দুই পরে সাব ইনসপেক্টর রজনী ধর আসলেন। ভারি অমায়িক লোক। হাসিয়া বলিলেন, না মশাই না, দেশে দেশে আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াইনি, যত বোকা ভাবেন আমাদের, অত বোকা আমরা নই, বি-এ এম-এটা আমরাও তো পাশ করি? আপনার বাড়িটাতে শুধু একটু নজর রেখেছিলাম—আমি নই, আমি মশায় থানায় ঘুমোচ্ছিলাম—অন্য লোক। আপনি একদিন আসবেন তা জানতাম,—সবাই আসে, স্ত্রী পরিবারের মায়া বড় মায়া মশায়। টাকাগুলো আছে নাকি পকেটে? দেখি একবার হাতড়ে। না থাকে তো নেই, টাকার চেয়ে আপনাকেই আমাদের দরকার বেশি, আপনাকে পাওয়া আর দু'শোটি টাকা পাওয়া সমান কিনা। জানেন না বুঝি? আপনার জন্যে কমলবাবু যে দু'শো টাকা পুরস্কার জমা দিয়েছেন।—নইলে এই শীতের রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেও আপনার সঙ্গে এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা কই?

শ্যামার কান্না, ছেলেমেয়ের কান্না, সর্ব্বসমেত পাঁচটি প্রাণীর কান্নার মধ্যে শীতলকে লইয়া সাব-ইন্‌সপেক্টর চলিয়া গেল।

মামা বলিল, কাঁদিসনে শ্যামা, কাল জামিনে খালাস করে আনব। তারপর চুপি চুপি বলিল, কি মুখ্য দেখলি? টাকাগুলো পকেটে করে নিয়ে এসেছে! নিজেও গেল টাকাও গেল,—গেল ত?

ছয়

শীতলের জেল হইয়াছে দু'বছর।

শ্যামা একজন ভাল উকিল দিয়াছিল। শীতলের এই প্রথম অপরাধ। টাকাও কমলবাবু প্রায় সব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন,—শ্যামা যে হাজার টাকা লুকাইয়া ফেলিয়াছিল আর শীতল যে শ'তিনেক খরচ করিয়াছিল, সেটা ছাড়া। জেল শীতলের ছ'মাস হইতে পারিত, এক বছর হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু শীতলের কিনা মাথায় ছিট আছে, বিচারের সময় হাকিমকে সে যেন একদিন কি সব বলিয়াছিল,—যেসব কথা মানুষকে খুসি করে না। তাই শীতলকে হাকিম কারাবাস দিয়াছিলেন আঠার মাস আর জরিমানা করিয়াছিলেন দু'হাজার টাকা,—অনাদায়ে আরও দশ মাস কারাবাস। জরিমানা দিলে কমলবাবু অর্ধেক পাইতেন, অর্ধেক যাইত সরকারী তহবিলে। এই জরিমানার ব্যাপারটা শ্যামাকে ক'দিন বড় ভাবনায় ফেলিয়াছিল। মামা না থাকিলে সে কি করিত বলা যায় না. বকুলকে শীতল যেদিন গভীর রাত্রে ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল, সেদিন দু'টি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাদের যেন একটা অভূতপূর্ব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল, দুই যুগ একত্র বাস করিয়াও তাহাদের যাহা আসে নাই: স্বামীর জন্য সে রাত্রে বড় মমতা হইয়াছিল শ্যামার। কিন্তু মামা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল. জরিমানার টাকা দেওয়াটা বড় বোকামির কাজ হইবে, বিশেষত বাড়ি বাঁধা না দিয়া যখন পুরা টাকাটা যোগাড় হইবে না—টাকা কই শ্যামার? হাজার টাকার নম্বর দেওয়া নোটগুলি তো এখন বাহির করা চলিবে না। বাহির করা চলিলেও আরেক হাজার টাকা?—কাজ নাই ওসব দুর্বুদ্ধি করিয়া। আঠার মাস যাকে কয়েদ খাটিতে হইবে, সে আর দশ মাস বেশি কাটাইতে পারিবে না জেলে! দশ মাসই বা কেন? বছরে ক'মাস জেল যে মকুব হয়। তারপর, শেষের চার ছ'মাস জেলে থাকিতে কয়েদীর কি আর কষ্ট হয়? তখন নামে মাত্র কয়েদী, সকালে বিকালে একবার নাম ডাকে, বাস তারপর কয়েদীর যেখানে খুসি যায়, যা খুসি করে,—রাজার হালে থাকে।

বাড়িতেও তো আসতে পারে, তবে এক আধ ঘণ্টার জন্যে?

না, তা পারে না,—জেলের বাইরে যেতে আসতে দেয়, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে এর ওর সঙ্গে কথা বলতে দেয়, তাই বলে নজর কি রাখে না একেবারে? তাছাড়া কয়েদীর পোষাক পরে কোথায় যাবে?—কেউ ধরে এনে দিলে তো শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াবে, পালিয়ে যাচ্ছিল!—আবার দেবে ছ'মাস ঠুকে! জেলের কাণ্ডকারখানার কথা আর বলিসনে শ্যামা, মজার জায়গা জেল,—শীতল যত কষ্ট পাবে ভাবছিস, তা সে পাবে না, ওই প্রথম দিকে একটু যা মনের কষ্ট।

উৎসাহের সঙ্গে গড়গড় করিয়া মামা বলিয়া যায়, অবাধ অকুণ্ঠ! কত অভিজ্ঞতাই জীবনে মামা সংগ্রহ করিয়াছে!

শ্যামা সজল চোখে বলিয়াছিল, এত খবরও তুমি জান

মামা! তুমি না থাকলে কি যে করতাম আমি,—ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যেতাম।—বছরে ক'মাস কয়েদ মকুব করে মামা? ভাল হয়ে থাকলে বোধ হয় শীগগির ছেড়ে দেয়—একদিন গিয়ে দেখা করে বলে আসব, ভাল হয়েই যেন থাকে।

পাড়ায় ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া গিয়াছে। পাড়ার যেসব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে শ্যামার জানাশোনা ছিল, শ্যামার সঙ্গে তাহাদের ব্যবহারও গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া। কেহ সহানুভূতি দেখায়, নীরবে ও সরবে: কেহ কোন রকম অনুভূতিই দেখায় না, বিস্ময়, সমবেদনা অবহেলা কিছুই নয়। পাড়ার নকুড়বাবুর পরিবারের সঙ্গে শ্যামার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি, এখন ওদের বাড়ি গেলে ওরা বসিতে বলিতে ভুলিয়া যায়, সংসারের কাজের চেয়ে শ্যামার দিকে নজর একটু বেশি দিতে মনে থাকে না, কথা বলিতে বলিতে ওদের কেমন উদাস বৈরাগ্য আসে, কত যেন শ্রান্ত ওরা, চোয়াল ভাঙ্গিয়া এখুনি হাই উঠিবে। শ্যামার বাড়িতে যারা বেড়াইতে আসিত, তাদের মধ্যে তারাই শুধু আসা যাওয়া সমানভাবে বজায় রাখিয়াছে, এমন কি বাড়াইয়াও দিয়াছে—যারা আসিলে শ্যামার সম্মান নাই, না আসিলে নাই অপমান।

বিধান এতকাল শঙ্করের সঙ্গে বাড়ির গাড়িতে স্কুলে গিয়াছে, একদিন দশটার সময় বই-খাতা লইয়া বাহির হইয়া গিয়া খানিক পরে সে আবার ফিরিয়া আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, স্কুলে গেলি নে?

শঙ্করকে নিয়ে গাড়ি চলে গেছে মা!

তোকে না নিয়েই চলে গেল? কেন রে খোকা, দেরি করে তো যাস নি তুই?

পরদিন আরও সকাল সকাল বিধান বাহির হইয়া গেল, আজও সে ফিরিয়া আসিল খানিক পরেই, মুখখানা শুকনো করিয়া। শ্যামা তখন বকুলকে ভাত দিতেছিল। সে বলিল, আজকেও গাড়ি চলে গেছে নাকি খোকা?

বিধান বলিল, ড্রাইভার আমাকে গাড়িতে উঠতে দিলে না মা, বললে, মাসিমা বারণ করে দিয়েছে—

এমন টনটনে অপমানজ্ঞান বিধানের? থামের আড়ালে সে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সে যেন অপরাধ করিয়া কার কাছে মার খাইয়া আসিয়াছে। শ্যামা বকুলকে ভাত দিয়া রান্নাঘরে পলাইয়া যায়, অতবড় ছেলে তাহার অপমানিত হইয়া ঘা খাইয়া আসিল, ওকে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

দুপুরবেলা শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়িতে গেল। দোতলায় বিষ্ণুপ্রিয়ার নিভৃত শয়নকক্ষ, সিঁড়ি দিয়া শ্যামা উপরে উঠিতে যাইতেছিল, রান্নাঘরের দাওয়া হইতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ঝি বলিল, কোথা যাচ্ছ মা হনহন করে?—যেও নি, গিন্নিমা ঘুমুচ্ছে,—এমনি ধারা সময় কারো বাড়ি কি আসতে আছে? যাও মা এখন, বিকেলে এসো।

শ্যামা বলিল, দিদির হাসি শুনলাম যে ঝি? জেগেই আছেন।

ঝি বলিল, হাসি শুনবে নি তো কি কান্না শুনবে মা? ওপরে এখন যেতে মানা, যেও না।

শ্যামা অগত্যা বাড়ি ফিরিয়া গেল। ভাবিল, পাঁচটার সময় আর একবার আসিয়া বলিয়া দেখিবে, উপায় কি, বিধানের তো স্কুলে না গেলে চলিবে না? বাড়ি ফিরিতেই বিধান বলিল, কোথা গিয়েছিলে মা?

ওই ওদের বাড়ি।

কাদের বাড়ি, বিধান জিজ্ঞাসা করিল না। ছেলেবেলা হইতে শ্যামা এই ছেলেটিকে অদ্ভুত বলিয়া জানে, রহস্যময় বলিয়া জানে, ছ'বছর বয়সে এই ছেলে তাহার উদাস নয়নে দুর্বোধ্য স্বপ্ন দেখিত, ডাকিলে সাড়া মিলিত না, কথা কহিয়া, খেলা দিয়া না যাইত হাসানো, না চলিত ভোলানো। আর নিষ্ঠুর? সময় সময় শ্যামার মনে হইত, ছেলে যেন পাষাণ,—রক্তমাংসে তৈরি বুক ওর নাই। তারপর ওর প্রকৃতির কত বিচিত্র দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আবার ওর মধ্যেই কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে,—একটির পর একটি দুর্বোধ্যতা, রাশি রাশি মুখোস পরিয়া সে যেন জন্মিয়াছিল, একে একে খুলিয়া চলিয়াছে, ওর আসল পরিচয় আজো শ্যামা চিনিল না। কত সময় সে ভয় পাইয়া ভাবিয়াছে, বাপের পাগলামিই কি ছেলের মধ্যে প্রবলতর হইয়া দেখা দিতেছে, ওকি একদিন পাগল হইয়া যাইবে? অত কি ভাবে ও? সময় সময় জননীর উন্মাদ ভালবাসাকে কেমন করিয়া দু'পায়ে মাড়াইয়া চলে অতটুকু ছেলে! বিধানকে মনে মনে শ্যামা ভয় করে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি যাওয়ার কথা ওকে সে বলিতে পারিল না।

বিধান বলিল, ওদের গাড়িতে আমি আর স্কুলে যাব না মা, কখখনো কোনদিন যাব না।

ওরা যদি আদর করে ডাকতে আসে?

ডাকতে এলে মেরে তাড়িয়ে দেব।

শুনিয়া শ্যামারও মনে হইল, এই তো ঠিক, অত অপমান তাহারা সহিবে কেন? যাদের মোটর নাই, ছেলে কি তাদের স্কুলে যায় না? সহসা উদ্ধত আত্মসম্মান জ্ঞানে শ্যামার হৃদয় ভরিয়া গেল। না, শঙ্করের সঙ্গে গাড়িতে তাহার ছেলেকে স্কুলে যাইতে দেওয়ার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার তোষামদ সে করিবে না।

পরদিন মামার সঙ্গে ছেলেকে সে স্কুলে পাঠাইয়া দিল। বলিল, এ মাসের ক'টা দিন মোটে বাকি আছে, এ'কটা দিন ট্রামে নগদ টিকিট কিনে ওকে স্কুলে দিয়ে এসো, নিয়ে এসো মামা, একদিন তোমার সঙ্গে এলে গেলে তারপর

ও নিজেই যাতায়াত করতে পারবে, মাস কাবারে কিনে দেব একটা মাসিক টিকিট।

বিধান অবজ্ঞার সুরে বলিল, যা তুমি খালি ভাব।—আমার চেয়ে কত ছোট ছেলে একলা ট্রামে চেপে স্কুলে যায়। আমি যেখানে খুসি যেতে পারি মা,—যাইনি ভাবছ? ট্রামে ক'দ্দিন গেছি চিড়িয়াখানায় চলে।

শ্যামা স্তম্ভিত হইয়া বলিল, স্কুল পালিয়ে একলাটি তুই চিড়িয়াখানায় যাস্ খোকা!

বিধান বলিল, রোজ নাকি? একদিন দু'দিন গেছি মোটে—স্কুল পালাইনি তো। প্রথম ঘণ্টা ক্লাশ হয়ে কদ্দিন আমাদের ছুটি হয়ে যায়, ক্লাশের একটা ছেলে মরে গেলে আমরা বুঝি স্কুল ক'র? এমনি হৈ-চৈ করি যে, হেডমাষ্টার ছুটি দিয়ে দেয়।

প্রথম প্রথম শীতলের জন্য বকুল কাঁদিত। দোতলার ঘরখানা শ্যামা তাহাদের শয়নকক্ষ করিয়াছে, দামি জিনিস-পত্রের বাক্স প্যাঁটরা, বাড়তি বাসনকোসনও ওই ঘরে থাকে, সকালে বিকালে ওঘরে কেহ থাকে না, শুধু বকুল আপন মনে পুতুল খেলা করে। পুতুল খেলিতে খেলিতে বাবার জন্য নিঃশব্দে সে কাঁদিত, মনের মানুষকে না দেখিয়া অতটুকু মেয়ের গোপন কান্না স্বাভাবিক নয়, কি মন বকুলের কে জানে। কোন কাজে উপরে গিয়া শ্যামা দেখিত মুখ বাঁকাইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বকুল তাহার পুতুল-পরিবার-টিকে খাওয়াইতে বসাইয়াছে। মেয়ে কার জন্য কাঁদে, শ্যামা বুঝিতে পারিত, এ বাড়িতে সেই জেলের কয়েদীটাকে ও ছাড়া আর তো কেহ কোনদিন ভালবাসে নাই। মেয়েকে ভুলাইতে গিয়া শ্যামারও কান্না আসিত।

মেয়েকে কোলে করিয়া পুরাণো বাড়ির ছাদে নূতন ঘরে ঝকঝকে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া শ্যামা বসিত, বুজিত চোখ। শ্যামার কি শ্রান্তি আসিয়াছে? আগের চেয়ে খাটুনি এখন কত কম, তাই সম্পন্ন করিতে সে কি অবসন্ন হইয়া পড়ে?

শীতলের জেলে যাইতে যাইতে শীত কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শীতলের জেলে যাওয়াটা অভ্যাস হইয়া আসিতে আসিতে শহরতলী যেন বসন্তের সাড়া পাইয়াছে। ধানকলের চোঙাটার কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া উত্তরে উড়িয়া যায়, মধ্যাহ্নে যে মৃদু উষ্ণতা অনুভূত হয়, তাহা যেন যৌবনের স্মৃতি। শ্যামার কি কোনদিন যৌবন ছিল? কি করিয়া সে চারটি সন্তানের জননী হইয়াছে, শ্যামার তো তা মনে নাই! আজ সে দারুণ বিপন্ন, স্বামী তার জেল খাটিতেছে, উপার্জন-শীল পুরুষের আশ্রয় তাহার নাই, ভবিষ্যত তাহার অন্ধকার, শহরতলীতে বন উপবনের বসন্ত আসিলেও জীবনে কবে তাহার যৌবন ছিল, তা কি শ্যামার মনে পড়া উচিত? কি অবান্তর তার বর্তমান জীবনে এই বিচিত্র চিন্তা? মুমূর্ষুর কাছে যে নামকীর্তন হয়, এ যেন তারই মধ্যে সুর তাল লয় মান খুঁজিয়া বেড়ানো।

জেলের কয়েদী বাপের জন্য যে মেয়ের চোখের জল তাকে কোলে করিয়া স্বামীর বিরহে সকাতর হওয়া কর্তব্য কাজ, কিন্তু জননী শ্যামা, তুমি আবার ছেলে চাও, শুনিলে দেবতারা হাসিবেন যে, মানুষ যে ছি ছি করিবে।

মামা বলে, এইবার উপার্জনের চেষ্টা সুরু করি শ্যামা, কি বলিস?

শ্যামা বলে, কি চেষ্টা করবে?

মামা রহস্যময় হাসি হাসিয়া বলে, দেখ না কি করি। কলকাতায় উপার্জনের ভাবনা! পথে ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে, কুড়িয়ে নিলেই হ'ল।

একটা ছুটো ক'রে নোটগুলো বদলানো আরম্ভ করলে হয় না?

তুই ভারি ব্যস্তবাগীশ শ্যামা! থাক না, নোট কি পালাচ্ছে? সংসার তোর অচলও তো হয়নি বাবু এখনো।

হয়নি, হতে আর দেরি কত?

সে যখন হবে, দেখা যাবে তখন,—এখন থেকে ভেবে মরিস কেন?

মামার সম্বন্ধে শ্যামা একটু হতাশ হইয়াছে। মামার অভিজ্ঞতা প্রচুর, বুদ্ধিও চোখা, কিন্তু স্বভাবটি ফাঁকি-বাজ। মুখে মামা যত বলে, কাজে হয়ত তার খানিকটা করিতে পারে, কিন্তু কিছু না করাই তাহার অভ্যাস। কোন বিষয়ে মামার নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। পদ্ধতির মধ্যে মামা হাঁপাইয়া ওঠে। গা লাগাইয়া কোন কাজ করা মামার অসাধ্য, আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। নকুড়বাবু ইনসিওরেন্স বেচিয়া খান, তাঁকে বলিয়া কহিয়া শ্যামা মামাকে একটা এজেন্সী দিয়াছিল, মামারও প্রথমটা খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু দু'দিন দু'একজন লোকের কাছে যাতায়াত করিয়াই মামার ধৈর্য ভাঙিয়া গেল, ব'লল, এতে কিছু হবে না শ্যামা, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে টাকার দরকার, লোককে ভজিয়ে ভাজিয়ে ইনসিওর করিয়ে পয়সার মুখ দেখা দুদিনের কর্ম নয় বাবু, আমার ওসব পোষাবে না। দোকান দেব একটা।

শ্যামা বলিল, দোকান দেবার টাকা কই মামা?

মামা রহস্যময় হাসি হাসিয়া বলিল, থাম না তুই, দেখ না আমি কি করি।

শ্যামা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, আমার সে হাজার টাকায় যেন হাত দিও না মামা।

মামা বলিল, ক্ষেপেছিস শ্যামা, তোর সে টাকা তেমনি পুলিন্দে করা আছে।

সকালে উঠিয়া মামা কোথায় চলিয়া যায়, শ্যামা ভাবে রোজগারের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। শহরে গিয়া মামা এদিক ওদিক ঘোরে, কোথাও ভিড় দেখিলে দাঁড়ায়. সংএর মত বেশ করিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া দুটি একটি সহজ ম্যাজিক দেখাইয়া যাহারা অষ্টধাতুর মাদুলি, বিষ তাড়ানো ভূত-

তাড়ানো শিকড় বিক্রয় করে, ধৈর্য সহকারে মামা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত তাহাদের লক্ষ্য করে। ফুটপাতে যে সব জ্যোতিষী বসিয়া থাকে তাদের সঙ্গে মামা আলাপ করে। কোনদিন সে ষ্টেশনে যায়, কোনদিন গঙ্গার ঘাটে, কোনদিন কালিঘাটে। যে সব ছন্নছাড়া ভবঘুরে মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া বেড়ায়, দেখিতে দেখিতে তাদের সঙ্গে মামা ভাব জমাইয়া ফেলে, সুখ-দুঃখের কত কথা হয়। সাধু নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, শহরে যেমন জাঁকজমক, রোজগারের সুবিধা তেমন নয়, বড় বেয়াড়া শহরের লোকগুলি, মফঃস্বলের যাহারা শহরে আসে শহরে পা দিয়া তারাও যেন চালাক হইয়া ওঠে,—নাঃ, শহরে সুখ নাই। মামা বলে, গ্যাট হয়ে বসে থাকলে কি শহরে সাধুর পয়সা আছে দাদা, যাও না শিশিতে জল পুরে ধাতুদৌর্বল্যের ওষুধ বেচ না গিয়ে, যত ফেনা কাটবে মুখে তত বিক্রি। পথ মামা রোজই হারায়, সে আরেক উপভোগ্য ব্যাপার। পথ জিজ্ঞাসা করিলে কলিকাতার মানুষ এমন মজা করে! কেউ বিনাবাক্যে গট গট করিয়া চলিয়া যায়, কেউ জলের মত করিয়া পথের নির্দেশটা বুঝাইয়া দিতে চাহিয়া উত্তেজিত অস্থির হইয়া ওঠে। মন্দ লাগে না মামার। শহরের পথও অন্তহীন, শহরের পথেও অফুরন্ত বৈচিত্র্য ছড়ানো, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তি আসিবে এতবড় ভবঘুরে কে আছে? প্রত্যহ মামা শহরেই কারো বাড়িতে অতিথি হইয়া দুপুরের খাওয়াটা যোগাড় করিবার চেষ্টা করে, কোনদিন সুবিধা হয় কোনদিন হয় না। বাড়িতে আজকাল খাওয়া দাওয়া তেমন ভাল হয় না, শ্যামা কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে।

কিছু হ'ল মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করে।

মামা বলে, হচ্ছে রে হচ্ছে, বলতে বলতে কি আর কিছু হয়?

এদিকে শ্যামার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। নগদ যা কিছু সে জমাইয়াছিল, ঘর তুলিতে, শীতলের জন্য উকিলের খরচ দিতেই তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, বাকি টাকায় ফাল্গুন মাস পর্যন্ত খরচ চলিল, তারপর আর কিছুই রহিল না। বড় দিনের সময় রাখাল আসিয়াছিল, টাকা আসে নাই। ইতিমধ্যে শ্যামা তাহাকে দুখানা চিঠি দিয়াছে, দশ বিশ করিয়াও শ্যামার পাওনাটা সে কি শোধ করিতে পারে না? জবাব দিয়াছে মন্দা, লিখিয়াছে, পাওনার কথা কি লিখেছ বৌ, উনি যা পেতেন তার চেয়েও কম টাকা নিয়েছিলেন দাদার কাছ থেকে, যাই হোক, তুমি যখন দুরবস্থায় পড়েছ বৌ, তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের উচিত বৈ কি, এ মাসে পারব না, সামনের মাসে কিছু টাকা তোমায় পাঠিয়ে দেব।

কিছু টাকা, কত টাকা? কুড়ি।

সেদিন বোধ হয় চৈত্র মাসের সাত তারিখ। বাড়িতে মেছুনি আসিয়াছিল। একপোয়া মাছ রাখিয়া পয়সা আনিতে গিয়া শ্যামা দেখিল দুটি পয়সা মোটে তাহার আছে। বাক্স প্যাটরা হাতড়াইয়া ক'দিন অপ্রত্যাশিতভাবে টাকাটা সিকিটা পাওয়া যাইতেছিল, আজও তেমনি কিছু পাওয়া যাইবে শ্যামা করিয়াছিল এই আশা,—কিন্তু দুটি তামার পয়সা ছাড়া আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না।

মাছের দু' আনা দাম মামাই দিল।

শ্যামা বলিল, এমন করে আর একটা দিনও তো চলবে না মামা? একটা কিছু উপায় কর? দু'চারখানা নোট তুমি নিয়ে এসো সেই টাকা থেকে, তারপর যা কপালে থাকে হবে।

মামা বলিল, টাকা চাই?—নে না বাবু দু'পাঁচ টাকা আমারি কাছ থেকে, আমি তো কাঙাল নই? বলিয়া মামা দশটা টাকা শ্যামাকে দিল।

মামার তবে টাকা আছে নাকি? লুকাইয়া রাখিয়াছেন? শ্যামা বলিল, দশ টাকায় কি হবে মামা? চাদ্দিকে অভাব খাঁ খাঁ করছে, কোথায় ঢালব এ টাকা?

এখনকার মত চালিয়ে নে না, ফুরিয়ে গেলে বলিস্।

আর ক'টা দাও। খোকার মাইনে, দুধের দাম—

মামা হাসিয়া বলিল, আর কোথায় পাব?

কিন্তু শ্যামার মনে সন্দেহ ঢুকিয়াছে, কিছু টাকা মামা নিশ্চয় লুকাইয়া রাখিয়াছে, এমনি চুপ করিয়া থাকে, অচল হইলে পাঁচ টাকা দশ টাকা বাহির করে। অবিলম্বে আরও বেশি টাকার প্রয়োজন শ্যামার ছিল না, তবু মামার সঙ্গতি আঁচ করিবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। মামা শেষে রাগ করিয়া বলিল, বললাম নেই, বিশ্বাস হ'ল না বুঝি? দেখগে আমার ব্যাগ খুঁজে!

ব্যাগ মামার শ্যামা আগেই খুঁজিয়াছে। দু'খানা গেরুয়া বসন, একটা গেরুয়া আলখাল্লা, কতকগুলি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, কতকগুলি কালো কালো শিকড়, কাঠের একটা কাকুই, টিনের ছোট একটি আরসি আর এমনি দুটো চারটে জিনিস মামার সম্বল। পয়সা কড়ি ব্যাগে কিছুই নাই। তবু মামার যে টাকা নাই শ্যামা তাহা পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারিল না।

দশটা টাকা যে কোথা দিয়া শেষ হইয়া গেল শ্যামা টেরও পাইল না। মামার কাছে হাত পাতিলে এবার মামা সঙ্গে সঙ্গে টাকা বাহির করিয়া দিল না, বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গিয়া একবেলা পরে আবার দশ টাকার একটা নোট আনিয়া দিল। শ্যামার প্রশ্নের জবাবে বলিল শিষ্য দিয়াছে।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ইংরাজি মাস কাবার হইলে এক দিন সকালে শ্যামা রাণীকে জবাব দিল। রাণীকে সে দু'মাস আগেই ছাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল, ঝি রাখিবার সামর্থ্য তাহার কোথায়?—মামার জন্য পারে নাই। মামা বলিয়াছিল, বড় তুই ব্যস্তবাগীশ শ্যামা, এত খরচের মধ্যে একটা

'ঝির মাইনে তুই দিতে পারবি নে, কত আর মাইনে ওর? আগে অচল হোক, তখন ছাড়াস, একা একা তুই খেটে খেটে মরবি আমি তা দেখতে পারব না শ্যামা—। এবার মামাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রাণীকে শ্যামা বিদায় করিয়া দিল। সারাদিন টহল দিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া মামা খবরটা শুনিয়া বলিল, তাই কি হয় মা! এতগুলো ছেলেমেয়ে, একা তুই পারবি কেন? ওসব বাদ্ধ করিস নে, এমনি যদি খরচ চলে একটা ঝির খরচও চলবে। আমি ওর মাইনে দেব'খন যা।

সকালে মামা নিজে গিয়া রাণীকে ডাকিয়া আনিল। বলিল, এমনি তো কাজের অন্ত নেই, বাসনমাজা ঘর-ধোয়ার কাজও যদি তোকে করতে হয় শ্যামা, ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে কে তাকাবে লো, ভেসে যাবে না ওরা? এ বুড়ো যদ্দিন আছে, সংসার তোর একভাবে চলে যাবে শ্যামা, কেন তুই ভেবে ভেবে উতলা হয়ে উঠিস্?

শ্যামার চোখে জল আসে। কলতলায় রাণী বাসন মাজিতেছে,—এতক্ষণ ও কাজ তাকেই করিতে হইত, নিজের মামা ছাড়া তাহা অসহ্য হইত কার? সংসারে আত্মীয়ের চেয়ে আপনার কেহ নাই। মানুষ করিয়া বিবাহ দিয়াছিল, তারপর কুড়ি বছর দেশবিদেশে ঘুরিয়া আসিয়া আত্মীয় ছাড়া কে মমতা ভুলিয়া যায় না?

শ্যামাকে উপার্জনের অনেক পন্থার কথা শুনাইবার পর যে পন্থাটি অবলম্বন করা চৈত্র মাসের মধ্যেই মামা স্থির করিয়া ফেলিল শ্যামাকে একদিন তাহার অভাসটুকু আগেই সে দিয়া রাখিয়াছিল। শুভ পয়লা বৈশাখ তারিখে মামা দোকান খুলিল।

বড় রাস্তায় গলির মোড়ের কাছাকাছি ছোট একটি দোকান ঘর খালি হইয়াছিল, বার টাকা ভাড়া। গলি দিয়া বার তিনেক পাক খাইয়া শ্যামার বাড়ি পৌঁছিতে হয়, একদিন বাড়ি ফিরিবার সময় 'এই দোকান ভাড়া দেওয়া যাইবে' খড়ি দিয়া আঁকাবাঁকা অক্ষরে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিবামাত্র মামার মতলব স্থির হইয়া গেল। ঘরটি ভাড়া লইয়া মামা মনোহারি দোকান খুলিয়া বসিল। ছোট দোকান, পুতুল, খাতা, পেন্সিল, চা. বিস্কুট, লজেঞ্জস, হ্যারিকেনের ফিতা, মাথার কাঁটা, সিঁদুর এই সব অল্প দামি জিনিসের, দু' বোতল সুবাসিত পরিশোধিত নারিকেল তৈলের বোতলের চেয়ে দামি জিনিস মামার দোকানে রহিল কিনা সন্দেহ। কাচের কেস আলমারি প্রভৃতি কিনিয়া দোকান দিয়া বসিতে দু'শ টাকার বেশি লাগিল না। মামা দোকানের নাম রাখিল শ্যামা ষ্টোরস্।

দু'শ টাকা মামা পাইল কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে মামা বলে, শিষ্য দিয়েছে। কেমন শিষ্য জানিস শ্যামা, বোম্বাই শহরের মার্চেণ্ট জুয়েলার—লাখোপতি মানুষ। প্রয়োগে কুম্ভমেলায় গিয়ে হাজার হাজার ছাইমাখা সন্ন্যাসীর মধ্যে গেরুয়া কাপড়টি শুধু পরে গায় একটা কুর্তা চাপিয়ে একধারে বসে আছি, না একরত্তি ভস্ম, না একটা রুদ্রাক্ষ, জটাফটাতো কস্মিন্ কালে রাখিনে—ওই,—অত সাধুর মধ্যে লাখোপতি মানুষটা করলে কি, অবাক হয়ে খানিক আমায় দেখলে, দেখে সটান এসে লুটিয়ে পড়ল পায়ে। বলল, বাবা এত ঝাঁটা মালের মধ্যে তুমি সাচ্চা সাধু, তোমার ভড়ং নেই, অনুমতি দাও সাধু সেবা করি। মামা অকৃত্রিম আত্মপ্রসাদে চোখ বজিয়া মৃদু মৃদু হাসে।

শ্যামা বলে, তা যদি বল মামা, এখনো তোমার মুখে চোখে যেন জ্যোতি ফোটে মাঝে মাঝে। কিছু পেয়েছিলে মামা, সাধনার গোড়ার দিকে সাধুরা যা পায় টায়, ক্ষেমতা না কি বলে কে জানে বাবু—তাই কিছু?

মামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, পাই নি?—ছেড়েছুড়ে দিলাম বলে, লেগে যদি থাকতাম শ্যামা—।

দোকান করার টাকাটা তবে ভক্তই দিয়াছে? শ্যামার সেই হাজার টাকায় হাত পড়ে নাই? শ্যামার মন খুঁতখুঁত করে। কুড়ি বছর অদৃশ্য থাকিবার রহস্য আবরণটি এক সঙ্গে বাস করিতে করিতে মামার চারিদিক হইতে খসিয়া পড়িতেছিল, শ্যামা যেন টের পাইতেছিল দীর্ঘকাল দেশ-বিদেশে ঘুরিলেই মানুষের কতগুলি অপার্থিব গুণের সঞ্চার হয় না, একটু হয়ত খাপছাড়া স্বভাব হইয়া যায় তার বেশি আর কিছু নয়, বিনা সঞ্চয়ে ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া হয়ত এসব লোকের দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। মামা যে এমন একটি ভক্তকে বাগাইয়া রাখিয়াছে চাহিলেই যে দু'চারশ টাকা দান করিয়া বসে, শ্যামার তাহা বিশ্বাস করিতে অসুবিধা হয়। তেমন জবরদস্ত লোক তো মামা নয়?

একদিন সন্ধ্যার পর চাদরে গা ঢাকিয়া শ্যামা দোকান দেখিয়া আসিল। দোকান চলিবে ভরসা হইল না। শ্যামা-ষ্টোরসএর সামনে রাস্তার ওপারে মস্ত মনোহারি দোকান, চারপাঁচটা বিদ্যুতের আলো, টিমটিমে কেরাসিনের আলো জ্বালা মামার অতটুকু দোকানে কে জিনিস কিনিতে আসিবে? মামার যেমন কাণ্ড, দোকান দিবার আর যায়গা পাইল না।

মামার উৎসাহের অন্ত নাই, বিধান ও খুকী দোকান দোকান করিয়া পাগল, মণিরও দুবেলা দোকানে যাওয়া চাই। মামা ওদের বিস্কুট ও লজেঞ্জুস্ দেয়, দোকানের আকর্ষণ ওদের কাছে তাহাতে আরও বাড়িয়া গিয়াছে। জিনিস বিক্রয় করিবার সখ বিধানের প্রচণ্ড। বলে এবার যে খদ্দের আসবে তাকে আমি জিনিস দেব দাদু, এ্যাঁ? মামা বলে, পারবি কি খোকা, খদ্দের বিগড়ে দিবি শেষে! কিন্তু অনুমতি মামা দেয়। বিধান ছোট শো-কেসটির পিছনে টুলটার উপরে গম্ভীর মুখে বসে, মামা কোণের বেঞ্চিটার উপর বসিয়া চশমা চোখে দিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়ে। ক্রেতা যে আসে হয়ত সে পাড়ার ছেলে, ঈর্ষার দৃষ্টিতে বিধানের দিকে চাহিয়া বলে, কি রে বিধু!—

বিধান বলে, কি চাই? সে পাকা দোকানী, কেনা বেচার সময় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অচল, খোস গল্প করিবার তার সময় কই? চশমার ফাঁক দিয়া মামা সহকারীর কার্য্যকলাপ চাহিয়া দ্যাখে, বলে, কালি? ওই ও কোণার টিনের কৌটোতে—দু'বড়ি এক পয়সায়, কাগজে মুড়ে দে খোকা।

এদিকে দোকান চলে ওদিকে মামা আজ দশটাকা কাল পাঁচটাকা সংসার খরচ আনিয়া দেয়: মামার চারিদিকে রহস্যের ভাঙ্গা আবরণটি আবার যেন গড়িয়া উঠিতে থাকে। পাড়ার লোকে এতকাল মামাকে অতিথি বলিয়া খাতির করিত, এখন প্রতিবেশী গৃহস্থের প্রাপ্য সহজ সমাদর দেয়, তবে অতটুকু দোকান দেওয়ার জন্য পাড়ার অনেক চাকুরে বাবুর কাছে মামার আসন নামিয়া গিয়াছে, খুব যারা বাবু দু'এক পয়সার জিনিস কিনিতে মামাকে তাদের কেহ তুমি পর্যন্ত বলিয়া বসে।

মামা বলে, কি চাই বললে? পরিমল নস্যি? ওই ও দোকানে যাও!

অপমান করিয়া মামার কাছে কারো পার পাওয়ার যো নাই।

বৈশাখ মাস শেষ হইলে শ্যামা একদিন বলিল, দোকানের হিসাবপত্র করলে মামা, লাভটাভ হ'ল?

মামা বলিল লাভ কিরে শ্যামা, বসতে না বসতে কি লাভ হয়? খরচ উঠুক আগে।

শ্যামা বলিল, নতুন দোকান দিয়ে বসার খরচ দু'এক মাসে উঠবে না তা জানি মামা, তা বলিনি, বিক্রীর ওপোর লাভটাভ কি রকম হল হিসাব করনি?—কত বেচলে, কেনা দাম ধরে কত লাভ রইল, করনি সে হিসাব?

মামা বলিল, তুই আমাকে দোকান করা শেখাতে আসিসনে শ্যামা।

এবার গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ার আগে ক্লাশের ছেলেদের অনেকেই নানাস্থানে বেড়াইতে যাইবে শুনিয়া বিধানের ইচ্ছা হইয়াছিল সেও কোথাও যায়,—কোথায় যাইবে? কোথায় তাহার কে আছে, কার কাছে সে গিয়া কিছুদিন থাকিয়া আসিতে পারে? বনগাঁ গেলে হইত,—মন্দাকে শ্যামা চিঠি লিখিয়াছিল, মন্দা জবাব দিয়াছে এখন সেখানে চারিদিকে বড় কলেরা বসন্ত হইতেছে,—এখন না গিয়া বিধান যেন পূজার সময় যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়ারা এবার দার্জিলিং গিয়াছে। তখনও স্কুলের ছুটি হয় নাই,—শঙ্কর সঙ্গে যাইতে পারে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া এখানে থাকিবার সময় শঙ্কর বোধ হয় সাহস পাইত না, বিষ্ণুপ্রিয়া দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলে একদিন বিকালে সে এ বাড়িতে আসিল।

শ্যামা বারান্দায় তরকারি কুটিতেছিল, বিধান কাছেই দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ছেলেদের একটা ইংরাজি গল্পের বই পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া শঙ্করকে দেখিয়া সে আবার পড়ায় মন দিল।

শঙ্করকে বসিতে দিয়া শ্যামা বলিল, কে এসেছে দেখ খোকা।

বিধান শুধু বলিল, দেখেছি।

বিধান কি আজো সে অপমান ভোলে নাই, বন্ধু বাড়ি আসিয়াছে তার সঙ্গে সে কথা বলবে না? লাজুকে শঙ্করের মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, শ্যামা টান দিয়া বিধানের বই কাড়িয়া লইল, বলিল, নে, ঢের বিদ্যে হয়েছে, যা দিকি দুজনে দোতালায়, বাতাস লাগবে একটু,—যা গরম এখানে!

বিধান আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিল। শ্যামা বলিল, তোমাদের ঝগড়া হয়েছে নাকি শঙ্কর?—ও বুঝি কথা বলে না তোমার সঙ্গে? কি পাগল ছেলে!—না বাবা, যেও না তুমি, পাগলটাকে আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

ঘরে গিয়া শ্যামা ছেলেকে বোঝায়। বলে যে শঙ্করের কি দোষ? শঙ্কর তো তাদের অপমান করে নাই, যে বাড়ি বহিয়া ভাব করিতে আসে তার সঙ্গে কি এমন ব্যবহার করিতে হয়? ছি! কিন্তু এ তো বোঝানোর ব্যাপার নয়, অন্ধ অভিমানকে যুক্তি দিয়া কে দমাইতে পাবে? ছেলেকে শ্যামা বাহিরে টানিয়া আনে, সে মুখ গোঁজ করিয়া থাকে। শঙ্কর বলে, আমি যাই মাসিমা।

আহা বেচারীর মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছে।

শ্যামা রাগিয়া বলে, ছি খোকা ছি, একি ছোট মন তোর, একি ছোটলোকের মত ব্যবহার? যা তুই আমার সামনে থেকে সরে!—বোসো, বাবা তুমি, কটা কথা শুধোই,—দিদি পত্র দিয়েছে? সেখানে ভাল আছে সব? তুমি যাবে না দার্জিলিং স্কুল বন্ধ হলে?

শ্যামা শঙ্করের সঙ্গে গল্প করে, হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া বিধান বসিয়া থাকে, কি ভয়ানক কথা ছেলেকে সে বলিয়াছে শ্যামার তা খেয়ালও থাকে না। তারপর বিধান হঠাৎ কাঁদিয়া ছুটিয়া দোতালায় চলিয়া যায়। লাজুক শঙ্কর বিব্রত হইয়া বলে, কেন বকলেন ওকে?—বলিয়া উসখুস করিতে থাকে।

তারপর সেও উপরে যায়। খানিক পরে শ্যামা গিয়া দেখিয়া আসে, দুজনে গল্প করিতেছে।

সেই যে তাহাদের ভাব হইয়াছিল, তারপর শঙ্কর প্রায়ই আসিত। শঙ্করের ক্যারমবোর্ডটি পড়িয়া থাকিত এ বাড়িতেই, উপরে খোলা ছাদে বসিয়া সারা বিকাল তাহারা ক্যারম খেলিত! বন্ধে তাহার সহিত বিধানের দার্জিলিং যাওয়ার কথাটা শঙ্করই তুলিয়াছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া ইহা পছন্দ করিবে না, জানিয়াও শ্যামা আপত্তি করে নাই, তেমন আদর যত্ন বিধান না হয় নাই পাইবে, সেখানে অতিথি ছেলেটিকে পেট ভরিয়া খাইতে তো বিষ্ণুপ্রিয়া দিবেই?

কিন্তু রাজি হইল না বিধান। একসঙ্গে দার্জিলিং গিয়া থাকার কত লোভনীয় চিত্রই যে শঙ্কর তার সামনে আঁকিয়া ধরিল, বিধানকে বাঁকানো গেল না। যথাসময়ে শঙ্কর চলিয়া গেল সেই শীতল পাহাড়ী দেশে, এখানে বিধানের দেহ গরমে ঘামাচিতে ভরিয়া গেল।

মনে মনে শ্যামা বড় কষ্ট পাইল। অভাব অনটনের অভিজ্ঞতা জীবনে তাহার পুরানো হইয়া আসিয়াছে, এমন দিনও তো গিয়াছে যখন সে ভাল করিয়া দেহের লজ্জাও আবরণ করিতে পারে নাই, কিন্তু আজ পর্যন্ত চারটি সন্তানের কোন বড় সাধ শ্যামা অপূর্ণ রাখে নাই,—আকাশের চাঁদ চাহিবার সাধ নয়, শ্যামার ছেলেমেয়ে অসম্ভব আশা রাখে না; শ্যামার মত গরীবের পক্ষে পূরণ করা হয়ত কিছু কঠিন এমনি সব সাধারণ সখ, সাধারণ আব্দার। বিধান একবার সাহেবি পোষাক চাহিয়াছিল, তাদের ক্লাশের পাঁচ ছ'টি ছেলে যে রকম বেশ ধরিয়া স্কুলে আসে, দোতালার ঘরের জন্য ইঁট সুরকি কিনিয়া শ্যামা তখন ফতুর হইয়া গিয়াছে। তবু ছেলেকে পোষাক তো সে কিনিয়া দিয়াছিল।

শ্যামার চোখে আজকাল সব সময় একটা ভীরুতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলের উপরেও কোনদিন সে নিশ্চিন্ত নির্ভর রাখিতে পারে নাই, কমল প্রেসের চাকরীতে শীতল যখন ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিতেছিল তখনও নয়, তবু তখন মনে যেন তাহার একটা জোর ছিল। আজ সে জোর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চোরের বৌ? জীবনে এ ছাপ তাহার ঘুচিবে না, স্বামীর অপরাধে মানুষ তাহাকে অপরাধী করিয়াছে, কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেহ সাহায্য দিবে না সকলেই, তাহাকে পরিহার করিয়া চলিবে। যদি প্রয়োজনও হয় ছেলেমেয়েদের দু'বেলার আহার সংগ্রহ করিবার সঙ্গত উপায় খুঁজিয়া পাইবে না, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায়, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা সে করিবে কিসের ভরসায়? বিধবা হইলেও সে বোধ হয় এতদূর নিরুপায় হইত না। দু'বছর পরে শীতল হয়ত ফিরিয়া আসিবে, হয়ত আসিবে না। আসিলেও শ্যামার দুঃখ সে কি লাঘব করিতে পারিবে? নিজের প্রেস বিক্রয় করিয়া কতকাল শীতল অলস অকর্মণ্য হইয়া বাড়ি বসিয়াছিল, সে ইতিহাস শ্যামা ভোলে নাই। তবু তখন শীতলের বয়স কম ছিল, মন তাজা ছিল। এই বয়সে দু'বছর জেল খাটিয়া আসিয়া আর কি সে এত বড় সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে? নিজেই হয়ত সে ভার হইয়া থাকিবে শ্যামার।

এক আছে মামা। সেও আবার খাঁটি একটি রহস্য, ধরা ছোঁয়া দেয় না। কখনো শ্যামার আশা হয় মামা বুঝি লাখপতিই হইতে চলিয়াছে, কখনো ভয় হয় মামা সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে। সংসারে শ্যামা মানুষ দেখিয়াছে অনেক, এরকম খাপছাড়া অসাধারণ মানুষ একজনকেও তো সে স্থায়ী কিছু করিতে দেখে নাই। সংসারে সেটা যেন নিয়ম নয়। সাধারণ মোটা-বুদ্ধি সাবধানী লোকগুলিই শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকে, শীতলের মত যারা পাগলা, মামার মত যারা খেয়ালী হঠাৎ একদিন দেখা যায় তারাই ফাঁকিতে পড়িয়াছে। জীবন তো জুয়া খেলা নয়।

স্কুল খুলিবার কয়েকদিন পরে শঙ্কর দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিল। শ্যামার সাদর অভ্যর্থনা বোধ হয় তাহার ভাল লাগিত, একদিন সে দেখা করিতে আসিল শ্যামার সঙ্গেই। শ্যামা দেখিয়া অবাক, পকেটে ভরিয়া সে দার্জিলিং-এর কয়েক রকম তরকারি লইয়া আসিয়াছে। বিধান তখন দোকানে গিয়াছিল, হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা শঙ্করের সঙ্গে আলাপ করিল। বকুল নামিয়া আসিল নিচে, মা'র গা ঘেঁষিয়া বসিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া সে সবিস্ময়ে শঙ্করের দার্জিলিং বেড়ানোর গল্প শুনিল। শুধু বিধানকে নয়, শঙ্কর বকুলকেও ভালবাসে। কেবল সে বড় লাজুক বলিয়া বিধানের কাছে যেমন বকুলের কাছে তেমনি ভালবাসা কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পায় না। পকেটে ভরিয়া সে কি শ্যামার জন্য শুধু তরকারিই আনিয়াছে? মুখ লাল করিয়া বকুলের জিনিসও সে বাহির করিয়া দেয়: কে জানিত দার্জিলিং গিয়া বকুলের কথা সে মনে রাখিবে?

শ্যামা বড় খুসি হয়। সোনার ছেলে, মাণিক ছেলে। কি মিষ্টি স্বভাব? আম কাটিয়া শ্যামা তাহাকে খাইতে দেয়, তারপর রঙীন স্ফটিকের মালা গলায় দিয়া বকুল গল গল করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া হাসিমুখে কাজ করিতে যায়, পাঁচ মিনিট পরে দেখিতে পায় দুজনে দোতালায় গিয়াছে। রাণীকে শোনাইয়া শ্যামা বলে, বড় ভাল ছেলে রাণী, একটু অহঙ্কার নেই। তারপর দোতালায় দুম্‌দাম করিয়া ওদের ছুটাছুটির শব্দ ওঠে, বকুলের অজস্র হাসি ঝরণার মত নিচে ঝরিয়া পড়ে, এ ওর পিছনে ছুটিতে ছুটিতে একবার তাহারা একতলাটা পাক দিয়া যায়, দুরন্ত মেয়েটার পাল্লায় পড়িয়া লাজুক শঙ্করও যেন দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন বিধান স্কুলে চলিয়া গেলে শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। দাসী তখন স্নানের আগে বিষ্ণুপ্রিয়ার চুলে গন্ধ তেল দিতেছিল, চওড়া-পাড় কোমল শাড়িখানি লুটাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আনমনে বসিয়াছিল শ্বেত-পাথরের মেঝেতে, কে বলিবে সেও জননী। এত বয়সে ওর ঢং দেখিয়া মনে মনে শ্যামার হাসি আসে,—প্রথম কন্যার জন্মের পর ও আবার সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছিল! আজ প্রতিদিন তিনটি দাসী মিলিয়া ওই স্থূল দেহটাকে ঘষিয়া মাজিয়া ঝক্‌ঝকে করিবার চেষ্টায় হয়রাণ হয়। গালে রঙটও দেয় নাকি বিষ্ণুপ্রিয়া?

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, বোসো।

শ্যামা মেঝেতেই বসিয়া বলিল, কবে ফিরলেন দিদি? দিব্যি সেরেছে শরীর, রাজরাণীর মত রূপ করে এসেছেন, রঙ্ যেন আপনার দিদি ফেটে পড়ছে।···অসুখ শরীর নিয়ে হাওয়া বদলাতে গেলেন, আমরা এদিকে ভেবে মরি কবে দিদি আসবেন, খবর পেয়ে ছুটে এসেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাই তুলিল, উদাস ব্যথিত হাসির সঙ্গে বলিল, এসেই আবার গরমে শরীরটা কেমন কেমন করছে, উঠতে বসতে বল পাইনে, বেশ ছিলাম সেখানে,—খুকি তো কিছুতে আসবে না, কিন্তু ইস্কুল টিস্কুল সব খুলে গেল, কত আর কামাই করবে? তাই সকলকে নিয়ে চলেই এলাম।

দার্জিলিংএ শুনেছি খুব শীত?—শ্যামা বলিল।

শীত নয়? শীতের সময় বরফ পড়ে।—বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল।

একথা সেকথা হয়, ভাঙা ভাঙা ছাড়া ছাড়া আলাপ। শ্যামার খবর বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করে না। শ্যামার ছেলেমেয়েরা সকলে কুশলে আছে কি না, শ্যামার দিন কেমন করিয়া চলে জানিবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না। শ্যামার বড় আপশোস হয়। কে না জানে বিষ্ণুপ্রিয়া যে একদিন তাহাকে খাতির করিত সেটা ছিল শুধু খেয়াল, শ্যামার নিজের কোন গুণের জন্য নয়। বড়লোকের অমন কত খেয়াল থাকে। শ্যামাকে একটু সাহায্য করিতে পারিলে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন কৃতার্থ হইয়া যাইত। না মিটাইতে পারিলে বড়লোকের খেয়াল নাকি প্রবল হইয়া ওঠে শ্যামা শুনিয়াছে, আজ দুঃখের দিনে শ্যামার জন্য কিছু করিবার সখ বিষ্ণুপ্রিয়ার কোথায় গেল? তারপর হঠাৎ এক সময় শ্যামার একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়, মনে হয় বিষ্ণুপ্রিয়া যেন প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিছু কিছু সাহায্য বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাকে করিবে, কিন্তু আজ নয়,—শ্যামা যেদিন ভাঙিয়া পড়বে, কাঁদিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিবে, এমন সব তোষামোদের কথা বলিবে· ভিখারির মুখে শুনিতেও মানুষ যাহাতে লজ্জা বোধ করে,—সেইদিন।

বাড়ি ফিরিয়া শ্যামা বড় অপমান বোধ করিতে লাগিল, মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুটি একটি শাপান্তও করিল। তবু, একদিক দিয়া সে যেন খুসিই হয়, একটু যেন আরাম বোধ করে। অন্ধকার ভবিষ্যতে এ যেন ক্ষীণ একটি আলোক, বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অপমানকর নিষ্ঠুর প্রত্যাশা। একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটা করিয়া সাহায্য আদায় করা চলিবে এ চিন্তা আঘাত করিয়াও শ্যামাকে যেন সান্ত্বনা দেয়।

দিনগুলি এমনিভাবে কাটিতে লাগল। আকাশে ঘনাইয়া আসিল বর্ষার মেঘ, মানুষের মনে আসিল সজল বিষণ্ণতা। ক'দিন ভিজিতে ভিজিতে স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া বিধান জ্বরে পড়িল, হারান ডাক্তার দেখিতে আসিয়া বলিল ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। রোজ একবার করিয়া বিধানকে সে দেখিয়া গেল। আজ পর্যন্ত শ্যামার ছেলেমেয়ের অসুখে বিসুখে অনেকবার হারান ডাক্তার এ বাড়ি আসিয়াছে, শ্যামা কখনো টাকা দিয়াছে কখনো দেয় নাই। এবার ছেলে ভাল হইয়া উঠিলে একদিন সে হারান ডাক্তারের কাছে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা, এবার তো কিছুই দিতে পারলাম না আপনাকে?

হারান বলিল, তোমার মেয়েকে দিয়ে দাও, আমাদের বকুলরাণীকে?

কান্নার মধ্যে হাসিয়া শ্যামা বলিল, তা নিন, এখুনি নিয়ে যান।

শ্যামার জীবনে এই আরেকটি রহস্যময় মানুষ। শীর্ণকায় তিরিক্ষে মেজাজের লোকটির মুখের চামড়া যেন পিছন হইতে কিসে টান করিয়া রাখিয়াছে, মনে হয় মুখে যেন চকচকে পালিশ করা গাম্ভীর্য্য। সর্ব্বদা কি যেন সে ভাবে, বাস যেন সে করে একটা গোপন সুরক্ষিত জগতে,—সংসারে মানুষের মধ্যে চলাফেরা কথাবার্ত্তা যেন তাহার কলের মত, আন্তরিকতা নাই অথচ কৃত্রিমও নয়। শ্যামার কাছে সে যে টাকা নেয় না, এর মধ্যে দয়ামায়ার প্রশ্ন নাই, মহত্ত্বের কথা নাই, টাকা শ্যামা দেয় না বলিয়াই সে যেন নেয় না, অন্য কোন কারণে নয়। শ্যামা দুরবস্থায় পড়িয়াছে একথা কখনো সে কি ভাবে?

মনে হয় বকুলকে বুঝি হারান ডাক্তার ভালবাসে। শ্যামা জানে তা সত্য নয়। এ বাড়িতে আসিয়া হারানের বুঝি অন্য এক বাড়ির কথা মনে পড়ে, শ্যামা আর বকুল বুঝি তাহাকে কাদের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। বকুলকে কাছে টানিয়া হারান যখন তাহার মুখের দিকে তাকায় শ্যামাও যেন তখন আর একজনকে দেখিতে পায়, গায়ে শ্যামার কাঁটা দিয়া ওঠে। এ বাড়িতে রোগ দেখিতে আসিবার জন্য হারান তাই লোলুপ, একবার ডাকিলে দশবার আসে, না ডাকিলেও আসে। মানুষকে অপমান না করিয়া যে কথা বলিতে পারে না, রোগের অবস্থা সম্বন্ধে আত্মীয়ের ব্যাকুল প্রশ্নে পর্যন্ত যে সময় সময় আগুনের মত জ্বলিয়া ওঠে, বহুদিন আগে শ্যামার কাছে সে পোষ মানিয়াছিল। শ্যামা তখন হইতে সব জানে। একটা হারানো জীবনের, পুনরাবৃত্তি এইখানে হারানের আরম্ভ হইয়াছিল, একান্ত পৃথক, একান্ত অমিল পুনরাবৃত্তি, তা হোক, তাও হারানের কাছে দামি। শ্যামা ছিল হারানের মেয়ে সুখময়ীর ছায়া, সুখময়ীর কথা শ্যামা শুনিয়াছে। এই ছায়াকে ধরিয়া হারান শ্যামার সমান বয়সের সময় হইতে সুখময়ীর জীবন-স্মৃতির বাস্তব অভিনয় আবিষ্কার করিয়াছে,—বকুলের মত একটি মেয়েও নাকি সুখময়ীর ছিল। শ্যামার ছেলেরা তাই হারানের কাছে মূল্যহীন, ওদের দিকে সে চাহিয়াও

দেখে না। এ বাড়িতে আসিয়া শ্যামা ও বকুলকে দেখিবার জন্য সে ছটফট করে।

অথচ শ্যামা ও বকুলকে সে স্নেহ করে কিনা সন্দেহ। ওরা তুচ্ছ, ওরা হারানের কেউ নয়, হারান পুলকিত হয় শ্যামার কণ্ঠ ও কথা বলার ভঙ্গিতে,—শ্যামার চলন দেখিয়া, বকুলের দুরন্তপনা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া তাহার মোহের সীমা থাকে না। মমতা যদি হারানের থাকে তাহা অবাস্তবতার প্রতি,—শ্যামার উচ্চারিত শব্দ ও কয়েকটি ভঙ্গিমায় এবং বকুলের প্রাণের প্রাচুর্য্যে,—মানুষ দুটিকে হারান কখনো ভালবাসে নাই; শোকে যে এমন জীর্ণ হইয়াছে সে কবে রক্তমাংসের মানুষকে ভালবাসিতে পারিয়াছে?

শ্যামা তাই হারানের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে পারে নাই, হারানের কাছে অনুগ্রহ দাবী করিতে আজো তাহার লজ্জা করে। বিধানের চিকিৎসা ও ওষুধের বিনিময়ে কাঞ্চন মুদ্রা দিবার অক্ষমতা জানাইবার সময় হারান ডাক্তারের কাছে শ্যামা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বিধানের পরে অসুখে পড়িল বকুল। বকুলের অসুখ? বকুলের অসুখ এ বাড়িতে আশ্চর্য্য ঘটনা। মেয়েকে লইয়া পলাইয়া গিয়া সেই যে শীতল তাহার জ্বর করিয়া আনিয়াছিল সে ছাড়া জীবনে বকুলের কখনো সামান্য কাসিটুকু পর্যন্ত হয় নাই, রোগ যেন পৃথিবীতে ওর অস্তিত্বের সংবাদই রাখিত না। সেই বকুলের কি অসুখ হইল এবার? ছোটখাট অসুখ তো ওর শরীরে আমল পাইবে না। প্রথম ক'দিন দেখিতে আসিয়া হারান ডাক্তার কিছু বলিল না, তারপর রোগের নামটা শুনাইয়া শ্যামাকে সে আধমরা করিয়া দিল। বকুলের টাইফয়েড হইয়াছে।

জান মা, এই যে কলকেতা শহর এ হ'ল টাইফয়েডের ডিপো, এবার যা সুরু হয়েছে চাদ্দিকে জীবনে এমন আর দেখিনি, তিরিশ বছর ডাক্তারি করছি সাতটি টাইফয়েড রোগির চিকিচ্ছে কখনো আর করিনি এক সঙ্গে,—এই প্রথম।

এমনি, ছেলেদের চেয়ে বকুলের সম্বন্ধে শ্যামা ঢের বেশি উদাসীন হইয়া থাকে, সেবাযত্নের প্রয়োজন মেয়েটার এত কম, নিজের অস্তিত্বের আনন্দেই মেয়েটা সবদা এমন মশগুল যে ওর দিকে তাকানোর দরকার শ্যামার হয় না। কিন্তু বকুলের কিছু হইলে শ্যামা সুদ সমেত তাহাকে তাহার প্রাপ্য ফিরাইয়া দেয়, কি যে সে উতলা হইয়া ওঠে বলিবার নয়। বকুলের অসুখে সংসার তাহার ভাসিয়া গেল কে রাঁধে কে খায়, কোথা দিয়া কি ব্যবস্থা হয়, কোনদিকে আর নজর রহিল না, অনাহারে অনিদ্রায় সে মেয়েকে লইয়া পড়িয়া রহিল। এদিকে রাণীও বকুলের প্রায় তিন দিন পরে একই রোগে শয্যা লইল। মামা কোথা হইতে একটা খোট্টা চাকর আর উড়িয়া বামুন যোগাড় করিয়া আনিল, পোড়া ভাত আর অপক্ক ব্যঞ্জন খাইয়া মামা, বিধান আর মণির দশা হইল রোগির মত, শ্যামার কোলের ছেলেটি অনাদরে অনাদরে মরিতে বসিল। বালক ও শিশুদের চেয়ে কষ্ট বোধ হয় হইল মামারই বেশি। দায়িত্ব, কর্তব্য আর পরিশ্রম, মামার কাছে এই তিনটিই ছিল বিষের মত কষ্ট, মামা একেবারে হাঁপাইয়া উঠিল। এতকাল শ্যামার সচল সংসারকে এখানে ওখানে সময় সময় একটু ঠেলা দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, এবার অচল বিপর্য্যস্ত সংসারটি মামাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিল, তারপর রহিল অসুখের হাঙ্গামা, ছুটাছুটি, রাতজাগা, দুর্ভাবনা এবং আরও কত কিছু। ওদিকে রাণীর খবরটাও মাঝে মাঝে মামাকে লইতে হয়, ন'দিনের দিন মামা লুকাইয়া কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তার আনিয়াছিল, রাণীর কতকগুলি খারাপ উপসর্গ দেখা দিয়াছে, সে বাঁচিবে কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ যাযাবর জীবনে ভদ্র অভদ্র মানুষের ভেদাভেদ মামার কাছে ঘুচিয়া গিয়াছিল, কত অস্পৃশ্য পরিবারের সঙ্গে মামা সপ্তাহ মাস পরমানন্দে যাপন করিয়াছে,—যেটুকু ভাসা ভাসা স্নেহ করিবার ক্ষমতা মামার আছে রাণী কেন তাহা পাইবে না? রাণী মরিবে জানিয়া মামার ভাল লাগে না, বহুকাল আগে শ্যামার বিবাহ দিয়া সে শূন্য ঘরে যে বেদনা ঘনাইয়া আসিয়া মামাকে গৃহছাড়া করিয়াছিল যেন তারই আভাস মেলে। আর বকুল? শ্যামার মেয়েটাকে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী মামা কি এত ভালবাসিয়াছে যে ওর রোগকাতর মুখখানি দেখিলে সে পীড়া বোধ করে, তাহার ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হয় অরণ্যে প্রান্তরে, দুরতম জনপদে,—মানুষের হৃদয় যেখানে স্বাধীন, শোক দুঃখ স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে মানুষের যেখানে সম্পর্ক নাই? মামার মুখ দেখিরা শ্যামা সময় সময় ভয় পাইয়া যায়। বকুলের অসুখের ক'দিনেই মামা যেন আরও বুড়া হইয়া হইয়া পড়িয়াছে। মিনতি করিয়া মামাকে সে বিশ্রাম করিতে বলে, যুক্তি দেখাইয়া বলে যে মামার যদি কিছু হয় তবে আর উপায় থাকিবে না। কিন্তু মামা যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে, সে বিশ্রাম করিতে পারে না, প্রয়োজনের খাটুনি খাটিয়া তো সারা হয়ই, বিনা প্রয়োজনেও খাটিয়া মরে।

রাণী যথাসময়ে মারা গেল, বকুলের সেদিন জ্বর ছাড়িয়াছে। বর্ষার সেটা খাপছাড়া দিন,—কি রোদ বাহিরে, মেঘশূন্য কি নির্ম্মল আকাশ! কেবল শ্যামার নিদ্রাতুর আরক্ত চোখে জল আসে। এ ক'দিন শ্যামা যেন ছিল একটা কামনার রূপক, সন্তানকে সুস্থ করার একটি জ্বলন্ত ইচ্ছা-শিখা—আজ তাহাকে চেনা যায় না। চৌদ্দ দিনে বকুলের জ্বর ছাড়িয়াছে? কিসের চৌদ্দ দিন,—চৌদ্দ যুগ!

শ্রাবণের শেষে মামা একদিন দোকানটা বেচিয়া দিল। দোকান করা মামার পোষাইল না। ভদ্রলোক দোকান করিতে পারে? শ্যামা হাসিয়া বলিল, তখনি বলেছিলাম

মামা, দিও না দোকান, তুমি কেন দোকান চালাতে পারবে?—কত টাকা লোকসান দিলে?

মামা বলিল, লোকসান দেব আমি? কি যে তুই বলিস শ্যামা!

তা'হলে কত টাকা লাভ হ'ল তাই বল?

না লাভ হয় নি, টায় টায় দেনা-পাওনার মিল খেয়েছে, ব্যস্। যে দিনকাল পড়েছে শ্যামা, আমি বলে তাই, আর কেউ হ'লে ঘর থেকে টাকা ঢেলে খালি হাতে ফিরে আসত, কত কোম্পানী এবার লালবাতি জ্বেলেছে জানিস?

দোকান বেচিয়া মামা এবার করিবে কি? যে ছুনিনেয় উৎস হইতে দরকার হইলেই দশ বিশটা টাকা উঠিয়া আসে, চিরকাল তাহা টিঁকিবে তো? মামা কিছু বলে না। করুণভাবে মামা শুধু একটু হাসে, উৎসুক চোখে আকাশের দিকে তাকায়। শরৎ মানুষকে ঘরের বাহির করে, বর্ষান্তে নবযৌবনা ধরণীর সঙ্গে মানুষের পরিচয় কাম্য, কিন্তু বর্ষা তো এখনো শেষ হয় নাই মামা, ওই দেখো আকাশে নিবিড় কালো সজল মেঘ, শরৎ কোথায় যে তুমি দেশে দেশে নিজের মনের মৃগয়ায় যাইতে চাও? মামার বিষণ্ণ হাসি উৎসুক চোখ, শ্যামাকে ব্যথা দেয়। শ্যামা ভাবে, কিছু করিতে না পারিয়া হার মানার দুঃখে মামা ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে, ভাগ্নীর ভার লইবে বলিয়া অনেক আস্ফালন করিয়াছিল কিনা এখন তাহার লজ্জা আসিয়াছে। চোরের মত মামা তাই অস্বস্তিতে উস্‌খুস্ করে। আহা, বুড়া মানুষ, সারাটা জীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়া আসিয়া সংসারের পাকা, উপার্জনে অভ্যস্ত লোকগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেন পারিয়া উঠিবে? টাকা তো পথে ছড়ানো নাই। ঘরে ঘরে যুবক বেকার হাহাকার করিতেছে। ষাট বছরের ঘরছাড়া বিবাগী এতগুলি প্রাণীর জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজিয়া পাইবে কোথায়? শ্যামা বড় মমতা বোধ করে। বলে, অত ভেবো না মামা ভগবান যাহাকে একটা উপায় করবেন।

ভগবান? মামার বোধ হয় ভগবানের কথা মনে ছিল না। ভগবান যে মানুষের যাহোক একটা উপায় করেন এও বোধ হয় এতদিন তাহার খেয়াল থাকে নাই। শ্যামা মনে পড়াইয়া দিলে মামা বোধ হয় নিশ্চিন্ত মনেই শ্যামা ও তাহার চারিটি সন্তানকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া ভাদ্রের তিন তারিখে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। যাওয়ার আগে শুধু বলিয়া গেল, কিছু মনে করিস্ নে শ্যামা, তোর সেই হাজার টাকাটা খরচ করে ফেলেছি,—শ' দেড়েক মোটে আছে, নে। বুড়ো মামাকে শাপ দিস্‌নে মা, একটি টাকা মোটে আমি সঙ্গে নিলাম।

শাপ শ্যামা দেয় নাই, পাগলের মত কি যেন সব বলিয়াছিল। কথাগুলি মিষ্টি নয়, কোন ভাগ্নীই সাধারণত মামাকে ওসব কথা বলে না। ক্যাম্বিশের ব্যাগটি হাতে করিয়া কম্বলের গুটানো বিছানাটা বগলে করিয়া মামা যখন চলিয়া গেল, শ্যামা তখন পাগলের মত কি সব যেন বলিতেছে।

সাত

পরের বছর শরৎ কালে,—শ্যামা প্রথম সন্তানের জননী হওয়ার সময় পৃথিবীতে শরৎ কালটা যেমন ছিল এখনো তেমনি থাকার মত আশ্চর্য শরৎকালে,—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া শ্যামা বনগাঁ গেল। বলিল ঠাকুরঝি, আমার আর তো কোথাও আশ্রয় নেই, খেতে না পেয়ে আমার ছেলেমেয়ে মরে যাবে, ওদের তুমি দুটি দুটি খেতে দাও, আমি তোমার বাড়ি দাসী হয়ে থাকব।

মন্দা মুখ ভার করিয়া বলিল, এসেছ থাকো, ওসব বোলো না বৌ। তোমামুদে কথা আমি ভালবাসি নে।

শ্যামা বনগাঁয়ে রহিয়া গেল।

শ্যামার গত বছরের ইতিহাস বিস্তারিত লিখিলে সুখপাঠ্য হইত না বলিয়া ডিঙাইয়া আসিয়াছি: এ তো দারিদ্র্যের কাহিনী নয়। শ্যামা যে একবার দুদিন উপবাস করিয়াছিল সে কথা লিখিয়া কি হইবে? ব্রত-পূজা করিয়া কত জননী অমন অনেক উপবাস করে, শ্যামা খাদ্যের অভাবে করিয়াছিল বলিয়া তো উপবাসের সঙ্গে উপবাসের পার্থক্য জন্মিয়া যাইবে না? শ্যামার গহনাগুলি গিয়াছে। বিবাহের সময় মামা শ্যামাকে প্রায় হাজার টাকার গহনাই দিয়াছিল, নিজের প্রেস বিক্রয় করিয়া শীতলের দীর্ঘকাল বেকার বসিয়া থাকার সময় চুড়ি হার বালা আর নাক ও কানের দুটি একটি ছুটকো গহনা ছাড়া বাকি সব গিয়াছিল, কমল প্রেসের চাকরীর সময় দোতালায় ঘর তুলিবার ঝোঁকে শ্যামা টাকা জমাইয়াছে, হাঙরমুখো পুরানো প্যাটার্নের বালা ভাঙিয়া আর একটু ভারি তারের বালা গড়ানো ছাড়া নূতন কোন গহনা সে কখনো করে নাই। এক বছরের তাই ঘরের বিক্রয়যোগ্য আসবাবের সঙ্গে শ্যামার গহনাগুলিও গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে একটি আংটি আর দু'হাতে দু'গাছি চুড়ি।

বিধানকে বড়লোকের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া কাশীপুরের সাধারণ স্কুলটিতে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল, বিধান হাঁটিয়াই স্কুলে যাইত। ধোপার সঙ্গে শ্যামা কোন সম্পর্ক রাখিত না, বাড়িতে সিদ্ধ করিয়া কাপড় জামা সাফ করিত,—কাপড় জামা দুই সে কিনিত কম দামি, মোটা, টিঁকিত অনেক দিন। খোকার জন্য দুধ কিনিত এক পোয়া, দু' বছর বয়সের আগেই খোকা দিব্যি ভাত খাইতে শিখিয়াছিল, পেট ভরিয়া খাইয়া টিং টিংএ পেটটি দুলাইয়া দুলাইয়া শ্যামার পিছু পিছু সে হাঁটিয়া বেড়াইত,—শ্যামা তাহাকে স্তন দিত সেই অপরাহ্নে, সারাদিন বুকে যে দুধটুকু জমিত বিকালে

তাহাতেই খোকার পেট ভরিয়া যাইত। কত হিসাব ছিল শ্যামার, ব্যাপক ও বিস্ময়কর! ভাতের ফেনটুকু রাখিলে যে ভাতের পুষ্টি বাড়ে এটুকু পর্যন্ত সে খেয়াল রাখিত। তাহার এই আশ্চর্য হিসাবের জন্য ছোট খোকার পেটটা একটু বড় হওয়া ছাড়া ছেলেমেয়েদের কারো শরীর তেমন খারাপ হয় নাই। রোগা হইয়াছে শুধু শ্যামা। শেষের দিকে শ্যামার যে মখমলের মত মসৃণ উজ্জ্বল চামড়াটি দেখা দিয়াছিল তাহা মলিন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক বছরে কারো বয়স এক বছরের বেশি বাড়ে না, শ্যামারও বাড়ে নাই, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কে তাহা ভাবিতে পারে। গত যে বসন্ত ব্যর্থ গিয়াছে তার আগেরটি উতলা করিয়াছিল কোন শ্যামাকে? বনগাঁয়ে এই যে শীর্ণা নিষ্প্রভজ্যোতি শ্রান্ত নারীটি আসিয়াছে, শহরতলীর সেই বাড়িটির দোতলায় সমাপ্তপ্রায় নতুন ঘরটির ছায়ায় দাঁড়াইয়া বসন্তের বাতাসে ধানকলের ছাই উড়িতে দেখিয়া জেলের কয়েদী স্বামীর জন্য এরই যৌবন কি ক্ষোভ করিয়াছিল?

শেষের দিকে পরাণ ডাক্তার বারো টাকা ভাড়ায় একতলাতে একটি ভাড়াটে জুটাইয়া দিয়াছিল, সরকারী অফিসের এক কেরাণী, সম্প্রতি স্ত্রী ও শিশুপুত্র লইয়া দাদার সঙ্গে পৃথক্ হইয়া আসিয়াছে। কেরাণী বটে কিন্তু বড়ই তাহারা বিলাসী। হাঁড়ি কলসী, পুরানো লেপ-তোষক, ভাঙ্গা রঙচটা বাক্স প্রভৃতিতে শ্যামার ঘর ভরা থাকিত, ওরা আসিয়া ঝকঝকে সংসার পাতিয়া বসিল, জিনিসপত্র তাহাদের বেশি ছিল না কিন্তু যা ছিল সব দামী ও সুদৃশ্য। বৌটি শ্যামা শুনিল বড়লোকের মেয়ে, স্কুলেও নাকি পড়িয়াছিল, স্বাধীন ভাবে একটু ফিটফাট থাকিতে ভালবাসে—বড় ভাইএর সঙ্গে ওদের পৃথক হওয়ার কারণটাও তাই। পৃথক হইয়া বৌটি যেন বাঁচিয়াছে। নিজের সংসার পাতিতে কি তাহার উৎসাহ! পথের দিকে যে ঘরে শ্যামা আগে শুইত তার জানালায় জানালায় সে নতুন পর্দা দিল, চিকণ কাজ করা দামী খাটটি, বোধ হয় বিবাহের সময় পাইয়াছিল, দক্ষিণের জানালা ঘেঁসিয়া পাতিল, আয়না বসানো টেবিলটি রাখিল ঘরে ঢুকিবার দরজার সোজা অপর দিকের দেয়ালের কাছে। খাট টেবিল আর কাঠের একটি চেয়ার তাহার সমগ্র আসবাব, তাই যেন তার ঢের। ভাঁড়ারে তাকের উপর মসলাপাতি রাখিবার কয়েকটি নতুন চকচকে টিন কাচের জার, ষ্টোভ, চায়ের বাসন আর দুটি একটি টুকিটাকি জিনিস রাখিয়া, রাখিবার আর কিছুই তাহার রহিল না, সমস্ত ঘরে একটি রিক্ত পরিচ্ছন্নতা ঝক ঝক করিতে লাগিল। সংসার করিতে করিতে একদিন হয় ত সে শ্যামার মতই ঘরবাড়ি জঞ্জালে ভরিয়া ফেলিবে, সুরুতে আজ সবই তাহার আনকোরা ও সংক্ষিপ্ত। বাড়াবাড়ি ছিল শুধু তাহাদের প্রেমের। এমন নির্লজ্জ নিবিড় প্রেম শ্যামা জীবনে আর দ্যাখে নাই। বিবাহ তাহাদের হইয়াছিল চার পাঁচ বছর আগে, এতকাল কে যেন তাহাদের প্রেমের উৎস মুখটিতে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়াছিল, এখানে মুক্তি পাইয়া তাহা উথলিয়া উঠিয়াছে। ভাল শ্যামার লাগিত না। নিরানন্দ বিমর্ষ তাহার জীবন, সন্তানের তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব, তারই পায়ের তলে তারই বাড়ির একতলায় এ কি বিসদৃশ প্রণয়-রস-রঙ্গ? কই, বয়সকালে শ্যামা তো ওরকম ছিল না? স্বামীর সঙ্গে মেয়েমানুষের এত কি ছেলেমানুষী, হাসা-হাসি, খেলা ও ছল করা কলহ? একটি ছেলে হইয়াছে, সম্মুখে অন্ধকার ভবিষ্যত, কত দুশ্চিন্তা কত দায়িত্ব ওদের, এমন হাল্কা ফাজলামিতে দিন কাটাইলে চলিবে কেন?

বৌটির নাম কনকলতা। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিত, তোমার স্বামী কত মাইনে পান?

কনক বলিত, কত আর পাবে, মাছিমারা কেরাণী তো, বেড়ে বেড়ে নব্বইএর মত হয়েছে,—খরচ চলে না দিদি। একটা ছেলে পড়ালে আরও কিছু আসে, আমি বারণ করি,—সারাদিন অপিস করে আবার ছেলে পড়াবে না কচু,—কি হবে বেশি টাকা দিয়ে? যা আসে তাই ঢের,—নয়? মাসের শেষে বড্ড টানাটানি পড়ে দিদি খরচ চলে না।

কনক এমনিভাবে কথা বলিত, উল্টাপালটা পুব পশ্চিম। বলিত, একা স্বাধীনভাবে সে মহা স্ফূর্তিতে আছে, আবার বলিত একা একা থাকতে ভাল লাগে না দিদি, আত্মীয় স্বজন দু'চারটি কাছে না থাকলে বড্ড যেন ফাঁকাফাঁকা লাগে,—নয়? শ্যামা বুঝিত, আনন্দে আহ্লাদে সোহাগে সে ডগমগ, কথা সে বলে না শুধু বকবক করে, ওর কথার কোন অর্থ নাই। কনকের বয়স বোধ হয় ছিল কুড়ি বাইশ বছর, শ্যামা যে বয়সে প্রথম মা হইয়াছিল,—এই বয়সে বৌটির অবিশ্বাস্য খুকী ভাবে শ্যামা থ' বনিয়া যাইত, কেমন রাগ হইত শ্যামার। মেয়েমানুষ এমন নিভয়, এমন নিশ্চিন্ত, এমন আহ্লাদী? এই বুদ্ধি-বিবেচনা লইয়া সংসারে ও টিঁকিবে কি করিয়া? বড়লোকের মেয়ে বুঝি এমনি অসার হয়?

তবু বিরুদ্ধ সমালোচনা-ভরা শ্যামার মন, কি দিয়া কনক যেন আকর্ষণ করিত। চৌবাচ্চার ধারে ওরা যখন পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত, কনকের স্বামী যখন তাহাকে শূন্যে তুলিয়া চৌবাচ্চায় একটা চুবানি দিয়া আবার বুকে করিয়া ঘরে লইয়া যাইত, খানিক পরে শুকনো কাপড় পরিয়া আসিয়া কনকের কাজের ছন্দে আবার অকাজের ছন্দ মিশিতে থাকিত তখন শ্যামার—কে জানে কি হইত শ্যামার, চোখের জল গাল বাহিয়া তাহার মুখের হাসিতে গড়াইয়া আসিত।

কনকের স্বামী আপিস গেলে সে নীচে নামিয়া বলিত, সব দেখে ফেলেছি কনক।

কনকের লজ্জা নাই, সে হাসিয়া ফেলিত,—জ্বালিয়ে মারে দিদি, আপিস গেলে যেন বাঁচি।

দোতালার ঘরখানা আর ছাদটুকু ছিল শ্যামার গৃহ, জিনিস-পত্র সহ সে বাস করিত ঘরে, রাঁধিত ছাদে, একখানা করোগেটেড টিনের নীচে। পাশে শুধু নকুড়বাবুর ছাদ নয়, আশে পাশের আরও কয়েক বাড়ির ছাদ হইতে উদভ্রান্ত শ্যামার সংসারের গতিবিধি দেখা যাইত। প্রথম প্রথম অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ দেখিতেও ছাড়িত না, যখন তখন ছাদে উঠিয়া নকুড়বাবুর বৌ জিজ্ঞাসা করিত, কি করছ বকুলের মা? শ্যামা বলিত, রাঁধছি দিদি,—বলিত, সংসারের কাজকর্ম করছি দিদি,—কি রাঁধলেন এবেলা? রাঁধিত এবং সংসারের কাজকর্ম করিত, শ্যামা আর কিছু করিত না? ধানকলের ধূমোদ্গারী চোঙটার দিকে চাহিয়া থাকিত না? রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িলে জাগিয়া বসিয়া থাকিত না. হিসাব করিত না দিন মাস সপ্তাহের, টাকা আনা পয়সার?

উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তাও শ্যামা করিত, নিশ্বাসও ফেলিত। জননীত্ব কেমন যেন নীরস অর্থহীন মনে হইত শ্যামার কাছে। কোথায় ছিল এই চারিটি জীব, কি সম্পর্ক ওদের সঙ্গে তাহার, অসহায়া স্ত্রীলোক সে, মেরুদণ্ড বাঁকানো এ ভার তার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে কেন? কিসের এই অন্ধ মায়া? জগজ্জননী মহামায়া কিসের ধাঁধায় ফেলিয়া তাহাকে দিয়া এত দুঃখ বরণ করাইতেছেন? সুখ কাকে বলে একদিনের জন্য সে তাহা জানিতে পারিল না, তাহার একটা প্রাণ নিঙড়াইয়া চারটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে,—কেন? কি লাভ তাহার? চোখ বুজিয়া সে যদি আজ কোথাও চলিয়া যাইতে পারিত।—ওরা দুঃখ পাইবে, না খাইয়া হয়ত মরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায় তার? সে তো দেখিতে আসিবে না। পেটের সন্তানগুলির প্রতি শ্যামা যেন বিদ্বেষ অনুভব করিত,—সব তাহার শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ! কি দশা তাহার হইয়াছে ওদের জন্য।

শেষের দিকে শ্যামা আর চালাইতে পারিত না, মাসিক বারো টাকায় এতগুলো মানুষের চলে না। তাই কুড়ি টাকা ভাড়ায় সমস্ত বাড়িটা কনকলতাকে ছাড়িয়া দিয়া সে বনগাঁয়ে রাখালের আশ্রয়ে চলিয়া আসিয়াছে।

বড় রাস্তা ছাড়িয়া ছোট রাস্তা, পুকুরের ধারে বিঘা পরিমাণ ছোট একটি মাঠ, লাল ইঁটের একতলা একটি বাড়ি ও কলাবাগানের বেড়ার মধ্যবর্ত্তী দু'হাত চওড়া পথ, তারপর রাখালের পাকা ভিত., টিনের দেয়াল ও শণের ছাউনির বৈঠকখানা। তিনখানা তক্তপোষ একত্র করিয়া তার উপরে সতরঞ্চি বিছানো আছে। তিন জাতের মানুষের জন্য হুঁকা আছে তিনটি। কাঠের একটা আলমারিতে পুরাতন বিবর্ণ দপ্তর, কাঠের একটি বাক্সের সামনে শীর্ণকায় টিকিসমেত একজন মুহুরি। রাখালের মুহুরী? নিজে সে সামান্য চাকরি করে, মুহুরি দিয়া তাহার কিসের প্রয়োজন? বাহিরের ঘরখানা দেখিলেই সন্দেহ হয় রাখালের অবস্থা বুঝি খারাপ নয়, অনেকটা উকিল মোক্তারের কাছারি ঘরের মত তাহার বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পরেই বহিরাঙ্গন, সেখানে দুটা বড় বড় ধানের মরাই। তারপর রাখালের বাসগৃহ, আটদশটি ছোট বড় টিনের ঘরের সমষ্টি, অধিবাসীদের সংখ্যাও বড় কম নয়।

ক'দিন এখানে বাস করিয়াই শ্যামা বুঝিতে পারিল রাখাল তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছিল, সে দরিদ্র নয়! মধ্যবিত্তও নয়। সে ধনী। চাকরী রাখাল সামান্য মাহিনাতেই করে কিন্তু সে অনেক জমিজমা করিয়াছে, বহু টাকা তাহার সুদে খাটে! রাখালের সম্পত্তি ও নগদ টাকার পরিমাণটা অনুমান করা সম্ভব নয়. তবু সে যে উঁচুদরের বড়লোক চোখ কান বুজিয়া থাকিলেও তাহা বোঝা যায়। মোটরগাড়ি, দামি আসবাব, গৃহের রমণীবৃন্দের বিলাসিতার উপকরণ গ্রাম্য গৃহস্থের ধনবত্তার পরিচয় নয়, তাহাদের অবস্থাকে ঘোষণা করে পোষ্যের সংখ্যা, ধানের মরাই, খাতকের ভিড়। রাখালের তিনটি জোড়া তক্তপোষ সকালবেলা খাতকের ভিড়ে ভরিয়া যায়।

দেখিয়া শুনিয়া শ্যামা নিশ্বাস ফেলিল। রাগ ও বিদ্বেষ এবার যেন তাহাদের হইল না, অনেক অভিজ্ঞতা দিয়া শ্যামা এখন বুঝিতে পারিয়াছে রাখাল একা নয়, এমনি জগৎ। এমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না জানিলে, ছল ও প্রবঞ্চনায় এমন দক্ষতা না জন্মিলে, সকালে উঠিয়া দশ বিশটি খাতকের মুখ দেখিবার সৌভাগ্য মানুষের হয় না। রাখালের দোষ নাই। মানুষের মাঝে মানুষের মত মাথা উঁচু করিবার একটিমাত্র যে পন্থা আছে তাই সে বাছিয়া নিয়াছে। রাখাল তো ধর্মযাজক নয়, বিবাগী সন্ন্যাসী নয়, সে সংসারী মানুষ, সংসারে দশজনে যে ভাবে আত্মোন্নতি করে সেও তেমনিভাবে অর্থসম্পদ সঞ্চয় করিয়াছে।

শ্যামা সব জানে। বড়লোক হইবার সমস্ত কলা কৌশল। কেবল স্ত্রীলোক করিয়া ভগবান তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন।

রাখালের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ সুপ্রভাকে দেখিয়া প্রথমে শ্যামা চোখ ফিরাইতে পারে নাই। রাখালের দু'বার বিবাহ করার কারণটাও তখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল। এত রূপ দেখিলে মাথার ঠিক থাকে পুরুষ মানুষের! একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইয়াছে সুপ্রভার, শ্যামা আসিবার আগে সে নাকি অনেকদিন অসুখেও ভুগিয়াছিল, তবু এখনো সে ছবির মত, প্রতিমার মত সুন্দরী। এমন সতীন থাকিতে মন্দা যে কেমন করিয়া এখানে গৃহিণীর পদটি অধিকার করিয়া আছে, চারিদিকে সকলকে হুকুম দিয়া বেড়াইতেছে—সুপ্রভাকে পর্য্যন্ত, ভাবিয়া প্রথমটা শ্যামা আশ্চর্য্য হইয়া

গিয়াছিল। তারপর সে টের পাইয়াছে যতই রূপ থাক সুপ্রভার বুদ্ধি নাই, বড় সে বোকা। পুতুলের মত সে পরের হাতে নড়ে-চড়ে, সাহস করিয়া যে তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে যায় তারই কর্তৃত্ব স্বীকার করে, একেবারে সে মাটির মানুষ, ঘোরপ্যাচ বোঝে না, নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে জানে না। তবু রাখাল কিনা আজও ছোটবৌ বলিতে অজ্ঞান, মনে মনে সকলেই সুপ্রভাকে ভয় করে, এ বাড়িতে আদরের তাহার সীমা নাই। সুপ্রভা প্রভুত্ব করার চেয়ে নির্ভর করিতেই ভালবাসে বেশি, আদর পাওয়াটাই তার জীবনে সব চেয়ে বড় প্রাপ্য। মন্দার গৃহিণীপনার ভিত্তিও ওইখানেই,—সুপ্রভাকে সে নয়নের মণি করিয়া রাখিয়াছে। কে বলিবে সুপ্রভা তাহার সতীন? স্নেহে যত্নে সুপ্রভার দিন-গুলিকে সে ভরাট করিয়া রাখে, নিজের হাতে সে সুপ্রভাকে সাজায়, সুপ্রভার ঘরখানা সাজায়, সুপ্রভার শয্যা রচনা করিয়া দেয়, সতীনের প্রতি স্বামীর গভীর ভালবাসাকে হাসিমুখে গ্রহণ করে।

সতীনের সংসারেও তাই এখানে কলহ-বিবাদ মান-অভিমান মনকষাকষি নাই। মন্দা ভুলিয়া গিয়াছে সে বধূ। এই মূল্য দিয়া সে হইয়াছে গৃহিণী।

কলিকাতার চেয়ে ঢের বেশি সুখেই শ্যামা এখানে বাস করিতে লাগিল। পরের বাড়ি পরের আশ্রয়ে থাকিবার একটু যা লজ্জা। এখানে আসিবার আগে শ্যামা ভাবিয়াছিল এমন নিরুপায় হইয়া আত্মীয়ের বাড়ি যাইতেছে, পদে পদে কত অপমান সেখানে না জানি তাহার জুটিবে, এখানে কিছু-দিন ভয়ে ভয়ে থাকিবার পর দেখিল গায়ে পড়িয়া অপমান কেহ করে না, সে যে এখানে আশ্রিতা, সময়ে অসময়ে সেটা মনে করাইয়া দিবারও কেহ এখানে নাই, মানাইয়া চলিতে পারিলে এখানে বাস করা কঠিন নয়।

এখানকার গ্রাম্য আবহাওয়াটিও শ্যামার বেশ লাগিল। শহরতলীর যে বাড়িতে বিবাহের পর হইতে এতকাল সে বাস করিয়াছিল সেখানটা শহরের মত ঘিঞ্জি নয়, তবু সেখানে তাহারা যেন বন্দী-জীবন যাপন করিত, ইঁটের অরণ্যের মধ্যে প্রকৃতির যেটুকু প্রকাশ ছিল তা যেন শহরের পার্কের মত ছেলে-ভুলানো ব্যাপার। তাছাড়া, সেখানে তাহারা ছিল কুণো, ঘরের কোণে নিজেদের লইয়া থাকিত, প্রতিবেশী থাকিয়াও ছিল না। এখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের বড় নিবিড় মেশামিশি। মিতালি যেখানে নাই সেখানেও অজস্র মেলামেশা আছে, সহজ বাস্তব মেলামেশা, শহরের মেলামেশার মত কোমল ও কৃত্রিম নয়, খাঁটি জিনিস। শ্যামার ছেলে-মেয়েরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এখানে তাহারা প্রকাণ্ড অঙ্গন পাইয়াছে, বাগান পুকুর পাইয়াছে, ধূলামাটিতে খেলা করার সুযোগ পাইয়াছে, আর পাইয়াছে সঙ্গী। বাড়িতেই শ্যামার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের সাথী আছে, বিধানের জন্মের সময় মন্দা যে কোলের ছেলেটিকে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল তার নাম অজয়, সকলে অজু বলিয়া ডাকে, বিধানের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। অজয় এক ক্লাশ নিচে পড়ে। পড়াশোনায় বিধান বড় ভাল, মন্দার ছেলেদের মাষ্টার একদিন বিধানকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া রায় এই দিয়াছেন। মন্দা জানিয়া খুশি হইয়াছে, বিধান কলিকাতার ছেলে বলিয়া অজয়ের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতায় মন্দার যেটুকু ভয় ছিল মাষ্টারের মন্তব্য শোনার পর আর তাহা নাই।

সুপ্রভা বকুলকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

বলে, কি মেয়ে আপনার বৌদিদি, দিয়ে দিন মেয়েটা আমাকে, দেবেন?

বলে, মেয়ে বলে ওকে কিছু শেখাচ্ছেন না, এতো ভাল কথা নয়? আজকালকার দিনে লেখাপড়া গানটান না জানলে কে নেবে মেয়েকে? একটু একটু সবি শেখাতে হবে ঠাকুরঝি।

সুপ্রভাই উদ্যোগ করিয়া বকুলকে মেয়েস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল, বলিল, স্কুলের মাহিনা সেই দিবে। গানটান শিখাইবার যখন উপায় নাই, লেখাপড়াই একটু শিখুক। বকুলকে সে যত্ন করে, লুকাইয়া ভাল জিনিস খাইতে দেয়, যে সব জিনিস শুধু মন্দা ও তার ছেলেমেয়ের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু একা বকুল ওসব খাইতে চায় না, বলে, দাদাকে দাও, ভাইকে দাও? সুপ্রভা তাতে বড় খুশি হয়। কি নিস্বার্থপর মেয়েটার মন? যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি মিষ্টি স্বভাব, ও যেন রাজরাণী হয় ভগবান।

রাজরাণী? এতবার সুপ্রভা এই আশীর্বাদের পুনরাবৃত্তি করে কেন, বকুলকে রাজরাণী করিতে এত তাহার উৎসাহ কিসের? রাজরাণী হওয়ার সখ ছিল নাকি সুপ্রভার, মনে সেই ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে? কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সুপ্রভাকে অসুখী মনে হয় কদাচিৎ। চুপচাপ বসিয়া সে অনেক সময়ই থাকে, সেটা তার স্বভাব, মুখ তাহার সব সময় বিমর্ষ দেখায় না, চোখে তাহার সব সময় ঘনাইয়া আসে না উৎসুক দিবা-স্বপ্নাতুরার দৃষ্টি। তবু শ্যামা মাঝে মাঝে সন্দেহ করে। অত যার রূপ সে কি একেবারেই নিজের মূল্য জানে না, কুমারী জীবনে আশা কি সে করে নাই, কল্পনা কি তার ছিল না? বুড়া বয়সে রাখাল যখন তাহাকে বিবাহ করিয়া তিন পুত্রের জননী সতীনের সংসারে আনিয়াছিল গোপনে সে কি দু'এক বিন্দু অশ্রুপাত করে নাই?

বাড়ি ভাড়ার কুড়িটা টাকা নিয়মিত আসে। দু'মাস টাকা পাঠাইয়া কনক একবার শ্যামাকে একখানা পত্র লিখিল। পাশে কোন বাড়িতে বিদ্যুতের আলো নেওয়া হইতেছে, দেখিয়া কনকের সখ জাগিয়াছে তারও বিদ্যুতের আলো চাই। বাড়িটা তাদের পছন্দ হইয়াছে, স্থায়িভাবে

তারা ওখানে রহিয়া গেল, এক কাজ করিলে হয় না দিদি? খরচপত্র করিয়া তারা বিদ্যুৎ আনাক, মাসে মাসে বাড়ি ভাড়ার টাকায় সেটা শোধ হইবে? এই পত্র পাইয়া শ্যামা বড় চিন্তায় পড়িয়া গেল। এখানে তাহার নানা রকম খরচ আছে, স্কুলের মাহিনা, জামাকাপড় এসব তাহাকেই দিতে হয়, এটা ওটা খুচরা খরচও আছে অনেক, বাড়িভাড়ার টাকা না আসিলে সে করিবে কি? অথচ বিদ্যুৎ আনিতে না দিলে ওরা যদি অন্য বাড়িতে উঠিয়া যায়? সঙ্গে সঙ্গে আবার কি ভাড়াটে মিলিবে? শেষে শ্যামা মিনতি করিয়া কনককে চিঠি লিখিল। লিখিল, ওই কুড়িটা টাকা তাহার সম্বল, ওই টাকা ক'টির জোরে সে পরের বাড়ি পড়িয়া আছে, বাড়িতে বিদ্যুৎ আনিবার তার ক্ষমতা কই? শ্যামা যে কি দুঃখে পড়িয়াছে কনক যদি তাহা জানিত—

। ডাকে দিবারও প্রয়োজন হইল না, কনকলতার স্বামীর নিকট হইতে সবিনয় নিবেদন ভনিতার আর একখানা পত্র আসিল, শ্যামার বাড়ি হইতে আপিসে যাতায়াত করা বড়ই অসুবিধা, একটি ভাল বাড়ি পাওয়া গিয়াছে শহরের মধ্যে, ইংরাজী মাসটা কাবার হইলে তাহারা উঠিয়া যাইবে। কলিকাতার কেরাণী-ভাড়াটের বাসা বদলানো রোগের খবর তো শ্যামা জানিত না, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কনকলতার উপর রাগ ও অভিমানের তাহার সীমা রহিল না। শ্যামার সঙ্গে না তাহার অত ভাব হইয়াছিল, দুঃখের কথা বলিতে বলিতে শ্যামার চোখে জল আসিলে সে না সান্ত্বনা দিয়া বলিত, ভেবো না দিদি, ভগবান মুখ তুলে চাইবেন? শ্যামা কত নিরুপায় সে তাহা জানে, কলিকাতায় বাড়িভাড়া করিয়াই সে থাকিবে তবু শ্যামার বাড়িতে থাকিবে না। এতকাল অসুবিধা ছিল না, আজ হঠাৎ অসুবিধা হইয়া গেল?

রাখালকে চিঠিখানা দেখাইয়া শ্যামা বলিল, ঠাকুরজামাই এবার কি হবে? কুড়িটে করে টাকা পাচ্ছিলাম, ভগবান তাতেও বাদ সাধলেন।

রাখাল বলিল, আহা, কলকাতায় কি আর ভাড়াটে নেই। যাক না ওরা, ফের ভাড়াটে আসবে,—ওপরে একখানা নিচে তিনখানা ঘর, কুড়ি টাকায় ও-বাড়ি লুপে নেবে না? পাড়ার কাউকে চিঠি দাও না?

হারান ডাক্তারকে শ্যামা একখানা পত্র লিখিয়া দিল। হারান জবাব দিল, ভয় নাই, বাড়ি শ্যামার খালি থাকিবে না, দু'এক মাসের মধ্যে আবার অবশ্যই ভাড়াটে জুটিবে।

ইংরাজি মাসের পাঁচ ছয় তারিখে শ্যামা ভাড়ার টাকার মণি-অর্ডার পাইত, এবার দশ তারিখ হইয়া গেল টাকা আসিল না। কনকলতারা কোথায় উঠিয়া গিয়াছে শ্যামা জানিত না, নিজের বাড়ির ঠিকানাতেই সে তাগিদ দিয়া চিঠি লিখিল, ভাবিল, পোষ্টাপিসে ওরা কি আর ঠিকানা রাখিয়া যায় নাই? এ পত্রের কোন জবাব শ্যামা পাইল না।

মন্দা বলিল, দিচ্ছে ভাড়া! এতকাল যে দিয়েছিল তাই ভাগ্যি বলে জেনো বৌ। কলকাতার লোকে বাড়ি ভাড়া দেয় নাকি? একমাস দু'মাস দেয়, তারপর য'দিন পারে থেকে অন্য বাড়িতে উঠে যায়,—কর ভাড়া আদায় মোকদ্দমা করে।

শ্যামা বিবর্ণ মুখে বলিল, আমার যে একটি পয়সা নেই ঠাকুরঝি? আমি যে ওই কটা টাকার ভরসা ক'রছিলাম?

মন্দা বলিল, জলে তো পড়নি?

তারপর বলিল, বাড়িটা বেচে দিলেই তো পার বৌ? এত কষ্ট সয়ে ও বাড়ি রেখে করবে কি? থাকতেও তো পারছ না নিজে? টাকাটা হাতে এলে বরং লাগবে কাজে,—তারপর কপালে থাকে বাড়ি আবার হবে, না থাকে হবে না! দাদা বেরিয়ে এসে কিছু একটা করবে নিশ্চয়। নাও যদি করে বৌ, ছেলে তো উপযুক্ত হয়ে উঠবে তোমার বাড়ির টাকা শেষ হতে হতে,—তখন আর তোমার দুঃখ কিসের?

মুখখানা মন্দা ম্লান করিয়া আনিল, দুঃখের সঙ্গে বলিল, ও বাড়ি বেচতে বলতে আমার ভাল লাগছে ভেবো না বৌ,—আমার বাপের ভিটে তো। কিন্তু কি করবে বল? নিরুপায় হলে মানুষকে সব করতে হয়।

বাড়িটা বিক্রয় করিয়া ফেলার কথা শ্যামা ভাবিতেও পারে না। একটা বাড়ি না থাকিলে মানুষের থাকিল কি? দেশে একটা ভিটা থাকিলেও সহরতলীর এই বাড়িটা সে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু দেশ পর্যন্ত কি শ্যামার আছে! যে গ্রামে সে জন্মিয়াছিল, তার কথা ভাল করিয়া মনেও নাই। মামার ভিটেখানা নিজের মনে করিয়াছিল, বেচিয়া দিয়া মামা নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। স্বামীর ওই একরত্তি বাড়িটুকু সে পাইয়াছে, বুকের রক্ত জল করা টাকায় বাড়ির সংস্কার করিয়াছে, আজ তাও সে বিক্রি করিয়া দিবে? ও বাড়ির ঘরে ঘরে জমা হইয়া তাহার বাইশ বছরের জীবন, ওইখানে সে ছিল বধূ, ছিল জননী, চারিটি সন্তানকে প্রসব করিয়া ওইখানে সে বড় করিয়াছে, ও-বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁট যে তার চেনা, দেয়ালের কোথায় কোন পেরেকের গর্তে কবে সে চুন লেপিয়া দিয়াছিল তাও যে তার স্মরণ আছে। পরের হাতে বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া আসিতে তার মন যে কেমন করিয়াছিল, জগতে কে তা জানিবে। হায়, ও-বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁটের জন্য শ্যামার যে অপত্যস্নেহ!

অথচ এদিকেও আর চলে না। নাই বলিয়া শ্যামার হাতে কিছুই যে নাই, অপরে তাহা বিশ্বাস করে না, শ্যামাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না বকুলের জমানো একটি চকচকে আধুলি ছাড়া আর একটি তামার পয়সাও তাহার নাই। মাসকাবারে সুপ্রভা গোপনে বিধানের

স্কুলের মাহিনাটা দিয়া দিল, চাহিলে সুপ্রভার কাছে আরও কিছু হয়ত পাওয়া যাইত, শ্যামার চাহিতে লজ্জা করিল। এবার বড় শীত পড়িয়াছে। বিধানের গরম জামা গতবার ছোট হইয়া গিয়াছিল, ছেলেটা হু হু করিয়া বড় হইয়া উঠিতেছে, এ-বছর নূতন একটা জামা কিনিয়া দিতে পারিলে ভাল হইত। আলোয়ানটাও তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ওদের বেশ-ভূষা চাহিয়া দেখিতে শ্যামার চোখে জল আসে। বাড়িবার মুখে বছর বছর ওদের পোষাক বদলানো দরকার, পুরানো সেলাই-করা আঁটো জামা পরিয়া ওদের ভিখারির সন্তানের মত দেখায়, শুধু সাবান দিয়া জামাকাপড়গুলি আর যেন সাফ হইতে চায় না, কেমন লালচে রঙ ধরিয়া যায়। পূজার সময় রাখাল ওদের একখানি করিয়া তাঁতের কাপড় দিয়াছিল, মানাইয়া পরা চলে এমন জামা নাই বলিয়া বিধান লজ্জায় সে কাপড় একদিনও পরে নাই।

মনটা শ্যামা ঠিক করিতে পারে না। মন্দার কথাগুলি মনের মধ্যে ঘুরিতে থাকে। রাখালের সঙ্গে একদিন সে এ বিষয়ে পরামর্শ করিল। রাখালও বাড়িটা বিক্রি করার পরামর্শই দিল। বলিল, বাড়িভাড়া দিবার হাঙ্গামা কি সহজ। অর্ধেক বছর বাড়ি হয়ত খালিই পড়িয়া থাকিবে, ভাড়াটে জুটিলেও ভাড়া যে নিয়মিত পাওয়া যাইবে তারও কোন মানে নাই, একেবারে না পাওয়াও অসম্ভব নয়। তারপর বাড়ির পিছনে খরচ নাই? পুরানো বাড়ি, মাঝে মাঝে মেরামত করিতে হইবে, বছর বছর চুণকাম করিয়া না দিলে ভাড়াটে থাকিবে না,—ড্রেন নেওয়া হইয়াছে শ্যামার বাড়িতে? এবার হয়ত ড্রেন না লইলে কর্পোরেশন ছাড়িবে না, সে অনেক খরচের কথা, শ্যামা কোথা হইতে খরচ করিবে?

বাড়ি পোষা হাতী পোষার সমান বৌঠান, বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও।

বিধান রাত প্রায় এগারোটা অবধি পড়ে, বকুল মণি ওরা ঘুমাইয়া পড়ে অনেক আগে। সেদিন রাত্রে শ্যামা বিধানকে বলিল, খোকা, সবাই যে বাড়ি বিক্রি করে দিতে বলছে বাবা?

বিধানের সঙ্গে শ্যামা আজকাল নানা বিষয়ে পরামর্শ করে, ভবিষ্যতের কত জল্পনা কল্পনা যে তাদের চলে তাহার অন্ত নাই। বিধান বলে, বড় হইয়া সে মস্ত চাকরি করিবে, তারপর শঙ্করের মত একটা মোটর কিনিবে। শঙ্করের মোটর? শীতলের জেল হইবার পর শঙ্করের মোটরে তার যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল সে অপমান বিধান কি মনে করিয়া রাখিয়াছে? রাত জাগিয়া তাই এত ওর পড়াশোনা? শীতলের কথা বিধান কখনো বলে না। পড়া শেষ করিয়া ছেলে শুইতে আসিলে শ্যামা কতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছে, চুপি চুপি বিধান হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, বাবা কবে ছাড়া পাবে মা? কিন্তু কোনদিন বিধান এ প্রশ্ন করে না। যে তীব্র অভিমান ওর, হয়ত বাপের জেল হওয়ায় লজ্জা ওকে মূক করিয়া রাখে, পরের বাড়ি তারা যে এভাবে পড়িয়া আছে, এজন্য বাপকে দোষী করিয়া মনে হয়ত ও নালিশ পুরিয়া রাখিয়াছে।

আলোটা নিভাইয়া শ্যামা বিধানের মাথার কাছে লেপের মধ্যে পা ঢুকাইয়া বসে। একপাশে ঘুমাইয়া আছে বকুল, মণি ও ফণী, এপাশে অবোধ বালক বুকে ক্ষোভ ও লজ্জা পুরিয়া এত রাত্রে জাগিয়া আছে। শ্যামা ছেলের বুকে একখানা হাত রাখে। বেড়ার ফুটা দিয়া জ্যোৎস্নার কতকগুলি রেখা ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানে শিয়ালগুলি ডাক দিয়া নীরব হইল। বেড়ার ব্যবধান পার হইয়া পাশের ঘরে রাখালের মামাতো বোন রাজবালার স্বামীর সঙ্গে ফিস ফিস কথা শোনা যায়, রাজবালার স্বামী আদালতে পঁচিশ টাকায় চাকরী করে। পঁচিশ টাকায় অত ফিস ফিস কথা? শ্যামার স্বামী মাসে তিনশ' টাকাও রোজগার করিয়াছে, নিজের বাড়িতে নিজের পাকা শয়নঘরে স্বামীর সঙ্গে অত কথা শ্যামা বলে নাই।—আর ওই চাপা হাসি? শ্যামা শিহরিয়া ওঠে।

ক'দিন পরে শ্যামার বাড়ি-বিক্রয়-সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। হারান ডাক্তার মণিঅর্ডারে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিলেন, বাড়িতে তিনি নূতন ভাড়াটে আনিয়াছেন, তাঁর পরিচিত লোক। ভাড়া আদায় করিয়া মাসে মাসে তিনিই শ্যামাকে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্যামার মুখে হাসি ফুটিল। পঁচিশ টাকা? পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়াছে? এখন তাহার রাজবালার স্বামীর সমান উপার্জন। কপাল হইতে কয়েকটা দুশ্চিন্তার চিহ্ন এবার মুছিয়া ফেলা চলে।

মাসখানেক পরে একদিন সকালে কোথা হইতে শঙ্কর আসিয়া হাজির। গায়ে রেপ্তারের কোট, তলায় ষ্ট্রাইপ দেওয়া সার্ট, পরণে শান্তিপুরে ধুতি, পায়ে মোজা,—কলিকাতায় বোঝা যাইত না, এখানে তাহাকে শ্যামার ভারি বাবু মনে হইল, রাখালের এই বাড়িতে। শ্যামা রাঁধিতেছিল, পরণের কাপড়খানা তাহার ছেঁড়া হলুদমাখা, হাতে দুটি শাঁখা ছাড়া কিছু নাই। কলিকাতা হইতে কে একটি ছেলে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে শুনিয়া সে কি ভাবিতে পারিয়াছিল সে শঙ্কর! শঙ্কর কেন বনগাঁ আসিবে?

শ্যামাকে শঙ্কর প্রণাম করিল। শ্যামার গর্বের সীমা রহিল না। মোটা হলুদ-মাখা ছেঁড়া কাপড় পরণে? কি হইয়াছে তাহাতে! সুপ্রভা, মন্দা, রাজবালা সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে রাজপুত্র প্রণাম তো করিল তাহাকে! খুসি হইয়া শ্যামা বলিল, ষাট ষাট, বেঁচে থাক বাবা, বিদ্যাদিগ্‌গজ হও! কি আবেগ শ্যামার আশীর্বচনে! শঙ্করের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল।

তারপর শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, বনগাঁ এসেছ কেন শঙ্কর?

শঙ্কর বলিল, ক্রিকেট খেলতে এসেছি মাসিমা, এখানকার স্কুলের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ম্যাচ।

শ্যামা, বিধান, মণি সকলেই শঙ্করকে দেখিয়া খুসি হইয়াছে। অভিমান করিয়াছে বকুল। পুজোর সময় আসব বলে এখন বাবু এলেন, বলিয়া সে মুখ ভার করিয়া আছে। কবে শঙ্কর বকুলের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল পুজোর সময় সে বনগাঁ আসিবে সে খবর কেহ রাখিত না, বকুলের কথায় বড়রা হাসে, শঙ্কর শ্যামার দিকে চাহিয়া সলজ্জ ভাবে কৈফিয়ৎ দিয়া বলে, পুজোর সময় মধুপুরে গেলাম যে আমরা!—তোকে চিঠি লিখিনি বিধান সেখান থেকে?

বকুল অর্ধেক ক্ষমা করিয়া বলে, তোমার জিনিসপত্র কই?

শঙ্কর বলে, বোর্ডিংএ আমাদের থাকতে দিয়েছে, সেখানে রেখেছি।

বকুল বলে, বোর্ডিং কি জন্যে, আমাদের বাড়ি থাক না?

শঙ্কর মুখ নিচু করিয়া একটু হাসে। শ্যামা তাকায় মন্দার দিকে।

শঙ্করকে এখানে থাকার নিমন্ত্রণ জানায় কিন্তু সুপ্রভা। প্রথমে শঙ্কর রাজি হয় না, ভদ্রতার ফাঁকা ওজর করে কলিকাতার ছেলে সে, ওসব কায়দা তার দুরস্ত। শেষে সুপ্রভার হাসি ও মিষ্টি কথার কাছে পরাজয় মানিয়া সে আতিথ্য স্বীকার করে। লজ্জায় যে আবরণটি লইয়া সে এ-বাড়িতে ঢুকিয়াছিল ক্রমে ক্রমে তাহা খসিয়া যায়, কানু ও কালুর সঙ্গে তাহার ভাব হয়, বিধানের পড়ার ঘরে খানিক হৈ-চৈ করিয়া উঠানে তাহারা মার্বেল খেলে, তারপর স্কুলের বেলা হইলে সকলে স্নান করিতে যায় পুকুরে। শ্যামা বারণ করিয়া বলে, সাঁতার জান না, তুমি পুকুরে যেও না শঙ্কর। জল তুলে এনে দিক, তুমি ঘরে স্নান কর।

শঙ্কর বলিয়া যায়, বেশি জলে যাব না মাসিমা। তবু শ্যামার বড় ভয় করে। বিধান, বকুল, মণি এরা সাঁতার শিখিয়াছে, কালু ও কানু তো পাকা সাঁতারু, পুকুরের জল তোলপাড় করিয়া ওরা স্নান করিবে; উৎসাহের মাথায় শঙ্করের কি খেয়াল থাকিবে সে সাঁতার জানে না? বাড়ির একজন চাকরকে সে পুকুরে পাঠাইয়া দেয়। খানিক পরে হৈ চৈ করিতে করিতে সকলে ফিরিয়া আসে, শঙ্কর আসে বিধান ও চাকরটার গায়ে ভর দিয়া এক পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। শামুকে না কিসে শঙ্করের পা কাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

বকুল দুরন্ত দুঃসাহসী মেয়ে, বকিলে, মারিলে, ব্যথা পাইলে সে কাঁদে না কিন্তু রক্ত দেখিলে সে ভয় পায়, ধুলা-কাদা ধুইয়া শ্যামা যতক্ষণ শঙ্করের পা বাঁধিয়া দেয় সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

মন্দা ধমক দিয়া বলে, তোর পা কেটেছে নাকি, তুই অত কাঁদছিস কি জন্যে? কেঁদে মেয়ে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন!

শঙ্কর বলে, কেঁদো না বুকু, বেশি কাটেনি তো।

আগে বিধান হয়ত শঙ্করের জন্য অনায়াসে সাতদিন স্কুল কামাই করিত, এখন পড়াশোনার চেয়ে বড় তাহার কাছে কিছু নাই, সে স্কুলে চলিয়া গেল। কানু ও কালু কোন উপলক্ষে স্কুল কামাই করিতে পারিলে বাঁচে, অতিথির তদ্বিরের জন্য বাড়িতে থাকিতে তারা রাজি ছিল, মন্দার জন্য পারিল না! স্কুলে গেল না শুধু বকুল। সারা দুপুরে এক মুহূর্তের জন্য সে শঙ্করের সঙ্গ ছাড়িল না। এ যেন তার বাড়ি-ঘর, শঙ্কর যেন তারই অতিথি, সে ছাড়া আর কে শঙ্করকে আপ্যায়িত করিবে! ফণীকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার অবিশ্রাম বকুনি শুনিতে শুনিতে শ্যামার চোখও ঘুমে জড়াইয়া আসে,—বকুলের মুখে যেন ঘুমপাড়ানি গান। বাড়ির কারোর সঙ্গে ও-মেয়েটার স্নেহের আদান-প্রদান নাই, কারো সোহাগ-মমতায় ও ধরা-ছোঁয়া দেয় না, অনুগ্রহের মত করিয়া সুপ্রভার ভালবাসাকে একটু যা গ্রহণ করে, শঙ্করের সঙ্গে এত ওর ভাব হইল কিসে, পরের ছেলে শঙ্কর? এক তার পাগল ছেলে বিধান, আর এক পাগলী মেয়ে বকুল,—মন ওদের বুঝিবার যো নাই। শ্যামা যে এত করে মেয়েটার জন্য, দু' মিনিট ওর অদ্ভুত অনর্গল বাণী শুনিবার জন্য লুব্ধ হইয়া থাকে, কই শ্যামার সঙ্গে কথা তো বকুল বলে না? কাছে টানিয়া আদর করিতে গেলে মেয়ে ছটফট করে, জননীর দু'টি স্নেহ-ব্যাকুল বাহু যেন ওকে দড়ি দিয়া বাঁধে। জগতে কে কবে এমন মেয়ে দেখিয়াছে?

শ্যামা একটা হাই তোলে। জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ শঙ্কর, আমাদের বাড়ির দিকে কখনো যাও-টাও বাবা? হারাণ ডাক্তার ভাড়াটে এনে দিলেন, তার নামটাও জানিনে।

শঙ্কর বলে, ভাড়াটে কই, কেউ আসেনি তো? সদর দরজায় তালা বন্ধ।

শ্যামা হাসিল, তুমি জান না শঙ্কর—এক মাসের ওপোর ভাড়াটে এসেছে, পঁচিশ টাকা ভাড়া দিয়েছে,—ওদিকে তুমি যাওনি কখনো।

শঙ্কর বলে, না মাসীমা, আপনাদের বাড়ি খালি পড়ে আছে, কেউ নেই বাড়িতে। জানালা কপাট বন্ধ, সামনে বাড়িভাড়ার নোটিশ ঝুলছে,—আমি কদ্দিন দেখেছি।

শ্যামা অবাক হইয়া বলে, তবে কি ভাড়াটে উঠে গেল?

আপনি যাদের ভাড়া দিয়াছিলেন তারা যাবার পর কেউ আসেনি মাসীমা। আমি যাই যে মাঝে মাঝে নকুড় বাবুর

বাড়ি, আমি জানিনে ?—শঙ্কর হাসে, ভাড়াটে এলে কি বাইরে তালা দিয়ে লুকিয়ে থাকত ?

হারাণ তবে ছুতা করিয়া তাহাকে অর্থ-সাহায্য করিতেছে ? হারাণের কাছে কোনদিন টাকা সে চাহে নাই, কেবল ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়া উপলক্ষে হারাণকে সেই যে সে চিঠি লিখিয়াছিল, সেই চিঠিতে দুঃখের কাঁদুনি গাহিয়াছিল অনেক। তাই পড়িয়া হারাণ তাহাকে পঁচিশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে, যতদিন বাড়িতে তাহার ভাড়াটে না আসে, মাসে মাসে নিজেই তাহাকে এই টাকাটা দেওয়া ঠিক করিয়াছে হারাণ? সংসারে আত্মীয় পর সত্যই চেনা যায় না। শ্যামা কে হারাণের? শ্যামার মত দুঃখিনীর সংস্রবে হারাণকে সবদা আসিতে হয়, শ্যামার জন্য এত তার মমতা হইল কেন ?

তিন দিন পরে শঙ্কর কলিকাতা চলিয়া গেল। এই তিন দিন সে ভাল করিয়া হাটিতে পারে নাই, ঘরের মধ্যে সে বন্দী হইয়া থাকিয়াছে। মজা হইয়াছে বকুলের। বাড়ির ছেলেরা বাহিরে চলিয়া গেলে একা সে শঙ্করকে দখল করিতে পারিয়াছে। শঙ্কর চলিয়া গেলে কদিন বকুল মনমরা হইয়া রহিল।

তিন চার দিন পরে হারাণের মণিঅর্ডার আসিল। সই করিয়া টাকা নেওয়ার সময় শ্যামার মনে হইল গভীর ও গোপন একটি মমতা দূর হইতে তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে, স্বার্থ ও বিদ্বেষ ভরা এই জগতে যার তুলনা নাই। দুঃখের দিনে কোথায় রহিল সেই বিষ্ণুপ্রিয়া, স্বামীর পাপের ছাপ মারা সন্তান গর্ভে লইয়া একদিন যে ভিখারিণীর মত জননী শ্যামার সখ্য চাহিয়াছিল ? যার এক মাসের পেট্রোল খরচ পাইলে সন্তানসহ শ্যামা দুমাস বাঁচিয়া থাকিতে পারিত ?

টাকার প্রাপ্তিসংবাদ দিয়া হারাণকে সে একখানা পত্র লিখিল। হারাণের ছল যে সে ধরিতে পারিয়াছে সে সব কিছু লিখিল না, লিখিল আর জন্মে সে বোধ হয় হারাণের মেয়ে ছিল, হারাণ তার জন্য যা করিয়াছে এবং করিতেছে জীবনে কখনো কি শ্যামা তাহা ভুলিবে? এমনি আবেগপূর্ণ অনেক কথাই শ্যামা লিখিল।

হারাণ জবাবও দিল না।

না দিক্। শ্যামা তো তাহাকে চিনিয়াছে। শ্যামার দুঃখ নাই।

শীতলের সঙ্গে শ্যামার যোগসূত্র শীতলের কয়েদ হওয়ার গোড়াতেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, জেলে গিয়া কখনো সে শীতলের সঙ্গে দেখা করে নাই, চিঠিপত্রও লেখে নাই। কোথায় কোন্ জেলে শীতল আছে তাও শ্যামা জানে না। আগে জানিবার ইচ্ছাও হইত না। এখন শীতলের ছাড়া পাওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে। সে কোথায় আছে, কবে খালাস পাইবে মাঝে মাঝে শ্যামার জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু জানিবার চেষ্টা সে করে না। শীতলকে কাছে পাইবার বিশেষ আগ্রহ শ্যামার নাই। সব সময় সে যে স্বামীর উপর রাগ ও বিদ্বেষ অনুভব করে তাহা নয়, বরং কোথায় লোহার শিকের অন্তরালে পাথর ভাঙ্গিয়া সে মরিতেছে ভাবিয়া সময় সময় মমতাই সে বোধ করে, তবু মনে তাহার কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছে। শীতল ফিরিয়া আসিলে আবার সে দারুণ কোন বিপদে পড়িবে। তা ছাড়া ব্যস্ত হইয়া লাভ কি ? ছাড়া পাইলে স্ত্রী পুত্রকে শীতল খুঁজিয়া লইবে নাকি ?

বেশ শান্তিতে আছে সে। নাইবা রহিল তাহার নিজের বাড়িতে থাকিবার আনন্দ, আর্থিক স্বচ্ছলতার সুখ? এখানে ছেলেমেয়েদের শরীর ভাল আছে, বিধানের অদ্ভুত পড়াশোনার ফল ফলিতেছে, স্কুলের হেডমাষ্টার নিজে রাখালকে বলিয়াছেন বিধানের মত ছেলে ক্লাসে দু'টি নাই। শ্যামা আবার আশা করিতে পারে, ধূসর ভবিষ্যতে আবার রঙের ছাপ লাগিতে থাকে। নাইবা রহিল তাহার নিকট আশা ভরসা, একদিন ছেলে তাহাকে সুখী করিবে।

কেবল, পড়িয়া পড়িয়া বিধান রোগা হইয়া যাইতেছে, এত ও রাত জাগিয়া পড়ে! যেমন পরিশ্রম করে তেমন খাওয়া ছেলেটা পায় না। পরের বাড়িতে কেই বা হিসাব করে যে একটা ছেলে দিবারাত্রি খাটিতেছে একটু ওর ভালমত খাওয়া পাওয়া দরকার, দুধ ঘির প্রয়োজন ওর সবচেয়ে বেশি? শ্যামা কি করিবে? চাহিবা চিন্তিয়া চুরি করিয়া যতটা পারে ভাল জিনিস বিধানকে খাওয়ায়, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করিতে সাহস পায় না। এ আশ্রয় ঘুচিয়া গেলে তার তো উপায় থাকিবে না।

মন্দা যখন চেঁচামেচি করিতে থাকে : একি কাণ্ড বাবা এ বাড়ির, ভূতের বাড়ি নাকি এটা, সন্দেশ করে পাথরের বাটি ভরে রাখলাম বাটি অর্ধেক হ'ল কি করে? এ কাজ মানুষের, বড় মানুষের, বিড়েলেও নেয় নি, ছেলেপিলেও খায়নি—নিয়ে দিব্যি আবার থাপরে থুপরে সমান করে রাখার বুদ্ধি ছেলেপিলের হবে না :—শ্যামার বুকের মধ্যে তখন ঢিপ ঢিপ করে। অর্ধেক? অর্ধেক তো সে নেয় নাই! যৎসামান্য নিয়াছে। মন্দা টের পাইল কেমন করিয়া ?

সুপ্রভা বলে, অমন করে বোলো না দিদি, লক্ষ্মী,—যে নিয়েছে, খাবার জিনিস নিয়েছে তো, বড় লজ্জা পাবে দিদি।

মন্দা বলে, তুই অবাক করলি বোন, চোর লজ্জা পাবে বলে বলতে পারব না চুরির কথা?

সুপ্রভা মিনতি করিয়া বলে, বলে আর লাভ কি দিদি? এবার থেকে সাবধানে রেখো।

তবু শ্যামা পরিশ্রমী সন্তানের জন্য খাদ্য চুরি করে। দুধ জাল দিতে গিয়া সুযোগ পাইলেই দুধে সরে খানিকটা লুকাইয়া ফ্যালে, দুধ গরম করিলে সর তো যায় গলিয়া

টের পাইবে কে? রাঁধিতে রাঁধিতে দু'খানা মাছভাজা শ্যামা শালপাতায় জড়াইয়া কাপড়ের আড়ালে গোপন করে, ঘরে গিয়া কখন সে তাহা লুকাইয়া আসে কে জানিবে? এমনি সব ছোট ছোট চুরি শ্যামা করে, গোপনে চুরি করা খাবার বিধানকে খাওয়ায়। একবার খানিকটা গাওয়া ঘি যোগাড় করিয়া সে বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিল। রাখালের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর সকলকে একসঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়, আগে অথবা পরে। একা খাইলেও রান্নাঘরে খাইতে হয় ভাত, দাওয়ায় খাইতে হয় জলখাবার, সকলের চোখের সামনে। কেমন করিয়া ঘিটুকু ছেলেকে খাওয়াইবে শ্যামা ভাবিয়া পায় নাই। বলিয়াছিল, এমনি একটু একটু খেয়ে ফ্যাল না খোকা পেটে গেলেই পুষ্টি হবে!

তাই কি মানুষ পারে, কাঁচা ঘি শুধু খাইতে?

শেষে মুড়ির সঙ্গে মাখিয়া দিয়া একটু একটু করিয়া শ্যামা ঘিটুকুর সদ্‌গতি করিয়াছিল।

খোকার তখন বাৎসরিক পরীক্ষা চলিতেছে, একদিন সকালে শ্যামাকে ডাকিয়া রাখাল বলিল, জান বৌঠান, শীতলবাবু তো খালাস পেয়েছেন আট দশ দিন হল। নকুড়-বাবু পত্র লিখেছেন। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে এসেই নাকি আছে, দিনরাত ঘরে বসে থাকে কোথাও যায়-টায় না—

পত্রখানা দেখি ঠাকুর-জামাই?

নকুড়বাবু লিখিয়াছেন শীতলের চেহারা কেমন পাগলের মত হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় সে কোন অসুখে ভুগিতেছে, এতদিন হইয়া গেল কেহ তাহার খোঁজ খবর লইতে আসিল না দেখিয়া জ্ঞাতার্থে এই পত্র লিখিলেন।

রাখাল বলিল, তোমাদের বাড়িতে না ভাড়াটে আছে বৌঠান? শীতলবাবু ওখানে আছেন কি করে?

কি জানি ঠাকুরজামাই কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একবার যান না কলকাতা?

কথাটা এখানে প্রকাশ করিতে শ্যামা রাখালকে বারণ করিয়া দিল। বিধান পরীক্ষা দিতেছে, এখন এ সংবাদ পাইলে হয় ত সে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, ভাল লিখিতে পারিবে না।—বছরকার পরীক্ষা সহজ তো নয় ঠাকুরজামাই, এখন কি ওকে ব্যস্ত করা উচিত?

পাগলের মত চেহারা হইয়া গিয়াছে? অসুখে ভুগিতেছে? বিধানের পরীক্ষা না থাকিলে শ্যামা নিজে দেখিতে যাইত। কিন্তু এখানে শীতল আসিল না কেন? লজ্জায়? কি অদৃষ্ট মানুষটার! দু'বছর জেল খাটিয়া বাহির হইয়া আসিল, ছেলে-মেয়ের মুখ দেখিবে, স্ত্রীর সেবা পাইবে, তার বদলে খালি বাড়িতে মুখ লুকাইয়া একা অসুখে ভুগিতেছে! এত লজ্জাই বা কিসের? আত্মীয়স্বজনকে মুখ কি দেখাইতে হইবে না?

শনিবারের আগে রাখালের কলিকাতা যাওয়ার উপায় ছিল না। দু'দিন ধরিয়া শ্যামা তাহার দুর্ভাগ্য স্বামীর কথা ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে আসিল মমতা।

শ্যামা কি জানিত নকুড়বাবুর চিঠির কথাগুলি যে ছবি তাহার মনে আঁকিয়া দিয়াছিল পরীক্ষায় ব্যস্ত সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার সময়ও তাহা সে ভুলিতে পারিবে না, এত সে গভীর বিষাদ বোধ করিবে? শনিবার রাখালের সঙ্গে সে কলকাতা রওনা হইল। সঙ্গে লইল শুধু ফণীকে। বিধানকে বলিয়া গেল সে বাড়িটা দেখিয়া আসিতে যাইতেছে, কলি ফেরানোর ব্যবস্থা করিয়া আসিবে, যদি কোন মেরামতের দরকার থাকে তাও করিয়া আসিবে।

—আমার কথা ভেবো না বাবা, ভাল করে পরীক্ষা দিও, কেমন? ছোট পিসীর কাছে খাবার চেয়ে খেও? আর বকুলকে যেন মেরো না খোকা।

বাড়ি পৌঁছিতে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। সদর দরজা বন্ধ, ভিতরে আলো জ্বলিতেছে কিনা বোঝা যায় না, শীতের রাত্রে সমস্ত পাড়াটাই স্তব্ধ হইয়া আছে, তার মধ্যে শ্যামার বাড়িটা যেন আরও নিঝুম। অনেকক্ষণ দরজা ঠেলাঠেলির পর শীতল আসিয়া দরজা খুলিল। রাস্তার আলোতে তাকে দেখিয়া শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল চারিদিকে অন্ধকার, একটা আলোও কি শীতল জ্বালায় না সন্ধ্যার পর? ফণী ভয়ে তাহাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া শ্যামা শিহরিয়া উঠিল। এমনি সন্ধ্যাবেলা একদিন সে এখানে প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেদিনও এমনি ছাড়াবাড়ির আবহাওয়া তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়া দিতেছিল, সেদিনও তাহার কান্না আসিতেছিল এমনি ভাবে। শুধু, সেদিন বারান্দায় জ্বালানো ছিল টিম টিমে একটা লণ্ঠন।

শীতল বিড় বিড় করিয়া বলিল, মোমবাতি ছিল, সব খরচ হয়ে গেছে।

রাখাল গিয়া মোড়ের দোকান হইতে কতগুলি মোমবাতি কিনিয়া আনিল। এই অবসরে শ্যামা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরে গিয়া বসিয়াছে, বাহিরে বড় ঠাণ্ডা। শীতলকে দুটো একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, প্রায় অবান্তর কথা, জ্ঞাতব্য প্রশ্ন করিতে কি জানি শ্যামার কেন ভয় করিতেছিল। ভিতরে ঢুকিবার আগে রাস্তার আলোতে শীতলের পাগলের মত মূর্তি দেখিয়া শ্যামা তো কাঁদিয়াছিল. অন্ধকার ঘরে সে বেদনা কি ভয়ে পরিণত হইয়াছে?

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া একটা মোমবাতি জ্বালিয়া জানালায় বসাইয়া দিল। ঘরে কিছু নাই, তক্তপোষের উপর শুধু একটা মাদুর পাতা, আর ময়লা একটা বালিশ। মেঝেতে একরাশি পোড়া বিড়ি আর কতগুলি শালপাতা ছড়ানো। যে জামা কাপড়ে দু'বছর আগে শীতল রাত দুপুরে পুলিশের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল তাই সে পরিয়া আছে, কাপড় বোধ হয় তাহার ওই একখানা, কি যে ময়লা হইয়াছে

বলিবার নয়, রাত্রে বোধ হয় সে শুধু আলোয়ানটা মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, চৌকীর বাহিরে অর্ধেকটা এখন মাটিতে লুটাই-তেছে। এসব তবু যেন চাহিয়া দেখা যায়, তাকানো যায় না শীতলের মুখের দিকে। চোখ উঠিয়া, মুখ ফুলিয়া বীভৎস দেখাইতেছে তাহাকে, হাড় কখানা ছাড়া শরীরে বোধ হয় কিছু নাই।

শীতল দাঁড়াইয়া থাকে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কাঁপে। তারপর সহসা শ্যামার কি হয় কে জানে, ফণীকে জোর করিয়া নামাইয়া দিয়া জননীর মত ব্যাকুল আবেগে শীতলকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া আনে, শিশুর মত আলগোছে শোয়াইয়া দেয় মাদুরে, বলে, এমন করে ভুগচ, আমাকে একটা খপরও তুমি দিলে না গো!

পরদিন সকালে সে হারান ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইল। হারানকে খবর দিলে পঁচিশ টাকা বাড়িভাড়া পাঠানোর ছলনাটুকু যে ঘুচিয়া যাইবে শ্যামা কি তা ভাবিয়া দেখিল না। ভাবিল বৈকি। রাত্রে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়া সে দেখিয়াছে, হারানের মহৎ ছলনাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য হারানকে তার ছলনা করা উচিত নয়। সে যে এখানে আসিয়া জানিতে পারিয়াছে বাড়িতে তাহার ভাড়াটে আসে নাই, হারান দয়া করিয়া মাসে মাসে তাকে টাকা পাঠায়—এটা হারানকে জানিতে দেওয়াই ভাল। পরে যদি হারান জানিতে পারে শ্যামা কলিকাতা আসিয়াছিল? তখন কি হইবে? হারান কি তখন মনে করিবে না যে সব জানিয়াও টাকার লোভে শ্যামা চুপ করিয়া আছে?

হারান আসিলে শ্যামা তাহাকে প্রণাম করিল। বলিল, ভাল আছেন বাবা আপনি? কাল সন্ধেবেলা এসে পৌঁছেচি আমি, আগে তো জানতে পারি নি কবে খালাস পেয়ে এখানে এসে পড়ে রয়েছে,—বিপদের ওপর কি যে আমার বিপদ আসছে বাবা, কোন দিকে কূল-কিনারা দেখতে পাইনে। সমস্ত মুখ ফুলে গিয়েছে, শরীরে দারুণ জ্বর, ডাকলে ডুকলে সাড়াও ভাল করে দেয় না বাবা। শ্যামা চোখ মুছিতে লাগিল।

হারান যেন অপরিবর্তনীয়, মাথার চুলে পাক ধরিবে দেহে বার্ধক্য আসিবে তবু সে কণামাত্র বদলাইবে না, বিধানের প্রথম অসুখের সময় দেখিতে আসিয়া যেমন নির্মমভাবে শ্যামাকে সে কাঁদিতে বারণ করিয়াছিল, আজও তেমনি ভাবে বারণ করিল। শ্যামার জীবনে রহস্যময়, দুর্বোধ্য মানুষের পদার্পণ আরও ঘটিয়াছে বৈকি, গোড়ায় ছিল রাখাল, তারপর আসিয়াছিল মামা তারাশঙ্কর, কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না, একে একে তাদের রহস্যের আবরণ খসিয়া গিয়াছে, হারান শুধু চিরকাল যবনিকার আড়ালে রহিয়া গেল। শ্যামাকে যদি সে স্নেহ করে, স্নেহের পাত্রীকে দেখিয়া একবিন্দু খুসি কি তাহার হইতে নাই? আজ হারান ডাক্তার শুধু রোগী দেখিতে আসার মত শ্যামার বাড়ি আসিবে, আত্মীয় বলিয়া ধরা দিবে না?

শীতলকে হারান অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিল।

বাহিরে আসিয়া রাখাল ও শ্যামাকে বলিল, কদ্দিন জ্বরে ভুগছে জানিনে বাবু আমি, জিজ্ঞাসা করলে বলতে চায় না। অনেকদিন থেকে না খেয়ে শুকোচ্ছে সেটা বুঝতে পারি। তারপর লাগিয়েছে ঠাণ্ডা। সব জড়িয়ে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে সারতে সময় নেবে,—বড় ডাক্তার ডাকতে চাও ডাকো আমি বারণ করিনে, কিন্তু ডাক্তার ফাক্তার ডাকা মিছে তাও বলে রাখছি,—ওর সব চেয়ে দরকার বেশি সেবাযত্নের।

বড় ডাক্তার? হারানের চেয়ে বড় ডাক্তার কে আছে শ্যামা তো জানে না! শুনিয়া হারান খুসি হয়। বলে, দাও দিকি কাগজ কলম, ওষুদ লিখি। আর মন দিয়ে শোনো যা যা বলে যাই, এতটুকু এদিক ওদিক হলে চলবে না,—টুকেই নাও না কথাগুলো আমার? মনে যা থাকবে আমার জানা আছে।

একে একে হারান বলিয়া যায়,—ওষুদ, পথ্য, সেবার নিদেশ। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সময় বাঁধিয়া দেয়। বারবার সাবধান করে, এতটুকু এদিক ওদিক নয়, আটটায় যে ওষুদ দেওয়ার কথা দিতে যেন আটটা বাজিয়া পাঁচ মিনিটও না হয়, যখন দু'চামচ ফুড দেওয়ার কথা তিন চামচ যেন তখন না পড়ে।

শ্যামা ভয়ে ভয়ে বলে, কোন ব্যবস্থাই তো নেই এখানে, খালি বাড়িতে এসে উঠেছি আমরা, বনগাঁ কি নিয়ে যাওয়া যাবে না?

হারান যেন আনমনেই বলে, বনগাঁ? তা চল, বনগাঁতেই নিয়ে যাই,—একটা দিন আমার নষ্ট হবে, হলে আর উপায় কি? জ্বর করে, না খেয়ে, ঠাণ্ডা লাগিয়ে কি কাণ্ডই বাধিয়ে রেখেছে হতভাগা! ক'টায় গাড়ি? দেড়টায়? তবে সময় আছে ঢের, যাও দিকি তুমি রাখাল ওষুদপত্রগুলি নিয়ে এসো কিনে, আমি রোগী দেখে আসছি ঘুরে এগারোটার মধ্যে।—দু'টো পান আমায় দিতে পার ছেঁচে? দোক্তা থাকে তো দিও খানিকটা।

হারান বুড়া হইয়া গিয়াছে, পান চিবাইতে পারে না, ছেঁচা পান খায়। কিন্তু হারান বদলায় নাই। বুড়া হইতে হইতে সে মরিয়া যাইবে, তবু বোধ হয় বদলাইবে না। শ্যামা কি জানে না আত্মীয়তা করিয়া শীতলকে সে বনগাঁ পৌঁছাইয়া দিতে যাইতেছে না, যাইতেছে ডাক্তার হইয়া রোগীর সঙ্গে? শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই। তা সে কোন দিনই রাখে না। সেই প্রথমবার বিধানের অসুখের সময় জ্বরতপ্ত শিশুটিকে সে যে গামলার ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়াছিল সেদিনও সে শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই। যা করা উচিত হারান তাই করে। হারানের স্নেহ নাই, আত্মীয়তা নাই, কোমলতা নাই, কতবার ভুল করিয়া শ্যামা ভাবিয়াছে হারান

তাহাকে মেয়ের মত ভালবাসে। তাই যদি সে বাসিবে তবে বাড়িভাড়ার নাম করিয়া টাকা শ্যামাকে সে পাঠাইবে কেন? সোজাসুজি পাঠাইতে কে তাকে বারণ করিয়াছিল? পরের দান গ্রহণ করিতে অন্য সকলের কাছে শ্যামা লজ্জা পাইবে, এই জন্য? হারানের মধ্যে ওসব দুর্বলতা নাই। কে কোথায় কি কারণে লজ্জা পাইবে হারান কি কখনো তা ভাবে? স্নেহ মনে করিয়া শ্যামা পাছে কাছে ঘেঁষিতে চায়, শ্যামা পাছে মনে করে অযাচিত দানের পিছনে হারানের মমতার উৎস লুকাইয়া আছে, আত্মীয়তা দাবী করার সুযোগ পাছে শ্যামাকে দেওয়া হয়, তাই না হারান তাহার দানকে শ্যামার প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল!

অভিমানে শ্যামার কান্না আসে। অভিমানে কান্না আসিবার বয়স তাহার নয়, তবু মনের মধ্যে আজো যে অবুঝ কাঁচা মেয়েটা লুকাইয়া আছে যে বাপের স্নেহ জানে নাই, অসময়ে মাকে হারাইয়াছে, ষোল বছর বয়স হইতে জগতে একমাত্র আপনার জন মামাকে খুঁজিয়া পায় নাই, স্বামীর ভয়ে দিশেহারা হইয়া থাকিয়াছে, সে যদি আজ কাঁদিতে চায় প্রৌঢ়া শ্যামা তাহাকে বারণ করিতে পারিবে কেন?

তাহারা বনগাঁ পৌঁছিলে মন্দা শীতলকে দেখিয়া একটু কাঁদিল, তারপর তাড়াতাড়ি তার জন্য বিছানা পাতিয়া দিল, এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল সে, সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিল, ছেলেমেয়েদের সরাইয়া দিল, শ্যামাকে বলিতে লাগিল, ভেবো না তুমি বৌ, ভেবো না,—ফিরে যখন পেয়েছি দাদাকে ভাল করে আমি তুলবই।

বকুল বিস্ফারিত চোখে শীতলকে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিল, তারপর সে যে কোথায় গেল কেহ আর তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। হারান ডাক্তারকেও নয়। কোথায় গেল দুজনে? শেষে সুপ্রভাই তাদের আবিষ্কার করিল বাড়ির পিছনে ঢেঁকিঘরে। ওঘরে বকুল খেলাঘর পাতিয়াছে? ঢেঁকিটার উপরে পাশাপাশি বসিয়া গম্ভীর মুখে কি যে তাহারা আলোচনা করিতেছিল তারাই জানে, সুপ্রভা দেখিয়া হাসিয়া বাঁচে না। ডাক্তার নাকি বুড়া? জগতে এত জায়গা থাকিতে, কথা বলিবার এত লোক থাকিতে, বুড়া ঢেঁকিঘরে বসিয়া আলাপ করিতেছে বকুলের সঙ্গে।

যা তো খোকা ডেকে আন ওদের। বুড়োকে বল মুখ হাত ধুয়ে নিতে,—খেতে টেতে দি। তোর বাবা কি খাবে তাও তো বলে দিলে না, ঢেঁকিঘরে গিয়ে বসে রয়েছে?

হারান আসে, মুখ হাত ধোয়, সুপ্রভা ঘোমটা টানিয়া তাহাকে জলখাবার দেয়। বকুল কিন্তু ঢেঁকিঘরেই বসিয়া থাকে। সুপ্রভা গিয়া বলে, ও বকু, খাবিনে তুই? তোর বাবা এল তুই এখেনে বসে আছিস?

—ও আমার বাবা নয়।

শোন কথা মেয়ের!—সুপ্রভা হাসে, আয়, চলে আয় আমার সঙ্গে, একলাটি এখানে তোকে বসে থাকতে হবে না।

রাত্রিটা এখানে থাকিয়া পরদিন সকালে হারান কলিকাতা চলিয়া গেল। শ্যামা সাবধান হইয়া গিয়াছিল, হারানকে অতিরিক্ত আত্মীয়তা জানাইবার কোন চেষ্টাই সে করিল না। যাওয়ার সময় শুধু ঘটা করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মেয়েকে ভুলবেন না বাবা।

খুব ধীরে ধীরে শীতল আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। সে নিঝুম নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছে। আপনা হইতে কথা সে একেবারেই বলে না, অপরে বলিলে কখনো দু'এক কথায় জবাব দেয়, কখনো কিছু বলে না। কেহ কথা বলিলে বুঝিতে যেন তাহার দেরি হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধও যেন তাহার নাই, খাইতে দিলে খায়, না দিলে কখনো চায় না। চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে যে ভাবে তা তো নয়। এখানে আসিয়া ক'দিনের মধ্যে চোখ ওঠা তাহার সারিয়া গিয়াছে, সব সময় সে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। দু'বছর জেল খাটিলে মানুষ কি এমনি হইয়া যায়? কবে ছাড়া পাইয়াছিল শীতল? কলিকাতার বাড়িতে আসিয়াই সে তো ছিল দশ বারোদিন, তার আগে? প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কিছু জানা যায় না। পরে অল্পে অল্পে জানা গিয়াছে, পনের কুড়ি দিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়া শীতল কলিকাতার বাড়িটাতে আশ্রয় লইয়াছিল। জানিয়া শ্যামার বড় অনুতাপ হইয়াছে। এই দারুণ শীতে একখানা আলোয়ান মাত্র সম্বল করিয়া স্বামী তাহার এক মাসের উপর কপর্দকহীন অবস্থায় যেখানে সেখানে কাটাইয়াছে! জেলে থাকিবার সময় শীতলের সঙ্গে সে যোগসূত্র রাখে নাই কেন? তবে তো সময় মত খবর পাইয়া ওকে সে জেলের দেউড়ি হইতে সোজা বাড়ি লইয়া আসিতে পারিত?

প্রাণ দিয়া শ্যামা শীতলের সেবা করে। শ্রান্তি নাই, শৈথিল্য নাই, অবহেলা নাই। চারটি সন্তান শ্যামার? আর একটি বাড়িয়াছে। শীতল তো এখন শিশু।

পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গিয়াছে বিধান ক্লাশে উঠিয়াছে প্রথম হইয়া।

আট

বনগাঁএ শ্যামার একে একে আরও চার বছর কাটিয়া গেল।

কলিকাতার বাড়িটা তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিতে হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া বিধান যখন কলিকাতায় পড়িতে গেল যখন,—শীতলের প্রত্যাবর্তনের এক বছর পরে।

শীতলের অসুখের জন্য অনেক টাকা খরচ করিতে না হইলে রাখাল হয়ত শেষ পর্যন্ত বিধানের পড়ার খরচ দিতে

রাজি হইত। বড় খারাপ অসুখ হইয়াছিল শীতলের। বেশী জ্বর, অনাহার, দারুণ শীতে উপযুক্ত আবরণের অভাব, মানসিক পীড়া, এই সব মিলিয়া শীতলের স্নায়ুরোগ জন্মাইয়া দিয়াছিল, দেহের সমস্ত স্নায়ু তাহার উঠিয়াছিল ফুলিয়া। চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনমাস সে পড়িয়া ছিল হাসপাতালে। তারপর শ্যামার কাঁদা-কাটায় রাখাল আরও তিনমাস তাহার বৈদ্যুতিক চিকিৎসা চালাইয়াছিল। তার ফলে যতদূর সুস্থ হওয়া সম্ভব শীতল তা হইয়াছে। কিন্তু জীবনে সে যে কাজকর্ম কিছু করিতে পারিবে সে ভরসা আর নাই। যতখানি তাহার অক্ষমতা নয়, ভান করে সে তার চেয়ে বেশি। শুইয়া বসিয়া অলস অকর্মণ্য দায়িত্বহীন জীবন যাপনের সুখটা টের পাইয়া হয়ত সে মুগ্ধ হইয়াছে। হয়ত সে সত্যই বিশ্বাস করে দারুণ সে অসুস্থ, কর্ম-জীবনের তাহার অবসান হইয়াছে। হয়ত সে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, অসুখের অজুহাতে সকলের দয়া ও সহানুভূতি, মমতা ও সেবা লাভ করার চেয়ে বড় আর তার কাছে কিছুই নাই। তবে সবটা শীতলের ফাঁকি নয়, শরীরে তাহার গোলমাল আছে, মাথাটা ভোঁতা হইয়া যাওয়াও কাল্পনিক নয়, অসুখের যে বাড়াবাড়ি ভানটুকু সে করে তার ভিত্তিও তো মানসিক রোগ।

তবু ছেলের পড়া চালানোর জন্য বাড়িটা শ্যামার হয়ত বিক্রয় করিতে হইত না, যদি বাঁচিয়া থাকিত হারান ডাক্তার। বিধানকে হারানের বাড়ি পাঠাইয়া সে লিখিত, বাবা, জীবনপাত করে ওর স্কুলের পড়া সাঙ্গ করেছি, আর তো আমার সাধ্য নেই, এবার দিন বাবা ওর আপনি কলেজে পড়ার একটা ব্যবস্থা করে। হারান তা দিত। শ্যামার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হারানের অনেক বয়স হইয়াছিল, বিধানের স্কুলের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সে বাঁচিয়া থাকিতে পারিল কৈ?

হারান মরিয়াছে। মরিবে না? কপাল যে শ্যামার মন্দ! হারান বাঁচিয়া থাকিলে শ্যামার ভাবনা কি ছিল? বাড়িতে শ্যামার ভাড়াটে আসিয়াছিল, তারা কুড়ি টাকা পাঠাইত শ্যামাকে, আর হারান পাঠাইত পঁচিশ। হারানের মনি অর্ডারের কুপনে কোন অজুহাতের কথা লেখা থাকিত না, শুধু অপাঠ্য হাতের লেখায় স্বাক্ষর থাকিত হারানচন্দ্র দে। শ্যামা তো তখন ছিল বড়লোক। কয়েক মাসে শ' দেড়েক টাকাও সে জমাইয়া ফেলিয়াছিল। কেন মরিল হারান? কত মানুষ সত্তর আশি বছর বাঁচিয়া থাকে, প'য়ষট্টি পার হইতে না হইতে হারানের মরিবার কি হইয়াছিল?

শ্যামা কি করিবে? ভগবান যার প্রতি এমন বিরূপ, বাড়ি বিক্রি করিয়া না দিয়া তার উপায় কি!

শহরতলীর বাড়ি, তাও বড় রাস্তার উপরে নয়, দক্ষিণ খোলা নয়। একতলা পুরানো। বাড়ি বেচিয়া শ্যামা হাজার পাঁচেক টাকা পাইয়াছিল।

টাকা থাকিলে খরচ কেন বাড়িয়া যায় কে জানে। আগে ছোট-বড় অনেক খরচ মন্দার উপর দিয়া চালানো যাইত, কিন্তু পুঁজি যার পাঁচ হাজার টাকা সে কেন তা পারিবে? মন্দাই বা দিবে কেন? দুধের কথাটা ধরা যাক। দুধ অবশ্য কেনা হয় না, বাড়িতে পাঁচ ছ'টা গরু আছে। কিন্তু গরুর পিছনে খরচ তো আছে? শ্যামার ছেলেমেয়েরা দুধ তো খায়? শ্যামা পাঁচ হাজার টাকা পাওয়ার মাসখানেক পরে মন্দা বলে, পয়সা কড়ি হাতে নেই বৌ, এ-মাসের খোলা কুঁড়োর দামটা দিয়ে দাও না,—সামনের মাসে আনাব'খন আমি।

কুঁড়ো কেনা হইবে কেন? সেদিন যে দু'মণ চাল করা হইল তার কুড়ো গেল কোথায়? এবার মন্দা ধান ভানার মজুরি নগদ দেয় নাই: ধান যে ভানিয়াছে কুঁড়ো পাইয়াছে সে। মন্দা তাহা হইলে শ্যামার টাকাগুলি খরচ করাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে? ঘরের ধানের কুঁড়ো পরকে দিয়া শ্যামাকে দিয়া কুঁড়ো কিনাইবে!

মাসের শেষে মুদি তাহার সাঁইত্রিশ টাকা পাওনা লইতে আসিয়াছে, মন্দা তিনখানা দশ টাকার নোট গুনিয়া দেয়, একটু ইতস্তত করিয়া নগদ টাকাও দেয় একটা, তারপর শ্যামাকে বলে, ছ'টা টাকা কম পড়ল, দাও না বৌ টাকাটা দিয়ে?

বর্ষাকালে জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে শ্যামার ঘর দিয়া, দু'খানা টিন বদলানো দরকার,—কে বদলাইবে টিন? বাড়ি মন্দার, ঘরখানা মন্দার, শ্যামা তো শুধু আশ্রিতা অতিথি,—মন্দারই তো উচিত ঘরখানা সারাইয়া দেওয়া। বলিলে মন্দা চুপ করিয়া থাকে। একটু পরেই সংসার খরচের দু'টি একটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় মন্দা এমন করিয়া বলিতে থাকে যে আর সে পারিয়া উঠিল না, এ যেন রাজার বাড়ি ঠাওরাইয়াছে সকলে, খরচ খরচ খরচ, চারদিকে শুধু খরচ, খরচ ছাড়া আর কথা নাই—যে মনে হয় সে বুঝি শ্যামার ঘর সারাইয়া দিবার অনুরোধেরই জবাব দিতেছে এতক্ষণ পরে।

বাড়ি বেচিয়া এমনি কত খরচ যে শ্যামার বাড়িয়াছে বলিবার নয়।

বিধানের কলিকাতার খরচ, মণি স্কুলে যাইতেছে তার খরচ, শীতলের জন্য খরচ, অসুখবিসুখের খরচ,—শ্যামার তো মনে হইত মন্দার নয়, খরচ খরচ খরচ, চারিদিকে শুধু খরচ, তার।

আর বকুল? বকুলের জন্য শ্যামার খরচ হয় নাই?

গত বৈশাখে তেরশ' টাকা খরচ করিয়া বকুলের শ্যামা বিবাহ দিয়াছে। কমিতে কমিতে পাঁচ হাজারের যা অবশিষ্ট ছিল, বকুল একাই প্রায় তা শেষ করিয়া দিয়াছে।

বকুলের বিবাহ হইয়াছে, আমাদের সেই বকুলের? কার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে বকুলের, শঙ্করের সঙ্গে নাকি? পাগল! শঙ্করের সঙ্গে বকুলের বিবাহ হয় না।

যে বৈশাখে আমাদের বকুলের বিবাহ হইল, তার আগের ফাল্গুনে বিবাহ হইয়াছিল সুপ্রভার মেয়েটির, বিবাহের তিন চার দিন আগে কলিকাতা হইতে বিধানের সঙ্গে শঙ্করও আসিয়াছিল। বয়সের আন্দাজে বকুল মস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শঙ্কর ভাবিতে পারে নাই বকুল এত বড় হইয়াছে, আর এত লজ্জা হইয়াছে বকুলের, আর এত সুন্দর হইয়াছে সে। মেয়ের সম্বন্ধে শ্যামা যে এত সাবধান হইয়াছে তাও কি শঙ্কর জানিত? বিবাহের পরদিন দুপুরবেলা বকুলকে আর শ্যামা দেখিতে পায় না। কোথায় গেল বকুল? বাড়িতে পুরুষ গিজগিজ করিতেছে, যেখানে যেখানে মেয়েরা একত্র হইয়াছে বকুল তো সেখানে নাই? হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা এখানে খোঁজে ওখানে খোঁজে, একে তাকে জিজ্ঞাসা করে। একজন বলিল, এই তো দেখলাম এখানে খানিক আগে, দেখ না কলাবাগানে গেছে নাকি?

বাড়ির পিছনে কলাবাগান, কলাবাগানে সেই ঢেঁকিঘর তাই বটে, ঢেঁকিঘরে ঢেঁকিটার উপর বসিয়া শঙ্কর আর বকুল কথা বলিতেছে বটে। ঘরের কোণে এখানে বকুল আর এখন পুতুল খেলা করে না, খেলাঘর তার ভাঙিয়া গেছে, শুধু আছে চিহ্ন, কতবার ঘর লেপা হইয়াছে আজো চারিদিকে উঁচু আলের চিহ্ন, পুকুরের গত মিলাইয়া যায় নাই, বেড়ায় যে শিউলিবোঁটার রঙে ছোপানো ন্যাকড়াটি গোঁজা আছে সে তো বকুলের পুতুলেরই জামা। পুতুল খেলার ঘরে কি ছেলেখেলা আজ করিতেছে বকুল? একটু বাড়াবাড়ি রকম ছাকাকাছি বসিয়া আছে ওরা, আর কিছু নয়। না, বকুলের হাতটিও শঙ্করের হাতে ধরা নাই। শ্যামা বলিয়াছিল, ও বকুল, এখানে বসে আছিস তুই? মেয়ে জামাই যাবে যে এখন, আয় চলে আয়।

বকুল তো আসিল, কিন্তু মেয়ের মুখ রাঙা কেন, চোখ কেন ছলো ছলো?—শঙ্কর আসিয়াছে চার পাঁচদিন, সকলের সামনে শঙ্করের সঙ্গে কত কথা বকুল বলিয়াছে, দু'চার মিনিট একা কথা বলিবার সময়ও কতবার শ্যামা হঠাৎ আসিয়া ওদের দেখিয়াছে, শ্যামাকে দেখিয়াও কথা শঙ্কর বন্ধ করে নাই, বকুল হাসি থামায় নাই। ঢেঁকি ঘরে আজ ওরা কোন্ নিষিদ্ধ বাণীর আদান প্রদান করিতেছিল, বকুলের মুখে যা রঙ আনিয়াছে, চোখে আনিয়াছে জল? কি বলিতেছিল শঙ্কর বকুলকে?

শ্যামা একবার ভাবিয়াছিল বকুলকে জিজ্ঞাসা করিবে। শেষে কিছু না বলাই ভাল মনে করিয়াছিল। কিছুই হয় তো নয়। হয় তো নির্জন ঢেঁকি ঘরে শঙ্করের কাছে বসিয়া থাকার জন্যই বকুল লজ্জা পাইয়াছিল, ওখানে ও ভাবে বসিয়া থাকা যে তার উচিত হয় নাই বকুল কি আর তা বোঝে না।

তারপর যে কদিন শঙ্কর এখানে ছিল, আর তিনটি দিন মাত্র, বকুলকে শ্যামা একদণ্ডের জন্য চোখের আড়াল করে নাই।

বকুল রাগ করিয়া বলিয়াছিল, সারাদিন পেছন পেছন ঘুরছ কেন বলত?

বকুলের বোধ হয় অপমান বোধ হইয়াছিল।

শ্যামা বলিয়াছিল, পেছন পেছন আবার তোর ঘুরলাম কখন?

তারপর বকুল কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, গিয়া বসিয়া ছিল শীতলের কাছে, সারাটা দিন!

দুমাস পরে বৈশাখ মাসে বকুলের বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের নাম মোহিনী, ছেলের বাপের নাম বিভূতি, নিবাস কৃষ্ণনগর। বিভূতি ছিল পোষ্টমাষ্টার, এখন অবসর লইয়াছে। মোহিনী পঞ্চাশ টাকায় ঢুকিয়াছে পোষ্টাপিসে, আশা আছে বাপের মত সেও পোষ্টমাষ্টার হইয়া অবসর লইতে পারিবে। মোহিনী কাজ করে কলিকাতায়, থাকে কাকার বাড়ি, যার নাম শ্রীপতি এবং যিনি মার্চেণ্ট আপিসের কেরাণী।

ছেলেটি ভাল, আমাদের বকুলের বর মোহিনী। শান্ত নম্র স্বভাব, পঞ্চাশ টাকার চাকরী করে বলিয়া এতটুকু গর্ব নাই, প্রায় শঙ্করের মতই লাজুক। দেখিতে মন্দ নয়, রঙ একটু ময়লা কিন্তু কি চোখ!—বকুলের চোখের মতই বড় হইবে।

জামাই দেখিয়া শ্যামা খুসী হইয়াছে, সকলেই হইয়াছে। জামাইএর বাপখুড়ার ব্যবহারেও কারো অসুখী হওয়ার কারণ ঘটে নাই, শ্বশুর বাড়ি হইতে বকুল ফিরিয়া আসিলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গিয়াছে শাশুড়ী ননদেরাও বকুলের মন্দ নয়, বকুলকে তারা পছন্দও করিয়াছে, আদর যত্ন মিষ্টি কথারও কমতি রাখে নাই, কেবল এক পিস্‌শাশুড়ী আছে বকুলের সেই যা রূঢ় কথা বলিয়াছে দু'একটা—বলিয়াছে, ধেড়ে মাগী, বলিয়াছে তালগাছ! ধোয়া পাকা মেঝেতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া বকুল যখন ডান হাতের শাঁখাটি ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল বিশেষ কিছু কেহ তখন তাহাকে বলে নাই, কেবল ওই পিস্‌শাশুড়ী অনেকক্ষণ বকাবকি করিয়াছিল, বলিয়াছিল অলক্ষ্মী, বলিয়াছিল বজ্জাত।

বলুক, পিস্‌শাশুড়ী কে? শাশুড়ী ননদই আসল, তারা ভাল হইলেই হইল।

বকুল বলিয়াছিল, না মা, পিস্‌শাশুড়ীর প্রতাপ ওখানে সবার চেয়ে বেশি, সবাই তার কথায় ওঠে বসে। ঘরদোর তার কিনা সব, নগদ টাকা আর সম্পত্তিও নাকি অনেক আছে শুনলাম, তাইতে সবাই তাকে মেনে চলে। বুড়ীর ভয়ে কেউ জোরে কথাটি কয় না মা।

তাহা হইলে ভাবনার কথা বটে। শ্যামা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিল, কদিন ছিলি তার মধ্যে শাঁখা ভেঙে বুড়ীর বিষনজরে পড়লি! বৌ-মানুষ তুই সেখানে, একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।

বকুল বলিয়াছিল, পা পিছলে গেল, আমি কি করব? আমি তো ইচ্ছে করে পড়িনি!

সুপ্রভা বলিয়াছিল, মরুক পিস্‌শাশুড়ী, জামাই ভাল হইলেই হল। সব তো আর মনের মত হয় না।

তা বটে। স্বামীই তো স্ত্রীলোকের সব, স্বামী যদি ভাল হয়, স্বামী যদি ভালবাসে, হাজার দজ্জাল পিস্‌শাশুড়ী থাক, কি আসিয়া যায় মেয়ে-মানুষের ?

মোহিনী ভালবাসে না বকুলকে ?

মোটা মোটা চিঠি তো আসে সপ্তাহে দু'খানা! ভালবাসার কথা ছাড়া কি আর লেখে মোহিনী অত সব ? আর কি লিখিবার আছে তাহার ?

সুপ্রভার মেয়েকে বকুল বরের চিঠি পড়িতে দেয়। শ্যামা, সুপ্রভা, মন্দা সকলে আগ্রহের সঙ্গে একবার তাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিয়াছিল, ভেবো না মামী ভেবো না, যা কবিত্ব করে চিঠিতে, জামাই তোমার ভেড়া বনে গেছে।

তবু, লুকাইয়া মেয়ের একখানা চিঠিতে শ্যামা চোখ বুলাইতে ছাড়ে নাই। টাঙ্গানো লেপের বস্তার কোথায় কোন ফাঁকে চিঠিখানা আপাতত গোপন করিয়া বকুল স্নান করিতে গিয়াছিল, শ্যামার কি তা নজর এড়াইয়াছে! চোরের মত চিঠিখানা পড়িয়া শ্যামা তো অবাক। এসব কি লিখিয়াছে মোহিনী ? সব কথার মানেও যে শ্যামা বুঝিতে পারিল না ?

কে জানে, হয় তো ভালবাসার চিঠি এমনি হয়। শীতল তো কোনদিন তাকে প্রেমপত্র লেখে নাই, সে কি জানে প্রেমপত্রের ?

না জানুক, জামাই যে মেয়েকে পছন্দ করিয়াছে তাই শ্যামার ঢের। একটি শুধু ভাবনা তাহার আছে। বকুল তো পছন্দ করিয়াছে মোহিনীকে ? কে জানে কি পোড়া মন তাহার, ঢেঁকিঘরে সেই যে বকুল আর শঙ্করকে সে একসঙ্গে দেখিয়াছিল, বার বার সে কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। বকুলের সে রাঙ্গা মুখ আর ছল ছল চোখ সর্বদা চোখের সামনে ভাসিয়া আসে।

পূজার সময় বকুলকে নেওয়ার কথা ছিল। পূজার ছুটির সঙ্গে আরও কয়েকদিনের ছুটি লইয়া মোহিনী ষষ্ঠীর দিন বনগাঁ আসিল। বিধানের কলেজ অনেক আগে বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে শঙ্করের সঙ্গে কাশী গিয়াছে। শঙ্করের কে এক আত্মীয় থাকেন কাশীতে, সেখানে পূজা কাটাইয়া বিধান বাড়ী আসিবে।

মোহিনী থাকিতে চায় না। অষ্টমীর দিনই বকুলকে লইয়া বাড়ি যাইবে বলে। সকলে যত বলে, তাকি হয় ? এসেছ, পুজোর কদিন থাকবে না ?—লাজুক মোহিনী ততই সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া বলে, না, তার যাওয়াই চাই।

কেন, যাওয়াই চাই কেন ? সকলে জিজ্ঞাসা করে। পনেরদিনের ছুটি তো নিয়েছ, দুদিন এখানে থেকে গেলে ছুটি তো তোমার ফুরিয়ে যাবে না ?

শেষে মোহিনী স্বীকার করে, এটা তার ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়, পিসীমার হুকুম অষ্টমীর দিন রওনা হওয়াই চাই।

সুপ্রভা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এ কি রকম হুকুম বাছা তোমার পিসীর ? বেয়াই বর্তমানে পিসীই বা হুকুম দেবার কে ? বেয়াইকে টেলিগ্রাম করে আমরা অনুমতি আনিয়ে নিচ্ছি, লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত তুমি থাকবে এখানে।

মোহিনী ভয় পাইয়া বলে টেলিগ্রাম যদি করতে হয়, পিসীকে করুন। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে না, অনুমতি পিসী দেবে না, বাবা থেকে শুধু চটবে।

কেহ আর কিছু বলে না, মনে মনে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এবিতে পারিয়া মোহিনী বড় অস্বস্তি বোধ করে। সুপ্রভার মেয়েকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ ব্যাপারে তার কোন দোষ নাই, পিসী তিনখানা চিঠিতে লিখিয়াছে অষ্টমীর দিন সে যেন অবশ্য অবশ্য রওনা হয়, কোন কারণে যেন অন্যথা না ঘটে, কথা না শুনিলে পিসী বড় রাগ করে। সুপ্রভার মেয়ে শুনিয়া বলে, বোঝো তো ভাই, আসার মত আসা এই তো তোমার প্রথম, দুদিন না থাকলে কেমন লাগে আমাদের ?

মোহিনী কয়েক ঘণ্টা ভাবে, তারপর সুপ্রভার মেয়েকে ডাকিয়া বলে, আচ্ছা দশমী পর্যন্ত থাকব।

শুনিয়া শ্যামা আসিয়া বলে, থাকলে পিসী রাগ করবে বলছিলে ?

গিয়ে বুঝিয়ে বলব'খন।—মোহিনী বলে।

শ্যামা তবু ইতস্তত: করে॥ জোর করে ধরে রেখেছি বলে পিসী তো শেষে—?

মনটা শ্যামার খুঁত খুঁত করে। কি যে জবরদস্তি সকলের! যাইতে দিলেই হইত অষ্টমীর দিন। তার মেয়ে-জামাই, পিসীর নাম শুনিয়া সে চুপ করিয়া গেল, সকলের এত মাথাব্যথা কেন ? ওরা কি যাইবে পিসীর রাগের ফল ভোগ করিতে ? ভুগিবে তার মেয়ে। সুপ্রভার মেয়ে একসময় তাহাকে একটা খবর দিয়া যায়। বলে, জান মামী, জামাই তোমার তার পাঠালে পিসীর কাছে। কি লিখেছে জান, এখানে এক গণৎকার বলেছে পুজোর কদিন ওর যাত্রা নিষেধ।

শ্যামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কি সব কাণ্ড মা, আমার ভাল লাগছে না খুকী, এমন করে কাউকে রাখতে আছে!

আমরা রেখেছি নাকি ? জামাই নিজেই তো বললে থাকবে।

তখন শ্যামা হাসিয়া সুপ্রভার মেয়ের চিবুক ধরিয়া বলে, আরেকটি জামাই তো আমার এল না মা ?

সে লক্ষ্মীপূজার পরেই আসিবে, শ্যামা তাই হাসিয়া একথা বলে, ব্যথার সঙ্গে বলিবার প্রয়োজন হয় না।

পূজা উপলক্ষে মন্দা সাধারণ ভাবে খাওয়া দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করিয়াছে, শ্যামা খরচপত্র করিয়া আরও

বেশি আয়োজন করিল, আসার মত আসা এই তো জামাইএর প্রথম। মোহিনীকে সে একপ্রস্থ ধুতিচাদর জামা জুতা কিনিয়া দিল, দিল দামী জিনিস, জামাই যে পঞ্চাশ টাকার চাকরে। শ্যামার টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কি করিবে, এসব তো না করিলে নয়।

কাজ করিতে করিতে শ্যামা বকুলের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। মোহিনী আসিয়াছে বলিয়া খুসি হয় নাই বকুল? এমন চাপা মেয়েটা তার, মুখ দেখিয়া কিছু কি বুঝিবার যো আছে! খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে অনেক রাত্রি হয়, বকুল আসিয়া শ্যামার বিছানায় শুইয়া পড়ে, শ্যামা বলে, রাত অনেক হল, আর এখানে কেন মা? ঘরে যাও।

এখানে শুই না আমি?—বকুল বলে।

শ্যামা ভয় পাইয়া সুপ্রভার মেয়েকে ডাকিয়া আনে। সে টানাটানি করে, বকুল যাইতে চায় না, শ্যামার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। শেষে ধৈর্য্য হারাইয়া শ্যামা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলে, পোড়ারমুখি, কেলেঙ্কারি করে সকলের মুখে তুই চুণকালি দিবি? যা বলছি যা, মেরে ছেঁচে ফেলব তোকে আমি!

সুপ্রভার মেয়ে বলে, আহা মামী, বকো না গো, যাচ্ছে।

তারপর বকুল উঠিয়া যায়। শ্যামা চুপ করিয়া তক্তপোষে বসিয়া ভাবে। নানা কারণে সে বড় বিষাদ বোধ করে। কে জানে কি আছে মেয়েটার মনে। পূজার সময়, চারিদিকে আনন্দ উৎসব, বিধানও কাছে নাই যে ছেলের মুখ দেখিয়া মনটা একটু শান্ত হয়। ছেলে বড় হইয়াছে তাই আর কলেজ ছুটি হইলে ছুটিয়া মার কাছে আসে না, বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে যায়।

শীতল বোধ হয় বাহিরে তাসের আড্ডায় বসিয়া আছে, শ্যামার বারণ না মানিয়া সে আজ সিদ্ধি গিলিয়াছে একরাশি। কে আছে শ্যামার? সারাদিনের খাটুনির পর শরীর শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, মনের মধ্যে একটা দুঃসহ ভার চাপিয়া আছে, কত যে একা আর অসহায় মনে হইতেছে নিজেকে, সেই শুধু তা জানে, এতটুকু সান্ত্বনা দিবারও কেহ নাই।

ভাল করিয়া আলো হওয়ার আগে উঠিয়া শ্যামা বকুলের ঘরের দরজায় চোখ পাতিয়া দাওয়ায় বসিয়া রহিল। বকুল বাহির হইলে একবার সে তাহার মুখখানা দেখিবে। খানিক বসিয়া থাকিয়া শ্যামার লজ্জা করিতে লাগিল, এদিক ওদিক সে একটু ঘুরিয়া আসিল, পুকুর ঘাটে গিয়া মুখে চোখে জল দিল। এও এক শরৎকাল, শ্যামার জীবনে এমন কত শরৎ আসিয়া গিয়াছে। পুকুরের শীতল জল, ঘাসের কোমল শিশির শ্যামার মুখে আর চরণে কত কি নিবেদন জানায়। সে কি একদিন বকুলের মত ছিল? কবে?

তারপর ভিতরে গিয়া শ্যামা দেখিল, বকুলের ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু বকুল কোথায়? শ্যামা এদিক ওদিক তাকায়, সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় ভিতরে চাহিয়া ত্যাখে মশারি তোলা, বিছানা খালি, বকুল বা মোহিনী কেউ ঘরে নাই। এত ভোরে কোথায় গেল ওরা? শ্যামা গালে হাত দিয়া সিঁড়িতে বসিয়া রহিল।

রান্নাঘরের পাশ দিয়া চোরের মত বাড়িতে ঢুকিয়া শ্যামাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দুজনেই তাহারা লজ্জা পাইল। মোহিনী ঘরে চলিয়া গেল। বকুল শ্লথ পদে মার কাছে আসিল।

কোথা গিয়েছিলি বকুল?

বকুল কথা বলে না। পাশে বসাইয়া শ্যামা একটা হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। তাই বটে, তেমনি রাঙ্গা বটে বকুলের মুখ, ঢেঁকিঘরে সেদিন শ্যামা যেমন দেখিয়াছিল। শুধু আজ ওর চোখ দুটি ছলছল নয়!

দশমীর দিন বেলা দশটার সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে বিধান আসিল। শ্যামা আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, তুই যে চলে এলি খোকা? মন টিঁকিল না বুঝি সেখানে তোর?

হঠাৎ শ্যামার মন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। সেদিন সঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া বকুলের মুখ যে রাঙ্গা হইয়াছিল তা দেখিবার পরেও শ্যামার মন কি ভার হইয়াছিল? ছিল বৈকি! শ্যামার ভাবনা কি শুধু বকুলের জন্য। এমনি শরৎকালে যাকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল, সোনার টুকরার সঙ্গে লোকে যাকে তুলনা করে, তাকে না দেখিলে শ্যামার ভাল লাগে না। মোহিনীর জন্য মাছ মাংস রাঁধিতে রাঁধিতে উন্মনা হইয়া চোখের জল সে ফেলিয়াছিল কার জন্য?

বিধান আসিয়াছে। আর শ্যামার দুঃখ নাই। পৃথিবীতে শরৎ আসিয়াছে হাসির মত, এতদিন শ্যামা হাসিতে পারে নাই। এবার শ্যামার মুখেও হাসি ফুটিয়াছে।

পরদিন বকুলকে বিদায় দিয়াও শ্যামার মুখ তাই বেশিক্ষণ ম্লান রহিল না। রান্না ঘরে গিয়া তার কাছে পিঁড়ি পাতিয়া বিধান বসিতে না বসিতে কখন যে সে ভুলিয়া গেল মেয়েব বিরহ।

নয়

শ্যামার মনে আবার নিবিড় হইয়া আর্থিক দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এবার আর কোনদিকে সে উপায় দেখিতে পায় না। আগে দুরবস্থায় পড়িয়া একটা ভরসা সে করিতে পারিত, বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিলে মোটা কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। এখন সে ভরসাও নাই। বাড়ি বিক্রীর অতগুলি টাকা

কেমন করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল? অপচয় করিয়াছে নাকি সে? হয়ত আরও হিসাব করিয়া খরচ করা উচিত ছিল। এক সঙ্গে অনেকগুলি টাকা হাতে পাইয়া নিজেকে হয় তো সে বড়লোক ঠাওরাইয়াই বসিয়াছিল।

তবে একথা সত্য যে এ ক'বছর একটি পয়সাও ঘরে আসে নাই। ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিলেও কলসীর জল একদিন শেষ হইয়া যায়। বিধানের পড়ার খরচও কি সহজ! বকুলের বিবাহেও ঢের টাকা লাগিয়াছে।

কিন্তু এখন উপায়?

শ্যামা এবার একটু মন দিয়া শীতলের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিল। খায় দায় তামাক টানিয়া তাস পাশা খেলিয়া দিন কাটায়, হাটে একটু খোঁড়াইয়া, বদহজমে ভোগে, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। তবু কিছু কি শীতল করিতে পারে না? ঘরে বসিয়া থাকিয়াই হয়ত সে একেবারে সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কাজে কর্মে মন দিলে হয়ত সুস্থ হইবে!

চুলে শীতলের পাক ধরিয়াছে। বিবর্ণ কপালের ঠিক উপরে একগোছা চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। না, বয়স শীতলের কম হয় নাই। বিবাহ সে বেশি বয়সেই করিয়াছিল, বয়স এখন ওর পঞ্চাশের কাছে গিয়াছে বৈকি। তবু, পঞ্চাশ বছর বয়সে পুরুষ মানুষ কি রোজগার করে না? হারান পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত কতটাকা উপার্জন করিয়াছে, শীতল কি কিছু ঘরে আনিতে পারে না, যৎসামান্য? পঞ্চাশটা টাকা অন্ততঃ? আর কিছু হোক বা না হোক, বিধানের পড়ার খরচ তো দিতে হইবে।

মৃদু মৃদু শীত পড়িয়াছে। কোঁচার খুট গায়ে জড়াইয়া বাহিরের অঙ্গনের জাম গাছটার গোড়ায় বেতের মোড়াতে বসিয়া শীতল তামাক টানে। বাড়ির পোষা কুকুরটা পায়ের কাছে মুখ গুঁজিয়া চুপচাপ শুইয়া থাকে, মাঝে মাঝে শীতলের পা চাটিয়া দেয়। কুকুরটার সঙ্গে শীতলের বড় ভাব। কুকুরটাও তার বড় বাধ্য। শ্যামা কাছে আসিয়া মানুষ ও পশুর চোখ-বোজা নিবিড় তৃপ্তির আলস্য চাহিয়া দ্যাখে।

কিন্তু উপায় কি? শ্যামার আর কে আছে, কে তার জন্য বাহির হইবে উপার্জন করিতে?

ধীরে ধীরে মিষ্টি করিয়াই কথাগুলি সে বলে, ভীত বিস্মিত চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া শীতল শুনিয়া যায়। কিছু সে যেন বুঝিতে পারে না, সংসার, কর্তব্য, টাকার অভাব, খোকার পড়া সব জড়াইয়া শ্যামা যেন তাকে ভয়াবহ শাসনের ভয় দেখাইতেছে।

শীতল মাথা নাড়ে, সন্দিগ্ধভাবে। সে কি করিবে? কি করিবার ক্ষমতা তার আছে? শিশুর মত আহত কণ্ঠে সে বলে, আমার যে অসুখ গো?

অসুখ তা জানি, সেরে তো উঠেছ খানিকটা, ঠাকুরজামাইকে বলে কম খাটুনির একটা কাজ টাজ তুমি করতে পারবে। আমি আর কতকাল চালাব?

বাড়ির টাকা পেলে, বাড়িটা কার?—শীতল বলে।

বটে! তাই তবে শীতল মনে করিয়াছে, তার বাড়ির টাকায় এতকাল চলিয়াছে আর তাহার কিছু করিবার প্রয়োজন নাই? এতকাল সেই সংসার চালাইয়াছে, এই কথা ভাবিয়া রাখিয়াছে শীতল? এবার তাই তাহার বসিয়া থাকার অধিকার জন্মিয়াছে!

এসব জ্ঞান তো টনটনে আছে দেখি বেশ?—শ্যামা বলে।

কুকুরটা উঠিয়া যায়। শীতলের দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করে। তারপর আবার কাতর কণ্ঠে সে বলে, আমার অসুখ যে গো?

একদিনে হাল ছাড়িবার পাত্রী শ্যামা নয়। বার বার শীতলকে সে তাহাদের অবস্থাটা বুঝাইবার চেষ্টা করে। কড়া কথা সে বলে না, লজ্জা দেয় না, অপমান করে না। আবার বাহির হইয়া ঘরে টাকা আনা শীতলের পক্ষে এখন কত কঠিন সে তা বোঝে, পারুক না পারুক গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া শীতল একবার চেষ্টা করুক, এইটুকু শুধু তার ইচ্ছা।

রাখালকে শ্যামা একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুরজামাই, আবার তো আমি নিরুপায় হলাম?

কেন? অতটাকা কি করলে বৌঠান? বলেছিলাম টাকা তুমি রাখতে পারবে না—

ঠাকুরজামাই, ছেলেকে আমার বি-এটা আপনি পাশ করিয়ে দিন।

পড়ার খরচ দেবার কথা বলছ বৌঠান?

হ্যাঁ, রাখাল এবার রাগ করিয়াছিল। সে কি রাজা না জমিদার? কতটাকা মাহিনা পায় সে শ্যামা জানে না? একি অন্যায় কথা যে শ্যামা ভুলিয়া যায় ক্ষমতার মানুষের একটা সীমা আছে, আজ কতবছর শ্যামা সকলকে লইয়া এখানে আছে, কত অসুবিধা হইয়াছে রাখালের, কত টানাটানি গিয়াছে তাহার কিন্তু কিছু সে বলে নাই, বলে নাই এই ভাবিয়া যে যতদিন তার দুমুঠা ভাত জুটিবে, শ্যামার ছেলেমেয়েকে একমুঠা তাকে দিতে হইবে, সেটা তার কর্তব্য। তাই কি শ্যামা যথেষ্ট মনে করে না একটা ছাঁপোষা মানুষের পক্ষে?

ঠাকুরজামাই, এ'কবছর আমিও তো কিছু কিছু সংসার খরচ দিয়েছি?

বলিয়া শ্যামা সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ করে। অনুগ্রহ চাহিতে আসিয়া এমন কথা বলিতে আছে! মুখখানা তাহার শুকাইয়া যায়! রাখাল বলে, তা জানি বৌঠান, আজ বলে নয় গোড়া থেকে জানি কৃতজ্ঞতা বলে তোমার কিছু নেই। যাক, আমার কর্তব্য আমি করেছি, নিন্দা প্রশংসার কথা তো আর ভাবিনি, এখানে থাকতেও তোমাদের আমি বারণ

করিনে, তার বেশি আমি কিছু পারব না বৌঠান, আমায় মাপ কর—এই হাত জোড় করলাম তোমার কাছে।

শীতলের একটা ব্যবস্থা? বিধানের পড়ার খরচ না দিক শীতলের জন্য রাখাল কিছু করিতে পারে না?

শীতল? রাখাল অবাক হইয়া থাকে। শীতল চাকরী করিবে, ওই অসুস্থ আধপাগলা মানুষটা! কি বলছ বৌঠান তুমি, তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে?

আমার যে উপায় নেই ঠাকুরজামাই?

শেষে রাখাল বলে, আচ্ছা দেখি।

রাখাল সত্যই চেষ্টা করিল। শীতল বহুকাল কলিকাতার প্রেসে বড় চাকরি করিয়াছে, এই সব বলিয়া কহিয়া বোধ হয় স্থানীয় একটা ক্ষুদ্র ছাপাখানায় একটা কাজ সে যোগাড়ও করিয়া ফেলিল শীতলের জন্য। বেতন পনের টাকা। কাজ কর্ম দেখিবে, খাতা পত্র লিখিবে, মফস্বলের ছোট ছাপাখানা, কাজ সামান্যই হয়, শীতল পারিবে হয়ত।

খবর শুনিয়া শীতল বিবর্ণ হইয়া বলিল, অসুখ যে আমার, আমি পারব কেন? কলম ধরলে আমার যে হাত কাঁপে, আমি যে লিখতে পারিনে রাখাল?

শ্যামা বলিল, আগে থেকে ভড়কাচ্ছ কেন বলত? গিয়েই ছাখো না পার কিনা, দুদিন যেতে আরম্ভ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোথায় পঞ্চাশ, কোথায় পনের। পঞ্চাশই বা কেন? ছাপাখানার কাজ করিয়া তিনশ' টাকাও তো শীতল একদিন মাসে মাসে ঘরে আনিয়াছে। তবে আজ সে কথা ভাবা মিছে। সেদিন আর ফিরিবে না, সে শীতল নাই, সে শ্যামাও নাই। পঞ্চাশ টাকার আশা করিয়া পনের টাকাতেই শ্যামা এখন খুসি হইতে জানে।

শীতল আপিসে যায়। ছাপাখানা প্রায় আধ মাইল দূরে। স্নান করিয়া খাইয়া শীতল ছেঁড়া কোটটি গায়ে চাপায়, বিষণ্ন সকাতর মুখে হুঁকায় কয়েকটা শেষটান দিয়া মোটা লাঠিটা বাগাইয়া ধরে। বড় দুর্বল পা দুটি শীতলের, লাঠিতে ভর দিয়া সে গুটিগুটি হাঁটিতে আরম্ভ করে। পোষা কুকুরটি তখন উঠিয়া দাঁড়ায়, লেজ নাড়িতে নাড়িতে সে শীতলের সঙ্গে যায়। পুকুর ঘুরিয়া গলি পথ পার হইয়া বড় সদর রাস্তা পর্যন্ত শীতলকে আগাইয়া দিয়া আসে।

বকুল চিঠি লিখিয়াছে, সে ভাল আছে। বিধান চিঠি লিখিয়াছে সেও ভাল আছে। সকলে ভাল আছে।

শরীরটা শ্যামারও বহুকাল ভালই আছে। দুবেলা রাঁধে, সংসারের কাজকর্ম করে, অবিশ্রাম খাটুনি শ্যামার, শক্ত সবল দেহ না থাকিলে কবে শ্যামা ক্ষয় হইয়া যাইত। এত খাটিতে হয় কেন শ্যামাকে? আশ্রিতার সমস্ত অবসর মুহূর্তগুলি কেমন করিয়া কর্তব্যে ভরিয়া ওঠে কেহ টেরও পায় না। একদিন দেখা যায় ভোর পাঁচটা হইতে রাত এগারোটা অবধি যত কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব সব সে করিতেছে একা।

কস্তাপাড় মোটা একখানা শাড়ি পরিয়া শ্যামা কাজ করে, দেখিয়া কে বলিবে সে এ বাড়ির দাসী নয়। হাতের চামড়া তাহার কর্কশ হইয়াছে, থাবা হইয়াছে বড়, আধমণ জলের বালতি সে অবলীলাক্রমে তুলিয়া নেয়, গায়ে এত জোর। ছেলেমেয়েরা বড় হইয়াছে, রাত্রে তাহাকে বারবার উঠিতে হয় না, বিধানও এখানে নাই যে জাগিয়া বসিয়া সে তাহার পাঠরত পুত্রের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিবে, কাজকর্ম শেষ করিয়া শোয়া মাত্র শ্যামা ঘুমাইয়া পড়ে, কোথা দিয়া রাত কাটিয়া যায় সে টেরই পায় না। টাকার চিন্তা করে না শ্যামা? শীতলের পনের টাকার চাকরিতেই সে নির্ভাবনা হইয়া গিয়াছে নাকি! চিন্তার তাহার শেষ নাই। তবে রাত জাগিয়া কোন ভাবনাই সে ভাবিতে পারে না। সারাদিন সহস্র কাজের সঙ্গে ভাবনার কাজটাও সে করিয়া যায়, অনেকটা কলের মত, পাঠাভ্যাসের মত। এমনি হইয়াছে আজকাল। আজীবন শ্যামা যে একা, কারো সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভাবিবার সুযোগ সে কোনদিন পায় নাই, অতীতের স্মৃতিতে, বর্তমানের সম্পদে বিপদে, ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনায় চিত্ত তাহার নিঃসঙ্গ, নির্ভরহীন।

ফণী একবার নিউমোনিয়ায় মরমর হইয়া বাঁচিয়া উঠিল, মন্দার যমজ ছেলে দুটির একজন, সে কালু, মরিল জ্বর-বিকারে। পড়াশোনা ভাই দু'টি বেশি দূর করে নাই, পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। গত বছর একদিনে এক লগ্নে দু'ভাইএর বিবাহ দিয়া মন্দা আনিয়াছিল দু'টি বৌ! শ্যামার জীবনে ওদের বিশেষ কোন স্থান ছিল না, কালুর মরণ শ্যামার কাছে বিশেষ কিছু শোচনীয় ব্যাপার নয়, তবু সেও যেন গভীর শোক পাইল। মন খারাপ হইয়া যাওয়া আশ্চর্য ছিল না। মামী বলিয়া কোনদিন খাতির না করুক, আশ্রিতা বলিয়া মাঝে মাঝে অপমানজনক ব্যবহার করুক, যত্ন করিয়া ওকে তো দুবেলা সে ভাত বাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এমন শোক কেন, পুত্রশোকের মত? কালুকে মনে করিয়া, কচি বৌটার বিধবার বেশ দেখিয়া, শ্যামার বুকের ভিতরটা পাক দিয়া যেন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল, উন্মাদিনী মন্দাকে দু'টি সবল বাহু দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অসহ্য বেদনায় শ্যামাও অজস্র চোখের জল ফেলিল। কেন তার এই অস্বাভাবিক ব্যথা?

পরে, মন্দার শোকও যখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখনও শ্যামা যেন অশান্ত হইয়া রহিল মনে মনে। রহস্যময় মনোবেদনা নয়, সাময়িক মনোবিকার নয়, একটা দিনও যে হাসিয়া কথা বলে নাই সেই কালুর জন্য স্পষ্ট দুরন্ত জ্বালা! শ্যামার মত কালুর বৌও অল্প বয়সে বাপ-মাকে হারাইয়াছিল, হঠাৎ শ্যামা যেন তার জন্য পাগল হইয়া উঠিল,

নিজের মেয়েকেও সে বুঝি এত ভাল কখনো বাসে নাই। বৌএর বিধবা বেশ মন্দা দেখিতে পারে না, নিজের শোক লইয়াই সে বিব্রত, বৌ সামনে গেলে কখনো সে শাপিতে আরম্ভ করে, বৌকে বলে মানুষখেকো রাক্ষুসী, আবার কখনো বুকে জড়াইয়া হা হা করিয়া কাঁদে, তার পরেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, চোখের সামনে থেকে সরে যা তুই, সরে যা আলক্ষী। শ্যামার মমতায় কালুর বৌ বড় একটি আশ্রয় পাইল। শ্যামার প্রশস্ত বুকে মাথা রাখিয়া সজল চোখে সে ঘুমায়, জাগিয়া ওঠে শ্যামারই বুকে, সারারাত ঠায় একভাবে কাটাইয়া শ্যামার পিঠের মাংসপেশী খিঁচিয়া ধরিয়াছে তবু সে নড়ে নাই, কর্ণ যে ভাবে বজ্রকীটের কামড় সহিয়াছিল তেমনি ভাবে দেহের যাতনা সহিয়াছে,—নড়িতে গেলে ঘুম ভাঙিয়া বৌ যদি আবার কাঁদে?

কালুর জন্য শ্যামার শোক কেন বুঝিতে না পারা যাক, কালুর বৌএর জন্য তার ভালবাসা নিশ্চয় বকুলের বিরহ? কিন্তু তা যদি হয় তবে কালুর জন্য শ্যামার এই শোক বিধানের বিরহ হইতে পারে তো!

ওসব নয়। আসলে শ্যামার মনটাই আগলা হইয়া আসিতেছে, পচিয়া যাইতেছে। গোড়াতে সাত বছর একদিকে পাগলা শীতলের সঙ্গে বাস করিতে করিতে কাঁচা বয়সের মনটা তাহার কুঁকড়াইয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে ছিল মাতৃত্বলাভের প্রাণপণ প্রয়াসের ব্যর্থতা—দু'টি একটি সঙ্গী অথবা আত্মীয়স্বজন থাকিলে যাহা তাহার এতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত না, কিন্তু একা পাইয়া সাত বছরে যাহা তাহাকে প্রায় কাবু করিয়া আনিয়াছিল,—এতকাল পরে এখন, জীবন-যুদ্ধে পরিশ্রান্ত মনটাতে যখন তাহার আর তেমন তেজ নাই, সেই অস্বাভাবিকতা, সেই বিকার আবার অধিকার বিস্তার করিতেছে।

মানুষ নয় শ্যামা? জীবনের তিনভাগ কাটিয়া গেল, এর মধ্যে একদিন সে বিশ্রাম পাইয়াছে? দেহের বিশ্রাম নয়। দেহ তার ভালই আছে, গর্ভের নবাগত সন্তানকে বহিয়া সে কাতর নয়। বিশ্রাম পায় নাই তার মন। এখন তাহার একটু সুখ শান্তি ও স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে বৈকি। প্রসবের তিনদিন আগেও শ্যামা এক একশ' জনের ভোজ রাঁধিয়া দিবে, শুধু পরের আশ্রয় হইতে এবার তাকে লইয়া চল, ভবিষ্যতকে একটু নিরাপদ করিয়া দাও, আর ওষুধের মত পথ্যের মত একটু স্নেহ দাও শ্যামাকে। একটু নিঃস্বার্থ অকারণ মমতা।

স্বামী আর আত্মীয়স্বজন শ্যামার সেবা লইয়াছে। সন্তান লইয়াছে সেবা ও স্নেহ। প্রতিদানে সেবা শ্যামা চায় না। আজ শ্যামাকে কেহ একটু স্নেহ দাও?

বড়দিনের সময় বিধান আসিলে সুপ্রভা বলিল, বড় হয়েছো তুমি তোমার সব বোঝা উচিত বাবা, বাপ তো তোমার সাতেও নেই পাঁচেও নেই—মার দিকে এক তাকাও? কি রকম হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাও না? চাউনি দেখলে বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে, সেদিন দেখি বিড়বিড় করে কি সব বকছে আপন মনে, আমার তো ভাল মনে হয় না।

বিধানের দু'চোখ ভরা রোষ, বলিল, তবু তো খাটিয়ে মারছেন।

সুপ্রভা আহত হইয়া বলিল, আমাকে তুমি এমন কথা বললে বিধান, কত বলেছি আমি তুমি তার কি জানবে? মাকে তোমার একদণ্ড বসিয়ে রাখার সাধ্যি আছে কারো? নইলে এতলোক বাড়ীতে, তোমার মা কিছু না কিছু করলে কাজ কি এ বাড়ির আটকে থাকবে?—সুপ্রভা অভিমান করিল, বেশ, আমরা না হয় পর, তুমি তো এসেছ এবার, পার যদি রাখ না মাকে তোমার বসিয়ে?

বিধান কারো অভিমানকে গ্রাহ্য করে না, বলিল, না ছোট পিসি, মাকে আর এখানে আমি রাখব না, আমি নিতে এসেছি মাকে।

ওমা, কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে?

খবর রটিবামাত্র সুপ্রভার মুখের এই প্রশ্ন সকলের মুখে গুঞ্জরিত হইতে থাকে। বিধান শ্যামাকে লইতে আসিয়াছে? মাকে আর এখানে সে রাখিবে না? কোথায় লইবে? কার কাছে? অতটুকু ছেলে, এখনো বি-এটা পর্যন্ত পাশ দেয় নাই, এসব কি মতলব সে করিয়াছে?

পড়া ছেড়ে দিয়েছিস খোকা? চাকরি নিয়েছিস? আমাকে না বলে এমন কাজ কেন করতে গেলি বাবা,—বলিয়া শ্যামা কাঁদিতে আরম্ভ করে।

বিধান বলে, কাঁদছ কেন, এঁ্যা? ভাল খবর আনলাম কোথায় আহ্লাদ করবে তা নয় তুমি কান্না জুড়ে দিলে? পাশ তো দিতাম চাকরির জন্যে? ভাল চাকরি পেয়ে গেলাম আর পাশ দিয়ে কি করব? ব্যাঙ্কে লোক নেবার জন্যে পরীক্ষা হল, শঙ্কর আমাকে পরীক্ষা দিতে বললে, পাশ-টাশ করব ভাবিনি মা, তিনশ' ছেলের মধ্যে থার্ড হয়ে গেলাম। প্রথম সাতজনকে নিলে—নব্বই টাকায় সুরু।

নব্বই? বিশ পঁচিশ টাকার কেরাণী বিধান তবে হয় নাই? শ্যামা একটু শান্ত হয়, বলে, আমায় কিছু লিখিসনি যে?

এটা বোঝানো একটু কঠিন শ্যামাকে। পড়াশোনা করিয়া বিধান একদিন বড় হইবে, এত বড় হইবে যে চারিদিকে রব উঠিবে ধন্য ধন্য—শ্যামার এ স্বপ্নের খবর বিধানের চেয়ে কে ভাল করিয়া রাখে। তাই পড়া ছাড়িয়া চাকরি লইয়াছে চিঠিতে শ্যামাকে একথা লিখিতে বিধানের ভয় হইয়াছিল। শুধু তাই নয়। বিধান ভাবিয়াছিল সে দু'শ-চারশ' টাকার চাকরি করিবে এই প্রত্যাশায় শ্যামা দিন গুণিতেছে, নব্বই টাকার চাকরি শুনিয়া সে যদি ক্ষেপিয়া যায়?

পরীক্ষা পর্য্যন্ত আরও একটা বছর ছেলের পড়ার খরচ দিতে পারিবে না ভাবিয়াই শ্যামা যে ক্ষেপিয়া যাইতে বসিয়াছিল বিধান তো তাহা জানিত না, চাকরিটা তাহার নব্বই টাকার শুনিয়াই শ্যামা এমনভাবের কৃতার্থ হইয়া গেল যে বিধান অবাক হইয়া রহিল। সন্দিগ্ধভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, খুসি হওনি মা তুমি?

খুসি হয় নাই!—খুসিতে শ্যামা আবোল তাবোল বকিতে আরম্ভ করে, এতকাল শ্যামাকে যারা অবহেলা অপমান করিয়াছে তাদের টিটকারি দেয়, কলিকাতায় মস্ত বাড়ি ভাড়া নেয়, বকুলকে আনে, বিধানের বিবাহ দেয়, দাসদাসীতে ঘরবাড়ি ভরিয়া ফেলে। তারপর হাসিমুখে সকলকে ডাকিয়া বিধানের চাকরির কথা শোনায়, তার দুধের ছেলে নব্বই টাকার চাকরি যোগাড় করিয়াছে, কারো সাহায্য চায় নাই, কারো তোষামোদ করে নাই,—বল তো বাছা এবার তাদের মুখ রইল কোথায় ছেলেকে আমার পড়ার খরচটুকু পর্য্যন্ত যারা দিতে চায় নি? কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় শ্যামা সত্যই বড় অকৃতজ্ঞ! এতগুলি বছর যার আশ্রয়ে সে থাকিয়াছে এখন ছেলের চাকরি হওয়ামাত্র নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে তার। এরা যে কত করিয়াছে তার জন্য সব সে ভুলিয়া গিয়াছে, মনে রাখিয়াছে শুধু ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপমান অবহেলা! মন্দা রাগিয়া বলে, ধন্যি তুমি বৌ, এতও ছিল তোমার পেটে পেটে। এত যদি কষ্ট পেয়েছ তুমি এখেনে থেকে, থাকলে কেন? নিজের রাজ্যপাটে গিয়ে বসলে না কেন রাজরাণী হয়ে? আজ পাঁচ বছর তোমাদের পাঁচটি প্রাণীকে আমি পুষলাম, ছেলে পড়ালাম মেয়েব বিয়ে দিলাম তোমার, আজ দিন পেয়ে আমাদের তুমি শাপছ!

অবাক হইয়া শুনিয়া শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, না ঠাকুরঝি, তোমাদের কিছু বলিনি তো আমি, কেন বলব তোমাদের? কম করেছ আমার তোমরা! আমাকে কিনে রেখেছ ঠাকুরঝি, তোমাদের ঋণ আমি সাত জন্মে শোধ দিতে পারব না। তোমাদের নিন্দে করে একটি কথা কইলে মুখ আমার খসে যাবে না, কুষ্ঠ হবে না আমার জিভে!— বলে আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া শ্যামা ভাসাইয়া দেয়।

শ্যামা কি পাগল হইয়া গিয়াছে? এতদিনে তার আবার সুখের দিন সুরু হইল, এমন সময় মাথাটা গেল তার খারাপ হইয়া? অনেক বলিয়া বিধান তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল, বারবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হয়েছে মা?—তারপর শ্যামা অসময়ে আজ ঘুমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া সে যখন জাগিল আর তাকে অশান্ত মনে হইল না। সে শান্ত নীরব হইয়া রহিল।

কত কথা শ্যামার বলিবার ছিল, কত হিসাব কত পরামর্শ কিন্তু এক অসাধারণ নীরবতায় সব চাপা পড়িয়া রহিল। বিধান বলিল, কলিকাতায় সে বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিয়াছে, শ্যামা জিজ্ঞাসাও করিল না কেমন বাড়ি, ক'খানা ঘর, কত ভাড়া। এতকাল এখানে থাকিয়া তার চাকরি হওয়ামাত্র একটা মাসও অপেক্ষা না করিয়া সকলের চলিয়া যাওয়াটা বোধ হয় ভাল দেখাইবে না, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা সায় দিয়া গেল। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় বাড়িটাড়ি যখন সে ঠিক করিয়াই আসিয়াছে দু'চার দিন পরে চলিয়া তাদের যাইতে হইবে, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা তাতেও সায় দিল। ছেলের সব কথাতেই সে সায় দিয়া গেল।

শেষে বিধান বলিল, পড়া ছেড়েছি বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করেছ মা!

শ্যামা একটু হাসিল, না খোকা রাগ করিনি, বড় হয়েছ এখন তুমি বুঝে শুনে যা করবে তাই হবে বাবা, তোমার চেয়ে আমি তো ভাল বুঝিনে, আমার বুদ্ধি কতটুকু?

কাজে যোগ দিতে বিধানের দিন দশেক দেরি ছিল, যাই যাই করিয়াও দিন সাতেক এখানে তাহারা রহিয়া গেল। শীতল চাকরি ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে জামগাছের তলে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল, পোষা কুকুরটি শুইয়া রহিল তাহার পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া। শীতলের ইচ্ছা আছে কুকুরটিকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে কলিকাতায়, কিন্তু মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তার সাহস হইল না।

পাগল হওয়ার আর কোন লক্ষণ শ্যামার দেখা গেল না, সেদিন ঘুমাইয়া উঠিয়া তার যে অসাধারণ নীরবতা আসিয়াছিল তাই শুধু কায়েমি হইয়া রহিল। আর যেন তাহার কোন বিষয়ে দায়িত্ব নাই, মতামত নাই, সে মুক্তি পাইয়াছে! জীবন-যুদ্ধ তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, এবার বিধান লড়াই চালাক, বিধান সব ব্যবস্থা করুক, সংসারের ভাল মন্দের দায়িত্ব থাক বিধানের, শ্যামা কিছু জানে না, জানিতে চাহে না,—ঘরের মধ্যে অন্তঃপুরের গোপনতায় তার যা কাজ এবার তাই শুধু সে করিবে; উপকরণ থাকিলে রাঁধিয়া দিবে পোলাউ, না থাকিলে দিবে শাক ভাত। বিধান তাহাকে এখানে রাখিলে এখানেই সে থাকিবে, কলিকাতা লইয়া গেলে কলিকাতা যাইবে, সব সমান শ্যামার কাছে। বিধানের চাকুরি-লাভও শ্যামার কাছে যেন আর উল্লাসের ব্যাপার নয়, খুবই সাধারণ ঘটনা। এই তো নিয়ম সংসারের? স্বামি-পুত্র উপার্জন করে, স্ত্রী ও জননী ভাত রাঁধে। আর ভালবাসে। আর সেবা-যত্ন করে। আর নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে অক্ষয় অমর একটি নির্ভরে।

শহরতলীতে নয়, এবার খাস কলিকাতায় নূতন বাড়িতে শ্যামা নূতন সংসার পাতিল। বাড়িটা নূতন সন্দেহ নাই, এখনো রঙের গন্ধ মেলে। দোতলা বাড়ি, একতলাতে বাড়িওলা থাকে। দোতালার মাঝামাঝি কাঠের ব্যবধান, প্রত্যেক ভাগে দু'খানা ঘর। রান্নার জন্য ছাদে দুটি ছোট ছোট টিনের চালা। শ্যামারা থাকে দোতালার সামনের অংশটিতে, রাস্তার উপরে ছোট একটু বারান্দা আছে। একটি

স্বামী ও দু'টি কন্যা সহ অপর অংশে বাস করে শ্রীমতী সরযূবালা দে, পাশকরা ধাত্রী।

সরযূ যেমন বেঁটে তেমনি মোটা, ফুটবলের মত দেখিতে। দেহের ভারেই সে যেন সব সময় হাঁপায়। কাজে যাওয়ার সময় সে যখন সাদা কাপড় ঢাকা রিক্সায় চাপে শীর্ণকায় কুলিটি রিক্স টানিয়া লইয়া যায়, উপর হইতে দেখিয়া শ্যামা হাসি চাপিতে পারে না।

সরযূর মেয়ে দুটি সুন্দরী। বড় মেয়েটির নাম বিভা, বিধানের সে সমবয়সীই হইবে, মেয়ে স্কুলে গান শেখায়। ছোট মেয়েটির নাম শামু, বিধানের বৌ হইলে মানায় এমনি বয়স, পড়ে স্কুলে। সরযূর সাধ শামুকে মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করাইয়া একেবারে ডাক্তার করিয়া ছাড়িবে—পাশ করা ধাত্রী নয়, লেডি ডাক্তার। লেডি ডাক্তারয়া বড় অবজ্ঞার চোখে দেখে সরযূকে, এতটুকু নিজের বুদ্ধি খাটাইতে গেলেই বকে। মেয়েকে এম, বি করিতে পারিলে গায়ের জ্বালা সরযূর হয়ত একটু কমিবে—অন্তত তাই আশা।

ওমা, সে কি, মেয়েদের বিয়ে দেবেন না দিদি?—শ্যামা বলে।

করুক না বিয়ে? আমি কি ধরে রেখেছি?—বলিয়া সরযূ হাসে।

ওদের ব্যাপারটা শ্যামা ভাল বুঝিতে পারে না। সরযূর স্বামী নৃত্যলাল কিছু করে না, বসিয়া বসিয়া খায় শীতলের মত, তবু গরীব ওরা নয়। সরযূ নিজে মন্দ রোজগার করে না, বিভাও পঞ্চাশ টাকা করিয়া পায়। কানা খোঁড়া কুৎসিতও নয় মেয়ে দুটি সরযূর। বিবাহ দেয় না কেন ওদের? বাধা কিসের? বিভার মত বয়স পর্যন্ত বকুলকে অবিবাহিতা রাখিলে শ্যামা তো ক্ষেপিয়াই যাইত। ভাবনা হয় না সরযূর?

কি আনন্দেই ওরা দিন কাটায়! সাজিয়া গুজিয়া ফিটফাট হইয়া থাকে, গান করে, গ্রামোফোন বাজায়, দিবারাত্রি শ্যামার কানে ভাসিয়া আসে ওদের হাসির শব্দ। মেয়ে দুটি শুধু নয়, মোটা সরযূ পর্যন্ত যেন উল্লাসের একটা হালকা হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়ায়। বাপ মা আর মেয়েরা যেন বন্ধু, সমান-ভাবে তাহারা হাসি-তামাসা করে, তাস খেলে চারজনে মিলিয়া, একসঙ্গে সিনেমা দেখিতে যায়। বাড়িতে লোকজনও কি আসে কম! সকলে তাহারা ধাত্রী ডাকিতে আসে না। অনেক বন্ধুবান্ধব আছে ওদের,—স্ত্রী ও পুরুষ। তাদের মধ্যে কয়েকটি যুবক যে প্রায়ই কেন আসে শ্যামা তাহা বেশ বুঝিতে পারে। কাঠের বেড়ার একটি ফোকরে চোখ রাখিয়া ও-বাড়িতে পুরুষ ও নারীর নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা দেখিয়া শ্যামা থ বনিয়া যায়, গান শুনিতে শুনিতে তাহার ভাত পোড়া লাগে।

বিভা এ-বাড়িতে বেশি আসে না, সে একটু অহঙ্কারী। শামু হরদম আসা-যাওয়া করে। শামুর প্রকৃতিটা শ্যামার একটু অদ্ভুত মনে হয়, একদিকে যেমন সে সরল অন্যদিকে আবার তেমনি পাকা। পোকায় কাটা ফুলের মত সে, খানিক অসাধারণ ভাল খানিক অসাধারণ মন্দ। এমনি বয়সে বিবাহ হইয়া বকুল শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, মেয়েটাকে শ্যামার একটু ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, শিশুর মত সরল আগ্রহের সঙ্গে শামু তাহার ভালবাসাকে গ্রহণ করে, শ্যামা হয় খুসি। কিন্তু বিধানের সঙ্গে শামুর আলাপ করিবার ভঙ্গিটা শ্যামার ভাল লাগে না। কেমন সব হেঁয়ালিভরা ঠাট্টা শামু করে, কেমন দুষ্টু দুষ্টু মুচকি হাসি হাসে, আড়চোখে কেমন করিয়া সে যেন বিধানের দিকে তাকায়,—সকলের সামনে কি একটা অদ্ভুত কৌশলে সে যেন গোপন একটা ভাবতরঙ্গ তার আর বিধানের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া রাখে। অতিশয় দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম ও গভীর একটা লুকোচুরি খেলা। শ্যামা কিছু বুঝিতে পারে না, তবু ভালও তাহার লাগে না। একটু সে সতর্ক হইয়া থাকে। শামু বিধানের ঘরে গেলে মাঝে মাঝে নানা ছলে দেখিয়া আসে ওরা কি করিতেছে। কোনদিন শামুকে বিধান পড়া বলিয়া দেয়, সেদিন শামুর শ্রদ্ধাপূর্ণ নিরীহ ভাবটি শ্যামার ভাল লাগে। কোনদিন বিধান জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলে, বুঝিতে না পারিয়া শামু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায়, আর থাকিয়া থাকিয়া ঢোক গেলে, সেদিনও শ্যামার মন্দ লাগে না। সে অসন্তুষ্ট হয় সেদিন, যেদিন শামু করে দুষ্টামি। দরজার বাহিরে শ্যামা থমকিয়া দাঁড়ায়। চোখ ঘুরাইয়া মুখভঙ্গি করিয়া শামু কথা বলে, বিধানের মুখের কাছে তর্জনী তুলিয়া শাসায়, তারপর হাসিয়া যেন গলিয়া পড়ে—দেখিয়া রাগে শ্যামার গা রি রি করিতে থাকে। একি নির্লজ্জ ব্যবহার অতবড় আইবুড়ো মেয়ের! এত কিসের অন্তরঙ্গতা? বিধান ওকে এত প্রশ্রয় দেন কেন?

ঘরে ঢুকিয়া শ্যামা বলে, কি হচ্ছে তোদের!—খুব সাবধানে বলে। বিধান না টের পায় সে অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

শামু বলে, মাসিমা, আপনার ছেলে বাজি হেরে দিচ্ছে না—দিন তো শাসন করে?

কিসের বাজি বাছা?—শ্যামা বলে।

বললে জিভ দিয়ে আমি যদি নাক ছুঁতে পারি দু'টাকার সন্দেশ খাওয়াবে। নাক ছুলাম, এখন দিচ্ছে না টাকা।

জিভ দিয়া নাক ছোঁয়া? এই ছেলেমানুষী ব্যাপার লইয়া ওদের হাসাহাসি? ছি, কি সব ভাবিতেছিল সে! তার সোনার টুকরো ছেলে, তার সম্বন্ধে ওকথা মনে আনাও উচিত হয় নাই। শ্যামা অপ্রতিভ হইয়া যায়।

বিভা আসিলে বসে না, দাঁড়াইয়া দু'চারটি কথা বলিয়া চলিয়া যায়। আঁচল লুটানো শিথিল-কবরী বিলাসী বাবু মেয়ে সে, উদাসী আনমনা তার ভাব, এ বাড়ির সকলের কত গভীর অপরাধ সে যেন ক্ষমা করিয়াছে এমনি উদার ও

নম্র তাহার গর্ব। রাজরানী যেন সখ করিয়া দরিদ্র প্রজার গৃহে আসিয়াছে, স্মিত একটু হাসি, ছেঁড়া লেপ তোষক ভাঙা বাক্স প্যাটরা ময়লা জামা কাপড় দেখিয়াও নাক-না-সিঁটকানোর মহৎ উদারতা, এই সব উপহার দিয়া সে চলিয়া যায়। বসিতে বলিলে বলে, এই যে বসি, বসার জন্য কি, বসেই তো আছি সারাদিন! এদিক ওদিক তাকায় বিভা শ্যামার হাঁড়ি কলসী, লোহার চায়ের কাপ, ছেঁড়া চটের আসন, গোবর লেপা ন্যাতা সব লক্ষ্য করে,—কিন্তু না, বিভার স্বপন-লাগা চোখে সমালোচনা নাই। কৃত্রিম না-থাকা নয়, সত্যই নাই। শ্যামা গামছা পরিয়া গা ধোয় বলিয়া বিভা তাকে অসভ্য মনে করে না, হাসে না মনে মনে। সে শুধু দুঃখ পায়। তার দয়া হয়। খাঁটি সমবেদনার সঙ্গেই সে মনে করে যে আহা, একটু শিক্ষা দীক্ষা পাইলে এমনটা হইত না, সকলের সামনে গামছা পরিতে শ্যামা লজ্জা পাইত।

হাসি যদি কখনো পায় বিভার, সে বিধানের জন্য। হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া বিভাকে দেখিলে আবার সে ঘরে ঢুকিয়া যায়, বিভা যেন অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী, নিচের বাড়িওয়ালার মেয়ে-বৌএর মত লজ্জাশীলা। বিধান নিজে লজ্জা পাইয়া সরিয়া গেলে কথা ছিল না, বিভার লজ্জা বাঁচানোর জন্য ভদ্রতা করিয়া সে সরিয়া যায় বলিয়াই বিভার হাসি পায়।

আপনার বড় ছেলে বুঝি?—সে জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা বলে, হ্যাঁ।

এত অল্প বয়সে পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছেন?

দুঃখের সংসার মা, উপায় কি! নইলে ছেলে আমার বড় ভাল ছিল পড়াশোনায়, ওর কি এ সামান্য চাকরি করার কথা?—বলিয়া শ্যামা নিশ্বাস ফেলে, কি পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি হয় না, তাই দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, ভগবান বিরূপ হলেন।

বিভা বলে, ও।

শ্যামার একদিকের প্রতিবেশিরা এমনি। নিচের তলার মতই ঘরোয়া গৃহস্থ মানুষ, সরযূদের মত উড়ু উড়ু পাখী নয়। শ্যামার মত তাদেরও ছোট-ছেলের-গন্ধভরা ছেঁড়া লেপতোষক! কর্তা ছিলেন আদালতের পেস্কার, পেনসন লইয়া এখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। প্রতি মাসের দুই তারিখে সকালবেলা ভাড়ার রসিদ হাতে সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিয়া ডাকেন, বিধানবাবু! নেত্যবাবু! আছেন না কি?

বাড়িওলার ছেলেমেয়ে বৌ নাতিনাতনিতে একতলাটা বোঝাই হইয়া থাকে,—ক'খানা মাত্র ঘর, কি করিয়া ওদের কুলায় কে জানে! তিনটি বিবাহিত পুত্রকে তিনখানা ঘর ছাড়িয়া দিলে বাকি সকলে থাকে কোথায়? বাকি ঘর তো থাকে মোটে একখানি। কর্তা গিন্নি, একটি বিধবা মেয়ে, ছোট মেয়ে আর মেয়ের জামাইও এখানে থাকে তারা, পেটেন্ট ওষুদের ক্যানভাসার ভাইপোটি, সকলে ওই একখানা ঘরে থাকে নাকি? প্রথমটা শ্যামার বড় দুর্ভাবনা হইত। তারপর একদিন রাত্রে রাঁধিয়া বাড়িয়া বাড়িওলা গিন্নির সঙ্গে খানিক আলাপ করিতে গিয়া সে ব্যাপার বুঝিয়া আসিয়াছে। বড় দু'খানা ঘরের প্রত্যেকটির মাঝামাঝি এ দেয়াল হইতে ও-দেয়াল পর্যন্ত তার টাঙানো আছে, তাতে ঝুলানো আছে ছিটের পর্দা। দিনের বেলা পর্দা গুটানো থাকে, রাত্রে পর্দা টানিয়া দু'খানা ঘরকে চারখানা করিয়া তিন ছেলে আর মেয়ে-জামাই শয়ন করে পর্দার উপরে একটি বিদ্যুতের বাতি জ্বালিয়া দু'দিকের দম্পতিকে আলো দেয়।

সিঁড়ির নিচে যে স্থানটুকু আছে ক্যানভাসার ভাইপোটি সেখানে থাকে। নাম তাহার বনবিহারী। সিঁড়ির উপরে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে নিচে বনবিহারীকে দেখিতে পাওয়া যায়। সারাদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া রাত্রি আটটা ন'টার সময় সে ফিরিয়া আসে। ওষুধের সুটকেশটি চৌকির নিচে ঢুকাইয়া জামাটি খুলিয়া সে পেরেকে টাঙাইয়া দেয়, কাপড় গায়ে দিয়া চৌকিতে বসিয়া জুতার ফিতা খোলে। তারপর চৌকিতে পা তুলিয়া নিজের পা টিপিতে আরম্ভ করে নিজেই। হঠাৎ বাড়িওলা গিন্নি ডাক দেয়, বনু এলি, বনু? পাঁউরুটি আনা হয় নি, ভোলা ভুলে এসেছে, যা তো বাবা মোড়ের দোকান থেকে চট করে একটা রুটি নিয়ে আয়,—সকালে উঠে খাই খাই করে সবাই তো খাবে আমায়। কোনদিন বড়বৌ কোলের ছেলেটিকে দিয়া যায়, বলে, দেখো তো ভাই পার নাকি ঘুম পাড়াতে হেঁটে হেঁটে? ডানা আমার ছিঁড়ে গেল। কোনদিন বাড়িওয়ালা স্বয়ং আসেন দাবার ছক লইয়া, বলেন, আয় বনু বসি একদান।—বনুর ভাত ঢাকা দিয়ে রাখো বৌমা, দুধ থাকে তো দিও দিকি বনুকে একটু, দু' হাতাই দিও,—ক্ষীর করে রাখ বাকিটা। কালের মত ঘন কোরো না বাছা ক্ষীর, ঘন ক্ষীর খেয়ে আজ পেট কামড়েছে,—পাতলাই রেখো আর চিনি দিও একটু। ভানু, ও ভানু, তামাক দে দিকি মা—বড় কলকেতে দিস বেশি তামাক দিয়ে।

এসব দেখিয়া শুনিয়া শ্যামার চোখে যদি জল আসিত, সে জল সোজা গিয়া পড়িত বনবিহারীর মাথায় পথের ধুলায় ধূসর রুক্ষ চুলে। এক একদিন বিভা আসিয়া দাঁড়ায়। ঝুঁকিয়া দেখিয়া ফিস ফিস করিয়া বলে, অনেক মানুষ দেখেছি, এমন বোকা কখনো দেখিনি মাসিমা। এমন করে এখানে তোর পড়ে থাকা কেন? মেসে গিয়ে থাকলেই হয়!

রোজগারপাতি বুঝি নেই।—শ্যামা বলে।

কুড়ি পঁচিশ ও যা পায় মাসিমা, একজনের পক্ষে তাই

ঢের। তা'ছাড়া এমন করে থাকার চেয়ে না খেয়ে মরাও ভাল।—পুরুষমানুষ নয় ও!

রাগে বিভা গরগর করে। শ্যামা একটু অবাক হয়, এত রাগ কেন বিভার? কোথায় কোন কাপুরুষ যুবক ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে খেয়াল করিয়া বিচলিত হওয়ার স্বভাব তো বিভার নয়! হঠাৎ বিভা করে কি, ঝুঁকিয়া ডাক দেয়, বনুবাবু, মা আপনাকে ডাকছেন, উপরে আসবেন একবার?

বনবিহারী মুখ তুলিয়া তাকায়, বলে, যাই।

সে উঠিয়া আসিলে শ্যামাকে অবাক করিয়া দিয়া বিভা তাহাকে বকে। রীতিমত ধমকায়। বলে, কি যে প্রবৃত্তি আপনার বুঝিনে কিছু, একেবারে আপনার ব্যাক্‌বোন নেই, সারাদিন ঘুরে এত রাত্রে ফিরে এলেন এখনও আপনাকে সংসারের কাজ করতে হবে? কেন করেন আপনি? আমি হলে তো সবাইকে চুলোয় যেতে বলে চাদর মুড়ি শুয়ে পড়তাম, এত কি আহ্লাদ সকলের! বিনে মাইনের চাকর নাকি আপনি!—এমনি ভাবে কত কথাই যে বিভা তাহাকে বলে। বলে, সংসারে এমন নিরীহ হইয়া থাকিলে চলে না। একটু শক্ত হইতে হয়। অপদার্থ জেলিফিশ তো নয় বনবিহারী!

বলিতে বলিতে এত রাগিয়া ওঠে বিভা যে হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া গটগট করিয়া সে ভিতরে চলিয়া যায়। মুখ নিচু করিয়া বনবিহারী নামে নিচে। শ্যামা দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে যে বিভা অনেকদিন এখানে আছে, বনবিহারীর সঙ্গে পরিচয় তাহার অনেক দিনের, বিভার গায়ে পড়িয়া বকাবকি করাটা যেমন বিসদৃশ শোনাইল আসলে হয়ত তা তেমন খাপছাড়া নয়।

এখানে আসিয়া অল্পে অল্পে শ্যামার মন কিছু সুস্থ হইয়াছে।

তবে শ্যামা আর সে শ্যামা নাই। বনগাঁয়ে হঠাৎ সে যেরকম শান্ত ও নির্বাক হইয়া গিয়াছিল, এখানেও সে প্রায় তেমনি হইয়া আছে, শুধু তার এই পরিবর্তন এখন আর অস্বাভাবিক মনে হয় না। আসন্ন সন্তান সম্ভাবনার সঙ্গে পরিবর্তনটুকু খাপ খাইয়া গিয়াছে। চলাফেরা কাজকর্ম সমস্তই তার ধীর মন্থর, সংসারটাকে ঠেলিয়া তুলিবার জন্য তার ধৈর্য্যহীন উৎসাহ আর নাই, নিজের সংসারে থাকিবার সময় সে একদিন ছেলেমেয়ের জামার ছাঁটটি পর্যন্ত ক্রমাগত উন্নততর করিতে না পারিলে স্বস্তি পাইত না, সংসারের তুচ্ছতম খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি পর্যন্ত তার কাছে ছিল গুরুতর, এখন সে শুধু মোটামুটি সংসারটা চালাইয়া যায়, ছোটখাট ত্রুটি ও ফাঁকি সে অবহেলা করে। সংসারের যেখানে বোতাম ছিঁড়িয়া ফাঁক বাহির হয় সেখানে সেফটিপিন গুঁজিয়া কাজ চালাইতে তাহার বাধে না। ছেলেদের জীবনের প্রত্যেকটি মিনিটের হিসাব রাখা আর হইয়া ওঠে না, বিধান দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিলে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সে ভুলিয়া যায়, শীতের সন্ধ্যায় ফণীর পায়ে মোজা না উঠিলেও তার চলে। ঘরের আনাচে কানাচে ধুলাবালি, জামাকাপড়ে ময়লা, চৌবাচ্চায় শ্যাওলা জমিতে পারে।

নূতন যারা শ্যামাকে দেখিল তারা কিছু বুঝিতে পারে না, আগে যারা তাহাকে দেখিয়াছে তারাই শুধু টের পায় বনগাঁ তাহাকে কি ভাবে বদলাইয়া দিয়াছে।

আবার শীত শেষ হইয়া আসিল। ফাল্গুন মাসে একটি কন্যা জন্মিল শ্যামার। বকুল বুঝি আবার সুরু হইল গোড়া হইতে। কিন্তু বকুলের কি দু'টি ডাগর চোখ ছিল। এ মেয়ের চোখ কোথায়? হায়, শ্যামার মেয়ে জন্মিয়াছে অন্ধ হইয়া। গর্ভের অনাদিকালের অন্ধকারে তাকে ঘিরিয়া রহিল, এ জগতের আলো সে চিনিবে না কোনদিন।

জন্মান্ধ? কার পাপের ফল ভোগ করিতে তুই পৃথিবীতে আসিলি খুকি! দৃষ্টি তোর হরণ করিল কে? ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা স্মরণ করে, বনগাঁয় একদিন সন্ধ্যায় সময় কলাবাগানে ছায়ার মত কি যেন দেখিয়া তার গা ছমছম করিয়াছিল, স্নানের আগে এলোচুলে তেল মাখিবার সময় আর একদিন পাগলা হারুর বুড়ি দিদিমা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল, অজ্ঞাতসারে আরও কবে কি ঘটিয়াছিল কে জানে!

কি আর করা যায়, অন্ধ মেয়েকে শ্যামা সমান আদরেই মানুষ করে, যেমন সে করিয়াছিল বকুলকে, যার ডাগর দুটি চোখ শ্যামাকে অবিরত অবাক করিয়া রাখিত। দু'মাস বয়স হইতে না হইতে শীতল মেয়েকে বড় ভালবাসিল। বিধান একটা ঠাকুর আনিয়াছিল, তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়া শ্যামা আবার রান্না আরম্ভ করিলে মেয়ে কোলে করিয়া বসিয়া থাকার কাজটা পাইয়া শীতল ভারি খুশি। এখানে আসিয়া বনগাঁর পোষা কুকুরটির জন্য শীতলের মন কেমন করিত, খুকিকে কোলে পাইয়া কুকুরের শোক সে ভুলিয়া গেল। শীতলের বাঁ পায়ের বেদনাটা আবার চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এ জন্য দোষী করে সে শ্যামাকে। শ্যামার জন্যই তো চাকরী করিতে দুর্বল পা লইয়া দু'বেলা তাহাকে হাঁটাহাঁটি করিতে হইত বনগাঁয়।

অবসর সময়টা শ্যামা তার পায়ে তার্পিন তেল মালিশ করিয়া দেয়। অসুস্থ স্বামীকে চাকরি করিতে পাঠাইয়া অপরাধ যদি তার হইয়া থাকে, এ তার অযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত নয়।

মোহিনী কলিকাতায় চাকরী করে কিন্তু শ্বশুরবাড়ি বেশি সে আসে না, বোধ হয় পিসির বারণ আছে। শ্যামা তাকে দু'দিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, দু'দিন আসিয়া সে খাইয়া গিয়াছে, নিজে হইতে একদিনও খোঁজখবর নেয় নাই। বিধান প্রথম প্রথম কাকার বাড়ি গিয়া মোহিনীর

সঙ্গে সর্বদা দেখাসাক্ষাৎ করিতে, এখন সেও আর যায় না। রাগ করিয়া শ্যামাকে সে বলে, এমনি লাজুক হলে কি হবে, মোহিনী বড় অহঙ্কারী মা,—কতবার গিয়েছি আমি, কত বলেছি আসতে, এল একবার? নেমন্তন্ন না করলে বাবুর আসা হয় না, ভারি জামাই আমার!—এদিকে তো মাছিমারা কেরানী পোষ্টাপিসের!

কিন্তু মোহিনী একদিন বিনা আহ্বানেই আসিল। লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া বিধানের কাছে সে স্বীকার করিল যে বকুলের চিঠি পাইয়া সে আসিয়াছে। বকুলকে এখন একবার আনা দরকার। পনের দিনের ছুটি লইয়া সে বাড়ি যাইতেছে, ইতিমধ্যে শ্যামা যদি তাহার পিসিকে একখানা চিঠি লিখিয়া দেয় আর চিঠির জবাব আসার আগেই বিধান যদি সেখানে গিয়া পড়ে, বকুলকে পাঠানোর একটা ব্যবস্থা মোহিনী তবে করিতে পারে।

মোহিনীর কথাবার্তা বিধানের কাছে হেঁয়ালির মত লাগে, সে বলে, বোসো তুমি, মাকে বলি।

মোহিনী বলে, না না, আমি গেলে বলবেন।

কিন্তু তা হয় না, শ্যামাকে না বলিলে এসব সাংসারিক ঘোরপ্যাচ কে বুঝিতে পারিবে?

বিধান শ্যামাকে সব শোনায়। শুনিবামাত্র ব্যাপার আঁচ করিয়া শান্ত নির্বাক শ্যামার সহসা আজ দেখা দেয় অসাধারণ ব্যস্ততা।

কই মোহিনী? ডাক খোকা, মোহিনীকে ডাক।

শ্যামার চোখ ছল ছল করে। আসিবার জন্য তাই বকুল ইদানীং এত করিয়া লিখিতেছিল! তারা আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই বলিয়া মেয়ে তার জামাইকে এমন চিঠি লিখিয়াছে যে, বিনা নিমন্ত্রণে যে কখনো আসে না সে যাচিয়া আসিয়াছে বকুলকে আনানোর ষড়যন্ত্র করিতে, ছুটি লইয়া যাইতেছে বাড়ি! মোহিনীকে কত জেরাই যে শ্যামা করে! সজল চোখে কতবার যে সে মোহিনীকে মনে করাইয়া দেয় তার হাতে যেদিন মেয়েকে সঁপিয়া দিয়াছিল সেইদিন হইতে শ্যামার ছেলের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নাই, বিধান যেমন মোহিনীও তেমনি শ্যামার কাছে। অনুযোগ দিয়া বলে, তোমার বাড়ির কারুর কি উচিত ছিল না বাবা একথাটা আমায় লিখে জানায়! আমি তার মা, আমি জানতেও পেলাম না ক'মাস কি বৃত্তান্ত? পিসি না বুঝুক, তুমি তো বোঝ বাবা মার দুঃখু?

মোহিনীকে সে-বেলা এখানেই খাইয়া যাইতে হয়। জামাই কোনদিন পর নয়, তবু আজ মোহিনী যেন বিশেষ করিয়া আপন হইয়া যায়। মনটা ভাল মোহিনীর, বকুলের জন্য টান আছে মোহিনীর, না আসুক সে নিমন্ত্রণ না করিলে, অবুঝ গোঁয়ার সে নয়, মধুর স্বভাব তার।

চার পাঁচদিন পরে বিধান গিয়া বকুলকে লইয়া আসিল। বলিল, উঃ মাগো, কি গালটা পিসি আমাকে দিলে! বাড়িতে পা দেয়া থেকে সেই যে বুড়ি মুখ ছুটাল মা, থামল গিয়ে একেবারে বিদায় দেবার সময়, অমঙ্গল হবে ভেবে তখন বোধ হয় কিছু বলতে সাহস হ'ল না, মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আর যাচ্ছিনে বাবু খুকির শ্বশুরবাড়ি এ জন্মে।

বকুল তো আসিল, এ কোন বকুল? একি রোগা শরীর বকুলের, নিষ্প্রভ কপোল, ভীরু চোখ, কান্তিবিহীন মুখ, লাবণ্যহীন বর্ণ? মেয়েকে তার এমন করিয়া দিয়াছে ওরা!—পেট ভরে খেতেও ওরা তোকে দিত না বুঝি খুকি? খাটিয়ে মারত বুঝি তোকে দিনরাত? আমি কি জানতাম মা এত তোকে কষ্ট দিচ্ছে! আনবার জন্যে লিখতিস, ভাবতাম আসবার জন্যে মন কেমন করছে তাই ব্যাকুল হয়েছিস,—পোড়া কপাল আমার!

শ্যামার মুখে হঠাৎ যে খিল পড়িয়াছিল, বকুল আসিয়া যেন তা খুলিয়া দিয়াছে। সেটা আশ্চর্য নয়। মনের অবস্থা অস্বাভাবিক হইয়া আসিলে এই তো তার সবার বড় চিকিৎসা, এমনি ভাবে মশগুল হইতে পারা জীবনের স্বাভাবিক বিপদে সম্পদে, যার মহা সমন্বয় সংসারধর্ম্ম। বহু দিনের দুর্ভাবনায়, বনগাঁর পরাশ্রিত জীবনযাপনে, শ্যামার মনে যদি বৈকল্য আসিয়া থাকে, ছেলের চাকরি, অন্ধ মেয়ের জন্ম, বকুলের এভাবে আসিয়া পড়া, এততেও সেটুকু কি শোধরাইবে না? আগের মত হওয়া শ্যামার পক্ষে আর সম্ভব নয়, তবু পরিবর্তিত পরিশ্রান্ত ক্ষয় পাওয়া শ্যামার মধ্যে একটু শক্তি ও উৎসাহ, একটু চাঞ্চল্য ও মুখরতা এখন আসিতে পারে, আসিতে পারে জীবনের হাসি-কান্নার আরও তেজী মোহ, সুখের নিবিড়তর স্বাদ।

মহোৎসাহে শ্যামা বকুলের সেবা আরম্ভ করিল।

বনগাঁয়ে চুরি করিয়া বিধানকে সে ভাল জিনিস খাওয়াইত, এখানে নিজের মুখের খাবারটুকু সে মেয়ের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। নব্বই টাকা আয়ে তো কলিকাতা শহরে রাজার হালে থাকা যায় না, নিজেকে বঞ্চিত না করিয়া মেয়েকে দিবার দুধটুকু ঘিটুকু ফলটুকু কোথায় পাইবে সে? কচি মেয়ে মাই খায়, শ্যামার নিজেরও দারুণ ক্ষুধা, পাতের মাছটি তবু সে বকুলের থালায় তুলিয়া দেয়, মণিকে দিয়া চিনিপাতা দই আনায় দু'পয়সার, বলে, দই মুখে রুচবে লো, ভাতকটা সব মেখে খেয়ে নে চেঁছেপুঁছে, লক্ষ্মী খা। দই খেলে আমার বমি আসে, তুই খা তো। ওমণি, দে বাবা, একটু আচার এনে দে দিদিকে।

বকুলকে সে বসাইয়া রাখে, কাজ করিতে দেয় না।

দেখিতে দেখিতে বকুলের চেহারার উন্নত হয়।

কিন্তু মুস্কিল বাধায় সরযূ। বলে, মেয়েকে কাজকর্ম করতে দিচ্ছ না, এ কিন্তু ভাল নয় ভাই।

শ্যামা বলে, খেটে খেটে সারা হয়ে এল, ওকে আর কাজ করতে দিতে কি মন সরে দিদি? অল্পবিস্তর কাজ ধরতে

গেলে করে বৈকি মেয়ে, বিছানা টিছানা পাতে। বিকেলে খানিকক্ষণ হেঁটেও বেড়ায় ছাতে, তা তো দেখতেই পাও?

মনে হয় সরযূর অনধিকার চর্চায় শ্যামা রাগ করে। পাশকরা ধাত্রী! পাঁচটি সন্তানের জননী সে মেয়ের কিসে ভাল কিসে মন্দ সে তা বোঝে না, পাশকরা ধাত্রী তাকে শিখাইতে আসিয়াছে!

শ্যামা প্রাণপণে মেয়েকে এটা ওটা খাওয়াইবার চেষ্টা করে, বকুলের কিন্তু অত খাওয়ার সখ নাই, তার সব চেয়ে জোরালো সংটি দেখা যায়, বিধানের বিবাহ সম্বন্ধে। শ্যামাকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বলে, কি করছ মা তুমি? চাকরী বাকরী করছে, এবার দাদার বিয়ে দাও? শামুর সঙ্গে দাদার অত মাখামাখি দেখে ভয়ও কি হয় না তোমার?

কিসের মাখামাখি লো?—শ্যামা সভয়ে বলে।

নয়? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, ও কেন রোজ পড়া জানতে আসবে দাদার কাছে? পড়া জানবার দরকার হয় মাষ্টার রাখুক না! না মা, দাদার তুমি বিয়ে দাও এবার।

শামুর আসা যাওয়া শ্যামার চেয়েও বকুল বেশি অপছন্দ করে। কি পাকা গিন্নিই বকুল হইয়াছে! সাংসারিক জ্ঞান বুদ্ধিতে কচি মনটি যেন তার টইটম্বর, আঁটিতে চায় না। শামুর কাপড়পরা বেণীপাকানো, পাউডার মাখার ঢং দেখিয়া গা যে তার জলিয়া যায় শ্যামা ভিন্ন কার সাধ্য আছে তা টের পাইবে, মনে হয় শামুর সঙ্গে সখিত্বই বুঝি তার গড়িয়া উঠিল। বনগাঁর সেই ঢেঁকি ঘরখানায় চালায় ইতিমধ্যে বুঝি নূতন খড়ও ওঠে নাই এক আঁটি, শঙ্করের গায়ের সেই জামাটি বুঝি ছেঁড়ে নাই, অশ্রুমুখী সেই অবোধ বালিকা বকুল এই বকুল হইয়াছে, দুটি ছেলেমানুষ ছেলেমেয়ের সহজ বন্ধুত্বে সে আঁসটে গন্ধ পায় এবং কোমুম তাহা গোপন রাখিয়া ওদের দেখায় হাসিমুখ, নাক সিঁটকায় মার কাছে আর করে ষড়যন্ত্র। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গড়িয়া পিটিয়া বকুলকে মানুষ করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই।

ষড়যন্ত্রে শ্যামার সায় আছে। মিথ্যা নয়, বিধানের এবার বিবাহ দেওয়া দরকার বটে।

বিধান শুনিয়া হাসে। বলে, পিসির গাল সয়ে নিয়ে এলাম কি না, মাকে বুঝি তাই এসব কুপরামর্শ দিচ্ছিস খুকী? তারপর গম্ভীর হইয়া বলে, এদিকে খরচ চলে না সে খবর রাখিস তুই? ট্রামের টিকিট না কিনে মণির স্কুলের মাইনে দিয়েছি এবার, তুই আছিস কোন তালে!

বকুল বলে, আমাকে এনে তোমার খরচ বাড়ল দাদা।

তবু তো আছিস আমায় ডুবিয়ে যাবার ফিকিরে।

বকুল অভিমান করে। সে আসিয়া খরচ বাড়াইয়াছে বিধান একবার প্রতিবাদ করিলে সে খুসি হইত। কারো মন বুঝিয়া একটা কথা যদি বিধান কোনদিন বলিতে পারে। খানিক পরে আবার উল্টা কথা ভাবিয়া বকুলের অভিমান কমিয়া যায়। তাই বটে দাদা কি পর যে তোষামোদ করিয়া কথা কহিবে তার সঙ্গে? আবার সে প্যান প্যান সুরু করিয়া দেয়। যুক্তি দেখায় যে ও-সব বাজে ওজোর বিধানের, এই যে সে আসিয়াছে, সংসার অচল হইয়াছে কি? একটা বৌ আসিলেও স্বচ্ছন্দে সংসার চালবে। তার চেয়ে বেশি ভাত বৌ খাইবে না নিশ্চয়।

সংসারের ভার গ্রহণ করার আনন্দ বিধানের এদিকে কয়েক মাসের মধ্যেই তিতো হইয়া গিয়াছিল: এই বয়সে ভাইএর স্কুলের মাহিনা দিতে রোজ হাঁটিয়া আপিস করা যদি বা সহ্য হয়, একেবারে নব্বই নব্বইটা টাকাতেও যে মাসের খরচ কুলায় না এটুকু মাথা গরম করিয়া দেয় তরুণ মানুষের। বকুলকে একদিন বিধান ভয়ানক ধমকাইয়া দিল। বলিল, বিয়ে! বিয়ে! একটা ট্যুসনি খুঁজে পাচ্ছি না, বিয়ে বিয়ে করে পাগল করে দিল আমায়। ফের ও কথা বললে চড় খাবি খুকী।

বলিয়া সে আপিস গেল। বকুল নাইল না, খাইল না, গোসা করিয়া শুইয়া রইল। বিকালে বাড়ি ফিরিয়া বিধান শুনিল শ্যামার বকুনি, তারপর সে বকুলকে তুলিয়া খাওয়াইতে গেল।

আজ বিভা বসিয়াছিল বকুলের কাছে।

বিধানের সঙ্গে আগে সে কোনদিন কথা বলে নাই, আজ দয়া করিয়া বলিল, পালাচ্ছেন কেন, আসুন না? কি বলেছেন বোনকে, বোন আজ রাগ করে সারাদিন খায় নি?

তারপর বিভা বলিল, শামু খুব প্রশংসা করে বিধানের। জগতে নাকি এমন বিষয় নাই বিধান যা জানে না? পড়াটড়া জানিতে আসিয়া শামু বোধ হয় খুব বিরক্ত করে বিধানকে? আশ্চর্য মেয়ে, মানুষকে এমন জ্বালাতন করিতে পারে ও! বিভা এই সব বলে, বিধান মুখ লাল করিয়া আড়ষ্ট ভাবে শোনে। শ্যামাও তো পিছু পিছু আসিয়াছিল, বিধানের সে আর বকুল ভাবে শামুর কথা ওঠান বিধানের মুখ লাল হইয়াছে। তারা তো বুঝিতে পারে না জীবনে যে কখনো মেয়েদের ধারে কাছে ঘেঁষে নাই, বিভার মত গান-জানা মন-টানা আধুনিক মেয়ের কাছে কি তার দারুণ অস্বস্তি।

গভীর বিষাদে শ্যামার মন ভরিয়া যায়। এইবার বুঝি তার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার দিন আসিয়াছে। অন্ধ মেয়ে দিয়া ভগবানের সাধ মিটিল না, ছেলে কাড়িয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবার। বিধানের স্নেহের স্রোত আর কি তার দিকে বহিবে? তার কড়া হাতের সেবা আর কি ভাল লাগিবে বিধানের? জননীকে আর তো বিধানের প্রয়োজন নাই। নিজের জীবন এবার নিজেই সে গড়িয়া তুলিবে, যে অধিকার এতদিন শ্যামার ছিল নিজস্ব। শ্যামা বুঝিতে পারে, জগতে এই পুরস্কার মা পায়। বকুলকে বড় করিয়া দান করিয়াছে পরের বাড়ি, তার চোখের সামনে বিধানের নিজের

স্বতন্ত্র জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে, যেখানে তার ঠাঁই নাই এতটুকু। মণির বেলা ফণীর বেলাও হইবে এমনি। আপন হইয়া কেহ যদি চিরদিন থাকে শ্যামার, থাকিবে ওই অন্ধ শিশুটি, যার নিমীলিত আঁখি দুটির জন্য শ্যামার আঁখি সজল হইয়া থাকিবে আজীবন।

এক বাড়িতে বাস করিলে পরের জীবনের গোপন ও গভীর জটিলতাগুলি, কেহ বলিয়া না দিলেও, ক্রমে ক্রমে সকলেই টের পাইয়া যায়। বিভা ও বনবিহারীর ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া শ্যামা ও বকুল হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে। বিভার জন্য ভেড়া বনিয়া এখানে পড়িয়া আছে বনবিহারী, একটু চোখের দেখা, একটু গান শোনা, বিভার যদি দয়া হয় কখনো দুটি কথা বলা এইটুকু সম্বল বনবিহারীর, —মাগো মা, কি অপদার্থ পুরুষ! না জানিস ভালরকম লেখা-পড়া, করিস ক্যানভাসারি, থাকিস পরের বাড়ি দাস হইয়া, তোর একি দুরাশা! সিঁড়ির নিচে ভাঙ্গা চৌকীতে যার বাস তার কেন আকাশের চাঁদ ধরার সাধ? বনবিহারীর পাগলামি বিশেষ অস্পষ্ট নয়, সকলেই জানে: সে নিজেই শুধু তা জানে না, ভাবে গোপন কথাটি তার গোপন হইয়াই আছে, ছড়াইয়া পড়ে নাই বাহিরে। টের পাওয়া অবশ্য কারো উচিত হয় নাই, কারণ বনবিহারী কিছুই করে না প্রেমিকের মত, বিভা সিঁড়ি দিয়া নামিলে শুধু চাহিয়া থাকে, বিভা গান ধরিলে যদি আশেপাশে কেহ না থাকে তবেই সে সিঁড়ি দিয়া গুটি গুটি উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর যা কিছু সে করে সব চুরি করিয়া, কারো তা দেখিবার কথা নয়। ক্যানভাস করিতে বাহির হইয়া বিভার স্কুলের কাছাকাছি কোথাও সে রোজই দাঁড়াইয়া থাকে ছুটির সময়, কোনদিন সাহস করিয়া সামনে গিয়া বলে, ছুটি হয়ে গেল আপনার?—কোনদিন দূর হইতেই সরিয়া পড়ে। এইটুকু যে সকলে জানিয়া ফেলিয়াছে টের পাইলে লজ্জায় বনবিহারী মরিয়া যাইবে। তারপর বিভার কাজ করিয়া দিতেও সে ভালবাসে বটে। লণ্ড্রিতে কাপড় দিয়া লইয়া আসে, ফর্দ মাফিক মার্কেট হইতে জিনিস-পত্র কিনিয়া আনে, যে দুটি ছোট ছোট মেয়ে সকালবেলা গান শিখিতে আসে বিভার কাছে, দরকার হইলে তাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দেয়। এখন, এসব ছোটখাট উপকার কে না কার করে জগতে? বাড়ির কাজও তো সে কম করে না। বিভার দুটি একটি কাজ করিয়া দেওয়ার মধ্যে তার গোপন মনের প্রতিচ্ছবি যে সকলে দেখিয়া ফেলিবে কেমন করিয়া সেটুকু অনুমান করিবে বনবিহারী? বিভার যে ফটোখানা সে চুরি করিয়াছে সেখানা সে লুকাইয়া রাখিয়াছে ক্যানভাসিংএ যাওয়ার স্যুটকেশটির মধ্যে আর পুরানো ব্লাউজটি রাখিয়াছে তার ট্রাঙ্কে তালাচাবি দিয়া। চুপি চুপি লুকাইয়া এগুলি সকলে যে আবিষ্কার করিয়াছে তাই বা সে জানিবে কিরূপে?

বিভা বিব্রত হইয়া থাকে। বনবিহারী এমন নিরীহ, যত স্পষ্টই হোক এমন মূক ও নিষ্ক্রিয় তার প্রেম, তার বিরুদ্ধে নালিশ খাড়া করিবার তুচ্ছতম প্রমাণটিরও এমন অভাব যে এ বিষয়ে সকলের যেমন তারও তেমনি কিছু বলিবার অথবা করিবার উপায় নাই। মনে মনে সে কখনো রাগে কখনো বোধ করে মমতা, সিঁড়ি দিয়া নামার সময় কোনদিন তাকায় ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনার চোখে কোন দিন দুটি একটি স্নিগ্ধ কথা বলে। ভাল যে লাগে না একেবারে তা নয়। একটা কুকুরও কুকুরের মত পোষ মানিলে মানুষের তাতে কত গর্ব কত আনন্দ, এতো একটা মানুষ। অথচ এরকম পূজা গ্রহণ করিবার উপায় না থাকিলে কি বিশ্রীই যে লাগে মানুষের, মনে যার একফোঁটা দয়ামায়া থাকে।

বকুলের সঙ্গে হাসাহাসি করে বটে মনে শ্যামা কিন্তু ব্যথা পায়। শক্ত সমর্থ যুবক, একি ব্যাধি তার মনের। মেরুদণ্ডটা পর্যন্ত যে ওর গলিয়া গেল, সুযোগ পাইয়া কি ব্যবহারটাই বাড়ির লোকে করে ওর সঙ্গে, নিজের মনুষ্যত্ব যে বিসর্জন দিয়াছে কে তাকে মানুষ জ্ঞান করিবে, দোষ কারো নাই।

আচ্ছা, শামুর জন্য বিধানও যদি অমনি হইয়া যায়? অমনি উন্মাদ? ও ভগবান, শ্যামা তবে নিজেই পাগল হইয়া যাইবে!

অনেক ভাবিয়া শ্যামা শেষে একদিন বকুলকে বলে, শোন খুকী বলি, ছাখ, শামুকে যদি খোকার পছন্দ হয়ে থাকে, ওর সঙ্গেই না হয় দিই খোকার বিয়ে? স্বঘর তো, দোষ কি।

বকুল স্তম্ভিত হইয়া যায়, বলে, ক্ষেপেছ নাকি তুমি মা, কি বলছ তার ঠিক ঠিকানা নেই, ওই মেয়ের সঙ্গে তুমি বিয়ে দিতে চাও দাদার। শামু ভাল নয় মা—সয়তানের একশেষ। এমন কথা মনেও ঠাঁই দিও না।

কি হইবে তবে? একদিন শ্যামু না আসিলে বিধান যে উসখুস করিতে থাকে। শামুর হাসির হিল্লোলে সংসার যে শ্যামার ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে!

ভগবান মুখ তুলিলেন।

অনেক দুঃখ শ্যামা পাইয়াছে, আর কি তিনি তাকে কষ্ট দিতে পারেন। একদিন বিধান বলিল, শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম মা, আমাদের বাড়িটা দেখে আসতে ইচ্ছে হ'ল, গিয়ে দেখি ভাড়ার নোটিশ ঝুলছে। যাবে ও বাড়িতে?

আমাদের বাড়ি! আজও সে-বাড়ির কথা বলিতে ইহারা বলে আমাদের বাড়ি!

শ্যামা সাগ্রহে বলিল, সত্যি খোকা?—যাব, চল সামনের মাসেই আমরা চলে যাই, পয়লা তারিখে।

সামনের মাসে পয়লা তারিখে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহারা বাড়ি বদলাইয়া ফেলিল। বিধান ছুটি লইল একদিনের। সকালে একা গিয়া জিনিষপত্র রাখিয়া আসিতে বেলা তার বারোটা বাজিয়া গেল। শামু আর বিভা দুজনেই তখন স্কুলে গিয়াছে, বাড়িওয়ালার ছেলেরা গিয়াছে আপিস,

বনবিহারী গিয়াছে ওষুধ ক্যানভাস করিতে। দুপুরে এখানেই পাতা পাতিয়া তাহারা ভাত খাইল। তারপর বাকি জিনিসপত্র সমেত রওনা হইয়া গেল সহরতলীর সেই বাড়ির উদ্দেশে, শ্যামার জীবনের দুটি যুগ যেখানে কাটিয়াছিল।

তেমনি আছে ঘরবাড়ি শ্যামার। এবাড়ি হইতে সে যখন বিদায় লইয়াছিল তখন বাড়টা শুধু ছিল একটু বিবর্ণ, বাড়ির মালিক এখন আগাগোড়া চুণকাম করিয়াছে, রঙ দিয়াছে। শ্যামা সোজা উঠিয়া গেল উপরে। উপরের ঘর-খানাকে আর নূতন বলিয়া চেনা যায় না, বাড়ির বাকি অংশের সঙ্গে মিশ খাইয়া গিয়াছে। নকুড় বাবু দোতলায় ঘর তুলিয়াছে একখানা। রেলের বাঁধটার খানিকটা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। আর কিছুই বদলায় নাই। ধানকলের বিস্তৃত অঙ্গনে তেমনি ধান মেলা আছে, পায়রার ঝাঁক তেমনি খাইতেছে ধান, উঁচু চোঙাটা দিয়া তেমনি অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যাইতেছে বাতাসে।

দশ

বকুলের একটি মেয়ে হইয়াছে।

প্রথম বারেই মেয়ে? তা হোক! শ্যামার শেষবারের মেয়ের মত ওতো অন্ধ হইয়া জন্মায় নাই, বকুলের চেয়েও ওর বুঝি চোখ দুটি ডাগর! কাজল দিতে দিতে ওই চোখ যখন গভীর কালো হইয়া আসিবে দেখিয়া অবাক মানিবে মানুষ। কি আসিয়া যায় প্রথমবার মেয়ে হইলে, মেয়ে যদি এমন ফুটফুটে হয়, এমন অপরূপ চোখ যদি তার থাকে?

শ্যামার একটু ঈর্ষা হইয়াছিল বৈকি! বকুলের মেয়ের চোখ আশ্চর্য সুন্দর হোক শ্যামার তাতে আনন্দ, আহা তার মেয়েটির চোখ দুটি যদি অন্ধ না হইত!

বকুলের মেয়ে মানুষ করে শ্যামা, প্রসবের পর বকুলের শরীরটা ভাল যাইতেছে না, তা ছাড়া সন্তান পরিচর্যার সে কি জানে? নিজের মেয়ে, বকুল আর বকুলের মেয়ে, শ্যামা তিনজনেরই সেবা করে। বকুলের মেয়ে আর নিজের মেয়েকে হয়ত সে কোনাদন কাছাকাছি শোয়াইয়া রাখে, বকুলের মেয়ে তাকায় বড় বড় চোখ মেলিয়া, শ্যামার মেয়ের অন্ধ আঁখি দুটিতে পলকও পড়ে না,—পলক পড়বে কিসে, চোখের পাতা যে মেয়েটার জড়ানো। শ্যামার মনে পড়ে বাদুর কথা—মন্দার সেই হাবা মেয়েটা, দিনরাত যে শুধু লালা ফেলিত। এমন সন্তান কেন হয় মানুষের,—অন্ধ, বোবা, অঙ্গহীন, বিকল? কেন এই অভিশাপ মানুষের? এক একবার শ্যামার মনে হয়, হয়ত বকুলের মেয়ে তার মেয়ের চোখ দুটি হরণ করিয়াছিল তাই ওর ডবল চোখের মত অতবড় চোখ হইয়াছে! তারপর সবিষাদে শ্যামা মাথা নাড়ে। না, এসব অন্যায় কথা মনে আনা উচিত নয়। কিসে কি হইয়াছে কে তা জানে, সত্য মিথ্যা কিছুতো জানিবার উপায় নাই, আবোল তাবোল যা তা ভাবিলে বকুলের মেয়ের চোখ দুটির যদি কিছু হয়! প্রথম সন্তান বকুলের, বড় সে আঘাত পাইবে।

মেয়ের ৬মাস বয়স করিয়া বকুল শ্বশুরবাড়ি গেল। যাওয়ার আগে কি কান্নাই যে বকুল কাঁদিল। বলিল, চেহারা তোমার বড্ড খারাপ হয়েছে মা, এবার তাকাও একটু শরীরের দিকে, এখনও এত খাটুনি তোমার সইবে কেন এ শরীরে? বিয়ে দিয়ে বৌ আনো এবার দাদার, সারাজীবন তো প্রাণ দিয়ে করলে সকলের জন্যে এবার যদি না একটু সুখ করে নেবে—

বলিল, আমার যেমন কপাল! সেবা নিয়েই চললাম, তোমার কাছে থেকে একটু যে যত্ন করব তা কপালে নেই?

কি গিন্নিই বকুল হইয়াছে। ছাঁচে ঢালা হইয়া আসিতেছে তাহার চালচলন, কথার ধরণ! যেন দ্বিতীয় শ্যামা।

শীতকাল। বকুল শ্বশুরবাড়ি গেল শীতকালে। শীতে সংসারের কাজ করিতে এবছর শ্যামার সত্যই যেন কষ্ট হইতে লাগিল! ছেলেকে আপিসের ভাত দিতে হয়, শীতের সকাল দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া যায়, খুব ভোরে উঠিতে হয় শ্যামার। আগুনের আঁচে রান্না করিয়া আসিয়া রাত্রে লেপের নীচে গা যেন শ্যামার গরম হইতে চায় না, যত সে জড়সড় হইয়া শোয় হাতে পায়ে কেমন একটা মোচড় দেওয়া ব্যথা জাগে, কেমন একটা কষ্ট হয় তাহার। ভোরে এই কষ্ট দেহে লইয়া সে লেপের বাহিরে আসে, আঁচল গায়ে জড়াইয়া হিহি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নিচে যায়! ঠিকা ঝি আসিবে বেলায়, তার আগে কিছু কিছু কাজ শ্যামাকে আগাইয়া রাখিতে হয়। বিধান বাহিরের ঘরে শোয়! ঝি আসিয়া ডাকাডাকি করিলে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়—শ্যামা তাই আগে সন্তর্পণে সদর দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া আসে! ঘুম সে ভাঙায় মণির। মণির পরীক্ষা আসিতেছে, নিচের যে ঘরে আগে শ্যামা সকলকে লইয়া থাকিত, সেই ঘরে মণি একা থাকে—পড়াশোনা করে, ঘুমায়। ভোর ভোর ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতে বড় মমতা হয় শ্যামার কিন্তু আজও তো তার কাছে ভবিষ্যতের চেয়ে বড় কিছু নাই, জোর করিয়া মণিকে সে তুলিয়া দেয়। বলে, ওঠ, বাবা ওঠ, না পড়লে পরীক্ষায় যে ভাল নম্বর পাবিনে?

মণি কাতর কণ্ঠে বলে, আর একটু ঘুমোই মা, কত রাত পর্যন্ত পড়েছি জানো?

জানে না! শ্যামা জানে না তার ছেলে কত রাত অবধি

পড়িয়াছে। দোতলা একতলার ব্যবধান কি ফাঁকি দিতে পারে শ্যামাকে!—কতবার উঠিয়া আসিয়া সে উঁকি দিয়া গিয়াছে মণি তার কি জানে!

একটু চা বরঞ্চ তোকে করে দি চুপি চুপি, খেয়ে চাঙ্গা হয়ে পড়তে সুরু কর। ড়ে শুনে মানুষ হয়ে কত ঘুমোবি তখন—ঘুম কি পালিয়ে যাবে!

কনকনে হাড় কাঁপানো শীত, বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল যেবার পালাইয়া গিয়াছিল সেবার ছাড়া শীত শ্যামাকে কোনবার এমন কাবু করিতে পারে নাই। উনানে আঁচ দিয়া ভালের হাঁড়িটা মাজিতে বসিয়া হাত পা শ্যামার যেন অবশ হইয়া আসে। কি হইয়াছে দেহটার? এই ভাল থাকে এই আবার খারাপ হইয়া যায়? মাঝে মাঝে এক একদিন তো শীত লাগে না, ঝরঝরে হাল্কা মনে হয় শরীরটা, আবছা ভোরে ঘুমন্ত-পুরীতে মনের আনন্দে কাজে হাত দেয়? কোনদিন মনে হয় বয়সটা আজো পঁচিশের কোঠায় আছে, কোনদিন মনে হয় একশো বছরের সে বুড়ী! এমন অদ্ভুত অবস্থা হইল কেন তাহার?

রোদের সঙ্গে বিধান ওঠে। এখুনি সে ছেলে পড়াইতে বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু তাহার হৈ চৈ হাঁক ডাক নাই। নিঃশব্দে মুখ হাত ধুইয়া জামা গায়ে দেয়, নীরবে গিয়া রান্না ঘরে বসে, শ্যামা যদি বলে, ডালটা হয়ে এল, নামিয়ে রুটি সেঁকে দি?—সে বলে না দেরি হইয়া যাইবে, আগে রুটি চাই। দুটো একটা কথা সে বলে, বেশির ভাগ সময় চুপ করিয়া ভোরবেলাই শ্যামার শ্রান্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া থাকে। সে বুঝিতে পারে শ্যামার শরীর ভাল নয়, ভোরে উঠিয়া সংসারের কাজ করিতে শ্যামার কষ্ট হয়, কিন্তু কিছুই সে বলে না। মুখের কথায় যার প্রতিকার নাই সে বিষয়ে কথা বলিতে বিধানের ভাল লাগে না। ভোরে উঠিতে বারণ করিলে শ্যামা কি শুনিবে?

বিধান চলিয়া গেলে খানিক পরে শ্যামা দোতালায় যায়, এতক্ষণে ছাদে রোদ আসিয়াছে। জানালা খুলিয়া দিতে শীতলের গায়ে রোদ আসিয়া পড়ে। শীতল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, কটা বাজল গা?

শ্যামা বলে, আটটা বাজে।—শীতলকে শ্যামা ধরিয়া তোলে, জানালার কাছে বালিশ সাজাইয়া তাহাকে রোদে ঠেস দিয়া বসায়, লেপ দিয়া ঢাকিয়াও দেয় গলা পর্যন্ত। শরীরটা শীতলের ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দুর্বল পা'টি তাহার ক্রমে ক্রমে একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে, আর সারিবে না। দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও দুর্বল হইয়া আসিতেছে, ক্রমে ক্রমে তারাও নাকি অবশ হইয়া যাইবে,—যাইবেই। কে জানে সে কতদিনে? শ্যামা ভাবিবারও চেষ্টা করে না। জীবনের অধিকাংশ পথ সেও তো অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, ভাবিবার বিষয়বস্তু খানিক খানিক বাছিয়া লইবার শক্তি তাহার জন্মিয়াছে—কত অভিজ্ঞতা শ্যামার, কত জ্ঞান। সধবা থাকিবার জন্য এ বয়সে আর নিরর্থক লড়াই করিতে নাই। এ তো নিয়মের মত অপরিহার্য। আশা যদি থাকিত, শ্যামা কোমর বাঁধিয়া লাগিত শীতলের পিছনে অবশ পা'টিকে সবল করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া দিত।

মিছামিছি হল্লা শ্যামা আর করিতে চায় না। ক্ষমতাও নাই শ্যামার—অর্থহীন উদ্বেগ, ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যয় করিবার মত জীবনীশক্তি আর কই? কতকাল পরে সে সুখের মুখ দেখিয়াছে। এবার সংসারের বাঁধা নিয়মে যতখানি আনন্দ ও শান্তি তাহার পাওয়ার কথা সে শুধু তাই খুঁজিবে, যেদিকে দুঃখ ও পীড়ন চোখ বুজিয়া সেদিকটাকে করিবে অস্বীকার।

ভাল কথা। শ্যামার এতটুকু প্রার্থনা অনুমোদন করিবে কে? স্বামীর আগামী মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করুক, ক্ষমা সে পাইবে সকলের। কিন্তু সন্তানের কথা এত সে ভাবিবে কেন? ঝড়ঝাপ্টা আসিলে ওদের আড়াল করিবার জন্য আজও সে থাকিবে কেন উদ্যত হইয়া? পঙ্গু স্বামীর কাছে বসিয়া খুকির অন্ধ চোখ দু'টি দেখিতে দেখিতে কেন সে হিংসা করিবে বকুলের মেয়ের পদ্মপলাশ আঁখি দু'টিকে? একি অন্যায় শ্যামার! জননী হিসাবে শ্যামা তো দেবীর চেয়েও বড়, এত সে মন্দ স্ত্রী কেন? শ্যামার এ পক্ষপাতিত্ব সমর্থনের যোগ্য নয়।

শীতলের অবস্থার জন্য শ্যামার মনে সর্বদা আকুল বেদনা না থাকাটা হয়ত দোষের, তবে সেবাযত্নে শীতলকে সে খুব আরামে রাখে, শীতলের কাছে থাকিবার সময় এত সে শান্ত এত তার সন্তোষ যে রোগযন্ত্রণার মধ্যে শীতল একটু শান্তি পায়। আদর্শ পত্নীর মত স্বামীর অসুখে শ্যামা যে উতলা নয়, এইটুকু তার সুফল।

খুকিকে দুধ দিয়া শ্যামা নিচে যায়। পথ্য আনে শীতলের। ঘটিভরা জল দেয়, গামলা আগাইয়া ধরে, বিছানায় বসিয়া মুখ ধোয় শীতল। মুখ মোছে শ্যামার আঁচলে। কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফে শীতলের মুখ ঢাকিয়া গিয়াছে, ঋষির মত দেখায় তাহাকে। দীর্ঘ তপস্যা যেন সাঙ্গ হইয়াছে, এবার মহামৃত্যুর সমাধি আসিবে।

কখন? কেহ জানে না। শ্যামা কাজের ফাঁকে ফাঁকে শতবার উপরে আসে, ডাক্তার বলিয়াছে শেষ মুহূর্ত আসিবে হঠাৎ, সে সময়টা কাছে থাকিবার ইচ্ছা শ্যামার।

মোহিনী মাঝে মাঝে আসে।

ওরা ভাল আছে বাবা? বকুল আর খুকি?

চিঠি পান নি মা?—মোহিনী জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা একগাল হাসিয়া বলে, হ্যাঁ বাবা, চিঠি তো পেয়েছি

—পরশু পেয়েছি যে চিঠি। লিখেছে বটে ভালই আছে—এমনি দশা হয়েছে বাবা আমার, সব ভুলে যাই। কখন কোথায় কি রাখি আর খুঁজে পাইনে, খুঁজে খুঁজে মরি সারা বাড়িতে।

বিধানবাবুর বিয়ে দেবেন না মা?—মোহিনী এক সময় জিজ্ঞাসা করে। বকুল বুঝি চিঠি লিখিয়াছে তাগিদ দিতে। এই কথা বলিতেই হয়ত আসিয়াছে মোহিনী।

শ্যামা বলে, ছেলে যে বিয়ের কথা কানে তোলে না বাবা? বলে মাইনে বাড়ুক। ছেলের মত নেই, বিয়ে দেব কার?

এ বাড়িতে আসিয়া বিবাহের জন্য ছেলেকে শ্যামা যে পীড়াপীড়ি করিয়াছে তা নয়, ভয়ে সে চুপ করিয়া আছে, ধরিয়া লইয়াছে বিবাহ বিধান এখন করিবে না। এর মধ্যে শামুকে বিধান কি আর ভুলিতে পারিয়াছে? যে মায়াজাল ছেলের চারিদিকে কুহকী মেয়েটা বিস্তার করিয়াছিল কয়েক মাসে তাহা ছিন্ন হইবার নয়। শামুর অজস্র হাসি আজও শ্যামার কানে লাগিয়া আছে। এখন ছেলেকে বিবাহের কথা বলিতে গিয়া কি হিতে বিপরীত হইবে? যে রহস্যময় প্রকৃতি তাহার পাগল ছেলের, কিছুদিন এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

মোহিনী বলে, বিধানবাবুর অমত হবে না মা, আপনি মেয়ে দেখুন।

মোহিনীর বলার ভঙ্গিতে শ্যামা অবাক হইয়া যায়। এত জোর গলায় মোহিনী কি করিয়া ঘোষণা করিতেছে বিধানের অমত হইবে না? বিধানের মন সে জানিল কিসে?

তারপর মোহিনী কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। বলে যে ক'দিন আগে বিধান গিয়াছিল তাহার কাছে, বিবাহের ইচ্ছা জানাইয়া আসিয়াছে।

যেচে বিয়ে করতে চান শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মা, তারপর ভেবে দেখলাম কি জানেন,—আপনার শরীর ভাল নয় কাজকর্ম করতে কষ্ট হয় আপনার! ভেবে চিন্তে তাই সম্মত হয়েছেন। ওসব কিছু বললেন না অবিশ্যি, বলবার মানুষ তো নন,—

শ্যামা জানে না! পড়া ছাড়িয়া বিধান একদিন হঠাৎ চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিল, আজ বিবাহে মত দিয়াছে। সেদিন অভাবে অনটনে শ্যামা পাগল হইতে বসিয়াছিল, আজ সংসারের কাজ করিতে তাহার কষ্ট হইতেছে। সেবার বিধান ত্যাগ করিয়াছিল বড় হওয়ার কামনা, এবার ত্যাগ করিয়াছে মত। শুধু মত হয়ত নয়। মত আর শামুর স্মৃতি হয়ত আজও একাকার হইয়া আছে ছেলের মনে।

তা হোক, ছেলেরা এমনি ভাবেই বিবাহে মত দিয়া থাকে, মায়ের জন্য। নহিলে স্বপন দেখিবার বয়সে কেহ কি সাধ করিয়া বিবাহের ফাঁদে পড়িতে চায়। তারপর সব ঠিক হইয়া যায়। বৌএর দিকে টান পড়িলে তখন আর মনেও থাকে না কিসের উপলক্ষে বৌ আসিয়াছে, কার জন্য। চোখের জলের মধ্যে শ্যামা হাসে। খুঁজিয়া পাতিয়া ছেলের জন্য বৌ সে আনিবে পরীর মত রূপসী, যার জন্য বিবাহ করিতে হইয়াছিল বলিয়া দু'দিন পরে আর আপশোষ থাকিবে না ছেলের—মনে থাকিবে না শামুকে।

শ্যামার মনে আবার উৎসাহ ভরিয়া আসিল। জীবনে কাজ তো এখনো তার কম নয়! আনন্দ উৎসবের পথ তো খোলা কম নয়! এত সে শান্ত হইয়া গিয়াছিল কেন? কত বড় সংসার গড়িয়া উঠিবে তাহার। এখনি হইয়াছে কি! বিধানের বৌ আসিবে, মনির বৌ আসিবে, ফণীর বৌ আসিবে,—যে ঘরে ওদের সে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে এক একটি শুভদিনে আসিতে থাকিবে নাতিনাতনির দল। দোতালায় সে আরও ঘর তুলিবে, পিছন দিকের উঠানে দালান তুলিয়া আরও বড় করিবে বাড়ি! অত বড় বাড়ি তাহার ভরিয়া যাইবে নবীন নরনারীতে—ও-বাড়ির নকুড় বাবুর শাশুড়ির মত মাথায় শনের নুড়ি ঝুলাইয়া কুঁজো হইয়া সে দাড়াইয়া থাকিবে জীবনের সেই বিচিত্র উজ্জ্বল আবর্তের মাঝখানে।

সবই তো এখনো তাহার বাকি?

কেবল একটা দুঃখ তাহাকে আজীবন দহন করিবে। তার অন্ধ মেয়েটা। ওর জন্য অনেক চোখের জল ফেলিতে হইবে তাহাকে!

শ্যামা মেয়ে খুঁজিতে লাগিল। সুন্দরী, সদ্বংশজাতা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, কিছু কিছু গানবাজনা লেখাপড়া সেলাইএর কাজ জানা, চোদ্দ পনর বছর বয়সের একটি মেয়ে। খানিকটা শামুর মত, খানিকটা শ্যামার ভাড়াটে সেই কনকের মত আর খানিকটা শ্যামার কল্পনার মত হইলেই ভাল হয়। টাকা শ্যামা বেশি চায় না, অসম্ভব দাবী তার নাই।

কয়েকটি মেয়ে দেখা হইল, পছন্দ হইল না। তারপর পাড়ার একবাড়ির গৃহিনী, শ্যামার সঙ্গে তার মোটামুটি আলাপ ছিল, একটি খুব ভাল মেয়ের সন্ধান দিলেন। শহরের অপরপ্রান্তে গিয়া মেয়েটিকে দেখিবামাত্র শ্যামা পছন্দ করিয়া ফেলিল। বড় সুন্দরী মেয়েটি, যেমন রঙ তেমনি নিখুঁত মুখ চোখ। আর কোমল আর ক্ষীণ আর ভীরু। শ্যামাকে যখন সে প্রণাম করিল মনে হইল দেহের ভার তুলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, এমন নরম সে মেয়ে, এত তার কোমলতা।

মেয়ে পছন্দ করিয়া শ্যামা বাড়ি ফিরিল। সে বড় খুসি হইয়াছে! এমন মেয়ে যে খুঁজিলেও মেলে না! কি রূপ, কি নম্রতা! ওর কাছে কোথায় লাগে শামু?

মোহিনীর সঙ্গে বিধানকে সে একদিন জোর করিয়া মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া মোহিনী বলিল, না মা, পছন্দ হল না মেয়ে।

শ্যামা যেন আকাশ হইতে পড়িল।

কার পছন্দ হল না, তোমার?

আমার পছন্দ হয়েছে। বিধানবাবুর পছন্দ নয়?

পছন্দ নয়? ওই মেয়ে পছন্দ নয় বিধানের? বাংলাদেশ খুঁজিলে আর অমন মেয়ে পাওয়া যাইবে? বিধান বলে কি?

কেন পছন্দ হল না খোকা?

বিধান বলিল, দূরে, ওটা মানুষ নাকি? ফুঁ দিলে মটকে যাবে।

না, শামুকে ছেলে আজও ভোলে নাই। শামুর নিটোল গড়ন, শামুর চপল চঞ্চল চলা-ফেরা, শামুর নির্লজ্জ দুরন্তপনা আজও ছেলের দৃষ্টিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, আর কোনো মেয়েকে তার পছন্দ হইবে না। শ্যামার মুখে বিষাদ নামিয়া আসে। ফুঁ দিলে মটকাইয়া যাইবে? মেয়েমানুষ আবার ফুঁ দিলে মটকায় নাকি! শামুর মত সবল দেহ থাকে কটা মেয়ের? থাকা ভালও নয়। কাঠ কাঠ দেখায়, পাকা পাকা দেখায়, অসময়ে সর্বাঙ্গে যৌবন আসিলে কি বিসদৃশ দেখায় মেয়েমানুষকে বিধান তার কি জানে? ও যে ধ্যান করিতেছে শামুর, শামুর পুরস্ত সুঠাম দেহটা যে চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ওর।

লজ্জায় দুঃখে ছেলের মুখের দিকে শ্যামা চাহিতে পারে না। রূপ ও সুষমাই যথেষ্ট নয়, ছেলে তার যৌবন চায়। দেহ অপরিপুষ্ট হইলে ছবির মত সুন্দরী মেয়েও ওর পছন্দ হইবে না। ছি, একি রুচি বিধানের?

ওরকম বৌ আসিলে শ্যামা তো তাকে ভালবাসিতে পারিবে না।

আবার মেয়ে খোঁজা হইতে লাগিল। মেয়ে খুঁজিতে খুঁজিতে কাবার হইয়া গেল মাঘ মাস।

ফাল্গুনের গোড়ায় শীত কমিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা সতেজে সুস্থ হইয়া উঠিল।

ফাল্গুনের শেষের দিকে বাগবাজারের উকিল হারাধন বাবুর মা-হারা মেয়েটার সঙ্গে বিধানের বিবাহ হইয়া গেল। মেয়ের নাম সুবর্ণলতা।

শ্যামা যা ভাবিয়াছিল তাই। মস্ত ধাড়ি মেয়ে, যৌবনের জোয়ার নয় একেবারে বান ডাকিয়াছে! রঙ মন্দ নয়, মুখ চোখ মন্দ নয়, কিন্তু শ্যামার চোখে ওসব পড়িল না, সে সভয়ে শুধু বৌএর সুস্থ ও সুন্দর শরীরটি দেখিয়া মনে মনে সকাতর হইয়া রহিল।

বাড়ন্ত বৌ এনেছ, না গো?—বলিল সকলে।

হ্যাঁ বাছা, জেনে শুনেই এনেছি, ছোট মেয়ে ছেলেরও পছন্দ নয়, আমারও নয়। একা আর পেরে উঠিনে মা সংসারের ঘানি টানতে, বড় সড় বৌটি এল শেখাতে হবে না কিছু, নিজেই সব পারবে।—বলিয়া শ্যামা কষ্টে একটু হাসিল।

তা, মন্দ কি হয়েছে বৌ? প্রিতিমের মত মুখখানা। সকলে বলিল।

তাই নাকি? শ্যামা ভাল করিয়া সুবর্ণের মুখের দিকে চাহিল। তা হইবে!

বিবাহ উপলক্ষে বকুল আসিয়াছিল, রাখালের সঙ্গে মন্দাও আসিয়াছিল। বকুল আসিয়াছিল তিন দিনের জন্য, বিবাহের হৈ চৈ থামিবার আগেই সে চলিয়া গেল। বৌকে ভাল লাগিয়াছে বকুলের। যাওয়ার সময় এই কথা সে শ্যামাকে বলিয়া গেল।

শ্যামা বলিল, তোর কি পছন্দ বুঝিনে বাবু, এত কি ভাল যে একেবারে গদগদ হয়ে গেলি?

বকুল বলিল, দেখো, ও বৌ যদি ভাল না হয় কান কেটে নিও আমার, মা-মরা মেয়ে একটু আদরযত্ন পাবে যার কাছে প্রাণ দেবে তার জন্যে। কি বলছিল জান? বলছিল তুমি নাকি ওর মার মত।

তাই নাকি? তা হইবে!

বকুল চলিয়া গেল, বৌ চলিয়া গেল, বিবাহ বাড়ি নিঝুম হইয়া আসিল, রহিয়া গেল মন্দা। এই তো সেদিন শ্যামা মন্দার আশ্রয় ছাড়িয়া আসিয়াছে, দাসীর মত খাটিয়াছে মন্দার সংসারে, অহোরাত্র মন যুগাইয়া চলিয়াছে, সে স্মৃতি ভুলিবার নয়। একবিন্দু কৃতজ্ঞতা নাই শ্যামার, মন্দা রহিয়া গেল বলিয়া সে এতটুকু কৃতার্থ হইয়া গেল না। কয়েক বছর আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া শ্যামার কাছে কি সমাদর মন্দা আশা করিয়াছিল সেই জানে, বোধ হয় ভাবিয়াছিল আজও শ্যামার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। কিন্তু সে না পাইল মনের মত সমাদর, না পারিল কোনদিকে কর্তৃত্ব করিতে। শ্যামার সংসারে কি কর্তৃত্ব আর সে করিতে চাহিবে, ভাল করিয়া আবার শীতলের চিকিৎসা করানোর জন্যই তাহার উৎসাহ দেখা গেল সব চেয়ে বেশি। বলিল, রয়ে কি গেলাম সাধে? কি করে রেখেছ তোমরা দাদাকে। দাদাকে ভাল না করে আমি এখান থেকে নড়ছিনে বৌ!

কত সে দরদী বোন, কত তার ভাবনা। কে জানে, হইতেও পারে। আজ তো সপুত্র সকন্যা শ্যামার ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, কিছুই তো ওদের জন্য আর তাহাকে করিতে হইবে না, শীতলের জন্য বয় তো! তাই আন্তরিক ব্যাকুলতাই মন্দার জাগিয়াছে। শ্যামাকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

শ্যামা বলিল, ওর আর চিকিচ্ছে নেই ঠাকুরঝি, ওর চিকিচ্ছে এখন সেবাযত্ন।

মন্দা স্তম্ভিত হইয়া বলিল, মুখ ফুটে এমন কথা তুমি বলতে পারলে বৌ! তুমি কি গো, এ্যাঁ?

শ্যামা বলিল, কি বলতে হবে তুমিই না হয় ভেবে বলে দাও?

মন্দা রাগিয়া উঠিল, কাঁদিয়াও ফেলিল। কে জানে অকৃত্রিম বেদনায় মন্দা কাতর হইয়াছে কিনা। এতো অর্থ

সাহায্যের কথা নয়, ভারবহনের কথা নয়, ভাইএর জীবন তাহার। চিকিৎসা নাই, ভাই তাহার বাঁচিবে না? মন্দার হয় তো ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। শীতলের অসংখ্য পাগলামি আর অজস্র স্নেহ,—বড় ভালবাসিত শীতল তাহাকে। সেই দিনগুলি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই বাড়িতেই সে সব ঘটিয়াছিল। এখানে বসিয়া অনায়াসে কল্পনা করা চলে সে সব ইতিহাস। হয় তো তাই মন্দার কান্না আসে।

বলে, দাদার জন্যে কিছুই করবে না তুমি? ডাক্তার কবরেজ দেখাবে না?

শ্যামা বলে, ডাক্তার কি দেখানো হয় নি ঠাকুরঝি? ডাক্তার না দেখিয়ে চুপ করে বসে আছি আমি? ষোল টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার এনেছি, কলকাতার সেরা কবরেজকে দেখিয়েছি—জবাব দিয়েছে সবাই। আমি আর কি করব?

তবে আর কি, কর্তব্য করেছ এবার টান দিয়ে ফেলে দাও দাদাকে রাস্তায়! আজ বুঝতে পারছি বৌ দাদা কেন বিবাগী হয়ে গিয়েছিল।

এতকাল পরে মন্দা তবে শ্যামাকে চিনিতে পারিয়াছে?

শীতলের পায়ের কাছে বসিয়া মন্দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। চমকাইয়া উঠিয়া বড় ভয় পায় শীতল। দাড়ির ফাঁকে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, আমার সেই কুকুরটা আছে মন্দা?

দাদা গো! বলিয়া মন্দা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

শীতল থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। মনে হয় আর কিছুদিন যদি বা সে বাঁচিত মন্দার বুকফাটা কান্নায় এখুনি মরিয়া যাইবে। বড় কষ্ট হয় শীতলের, বড় ভয় করে। বড় বড় কালো লোমশ পা ফেলিয়া নিজের মরণকে সে যেন আগাইয়া আসিতে দেখিতে পায়! বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে মন্দার দিকে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শ্যামা বলে, ঠাকুরঝি, শোন, বাইরে এসো একবার—

সকলেই বুঝিতে পারে মরণাপন্ন মানুষের কাছে এভাবে কাঁদিতে নাই এই কথা বলিতে চায় শ্যামা। মন্দা চোখ মুছিয়া উদ্ধত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া বসে। বেশ করিয়াছে কাঁদিয়া। শীতলও বুঝি তাই মনে করে। মন্দার আকস্মিক কান্নায় আঁতকাইয়া উঠিয়া তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তবু শ্যামার বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে যে দরদের কান্না মারিয়া ফেলার উপক্রম করে তাই বুঝি ভাল শীতলের কাছে। কি উৎসুক সে মন্দার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ছেলেবেলা বকুল আর বনগাঁয় মন্দার সেই কুকুরটা ছাড়া এ জগতে সকলে ফাঁকি দিয়াছে শীতলকে।

দিন কুড়ি থাকিয়া মন্দা চলিয়া গেল। আসিল নববর্ষ আর গ্রীষ্ম। শীতের শেষে শ্যামার শরীরটা ভাল হইয়াছিল, গরমে আবার যেন সে দুর্বল হইয়া পড়িল। কাজ করিতে শ্রান্তি বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় হাত-পা চিবাইতে থাকে। কিন্তু কাহাকেও সে তাহা বুঝিতে দেয় না, চুপ করিয়া থাকে।

কেন, দুর্বল শরীরে খাটিয়া মরে কেন শ্যামা? তার সেবা করার জন্য ছেলে না তার বিবাহ করিয়াছে? বৌকে আনাইয়া লইলেই তো এবার সে অনায়াসে বসিয়া বসিয়া আয়াস করিতে পারে। কিন্তু কেন যেন বৌকে আনিবার ইচ্ছা শ্যামার হয় না! না আনিলে অবশ্য চলিবে না, ছেলের বৌকে কি বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখা যায় চিরদিন? যাক, দুদিন যাক্!

একদিন বিধান আপিস গিয়াছে, কোথা হইতে রঙীন খাম আসিল একখানা, আকাশের মত নীল রঙের। শ্যামা অবাক হইয়া গেল। এর মধ্যে চিঠি লিখিতে সুরু করিয়াছে বৌ? ওদের ভাব হইল কবে? ক'দিনের বা দেখা-শোনা! বিধান লুকাইয়া লুকাইয়া যায় না তো শ্বশুরবাড়ি? নিজের মনে শ্যামা হাসে। লুকাইয়া শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ছেলেই বটে তার! কি লিখিয়াছে বৌ? চিঠিখানা সে বিধানের মশারির উপর রাখিয়া দিল।

বিধান আসিলে বলিল, তোর একখানা চিঠি এসেছে খোকা রেখে দিয়েছি মশারির ওপোর।

বিধান চিঠি পড়িয়া পকেট রাখিয়া দিল।

বাগবাজারের চিঠি বুঝি? ওরা ভাল আছে?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল। বিধান বলিল, আছে।

ছেলের সংক্ষিপ্ত জবাবে শ্যামা যেন একটু রাগ করিয়াই সরিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে একটা ছুটির দিনে শ্যামা একটু বিশেষ আয়োজন করিয়াছিল রান্নার। রাঁধিতে রাঁধিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রান্নাঘরের ভিতরটা অসহ্য গরম, শ্যামা যেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ওমনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। সামান্য ব্যাপার, মূর্ছাও নয়, সন্ন্যাস-রোগও নয় মাথায় একটু জলটল দিতেই শ্যামা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। বিধান কিন্তু তাহাকে সেদিন আর উঠিতে দিল না, শোয়াইয়া রাখিল। বিকালে বিধান বাহির হইয়া গেল। রাত্রি আটটার সময় ফিরিয়া আসিল সুবর্ণকে সঙ্গে করিয়া।

বিধানের নিষেধ অমান্য করিয়া শ্যামা তখন রাঁধিতে গিয়াছে। সুবর্ণ প্রণাম করিতে সে একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল!

একি রে খোকা? বলা নেই কওয়া নেই বৌমাকে নিয়ে এলি যে তুই? জিজ্ঞেস করা দরকার মনে করলি নে বুঝি একবার?

এরকম অভ্যর্থনার জন্য বিধান প্রস্তুত ছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল। সুবর্ণকে দেখিয়া শ্যামা খুসি হয় নাই? তার সেবা করার জন্য সে যে হঠাৎ বৌকে লইয়া আসিয়াছে এটা সে খেয়াল করিল না? বিধান দুঃখিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুবর্ণের কি হইল বোঝা গেল না।

শ্যামা মণিকে বলিল, যা ত মণি, তোর বৌদিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা গে।…কি সব কাণ্ড বাবা এদের

রাতদুপুরে চট করে নতুন বৌকে এনে হাজির—কিসে কি ব্যবস্থা হবে এখন?

বিধান ভয়ে ভয়ে বলিল, বাইরে তোমার বেয়াই বসে আছেন মা।

তাকেও এনেছিস? আমি পারবো না বাবু রাত দুপুরে রাজ্যের লোকের আদর আপ্যেন করতে, মাথা বলে ছিঁড়ে যাচ্ছে,—কি বলে ওদের তুই নিয়ে এলি খোকা? এক ফোঁটা বুদ্ধি কি তোর নেই?

কি রাগ শ্যামার! ছেলেবেলা যাকে সে ধমক দিতে ভয় পাইত সেই ছেলেকে কি তার শাসন! গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই সে রাঁধিতে রাঁধিতে আসিয়াছিল। সুবর্ণকে দেখিয়াই তার মাথা ধরিয়া গেল বেশ গা-হাত চিবাইতে আরম্ভ করিল, শ্যামার অন্ত পাওয়া ভার। কি শোচনীয় ভাবে তার মনের জোর কমিয়া গিয়াছে! তারই সেবার্থে পরিণীতা পত্নীকে তারই সেবার জন্য অসময়ে বিধান টানিয়া লইয়া আসিয়াছে,—শুধু অনুমতি নেয় নাই, আগে ছেলের এই কাণ্ডে শ্যামা কত কৌতুক বোধ করিত, কত খুসি হইত, আজ শুধু বিরক্ত হওয়া নয়, বিরক্তিটুকু চাপিয়া পর্যন্ত রাখিতে পারিতেছে না। এ আবার কি রোগ ধরিল শ্যামাকে? ছেলে একটি যৌবনোচ্ছলা মেয়েকে বাছিয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া জননীর কি এমন অবুঝ হওয়া সাজে।

ছেলে তো এখনো পর হইয়া যায় নাই? মেনকা উর্বশী তিলোত্তমার মোহিনী মায়াতেও পর হইয়া যাওয়ার ছেলে তো সে নয়? শ্যামা কি তা জানে না? এমন অন্ধ জ্বালাবোধ কেন তার?

বোধ হয় হঠাৎ বলিয়া, ওরা খবর দিয়া আসিলে এতটা হয়ত হইত না। ক্রমে ক্রমে শ্যামা শান্ত হইল। একবার পরণের কাপড়খানার দিকে চাহিল,—না, হলুদ-কালি-মাখা এ কাপড়ে কুটুমের সামনে যাওয়া যায় না।—যা ত' খোকা চট করে ওপোর থেকে একটা সাফ কাপড় এনে দে তো আমায়। কাপড় বদলাইয়া শ্যামা বাহিরের ঘরে গেল। হারাধন বিধানের বিছানায় বসিয়াছিল, শীর্ণদেহ লম্বাকৃতি লোক, হাতের ছাতিটার মত জরাজীর্ণ, দেখিতে অনেকটা সেই পরাণ ডাক্তারের মত।

শ্যামাকে দেখিয়া হারাধন বুঝি একটু অবাক হইল। বলিল, আহা আপনি কেন উঠে এলেন? কেমন আছেন এখন?

শ্যামা বলিল, খোকা বুঝি বলেছে আমার খুব অসুখ?

হারাধন বলিল, তাই তো বললে, গিয়ে একদণ্ড বসলে না, তাড়াহুড়ো করে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল,—কাপড় ক'খানা গুছিয়ে আনার সময়ও মেয়েটা পায় নি। মেয়ের মাসি কেঁদে মরছে, অমন করে কেউ মেয়ে পাঠাতে পারে বেয়ান?

বোঝা গেল, শ্যামাকে সুস্থ দেখিয়া হারাধন অসন্তুষ্ট হইয়াছে। হারাধনের অসন্তোষে শ্যামা কিন্তু খুসি হইল। মধুর কণ্ঠে বলিল, অমনি পাগল ছেলে আমার বেয়াই, আমার একটু কিছু হলে কি করবে দিশে পায় না। সকালে উনুনের ধার থেকে বাইরে এসে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, পড়ে গেলাম উঠানে, তাইতে ভড়কে গেছে ছেলে।—বড় তো কষ্ট হ'ল আপনাদের?

শ্যামা মিষ্টি আনাইল, খাইতে পীড়াপীড়ি করিল, হারাধন কিছু খাইল না। খাইতে নাই। বলিয়া গেল, নাতি হইলে যাচিয়া আসিয়া পাত পাড়িবে। হারাধনকে বিদায় করিয়া শ্যামা সুবর্ণের খোঁজে গেল।

কোথায় গেল সুবর্ণ? সে তো একতলায় নাই!

সিঁড়ি ভাঙিয়া শ্যামা উপরে গেল। শীতলের পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া সুবর্ণ বসিয়া আছে, তার কোলে শ্যামার অন্ধ মেয়েটি। থাবা পাতিয়া বসিয়া ফণী হাঁ করিয়া বৌদিদির মুখখানা দেখিতেছে, আহ্লাদে গদগদ হইয়া মণি কথা কহিতে গিয়া ঢোঁক গিলিতেছে। ধীরে ধীরে শীতল কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে সুবর্ণকে। সুবর্ণের মুখখানা ঈষৎ আরক্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চন্দনের স্বচ্ছ ফোঁটার মত।

ঘরের মেয়ে? তাই তো বটে! তার স্বামি-পুত্রের মাঝখানে ওকে তো অনভ্যস্ত, আকস্মিক আগন্তুক মনে হয় না। ঘরের মেয়ের মতই যে দেখাইতেছে সুবর্ণকে?

শ্যামা আগাইয়া গেল, বলিল, বৌমা, কিছু খাওনি বিকেলে, এসো তোমায় খেতে দি।

নতুন বৌএর আর ভাল মন্দ কি, সে তো শুধু এতকাল লজ্জা ভয় নম্রতা, তবু ওর মধ্যেই মনটা বোঝা যায়, সরল না কুটিল, কুড়ে না কাজের লোক। মা-হারা মেয়ে? কথাটা শ্যামার মনে থাকে না,—তুমিই আমার হারাণো মা, বলিয়া শ্যামার স্নেহের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিবার মেয়েও সুবর্ণ নয়, সে সরল কিন্তু বুদ্ধিমতী, কাজের মানুষ কিন্তু কুলরমণী নয়। দরকার মত একখানা দুখানা বাসন সে বাসন-মাজার মতই মাজিয়া আনে, কাজটুকু করিতে পাইয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে না যে মনে হইবে পুষ্প-চয়ন করিতে পাইয়াছে। শাশুড়ীর হাতের কাজ কাড়িয়া যে বৌ কাজ করে কোনো শাশুড়ীই তাকে দেখিতে পারে না, সুবর্ণ সে চেষ্টা করে না, স্বাভাবিক নিয়মে যে সব কাজ শ্যামার হাত হইতে খসিয়া তাহার হাতে আসে মন দিয়া সেইগুলিই সে করিয়া যায়, আর একটি সজাগ দৃষ্টি পাতিয়া রাখে শ্যামার মুখে, আলো নিভিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিবার উপক্রমেই চালাক মেয়েটা ত্রুটি সংশোধন করিয়া ফেলে।

নেহাৎ দোষ করিয়া ফেলিলে প্রয়োগ করে একেবারে চরম অস্ত্র! চোখ দুটা জলে টাবুটুবু ভর্তি করিয়া শ্যামার

সামনে মেলিয়া ধরে। ভাল করিয়া সুরু করার আগেই শ্যামার মুখের কথাগুলি জমিয়া যায়।

শ্যামা হঠাৎ সুর বদলাইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলে, আ আবাগের বেটি, এই কথাতে চোখে জল এল! কি আর বলেছি মা তোকে এ্যা?

চোখ! অশ্রুসজল চোখকে শ্যামা বড় ডরায়। মানুষের চোখের সম্বন্ধে সে বড় সচেতন। চোখে ছিল তার বকুলের আর চোখ হইয়াছে বকুলের মেয়েটার! শ্যামার মেয়েটি অন্ধ, এত যে আলো জগতে একটি রেখাও তার খুকির চেতনায় পৌঁছায় না। সজল চোখে চাহিয়া যে-কোন দৃষ্টিমতী শ্যামাকে সম্মোহন করিতে পারে।

বড় দোটানায় পড়িয়াছে শ্যামা।

ছেলের বৌটাকে ভালবাসিবে কি বাসিবে না।

এমনি মন্দ লাগে না, মায়া করিতে ইচ্ছা হয়, বকুল যে ফাঁকটা রাখিয়া গিয়াছে সুবর্ণকে দিয়া তাহা ভাবিয়া তুলিবার কল্পনা প্রিয়ই মনে হয় শ্যামার। কিন্তু হঠাৎ তাহার চমক ভাঙে, উঃ একি হিল্লোল তুলিয়া সামনে দিয়া হাঁটিয়া গেল বৌ, একি আগুন ওর দেহময়? এমন করিয়া কে ওকে গড়িয়াছিল, রক্তমাংসের এই মোহিনীকে? সুবর্ণ স্নান করে, চাহিয়া দেখিয়া শ্যামার বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া যায়। বড় ভয় করে শ্যামার। কে জানে ওর ওই ভয়ানক সুন্দর দেহের আকর্ষণে কোথা দিয়া অমঙ্গল ঢুকিবে সংসারে।

কড়া শীতে যেমন হইয়াছিল, চড়া গরম পড়িতে শ্যামার শরীর আবার তেমনি খারাপ হইয়া গেল। এবার একটা অতিরিক্ত উপসর্গ দেখা দিল—তিরিক্ষে মেজাজ। অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষে বকুনি ছাড়া কথা বলাই যেন সে বন্ধ করিয়া দিল। থাকে থাকে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে, যাকেই পায় তাকেই যত পারে বকে, তারপর অদৃষ্টের নিন্দা করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলে। শ্যামার ভয়ে বাড়িশুদ্ধ সকলের মুখ সর্বদা শুকনো দেখায়। সবচেয়ে মুস্কিল হয় সুবর্ণের। অন্য সকলে শ্যামার সম্মুখ হইতে পলাইয়া বাঁচে, তার তো পালানোর উপায় নাই। তার উপর বিধান আবার তাহাকে হুকুম দিয়া রাখিয়াছে, সব সময় কাছে কাছে থাকবে মার, যা বলেন শুনবে, আগুনের আঁচে বেশি যেতে দেবে না, ওপোর-নিচ করতে দেবে না, সেবাযত্ন করবে—মার শরীর ভাল নয় জানত? বিধান বলিয়া খালাস, সকালে উঠিয়া ছেলে পড়াইতে যায়, বাড়ি ফিরিয়াই ছোটে আপিসে, ফেরে সন্ধ্যার পর, সারাদিন শ্যামা কি কাণ্ড করে সে তো দেখিতে আসে না, সুবর্ণের অবস্থা সে কি বুঝিবে! কিছু বলিবার উপায়ও সুবর্ণের নাই। কি বলিবে? যদি বলিতে যায়, বিধনে যে ভাবিয়া বসিবে, দ্যাখো এর মধ্যে নালিশ করা সুরু হইয়াছে।

কিন্তু বিধান সব বোঝে। চিরকাল বুঝিয়া আসিয়াছে। সুবর্ণ এখনো জানে না যে বুঝিয়াও বিধান কোনদিন কিছু বলে না, চুপচাপ নিজের কাজ করিয়া যায়, চুপচাপ উপায় ঠাওরায়। বনগাঁয় শ্যামা একবার পাগল হইতে বসিয়াছিল এবারও সেই রকম আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া বিধান কম ভয় পায় নাই, প্রতিবিধানের কোন উপায় শুধু সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যঘটিত, শ্যামাকে লইয়া কোথাও চেঞ্জে যাইতে পারিলে ভাল হইত, কোন ঠাণ্ডা দেশে, দার্জিলিং অথবা সিমলা। সে অনেক টাকার কথা। অত টাকা কোথায় পাইবে সে?

সংসার চালানোর ভাবনাতেই এই বয়সে সে বুড়ো হইয়া গেল। এ বাড়িতে সে ছাড়া আর সকলেই বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে বাড়িটা পর্যন্ত তাদের নয়, মাসে মাসে ভাড়া গুণিতে হয় বিধানকে।

সত্যই কি শ্যামার আবার সেইরকম হইতেছে, বনগাঁয়ে যেমন হইয়াছিল, যেজন্য পড়া ছাড়িয়া চাকরি লইতে হইয়াছিল বিধানকে? শ্যামার চোখের দিকে তাকাও, বাহিরে দুরন্ত রোদের যেমন তেজ তেমনি জ্বালা শ্যামার চোখে। এ বুঝি জীবনব্যাপী দুঃখের অভিশাপ। আজীবন শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে সুরক্ষিত আশ্রয়ের আড়ালে বাস করিতে না পারিলে এমনি বুঝি হইয়া যায় অসহায়া নারী, আজীবন দুঃখ দুর্দ্দশার পীড়ন সহিয়া শেষে যখন সুখী হওয়ার সময় আসে তখন তুচ্ছ আবহাওয়ার উত্তাপেই গলিয়া যায়। আঁচল গায়ে জড়াইয়া শ্যামা কত শীত কাটাইয়া দিয়াছে, তিনটি উনানের আঁচে বসিয়া পার করিয়া দিয়াছে কত গ্রীষ্ম। এবার সে এত কাবু হইয়া গেল!

তারপর একদিন আকাশে ঘনঘটা আসিল। মাটি জুড়াইল, জুড়াইল মানুষ। বিকারের শেষের দিকে ধীরে ধীরে চুপ করিয়া মানুষ যে ভাবে ঘুমাইয়া পড়ে শ্যামাও তেমনি ভাবে ক্রমে ক্রমে শান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া আসিল।

সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তবু সুবর্ণকে শ্যামা পুরাপুরি সুনজরে দেখিতে পারিল না। একটা বিদ্বেষের ভাব রহিয়াই গেল। বিধান কত আদরের ছেলে শ্যামার, সাত বছর বন্ধ্যা থাকিয়া, প্রথম সন্তানকে বিসর্জ্জন দিয়া ওকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল,—সুবর্ণ তার বৌ! তবু সুবর্ণকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না, কি দুর্ভাগ্য শ্যামার।

শীতল তেমনি অবস্থায় এখনো বাঁচিয়া আছে, ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়। এতদিনে তার মরিয়া যাওয়ার কথা। মৃত্যু কিন্তু দু'টি একটি অঙ্গ গ্রাস করিয়া, সর্বাঙ্গের প্রায় সবটুকু শক্তি শুষিয়া তৃপ্ত হইয়া আছে, হঠাৎ কবে আবার ক্ষুধা জাগিবে এখনো কেহ তাহা বলিতে পারে না।

শ্যামা বলে, হ্যাঁ গা, বড় কি কষ্ট হচ্ছে? কি করবে বল দেখি? বৌমা বসবে একটু কাছে? গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে? কোন্‌খানে কষ্ট তোমার? ও মণি ডাকতো তোর

বৌদিকে, ওষুদ মালিশ করে দিয়ে যাক।—কোথায় যে যায়, ফাঁক পেয়েই কি ছেলের সঙ্গে ফুসফাস গুজগাজ করতে চলল—কি মন্ত্র দিচ্ছে কানে কে জানে।

সুবর্ণ ওষুদ মালিশ করিতে বসে।

শ্যামা বলে, দেখ তো মণি ও-বাড়ির ছাদে কে? নকুড়-বাবুর বাঁশিবাজানো ভাইটে বুঝি? দেতো দরজাটা ভেজিয়ে,—বৌমা, আরেকটু সামলে সুমলেই না হয় বসতে বাছা, একটু বেশি লজ্জা থাকলে ক্ষেতি নেই কারো।

সুবর্ণ জড়সড় হইয়া যায়, রাঙা মুখ নত করে। শ্যামা যখন এমনিভাবে বলে কোন উপায়ে মিশাইয়া যাওয়া যায় না শূন্যে?

ভাল লাগে না, বলিয়া শ্যামারও ভাল লাগে না! সুবর্ণের ম্লান মুখখানা দেখিয়া কত কি সে ভাবে! ভাবে, সে যদি আজ ওমনি বৌ হইত এবং আর কেহ যদি ওমনি করিয়া তাকে বলিত, কেমন লাগিত তার? বিধানের কানে গেলে কত ব্যথা পাইবে সে। মণি বড় হইতেছে, কথাগুলি তার মনে না-জানি কি ভাবে কাজ করে। একি স্বভাব, একি জিহ্বা হইয়াছে তার? কেন সে না বলিয়া থাকিতে পারে না? শ্যামা বাহিরে যায়। বর্ষার মেঘলা দিন। ধানকলের অঙ্গনে আর ধান মেলিয়া দেয় না, অতবড় অঙ্গনটা জনহীন, কুলিরমণী নাই, পায়রার ঝাঁক নাই। খুকিকে শ্যামা বুকের কাছে আরও উঁচুতে তুলিয়া ধরে। বিধানের বৌকে কি কটু কথা শ্যামা বলিয়াছে, কি বিষাদ শ্যামার মনে—দিগ্‌দিগন্ত চোখের জলে ঝাপ্সা হইয়া গেল।

আশ্বিনের গোড়ায় হারাধন মেয়েকে লইয়া গেল।

যাওয়ার সময় সুবর্ণ অবিকল মা-হারা মেয়ের মতই ব্যবহার করিয়া গেল। শ্যামা ভালবাসে না, শ্যামা কটু কথা বলে, তবু মনে হইল সুবর্ণ যাইতে চায় না, এখানে থাকিতে পারিলেই খুসি হইত। শ্যামা নির্বিবাদে ভাবিয়া বসিল, এ'টান বিধানের জন্য—সে যা ব্যবহার করিয়াছে তার জন্য সুবর্ণের কিসের মাথাব্যথা?

পূজার পরেই আমায় আনবেন মা।—সুবর্ণ সজল চোখে বলিয়া গেল।

শ্যামা শুধু বলিল, আনব।

বিধানের বৌ! সে বাপের বাড়ি যাইতেছে। বুকে জড়াইয়া একটু তো শ্যামা কাঁদিতে পারিত? কিন্তু কি করিবে শ্যামা, যাওয়ার জন্য সুবর্ণ তখন সাজগোজ করিয়াছে, বৌএর চোখ-ঝলসানো মূর্তির দিকে শ্যামা চাহিতে পারিতেছিল না, মনে হইতেছিল, যাক্, ও চলিয়া যাক্, দু'দিন চোখ দু'টা একটু জুড়াক শ্যামার।

পূজার সময় মন্দা আসিয়া কয়েকদিন রহিল। শীতলকে দেখিতে আসিয়াছে। মন্দার জন্য সুবর্ণকেও দু'দিন আনিয়া রাখা হইল। সুবর্ণ ফিরিয়া গেলে একদিন মন্দা বলিল, হ্যাঁ বৌ, একটা কথা বলি তোমায়, ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ বৌমার দিকে? আমার যেন সন্দেহ হ'ল বৌ।

শ্যামা চমকাইয়া উঠিল। তারপর হাসিয়া বলিল, না ঠাকুরঝি, ও তোমার চোখের ভুল।

মন্দার চোখের ভুলকে শ্যামা কিন্তু ভুলিতে পারিল না, দিবারাত্রি মনে পড়িতে লাগিল সুবর্ণকে আর মন্দার ইঙ্গিত। কি বলিয়া গেল মন্দা? সত্য হইলে শ্যামা কি অন্ধ, তার চোখে পড়িত না? শ্যামা বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সংসারের কাজে বড় ভুল হইতে লাগিল শ্যামার। কি মন্ত্র মন্দা বলিয়া গিয়াছে, সুবর্ণকে দেখিবার জন্য শ্যামার মন ছটফট করে, সে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে না। একদিন মণিকে সঙ্গে করিয়া সে চলিয়া গেল বাগবাজারে। মন্দার মন্ত্র কি শ্যামার চোখে অঞ্জনও পরাইয়া দিয়াছে? কই, সুবর্ণের দিকে চাহিয়া এবার তো শ্যামার চো পীড়িত হইয়া উঠিল না?

শ্যামা বলিয়া আসিল, সামনের রবিবার দিন ভাল আছে, ওইদিন বিধান আসিয়া সুবর্ণকে লইয়া যাইবে। না, তাকে বলা মিছে, বৌকে সে আর বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।

সুবর্ণের মাসি বলিল, এই তো সেদিন এল, এর মধ্যে এত তাড়া কেন? আরেকটা মাস থেকে যাক্।

শ্যামা বলিল, না বাছা না, তুমি বোঝ না,—যার ছেলের বৌ সে ছাড়া কারো বুঝবার কথা নয়,—ঘর আমার আঁধার হয়ে আছে!

একে একে দিন গেল। ঋতু পরিবর্তন হইল জগতে। শীত আসিল, শীতল পরলোকে গেল, শ্যামা ধরিল বিধবার বেশ, তারপর শীতও আর রহিল না। সুবর্ণকে শ্যামা যেন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটি দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কোথায় গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, তুচ্ছ শত্রুতা! সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা যেন বাঁচিয়া রহিল। তারপর এক চৈত্র নিশায় এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে সুবর্ণ অচৈতন্য হইয়া গেল, ঘরে রহিল কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শাঙ্কিত মানুষের ছায়া, জানালার অল্প একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।

জননী সমাপ্ত

হলুদ পোড়া

সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে পরে গাঁয়ে দু'টো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝ বয়সী জোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং বোল সতের বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নীচে একদিন বলাই চক্রবর্ত্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে বিস্মিত হল না। বলাই চক্রবর্ত্তীর এই রকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করছিল। অন্যপক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হৈ চৈ হল কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মত বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ী ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ীর মেয়েরা পর্যান্ত কোনদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল! গাঁয়ে সব শেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে তখন বাড়ীর পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মত মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁ শুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুর বাড়ী ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে? বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমন ভাবে জখম পর্য্যন্ত হয়নি, যখন হল পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী। দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্ত্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরী ছেড়ে সহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, "পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসি কাঠে ঝুলোতে না পারি—"

চশমার কাঁচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ীর পুব কোণের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম।

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাষ্টারী করে। গাঁয়ে সেই একমাত্র ডাক্তার-পাশ-না-করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশ-খানা বই নিয়ে লাইব্রেরী, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু'বছরে চারটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরীর বইএর সংখ্যা তিনশ'তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়ীতেই তালাবন্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু'চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু'তিনবার তরুণ-সমিতির মিটিং হয়। চার আনা আট আনা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রী করে। •

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হল, কলসী কলসী জল ঢেলে দামিনীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাশ করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্ত্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে। তুমি আমার কথা শোন বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও!'

গাঁয়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয়?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্ব্বুদ্ধি কোরো না নবীন! আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়! লেখা পড়া শিখেছ, জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তুমিও কি বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

নবীন আমতা আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভাল ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিনচার বছরের বড় কিন্তু এককালে দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধ হয় সেই খাতিরেই কৈলাশ ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দু'জনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌঁছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্ত্তীদের বৌকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুণপনা দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ভর সাঁঝে ভর করেছেন সহজে ছাড়বেন না!'

ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তে হবেই শেষ তক্। কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না!'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হল। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়া দিল। দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্ত্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারী দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও বাছাধন রও। এখনি হয়েছে কি! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়!'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?'

'তুমি চুপ কর, ভাই।'

উঠানে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশী। কম বয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায় নি, অনুমতিও পায় নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মত এতগুলি মেয়েপুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই দাওয়াটি যেন ষ্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানী করেছে জীবনের শেষ সীমানার ও পারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ।

এক। সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মত একথা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্ত্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এক সময় খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোঁজ' বোঁজ' চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলু ঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্ব্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই? বল, তুই কে?'

'আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না!'

'চাটুয্যে বাড়ীর শুভ্রা? যে খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্ত্তা?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দ্দেশ এল, 'কে খুন করেছিল শুধোও না কুঞ্জ? ওহে কুঞ্জ, শুনছো? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট্ করে।'

কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, দামিনী নিজে থেকেই ফিস ফিস করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হল কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোন জবাব বার হল না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর

একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদপোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসি কাঠে ঝুলোচ্ছি। ওষুদ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস।"

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাই-এর দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে গায়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, 'আমায় মেরো না গো, মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুয্যে বাড়ীর শুভ্রা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্ত্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধাঁর সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার তিন দিন আগে বলাই চক্রবর্ত্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে মশানে দিনক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্য্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্য্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠিল। বলাই চক্রবর্ত্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ, মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্ত্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে!

এক রাত্রে অনেক কাণ ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কাণে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ীর পিছনে ডোবাটি কচুরীপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফুল। তালগাছের গুঁড়ির ঘাটটি কার্ত্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল, এখন জল কমে অর্দ্ধেকের বেশী ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ী বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোনদিক থেকে কি ভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, এই পুরোণো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের ভার এত প্রাচুর্য্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোন বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—'

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। যা খুসী মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খবর্দ্দার।'

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল: কথাটা তুমি কি ভাবে নিয়েছ শুনি? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষমোচনের জন্য দরকারী ক্রিয়াকর্ম্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তার বাড়ী থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ীর সকলের ধারণের জন্য মাদুলী নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাশ ছিল। অর্দ্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকী অর্দ্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফিস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যাঙের মত মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাষ্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি একমাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসের ছুটি?'

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারী। মাইল খানেক পথ হাঁটলেই তার বাড়ী পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এই রকম ঘুরে উঠছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে। অথবা এমনি ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, একমাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতে পায়ে না ধরাই ভাল। মথুরবাবুর যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে, দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তা হলে মুস্কিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ী চলেছে। বাড়ী গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারি মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল। ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশ-ঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মত কি যেন একটা নাড়াচাড়া করছে।

ধীরেন আর্ত্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে? কে?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উর্টপড়ি' করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে? কোনখানে?'

বাঁশ-ঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।—'আমি মাষ্টারবাবু। বাঁশ কাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তি পিসী বলল, নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে তাড়াতাড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধ্যের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেও না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধা বাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাট পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন আকাশ পাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসী ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেত্নী। ব্যাটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাত্রে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পুব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দু'ধারের বাঁশ ছাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারি-ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াসায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ী আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশটা পেতে দাও।'

'বাঁশ পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দু'টি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দু'প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোন কিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ীর উঠানে আসতে চায়, এই বাঁশ পর্য্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাদীপ না জ্বেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভাল করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজ-কাল সে মাছ রান্না করে না, এটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায় নি। দু'তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আর এক মিনিট দু'মিনিটের মধ্যে রাত্রি সুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা। ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরী না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মত ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙ্গিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপাগর্জ্জনের মত গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙ্গিয়ে এসো! বাঁশ ডিঙ্গিয়ে চলে এসো! কি হয়েছে? পড়ে গেছ নাকি?'

'ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙ্গোতে পারছে না! মাটিতে শোয়ানো বাঁশ! শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ চেরা তীক্ষ্ণ গলায় আর্ত্তনাদের পর আর্ত্তনাদ সুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল। মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্ত্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

বোমা

পৃথিবীর কত জায়গায় কত বোমাই তো ফাটছে, হিসাব রাখা কেবল অসম্ভব নয়···অন্যায়। তাতে পৃথিবীর অনেক জায়গায় এখনকার মত অসংখ্য বোমা ফাটায় বাধা হতে পারে। বোমার চেয়ে মানুষকে বেশী কাবু করে হিসাব। বোমা ফাটার অতি আন্দাজী অতি বেঠিক হিসাবও হয়ত অনেকগুলি মানুষকে করে দেবে অনেকগুলি জীবন্ত প্রশ্ন: এত বোমা ফাটে কেন ?

জীবন্ত প্রশ্ন জবাব আবিষ্কার করবেই। তার ফলে পৃথিবী জুড়ে হয়ত বোমা ফাটাফাটি সম্বন্ধে এমন কোড়া ব্যবস্থাই হবে যে বোমা আর একরকম ফাটবেই না।

আর তার ফলে হয়তো পৃথিবী জুড়ে এমন ভীষণ নিঃশব্দ শান্তি বিরাজ করবে যে গোপালের পর্য্যন্ত মনে হবে আর একবার পৃথিবীটা পাক দিয়ে আসা যাক। ঘরের চেয়ে বাইরের শান্তি বেশী হলে অশান্ত মানুষের কি ঘরের টান থাকে ?

আহা, এত ভাল মানুষ হয়েছে গোপাল, দোতলা একটা বাড়ীতে এত যত্নে সে এমন নিবিড় শান্তিপূর্ণ সংসার পেতেছে, রোজ রাত্রে নীল আলো জ্বালা ঘরে তাকেই বিবসনা করার অধিকার পেয়েছে, যার জন্য একবার পৃথিবীটাই সে পাক দিয়ে এসেছিল, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বোমার ফাটাফাটিতে উড়ে যেতে হলেও কি আর তাকে ঘর ছাড়া করা উচিত ?

এই ধরণের ভাবনাই সুধা ভাবে,—সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। সে এমন ভীরু আর চালাক মেয়ে যে আরও কয়েকটা বছর গোপালের দিনান্তের কর্মান্তিক অবসাদের সঙ্গে ঘরের আবহাওয়ার সামঞ্জস্য সে বজায় রাখবেই। এখনও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সে পছন্দ করে না। এখনও হিষ্টিরিয়াকে সে ঘেন্না করে। কারণ সুধার স্নায়ু এখনও বড় দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে এখনও তার হিষ্টিরিয়া হয়। কিন্তু স্নায়ু তো একদিন সবল হবে ? হিষ্টিরিয়া তো একদিন সেরে যাবে ? নিজমূর্ত্তি ধারণ করলে কি বিপদটাই না জানি তখন তার হবে !

পৃথিবীর আর কোন জীবন্ত প্রাণী বাঁচুক মরুক কিছুই তার এসে যায় না এমনভাবে সুধাকে গোপাল ভালবাসে, রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে নৈতিকনীতি পর্য্যন্ত চুলোয় পাঠান যায় এমনভাবে গোপাল সুধাকে ভালবাসে। তবু সুধার ভয় আর চালাকির শেষ নেই। আবার যদি গোপাল পৃথিবী পাক দিতে চলে যায় ? কিছুতেই মুখ ফুটে বিয়ের কথাটা বলছিল না বলে কথাটা বলবার জন্য একজনের কাছে আত্মসমর্পণের ভাণ করায় কুমারী অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে সাত বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে আর ভাণটা কার্য্যে পরিণত করা সত্ত্বেও সাত বছর পরে ফিরে এসে সেই আর একজনের বিধবা অবস্থায় পেয়েও তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে যে বিয়ে করে ফেলতে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই। সে সব পারে। একা সে তাকে বেশী দিন বেঁধে রাখতে পারবে না। সেজন্য ছেলে মেয়ে চাই।

যে দুটি ছেলে তার আছে তারা নয়। গোপালের নিজের ছেলে মেয়ে।

ছেলে সুধার হল,—পর পর তিনটি। স্নায়বিক দুর্ব্বলতাও সুধার কমে গেল, হিষ্টিরিয়াও বিদায় হল। কিন্তু দুই আর তিনে যে পাঁচ হয় এই হিসাবটাই তাকে করে রেখে দিল কাবু। পর পর পাঁচ ছেলে কোলে পাওয়া যে কোন মেয়েমানুষের পক্ষে সাংঘাতিক ব্যাপার,—অদ্ভুত অকথ্য রহস্য। মেয়ে কই ? কেন মেয়ে হয় না তার ? গোপাল ছাড়া এ জগতে কার কাছে কবে সে কি অপরাধ করেছে যে তার মেয়ে হয় না,—হয়ত হবে না ?

এবারও যদি ছেলে হয় ?

টের পাওয়ার একমাসের মধ্যে সুধা দুর্ভাবনায় শুকিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, অসুখ নয়, অন্য কিছু, এরকম হয়, ভাবনার কিছু নেই, টনিক খেলেই ঠিক হয়ে যাবে, চেঞ্জের ব্যবস্থা করতে পারলে—

সুধা রাগ করে বলে, 'চেঞ্জ না হাতী। ছুটি তো তোমার একদিনও পাওনা নেই, কার সঙ্গে যাব ?

'তোমার দাদার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে ফেলে রেখে দাদার সঙ্গে চেঞ্জে যাব—অত সখে আমার কাজ নেই।'

পাঁচবার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পাঁচবার ছেলে হয়েছে। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য এবার যদি মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল করার চেষ্টা করাটা কি উচিত হবে ? সুধা টনিকও খেল না, চেঞ্জেও গেল না, খারাপ শরীর খারাপ করেই রেখে দিল। এমন কি, বেশীরকম চুল উঠে যেতে আরম্ভ করায় চুলের সঙ্গে জীবনটাই যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মনে হতে লাগল বটে তবু চুলের জন্য পর্য্যন্ত টনিকের ব্যবস্থা করল না।

ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে গোপালকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবারও যদি ছেলে হয় ?'

গোপাল উদাসভাবে বলল, 'হলে হবে।'

খানিকটা ঝিমিয়ে সুধা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এমন কি কোন উপায় সেই, যাতে লোক ছেলে চাইলে ছেলে পায়, মেয়ে চাইলে মেয়ে ?'

গোপাল হঠাৎ সচেতন হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কি শুনি ? তোমার হয়েছে কি ?'

সুধা রেগে বলল, 'ব্যাপার পরে শুনো, আগে যা বললাম তার জবাবটা দিয়ে নাও।'

জবাব গোপাল কি দেবে? এ তো জীবন্ত প্রশ্ন নয় যে মানুষ প্রশ্ন করতে শিখবার পর অনেককাল কেটে গিয়েছে বলেই জবাব একটা আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে,—জীবনের এ একটা সাধারণ প্রশ্ন, সাধারণ কৌতূহল। গোপাল তাই চিরন্তন যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'হয়তো উপায় আছে, মানুষ তা জানে না।'

মানুষ কেন জানে না এরকম কুটিল প্রশ্ন করার মত জটিল মনোবিকার সুধার জন্মে নি, সে তাই বিনা প্রতিবাদে প্রতিদিন রোগা হয়ে যেতে আরম্ভ করল। রোগা হতে হতে মাস দেড়েকের মধ্যে এমন রোগাই হয়ে গেল যে জন্মাবার আগেই মেয়েটি তার গেল মরে।

সুধা কেঁদেই অস্থির। হায়, মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়ে মেয়েকেই সে হারিয়ে বসল! মাথা খারাপ না হলে মেয়ে কিনা জানার আগে মেয়ে নয় মনে করে মানুষ এমন ব্যাকুল হয়? কদিন খুব কাঁদাকাটা করে সুধার মন শান্ত হবার আর স্নায়ু অবসন্ন হবায় সুযোগ পেল। তার ফলে ধীরে ধীরে এল স্থায়ী বিষাদ, যা অনেকটা পরিতৃপ্তির সামিল।

পরের বার একটি মেয়ে হল সুধার। অনেকদিন পরে—প্রায় চারবছর।

এইখানে উনিশ বছরের ছেদ দেবার সুযোগে সুধার মেয়ে হওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর বোমা ফাটাফাটি সম্পর্কটা সংক্ষেপে একটু ব্যাখ্যা করি। এটা অবশ্য একটা চরম দৃষ্টান্ত কিন্তু সেজন্যে কিছু এসে যায় না। দুয়ে আর দুয়ে যে যুক্তিতে চার হয় দু'লাখে আর দু'লাখে সেই যুক্তিতেই হয় চারলাখ। তুলনামূলকতার ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া আর এর মধ্যে আর কোন বিস্ময়কর অসত্য নেই,—অতি সহজ কথা। এ যুগের চরম আর পরিণত দৃষ্টান্ত হিসাবে না ধরে সুধাকে ছেঁটে কেটে যদি যুগের মৌলিক আর অপরিণত দৃষ্টান্তে দাঁড় করান হয়, তবু দেখা যাবে এই সুধার এভাবে মেয়ে হওয়ার মত সেই সুধার অতি সামান্য রকম এভাবে মেয়ে হওয়ার জন্যই মানুষের দাঁত আর নখে বোমার রক্তপিপাসা জেগেছিল। নখের আঁচড় আর বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে যে পার্থক্য নেই, এই ধারণা পোষণ করাই প্রত্যেকের উচিত। তা না হলে তুলনামূলক ঘোরপ্যাঁচের ফাঁদে পড়ে মানুষ তর্ক আর হাতাহাতি করে,—কোন সময় নখ দিয়ে আঁচড়ায় আর দাঁত দিয়ে কামড়ায়, কোন সময় এক ঝাঁক এরোপ্লেন পাঠিয়ে বোমা বৃষ্টি করায়।

মন্দা একদিন সুধাকে বলল, 'মা আজ বাড়ী থেকো, সন্ধেবেলা অনাদি আসবে। বাবাকে বলতে পারবে না, তোমায় বলবে। তুমি বাবাকে বোলো।'

সুধা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে বলল, 'অনাদি? তাই তো।'

মন্দার মুখ গম্ভীর হল, চোখ বড় হল, দৃষ্টিতে তীব্রতা এল। তীক্ষ্ণ মাকে একটি আঙুল দেখিয়ে বলল, 'তুমি ভাবচ এখনো আমি কচি খুকীটি আছি, না? কিছু বোবো না, কেন ভেবে মর, কি দরকার তোমার এত ভাবনার? কাল সন্ধেবেলা সমীর আসবে—আসতে বলেছি।'

সুধার বয়স প্রায় পঞ্চাশে এসে ঠেকেছে, বেচে থাকার প্রয়োজনীয়তা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতাগুলি সরল হতে আরম্ভ করায় ভয় পরিণত হয়েছে বুকের ধড়-পড়ানিতে আর চালাকিতে পরিণত হয়েছে প্রায় নির্বুদ্ধিতায়। কিছুই যেন সহজে বোধগম্য হয় না। গল্পের মাঝখানে আমার গল্প ব্যাখ্যা করার মত মন্দাকে তাই আবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হয়।

'আমি ওপরে থাকব। সমীর এলেই অনাদির কথাটা বলবে—বেশ হাসিমুখে বলবে, তোমাদের যেন মত আছে এমনিভাবে, বুঝলে? তারপর সমীরকে ওপরে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে বুঝলে?

সুধা কাতরকণ্ঠে বলল, 'এসব তুই কি বলছিস মন্দা? আজ আনাদি কাল সমীর—এসব কোন দেশী কাণ্ড?'

সুধার তখনকার মুখ দেখেই যে কোন বুদ্ধিমতীর রাগ করার কথা, তবু সুধার কথা শুনেই যেন হঠাৎ নিজের বিপন্ন অবস্থাটা খেয়াল করে মন্দা একেবারে ঝিমিয়ে গেল। গম্ভীর মুখ ম্লান হল, বড় চোখ স্তিমিত হল, দৃষ্টি ভিজে এল। কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলল, 'কেন ভাবচ তুমি? ভেবোনা। সমীরের জন্যেই তো—না বলালে কোনদিন মুখ ফুটে বলবে ভেবেছ?

বলে সুধাকে হাত ধরে বসিয়ে তার পাশে বসে কোলে মুখ গুঁজে মন্দা আরম্ভ করে দিল কান্না। সুধার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আহা, সমীরের জন্য মেয়ে যখন তার এমন করে কাঁদছে, সমীরকে নিয়েই সে তার নীড় বাঁধুক। কি আসে যায় একটু যদি একগুঁয়ে মানুষ হয় সমীর, অনাদির সঙ্গে কবে একটু বাড়াবাড়ি করেছিল বলে মেয়েকে যদি এতকাল একটু পীড়ন করেই থাকে সমীর? সব ভাল যার শেষ ভাল।

তোমরা সবাই ভালো

আঠার মিনিট লেট। সারারাত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে কলকাতা পৌঁছুতে আঠার মিনিট লেট করে গাড়ীটা কি অমার্জ্জনীয় অপরাধই তার কাছে করেছে।

দিবাকর বাবুর বোন সুবালা জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ীতে ভিড় ছিল না?'

'ভীষণ ভিড়। কোনমতে একটু বসবার যায়গা পেয়েছিলাম।'

সুবালা ভাবল, ছেলেটা কি মিথ্যাবাদী! সারারাত গাড়ীতে জেগে বসে এলে কারো এমন তাজা চেহারা থাকতে পারে!

'সারা রাত ঘুমোও নি বুঝি?'

'ঘুমিয়েছি। আমার এই বাক্সে পা ঝুলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখি একেবারে নৈহাটি পৌছে গেছি।'

ষ্টীলের ফোঁড়ায় কণ্টকিত তার ট্রাঙ্কটির দিকে তাকিয়ে কেবল সুবালা নয় উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠল। ট্রাঙ্কের ওপর বিছানা পেতে নিয়েছিল নিশ্চয়? কিন্তু বিছানা কই রমেনের? সঙ্গে তো শুধু একটা সতরঞ্চি!

'আমি তো তোষক বালিশে শুই না। চৌকিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে চাদর পেতে নিই। শক্ত বিছানায় শোয়া খুব উপকারী পিসীমা।'

পিসীমা? কাকে সে পিসীমা বলছে?

'আমি তোমার পিসীমা নই।' সুবালা প্রতিবাদ জানাল।

'পিসীমাই হন আপনি।' রমেন মৃদু মৃদু হাসছে!

'আমি তোমার এই পিসে মশায়ের বোন—ছোট বোন।' সুবালা দিবাকর বাবুকে দেখিয়ে দিল। 'তোমার পিসীমা রান্নাঘরে আছেন।'

মনে মনে সুবালা ভীষণ চটে গেল। কোথাকার হনুমান ছেলে! দিবাকর বাবুর বয়স ষাট হতে চলল, রমেনের পিসীমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, আর তাকে সে মনে করে বসল পিসীমা, বয়স তার এখনো সাতাশ হয় নি! চোখে না দেখে থাকলেও এটুকু তো তার জানা আছে যে তার পিসীমার বড় ছেলেটার একটা মেয়ে হয়েছে সম্প্রতি, তার পিসীমার এখন ঠাকুরমা পদবী!

রমেন বলল, 'এই পিসীমার সম্পর্কে আপনাকে পিসীমা বলিনি। নন্দ পিসেমশায়ের সম্পর্কে আপনি পিসীমা হন।'

শুনে কেবল সুবালা নয়, উপস্থিত সকলেই থ বনে গেল। সকলের মনে পড়ল, সত্য সত্যই রমেনের সঙ্গে সুবালার দু'দিক থেকে সম্পর্ক আছে, সে তার এক পিসেমশায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দিবাকর অনেক অনেক দূর সম্পর্কের পিসেমশায়, কিন্তু প্রথমে রমেনের বাবার মাসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন বলে সুবালার স্বামী নন্দগোপাল তার খাঁটি মাসতুতো পিসেমশায়। ছেলেটা ভুল করেনি, সুবালাকে জন্মে কখনো চোখে না দেখে থাকলেও সে যে কে মনে মনে আন্দাজ করে তার সঙ্গে ডবল সম্পর্কের মধ্যে কোনটা বেশী লাগসই তাও স্থির করে ফেলেছে। এতো যেমন তেমন ছেলে নয়!

ইতিমধ্যে দিবাকর বাবুর স্ত্রী এসে পড়েছিলেন। মানুষটা তিনি রোগা এবং লম্বা, মুখখানা বদমেজাজী। চশমার ভেতর দিয়ে রমেনকে নিরীক্ষণ করে তিনি যথাবিহিত স্নেহার্দ্র বিস্ময়ের ভদ্রতা করে বললেন, 'ওমা, তুমি চারুদাদার ছেলে?'

রমেন বলল, 'বাবাকে আপনি দাদা বলেন পিসীমা? আমি শুনেছিলাম বাবা আপনার চেয়ে ছোট।'

পিসীমা ঢক করে ঢোঁক গিলে ফেললেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা বলি।' তারপর প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'নাও, জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ হাত-ধুয়ে নাও।'

রমেনের প্রণাম গ্রহণের জন্য গুরুজনেরা প্রস্তুত হয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন, ভাবছিলেন প্রণাম করার কথাটা বুঝি তার মনে নেই। রমেন জামার বোতাম খুলতে আরম্ভ করায় সুবালা আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'পিসীমা পিসেমশাইকে প্রণাম কর রমেন।'

'আমি তো কাউকে প্রণাম করি না, ছোট পিসীমা?'

'প্রণাম কর না।'

'প্রণাম করা ছেড়ে দিয়েছি!'

এমন ভাবে রমেন কথাটা বলল, যেন একটা তার বদ অভ্যাস ছিল, খুব মনের জোর দেখিয়ে অভ্যাসটা ত্যাগ করেছে। সুবালা আর পিসীমা বাক্যহারা হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিসীমার সেজ মেয়ে রাণী খিল খিল করে হেসে উঠেই বিবর্ণ হয়ে চুপ করে গেল। দিবাকরবাবু ঘরে আছেন ভুলে গিয়ে সে হেসে ফেলেছিল। বাড়ীতে বিশেষ করে তার সামনে, কারো শব্দ করে হাসাটা দিবাকরবাবু পছন্দ করেন না। অন্য সময় হয়তো তিনি হাসি বন্ধ করা সত্ত্বেও রাণীকে ধমক দিতেন, এখন নবাগত ছেলেটার চমকপ্রদ পাকামিতে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ায় মেয়েকে শাসন করতে বোধ হয় ভুলে গেলেন। যতবড় বেয়াদপ হোক, বাড়ীতে যে পা দিয়েছে মোটে পাঁচ মিনিট, তার ওপর গর্জ্জন করে ওঠা উচিত নয় ভেবে আত্মসম্বরণের অতি কষ্টকর চেষ্টায় কাতর হয়েই সম্ভবতঃ তিনি হঠাৎ ধপ করে চৌকিতে বসে পড়লেন। চৌকীটা কচমচ শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল। দিবাকর বাবুর দেহটি প্রকাণ্ড, চুলে পাক ধরলেও গায়ে তার এখনো অসম্ভব

জোর। এই কদিন আগে তার বিরাট থাবার থাবড়া খেয়ে মেজছেলে সুকান্ত ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।

সকলের মুখের ভাব দেখে রমেন কি বুঝল সেই জানে, ক্ষমা প্রার্থনার সুরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'তাই বলে গুরুজনদের ভক্তি করি না ভাববেন না কিন্তু ছোট পিসীমা। মানুষের পায়ে কত ধুলোবালি ময়লা লাগে, পায়ে হাত দেয়া উচিত নয় বলে প্রণাম করি না। বাবাও তাই বলেন। গুরুজনকে ভক্তি করি, পায়ের ময়লাকে তো ভক্তি করি না। একজনের পা থেকে ময়লা নিয়ে নিজের কপালে লাগানোর কোন মানে হয়?'

দিবাকরবাবু আর সামলাতে পারলেন না, সিংহের মত গর্জ্জন করে উঠলেন, 'মানে বুঝেছি। তুমি একটি এক নম্বরের জ্যাটা ছেলে। যা, ওঘরে যা।'

রমেন যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল, একপা দিবাকরবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল 'রাগ করলেন পিসেমশাই?'

দিবাকরবাবুও নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে চৌকী ছেড়ে উঠে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমেন আপন মনে বলল, 'পিসেমশাই রাগ করেছেন।'

সে যেন বুঝতে পারে না কেন দিবাকরবাবু রাগ করলেন, তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না দিবাকরবাবু সত্য সত্যই রাগ করেছেন।

বেলা তখন প্রায় এগারটা বাজে। রমেনকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারও ছিল না। লোক তো বাড়ীতে কম নয়, নাওয়া খাওয়ার হাঙ্গামাও তাদের সহজ নয়। তাছাড়া আশ্রিত হিসাবে বাড়ীতে থাকবার জন্য যে এসেছে তাকে নিয়ে অত ব্যস্ত হবার গরজই বা হবে কার।

রমেনের ট্রাঙ্কটা বৈঠকখানা থেকে ভেতরের একটা ঘরে নিতে সাহায্য করে সেই যে চাকরটা কোথায় গেল আর তার পাত্তা নেই। দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় সুবালা একবার রমেনকে চান করে নিতে বলে গেল, আর কেউ খবর নিতে এল না। ঘরটা বেশী বড় নয়, দুটি চৌকি একটি টেবিল আর দু'খানা রঙ করা লোহার চেয়ার আছে। দুটি চৌকিতেই বিছানা গুটানো আছে। একটি সুকোমলের, অন্যটি দিবাকরবাবুর ছোট ভাই সুধাকরবাবুর শালা রঞ্জিতের। টেবিলের একপাশে আই, এ, ক্লাসের বই, বাকী অংশ জুড়ে স্কুলের নীচু ক্লাসের ইংরাজী বাংলা অঙ্কের মলাট ছেঁড়া বই আর খাতা ছড়ানো। দেয়ালে বসানো কাঠের তাক দু'টিতে ঘুড়ি লাটাই, মার্ব্বেল, রবারের বল, টিনের কৌটা, কাগজের বাক্স থেকে সুরু করে পালিশ-চটা জুতো পর্য্যন্ত কি যে নেই বলা কঠিন। সুকোমল আর রঞ্জিৎ এ ঘরে থাকে এবং বাড়ীর গণ্ডা দেড়েক ছেলে-মেয়ে দুবেলা এ ঘরে বসে নকুল মাষ্টারের কাছে পড়াশোনা করে।

সুকোমল সঙ্গে এসেছিল, তার সঙ্গে দু'চারটি কথা বলার চেষ্টা করে রমেন সুবিধা করতে পারল না। কাটা কাটা জবাব দিয়ে সুকোমল কুটিল চোখে তাকে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগল। রমেন যখন ট্রাঙ্ক খুলে তার বই আর কাপড় বার করছে, হঠাৎ সে চিবিয়ে চিবিয়ে মন্তব্য করল, 'আমি ভাবছিলাম তোমায় ওপরে ভাল ঘরে থাকতে দেবে।'

'ঘর খালি নেই নিশ্চয়।'

'নেই? দেখে এসো না আছে কিনা। দোতলায় আছে তিন তলায় আছে। সব বড়মামার নিজের লোকের দখলে—এক একজনের এক একটা ঘর! খাটে না শুলে বড় মামার ছেলেমেয়েদের ঘুম আসে না।'

'খাটে শুয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো।'

সুকোমল ফোঁস করে উঠল, 'আমরা কেন নীচের স্যাতস্যেতে ঘরে গাদাগাদি করে থাকব?'

'পিসেমশায়ের ভাইও তো নীচের তলায় থাকেন ভাই।'

'সাধে থাকেন? বাত নিয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারেন না বলে। ছোট মামীরা ওপরে থাকেন।' রাগে অভিমানে সুকোমলের মুখখানা বাঁকা দেখায়, 'এই তো সবে এলে। দু'দিন থাকো, টের পাবে আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে। বাড়ীতে থাকতে দিয়েছে তাই যেন ঢের!'

রমেন এক গাল হেসে বললে, 'ধেৎ, তাই কখনো হয়? খারাপ ব্যবহার যদি করবে, বাড়ীতে থাকতে দেবার দরকার? মনে কষ্ট দেবার জন্যে কেউ কাউকে ইচ্ছে করে বাড়ীতে রাখে নাকি?'

সুকোমল হতভম্বের মত বলল, 'রাখে না?'

রমেন বলল, 'কেন রাখবে? একজনকে কষ্ট দিলে নিজেরও কষ্ট হয়, মিছামিছি নিজে কষ্ট পাবে এমন বোকা কেউ নয় ভাই। আমরা জোর করে থাকতে আসতাম তা'হলে বরং কথা ছিল। তা তো আমরা আসিনি। আমার কথা ধরো। বাবা পিসেমশাইকে লিখলেন আমি এখানে থাকতে পারব কি না, পিসেমশাই জবাবে আমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখলেন। লিখলেন, কোন অসুবিধে নেই। অনাদর করবার জন্যে আমাকে ডেকে আনার তাঁর কি দরকার ছিল? বাবাকে তাহলে লিখে দিতেন সুবিধে হবে না।'

কথা বলতে বলতে রমেন টেবিলে ছড়ানো বইগুলি গুছিয়ে ফেলেছে। বইখাতা সমস্ত টেবিল জুড়ে ছিল, এখন দেখা গেল টেবিলে অনেক জায়গা। তাকের জঞ্জালগুলি সরিয়ে, নামিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে জায়গা খালি করতে করতে রমেন হঠাৎ বলল, 'তুমি ওপরের ঘরে থাকবে ভাই? আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

রমেন ব্যবস্থা করে দেবে! সেই যেন বাড়ীর কর্ত্তা! সুকোমল চটে গিয়ে একটা ব্যাঙ্গোক্তি করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে হল রমেন বাহাদুরী করে নি, ওপরে তার থাকবার ব্যবস্থা করার ক্ষমতায় নিজের বিশ্বাসটা শুধু প্রকাশ করেছে।

'আমার দরকার নেই।—সুকোমল জবাব দিল।

এগারটা পর্য্যন্ত নীচের তলায় কোন রকম গোলমাল ছিল না, তারপর এমন হৈ চৈ হট্টগোল সুরু হয়ে গেল যেন হাট বসেছে।

সুকোমল বলল, 'বড় মামা ওপরে গেলেন।'

এ বাড়ীতে দিবাকর বাবুর প্রচণ্ড শাসন কেবল তার নিজস্ব সুখসুবিধা আর জ্বালাতন হওয়া-না-হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চোখ আর কাণের আড়ালে কি ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নেই, তাঁর সামনে সবাই ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা করবে, জোরে কথা বলবে না, হাসবে না, ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত চেঁচামেচি দুরন্তপণা বন্ধ রাখবে—এইটুকু হলেই তিনি সন্তুষ্ট। তাই, তিনি একতলায় নামলে দোতালা হাঁফ ছেড়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, দোতলায় সুরু হয় চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি। বড়রা অবশ্য মারামারিটা করে না, সেটা ছেলেমেয়েদের একচেটিয়া হয়েই থাকে, বড়রা শুধু তাদের মারে। যখন তখন যার যাকে খুসী হরদম মারে। মনের মধ্যে সকলে যেন কি জ্বালা পুষে রেখেছে, ছোটদের ওপর কারণে অকারণে ঝাল না ঝেড়ে থাকতে পারে না।

নিজের বইখাতা গুছিয়ে রমেন একা ঘরে বসে আছে। সুকোমল বলেছিল, সারাদিন না খেয়ে ঘরে বসে থাকলেও কেউ আর তাকে ডাকতে আসবে না। রমেন তা স্বীকার করেনি এবং তার ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেবার জন্য তাকে নাইতে পাঠিয়ে নিজে প্রতীক্ষা করছে। তেল মেখে গামছা হাতে সে একেবারে তৈরী হয়ে আছে, দু'চার মিনিটের মধ্যেই যে আদর আহ্বান আসবে তাতে যেন তার কিছু মাত্র সন্দেহ নেই।

সুধাকরবাবুর স্ত্রী মনোরমা সত্য সত্যই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে এলেন। ঠিক নাইতে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে নয়, পরিচয় করতে। রমেনের বেয়াদবির গন্ধ ইতিমধ্যেই মুখে মুখে আলোচিত হয়ে উপন্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, মনোরমা এতক্ষণ তাই শুনছিলেন। দিবাকরবাবুর স্ত্রী অনুপমা আর সুধাকর বাবুর স্ত্রী মনোরমা এই দু'টি জা'য়ের মনের গতি সর্ব্বদাই পূব আর পশ্চিমের মত পরস্পরবিরোধী। একজন লালপাড় শাড়ী পরলে অন্যজন পরেন কালোপাড় শাড়ী, একজন রুইমাছ খেলে পরে অন্যজন খান কৈ মাছ, একজন কারো নিন্দে করলে অন্যজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। একজনের কোন ছেলে বা মেয়ে পর্য্যন্ত যদি অন্যজনের একটু বেশী আদর পায়, নিজের সেই ছেলে বা মেয়েকে ধরে তার মা আচ্ছা করে পিটিয়ে দেন। এখন, রমেন যখন আজ এল, মনোরমার কাছে সংবাদ ঠিকমতই পৌছেছিল কিন্তু অনুপমা তাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন বলে তিনি তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে যাওয়ারও উচিত মনে করেন নি। তারপর অনুপমা যখন তীব্রভাবে রমেনের নিন্দে সুরু করলেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করে দিলেন যে বাড়ীর ছেলেদের মাথা খাবার জন্য এ শনিগ্রহকে তিনি বাড়ীতে যায়গা দিতে পারবেন না, দু'চারদিন দেখে দূর দূর করে খেদিয়ে দেবেন, তখন মনোরমার মনে হল এই তেজস্বী সুবিবেচক, আদর্শ চরিত্র ছেলেটির সঙ্গে তো অতি অবশ্য তাঁর ভাব করা দরকার! ঘরে ঢুকেই তাই হাসিমুখে অত্যন্ত মিষ্টি সুরে বললেন, 'একলাটি বসে আছো বাবা? বাড়ী ছেড়ে এসে মন কেমন করছে?'

রমেন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—'হ্যাঁ।'

মনোরমা একটু ভড়কে গেলেন। এত বড় ধাড়ী ছেলের মুখে এমন ধারা জবাব কি শোভা পায়? বাড়ীর জন্য মন কেমন করার অভিযোগ রমেন অস্বীকার করলে তিনি তাকে কি বলবেন মনে মনে তাই মনোরমা ঠিক করে রেখেছিলেন, চার পাঁচ বছরের ছেলের মত সে সহজ সরল জবাব দিয়ে বসায় তাকে এবার কি বলবেন খানিকক্ষণ তিনি ভেবেই পেলেন না। বোকা হাবা নয়তো ছেলেটা? মাথার কোন দোষ নেই তো?

সহজ ও অকৃত্রিম আবেগের অনভ্যস্ত ধাক্কা সামলে মনোরমা তারপর বললেন, 'প্রথম দু'চার দিন ওরকম লাগবে বাবা। তা আমরাও তোমার পর নই। আমি হলাম গিয়ে তোমার—' মনোরমা থমকে থেমে গেলেন। তিনি রমেনের কে হন? দূর সম্পর্কের পিসীমার জা'এর সঙ্গে কি সম্পর্ক হয়?

'আপনি আমার ভালো পিসীমা।'

পিসীমা? তাই বটে, রমেনের পিসীকে তিনি যখন দিদি বলেন, তিনিও রমেনের পিসীমা হন বটে। কিন্তু ভালো পিসীমা কেন? ছোট, বড়, মেজ, সেজ, রাঙা, কালো মাসী পিসী দিদি বৌদি শুনেছেন, ভালো-পিসীমা তো শোনেন নি কখনো! তিনি কি ভালো? রমেন কি দেখেই চিনেছে তিনি মানুষটা মন্দ নন, মন তার ভালো? মনোরমা একটা বিস্ময়কর আনন্দ অনুভব করেন। অনেক দিন ধরে মনের ওপর যেন একটা ভার চাপানো ছিল, ভারটা হাল্কা হয়ে গেছে। কতকাল ধরে শুনে আসছেন তিনি হিংসুটে, স্বার্থপর, ঝগড়াটে এবং আরও অনেক কিছু! শুনতে শুনতে ধারণা জন্মে গেছে যে তিনি সত্যই তাই। হিংসা, স্বার্থপরতা আর ঝগড়াঝাটি নিয়েই দিনও তার কাটছে বৈকি! রমেনের কথা শুনে হঠাৎ মনে হল, ওসব কিছু নয়, অনেক কাল আগে অল্প বয়সে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন,—সাদাসিদে ভালোমানুষ। তিনি ভালো।

কাছে বসিয়ে আদর করে মনোরমা রমেনকে খাওয়ালেন। অনুপমার পিত্তি জ্বলিয়ে বার বার বলতে লাগলেন, খাসা ছেলে দিদি। ছেলে-মেয়েদের একটিবার ধমক দিলেন না, কারো দিকে কড়া চোখে তাকালেন না, ছেলেবুড়ো চাকর দাসী

প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কইলেন হাসিমুখে। মনে হতে লাগল, খোলস ছেড়ে মনোরমা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। খাওয়ার পর তিনিই রমেনকে বললেন, 'এইটুকু ঘরে কি তিনজনের যায়গা হয়? তুমি ওপরে থাকবে রমেন?'

তখন রমেন বলল, 'ভালো-পিসীমা, আমি এ ঘরে থাকি, স্থকোমলকে ওপরে নিয়ে যান।'

মনোরমা হেসে বললেন, 'এ ঘরে থাকতে চাও তুমি? বেশ বাবা, তাই হবে। স্থকোমল ধীরেনের ঘরে যাক্, তুমি এখানেই থাকো।'

এ ব্যবস্থায় খুসী হওয়ার বদলে স্থকোমল কিন্তু ভয়ানক চটে গেল। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগল কি না। এতদিন বাড়ীর লোকের উপেক্ষায় তার অভিমানের সীমা ছিল না, আজ তাদের পক্ষপাতিত্বে সে হিংসায় পুড়তে লাগল। তাকে কেউ গ্রাহ্যও করে না, রমেনের মুখের কথায় তার দোতলায় ভাল ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। বাড়ীতে পা দিয়েই ছেলেটার এতখানি প্রতিপত্তি জন্মে গেছে?

কৃতজ্ঞতা বোধ করার বদলে রমেনের বিরুদ্ধে সে তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, উপকার করার বদলে রমেন তাকে ভীষণ অপমান করেছে। মনটা তার আরও বেশী খিচড়ে গেল, ওপরের ঘরে যেতে একান্ত অনিচ্ছা জানাতেও কেউ যখন তার কথা কানে তুলল না, ধমক দিয়ে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দোতালায়।

কেবল স্থকোমল নয়, অনুপমারও এমন রাগ হল বলবার নয়। একে তো প্রথমেই রমেনের ব্যবহারে তিনি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন, তার ওপর তার সম্পর্কে তার বাড়ীতে এসে মনোরমার দলে ভিড়ে তাকে যে অপমানটা সে করল তার জ্বালা চেপে রাখতে গিয়ে গায়ে জ্বর আসার মত শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন। মুখে যাই বলুন, দু'দিন দেখে সত্যি সত্যি কি আর রমেনকে তিনি তাড়িয়ে দিতেন? এখন মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, তেরাত্রি পোয়ানোর আগে ছোঁড়াটাকে তিনি বিদেয় করবেন, কাণ্ড করে ছাড়বেন একটা। তাকে ডিঙ্গিয়ে তার ভাইপোকে ছোট-বৌ কিসের জোরে দখল করে তাও দেখে নেবেন।

দুপুরবেলা একবার অনুপমার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতরে রমেনের সঙ্গে তাকে গল্প করতে দেখে মনোরমার চশমা-পরা চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম হল।

নিজের ঘরে গিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, না, আগে রমেনকে বাড়ী থেকে তাড়ান হবে না। আগে শিক্ষা দিতে হবে ছোট-বৌকে। রমেনকে বশ করে ওকে দিয়ে অপমান করতে হবে। ডাকলে রমেন ছোট-বৌয়ের কাছে যাবে না, কথা বললে শুনবে না, অবজ্ঞা দেখাবে, অপমান করবে—এই যদি করতে পারেন, তবেই অনুপমার বেঁচে থাকা সার্থক।

রমেনকে দেখেই সকলের মনে যে একটা দুর্ব্বোধ্য অস্পষ্ট আশঙ্কা জেগেছিল, দেখা গেল সেটা একেবারেই অমূলক নয়। ছেলেটাকে আয়ত্ত করা একরকম অসম্ভব। তাকে স্নেহ করার, খাতির করার, খুসী করার, আঘাত দেওয়ার কোন প্রচলিত পদ্ধতি কারো জানা নেই। নিজে থেকে কাউকে সে এড়িয়ে চলে না, কারো সঙ্গে বেশী খাতির জমানোর চেষ্টা করে না, একজনকে ছোট করে আরেকজনকে বড় করার এতটুকু উৎসাহও তার নেই। বেশী বেশী আদর যত্ন স্নেহ মমতা দিয়ে তাকে বশ করা যেমন অসম্ভব, অবজ্ঞা করে নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে তাকে কাবু করাও তেমনি অসম্ভব। মমতা আর অবহেলার দাম তার কাছে যেন সমান। কয়েকদিনের মধ্যে তার ব্যাপার দেখে অনুপমা আর মনোরমা দু'জনেরি ধাঁধা লেগে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের দু'জনের মধ্যে কেউ রমেনের এতটুকু পক্ষপাতিত্ব অর্জ্জন করতে পারলেন না। কিশোর সন্ন্যাসীর মত সে যে একেবারে নির্ব্বিকার হয়ে থাকে না নয়, ভালবাসা দেখালে শিশুর মত খুসী হয়ে উঠে, কিন্তু গলে পড়ে না। ভালবাসা দেখানোর আগে যেমনটি ছিল পরেও তেমনি থাকে। লেজও নাড়ে না, পা'ও চাটে না!

প্রথমদিন অনুপমা ভেবেছিলেন, মনোরমা আগেই ভাব আরম্ভ করেছে তার সঙ্গে তিনি বোধ হয় পাল্লা দিতে পারবেন না। বিকেলে মিষ্টি আনিয়ে লুচি ভেজে রমেনকে খেতে দিলেন। অন্য সকলেই অবশ্য লুচি আর মিষ্টি খেল, কিন্তু তার মিষ্টি কথাগুলি পেল শুধু রমেন। পুলকিত হয়ে অনুপমা লক্ষ্য করলেন, এ বাড়ীতে তাকেই যেন সে আপন মনে করে, তার স্নেহ আর যত্নই সে যেন চায়, এমনি ভাব রমেনের। নতুন পরিচয়ের সঙ্কোচ নেই, পর মনে করা নেই। কি আগ্রহের সঙ্গেই রমেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সেই প্রাইজগুলি আছে পিসীমা? দেখাবেন আমায়?'

কবে সেই অল্প বয়সে সেলায়ের কাজ আর গানের জন্য অনেকগুলি প্রাইজ পেয়েছিলেন, বাপের কাছে শুনে সেগুলি দেখবার জন্য রমেন উৎসুক হয়ে আছে! মনটা অনুপমার কেমন করে উঠল। কই, দশ বিশ বছরের মধ্যে কেউ তো কোনদিন জানবার আগ্রহ দেখায়নি তার এককালে বিশেষ কি গুণ ছিল, কিসের জন্য বাড়ীতে আর পাড়াতে এককালে তিনি সকলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতেন! আজ আড়ালে লোকে তাকে শুঁটকি মাছ বলে, তার মাথায় নাকি ছিট আছে, সাদা চোখে তাকালে ছেলেপিলে ভস্ম হয়ে যেতে পারে বলে তিনি নাকি চশমা পরে থাকেন! সত্যই কি তিনি এই রকম মানুষ? বড় ট্রাঙ্কের তলা থেকে খুঁজে পেতে পুরানো দিনের প্রাইজগুলি দেখাবার সময় রমেনের চোখভরা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা দেখে তো তার মনে হচ্ছে আজও তিনি সেই আগের অনুপমার মতই আছেন, যার হাসিখুসী ভাব আর মিষ্টি স্বভাবে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত,

পাড়ার মেয়ে বৌ ভিড় করে যার কাছে আসত সেলাই শিখতে আর গান শুনতে।

অনুপমা স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন ভেতরটা তার অনেকদিন শুকনো হয়ে ছিল আজ হঠাৎ একটা মধুর রসালো আবেগে ভিজে সরস হয়ে উঠেছে। ঠিক এই রকম মনের অবস্থা ছিল বলে সন্ধ্যার পর মনোরমার ঘরে রমেনকে দেখে রাগ হবার বদলে তার খুব অভিমান হয়ে গেল। খানিক পরেই রাণীকে দিয়ে তাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে উদাসভাবে বললেন, 'আমার নিন্দে শুনতে বেশ ভাল লাগছিল, না বাবা? আমি তো মন্দ আছিই—'

'না, পিসীমা।'

অনুপমা কাতর হয়ে বললেন, 'তুমি কি জানবে, সবাই আমায় মন্দ বলে। যার জন্যে যত করি তার কাছে আমি তত মন্দ।'

রমেন হেসে ফেলল। অনুপমা যেন হাসির কথা বলেছেন এমনি ভাবে হেসে ফেলল।—'কেউ মন্দ বলে না পিসীমা। আপনি কেন মন্দ হতে যাবেন? ভালো-পিসীমা নিন্দে করেন নি, দুঃখ করছিলেন। আপনি নাকি আগে খুব ভালবাসতেন ভালো-পিসীমাকে এখন আর বাসেন না। শুনে আমি কি বললাম জানেন?

'কি বললে?'

বললাম, 'তা নয় ভালো-পিসীমা, পিসীমার শরীর ভাল নেই। তাই আগের মত আদর যত্ন করতে পারেন না। সত্যি নয়?'

সত্যি নয় আবার! আজ কতকাল ধরে কত অসুখে ভুগছেন পিসীমা কে তার খবর রাখে! কে তাকিয়ে ছাখে তার দিকে, তিনি মরলেই বা কার কি এসে যায়। সংসারের জন্য উদয়াস্ত তিনি খেটে যাবেন, সকলের ভাবনা ভেবে জর্জরিত হবেন, তা'হলেই সবাই খুসী। কিন্তু এ ছেলেটার দয়ামায়া আছে, দেখেই বুঝতে পেরেছে তার শরীর ভাল নয়।

'ছোট বৌ কি বললে?'

'বললেন স্বর্ণসিন্দুর খেলে আপনার উপকার হবে। ওঁর এক মামা কবিরাজী করেন, তার কাছে খাঁটি ওষুধ পাওয়া যায়, আনিয়ে দেবেন বললেন।'

অনেককাল পরে সেদিন রাত্রে হেসেলে খেতে বসে অনুপমা আর মনোরমার মধ্যে কিছুক্ষণ সুখ-দুঃখের গল্প হল।

তারপর কাটল অনেকগুলি দিনরাত্রি। বাড়ীর অসংখ্য সংঘর্ষ, ছোট আর বড়, সামান্য ও সাংঘাতিক, যেন আপনা থেকে উপে যেতে লাগল অতীতে। একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা দিল বাড়ীতে।

সবাই ভাবতে লাগল, আমি ভালো। আমি কেন খারাপ হতে যাব?

চুরি চুরি খেলা

দ্রষ্টব্য খুব বেশী অসাধারণ নয়, কিন্তু কমলার দেখিবার ভঙ্গিতে মনে হয় এ যেন পৃথিবীর অপূর্ব্ব দৃশ্য।

মাঠের দক্ষিণে একসারি নিষ্কম্প নারিকেল তরু, মাঠের মাঝখানে পাতা-ঝরা ঐকটি পেয়ারা গাছ, উত্তরে আম-বাগানের জমাট শ্যামলতা এবং ইহাকে বেষ্টন করিয়া অর্দ্ধ-চক্রাকার ইটবাঁধানো লাল পথ। পথের ধারে, ঘোষসাহেবের সাদা বাড়ীর সামনে, টেলিগ্রাফ পোষ্টে হৃষ্টপুষ্ট গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে। রায়বাবুদের জমাদার কিষণ প্রত্যহ দুইবেলা গাভীটিকে আনিয়া ওই পোষ্টে বাঁধিয়া ঘোষসাহেবের চাকরের সামনে থাটি দুধ দুহিয়া দিয়া যায়।

নিকটে বাছুরটি দাঁড়াইয়া আছে, নিষ্কম্প, নিশ্চল,—বীভৎস। দু'মাসের বাছুরটি মানুষের সীমাহীন লোভের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পনের দিন আগে মরিয়া গিয়াছিল, মানুষ তবু তাহাকে রেহাই দেয় নাই। চামড়া ছাড়াইয়া নিয়া ভিতরে খড় পুরিয়া কাঠের পায়ে সামনে দাঁড় করাইয়া প্রতিনিয়ত গাভীটিকে প্রতারণা করিতেছে।

নির্ব্বোধ পশু মৃত্যু বোঝে না। ক্রমাগত চাটিয়া চাটিয়া সন্তানের স্থির অঙ্গে জীবনের সাড়া আনিবার চেষ্টা করে। এতদূরে জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার গভীর কালো চোখের সকাতর চাহনি কমলা যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়। তার চোখ জ্বালা করিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে কিষণকে অভিশাপ দেয়, মানুষকে ঘৃণা করে।

তার মনে পড়ে ফুকা নামক প্রক্রিয়ার কথা, গরুর দুধ বাড়ানোর যে বীভৎস উপায়ের কথা কিছুদিন আগে সে শুনিয়াছে। কমলার মনে হয় মানুষ পারে না এমন কাজ নেই।

মাথা ঝিম-ঝিম করে কমলার।

কমলা এদিকের জানালায় সরিয়া আসে।

নীচে ফুলের বাগান, বাগানের শেষে ফল-বাগিচা। তাহার শেষ প্রান্তে বাদামী রঙের ঘর তিনখানা এ বাড়ীরই পরিসীমার অন্তর্গত। গাছের ফাঁক দিয়া ঘর তিনখানির দিকে কমলা শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

তার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে।

বারান্দায় জুতার শব্দ হয়।

স্বামীর পদশব্দ কমলা চেনে তবু সে যেন চমকাইয়া ওঠে ছিটকাইয়া গিয়া সে দরজায় খিল তুলিয়া দেয়।

ছোট ছোট নিশ্বাসের দোলনে তার অপরিপুষ্ট স্তন দুটিতে দোলা লাগে। কমলা ব্লাউজের বোতাম লাগায় না। লোকের সামনে শুধু শাড়ীর আঁচলটা গায়ে জড়ায়।

দরজায় টোকা দিয়া খানিকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া অনন্ত ম্লান মুখে ফিরিয়া যায়। ঘরের মাঝখানে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কমলা যতক্ষণ শোনা যায় কাণ পাতিয়া তাহার পদশব্দ শোনে।

তার চোখ ছল ছল করে।

আজ কিন্তু অনন্ত ফিরিয়া গেল না। রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করিয়া বলিল, আমার সাড়া পেয়ে দরজা বন্ধ করলে যে? মুখ দেখবে না?

খুলচি।

খিল খুলিতে কমলার অনাবশ্যক সময় লাগিল। হাতে সে দু'গাছা শাঁখা পরিয়াছে, খিল খুলিবার সময় সরু রুলির পাশে শাঁখা দু'টি কি চমৎকার মানাইয়াছে চোখে পড়ায় সে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

অনন্তের বয়স ত্রিশ বত্রিশ, সুঠাম চেহারা। শরীর দেখিয়া স্বাস্থ্যের অভাব অনুমান করা যায় না, চোখ দু'টি কিন্তু তাহার সর্ব্বদা ক্লান্ত, নিদ্রাতুর। যারা হাইপাওয়ারের চশমা ব্যবহার করে, চশমা খুলিয়া রাখিলে তাদের চোখ যেমন ঢুলু ঢুলু দেখায় তেমনি।

হাসিয়া বলিল, এ যেন আমার নিদ্রাপুরী কমলা। দুয়ার খুলেও খুলতে চায় না।

কমলা চুপ করিয়া রহিল।

কমলার মুখ দেখিয়া হাসি বন্ধ করিয়া অনন্ত বলিল, বিরক্ত করলাম?

না।

কিন্তু মুখ দেখে যে মনে হয় বিরক্তির সীমা নেই! মনে হয়—

কি মনে হয়?

অনন্ত একটু ভাবিয়া বলিল, মনে হয় এটা যেন জেলখানার সেল, আর তুমি তার কয়েদী। তোমায় জেল দিয়েছে হাকিম, কিন্তু নিরপরাধ জেলারকে দেখে রাগে চোখ লাল করে ফেলেছ!

কমলা মৃদুস্বরে বলিল, রাগে নয়।

অনুরাগে?

এই পরিহাসের জবাবে কমলা নীরব হইয়া রহিল। খাটের প্রান্তে বসিয়া তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অনন্ত বলিল, ভূষণের অন্তর্দ্ধান, বসনের বিদ্রোহ। এ সাড়ী তোমার কে এনে দিয়েছে শুনি?

আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে।

এনে দিয়েছে কে?

আমি আনিয়েছি।

আমি এনে দিই নি।

কে এনে দিয়েছে শুনবে? সুশীলবাবু।

অনন্তের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল।

সুশীল? ওকে বরখাস্ত করতে হবে।

মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া অনন্ত গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিল।

কমলা বলিল, বরখাস্ত করতে হবে কেন? আমার আদেশ পালন করেছে বলে?

না। আমার আদেশ পালন করেনি বলে।

কমলা ম্লান ভাবে হাসিল, ও! তবে বরখাস্ত করতেই হবে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অনন্ত বলিল, সুশীলের স্পর্দ্ধা এত বেড়েছে কেন জান কমল? ওর ছেলেকে তুমি অতিরিক্ত আদর কর বলে।

কমলা উদাস ভাবে বলিল, হবে। কিন্তু এ স্পর্দ্ধা নয়। এতে আমি ওঁর বিনয়ের লক্ষণই খুঁজে পাই। কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করছ কেন? দিও তুমি সুশীল বাবুকে বিদায় করে।

অনন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার চুরুটের ধোঁয়া পাক খাইতে খাইতে উপরে উঠিতে লাগিল; মন্থর গতি। এদের কলহও এমনি অলস, এমনি সংক্ষিপ্ত, এমনি ভীরু। কেহ রাগ করে না, ধৈর্য্য হারায় না, কড়া কথা বলে না। এই যে সামান্য একটু আলোচনা হইয়া গেল ইহা শুনিয়া বাহিরের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন যে, সুশীলকে বরখাস্ত করিতে না পারিলে অনন্ত বহুদিন ধরিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে, পারিলে তাহার জের কমলা সহজে মিটিতে দিবে না। কিন্তু ইহাদের অভিজ্ঞতা এমনি প্রচুর যে ভবিষ্যতের এই অতিরিক্ত দুর্গতির সম্ভাবনায় সন্দেহ করিবার সুযোগও পায় না। সুশীল থাক্ বা যাক্, আজ হইতে দু'জনের সম্পর্ক আরও বৈচিত্র্যহীন আরও নীরস হইয়া উঠিবে, কমলা চট পরিয়া থাকিলে অনন্ত তাহা দেখিতে পাইবে না, অনন্তের কোন কথার মৃদুতম প্রতিবাদ করিতেও কমলা ভুলিয়া যাইবে।

কমলার চোখ জল জল করিতে লাগিল। একি জীবন! আনন্দের অভাব শুধু নয়, নিরানন্দের প্রাচুর্য্য। অথচ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভুল অনন্ত অনেক করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি ভুল নিন্দনীয়, কিন্তু পরমাত্মীয়ের ত্রুটি বিচুতি ক্ষমা করিতে তো খুব বেশী উদারতার প্রয়োজন হয় না। কেন সে তা পারে না? তা ছাড়া এ তো ক্ষতি, নিজেকে অধিকতর বঞ্চিত করা।

চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অনন্ত বলিল, সময় সময় তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি লজ্জা পাই কমল।

সে তো আমারি লজ্জা।

তা বটে। কতদিন আমরা পরস্পরের কাছে লজ্জিত হয়ে আছি?

কমলা বলিল, মনে নেই।

মনে না থাকা আশ্চর্য্য কিন্তু অসঙ্গত নয়। অনন্ত আর কিছু বলিল না।

লঘুপদে ঘরে ঢুকিল মাধুরী। কোলে তার বছর দেড়েকের একটি রুগ্ন শিশু। শিশুটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছিল।

কমলার দিকে খোকাকে বাড়াইয়া দিয়া মাধুরী বলিল, গিয়ে থেকে কাঁদছে। বাপমার কাছে এক ঘণ্টা ছেলে থাকতে চায় না একি লজ্জা বলুন ত?

বলিয়া সে সকৌতুকে হাসিল। সে হাসিতে লজ্জার চিহ্নও ছিল না। কমলাই চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না, খোকাকে কোলে নিয়া অপরাধীর মত বলিল, সুশীল বাবু কি বললেন?

মাধুরী হাসিল, কি আর বলবে? সখ মিটে বিরক্ত হয়ে উঠল। কথাতো শুনবে না! সকাল থেকে বলছি, কি হবে খোকাকে এনে? থাকবে তোমার কাছে খোকা? তা কেবলি বলতে লাগল, নিয়েই এসো না একবার খোকাকে, দুদিন যে ওকে আমি দেখিনি। অসুখ হলে ওর ন্যাকামি যেন বেড়ে যায়।

কমলা নীরবে জানালায় গিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন মাধুরীর ছিল না কিন্তু কমলার পিঠে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছার দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়াই রহিল। পরের কোলে গিয়াই ছেলে যে চুপ করিয়াছে এতে তার যেন কৌতুকের সীমা নাই। ছেলে পর হইয়া যাওয়ার আনন্দ যথাসাধ্য উপভোগ না করিয়া সে যেন এখান হইতে নড়িবে না।

অনন্ত স্তিমিত নেত্রে মাধুরীর দিকে চাহিয়া ছিল, দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের পর তার যেন বড় ঘুম পাইয়াছে। হঠাৎ সে সোজা হইয়া বসিল। এমন জমজমাট সৌন্দর্য্য সে জীবনে কখনো ছাখে নাই, পাথরে খোদাই করা এমন অর্থহীন তীব্র হাসিও নয়। মাধুরীর চোখের পাতাটি যেন কাঁপে না, এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অবসাদ আসে না, অনেক দিনের ইট চাপা ঘাসের মত এক মুহূর্ত্তে সমস্ত মুখ অসুস্থ সাদা হইয়া ওঠে,—প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের মত তার সেই বর্ণহীন শুভ্ররূপ দুই চক্ষুকে পীড়ন করে।

কমলা অস্ফুটস্বরে খোকার উদ্যত কান্না সংযত করে, বারেকের জন্যও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না।

কমলার দিকে চাহিয়া অনন্তের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। পরের ছেলে কোলে নিয়া ও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না কেন? কি ভাবে ও? সে যে সুশীলকে কেন বরখাস্ত করিতে চায় মনে মনে তারই একটা ভুল বিশ্লেষণ করিয়া চলিতেছে কি?

অনন্তের মনে হইল মাধুরী উপস্থিত না থাকিলে আজ সে কমলাকে না বলিয়া থাকিতে পারিত না, কোন নিগ্রহের একটানা আতঙ্কে তার দিনগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে, পরের দিনের কি দুর্ভাবনায় অর্দ্ধেক রাত্রি তার বিনিদ্র কাটিয়া যায়।

অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলাকে কি বলিতে গিয়া হঠাৎ নীরবেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নীচে নামিয়া পিছনের মৃদু আহ্বানে অনন্ত চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধুরী বলিল, আমি আজ নিজে সন্দেশ করেছি। খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে?

অনন্ত বিবর্ণ মুখে বলিল, রোজ রোজ কষ্ট করে কেন তুমি এসব করতে যাও মাধুরী?

আমার কোন কষ্ট নেই। তবে আপনি যদি বিরক্ত হন—

তার চোখের সামনে কমলার দিকে চাহিয়া উদ্ধত হাসিবার পর এই সকরুণ বিনয় প্রকাশে অনন্তের মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল, সুশীলের অসুখ শুনলাম—

সামান্য অসুখ। আমি কাছে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সারাদিন আজ কবিতা লিখেছেন—

সামান্য কয়েকটি কথায় কৈফিয়ৎ ও অনুনয়ের কি অপূর্ব্ব সমন্বয়। অনন্ত যেন হতাশ হইয়া গেল,—কবিতা?

হ্যাঁ। লিখবার সময় ওকে দেখলে আমার এমন ভয় করে! চোখ রক্তবর্ণ, কপালে একটা শিরা দপ্ দপ্ করছে—

জ্বরের জন্য বোধ হয়।

মাধুরী ম্লান ভাবে হাসিল, হবে। কিন্তু আমার ভয় করে।—কোথায় বসবেন?

লাইব্রেরীতে।

অনন্ত চিন্তিত মুখে লাইব্রেরীতে গিয়া বসিল। একটা প্লেটে একটিমাত্র সন্দেশ আনিয়া কাগজপত্র সরাইয়া টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া মাধুরী বলিল, করেছি বোধ হয় পঞ্চাশটা, খাবেন মোটে একটা।

বেশী খেলে তুমি খুসী হবে?

মাধুরী ম্লান মুখে বলিল, হ'তাম, বেশী খেলে যদি আপনার শরীর খারাপ হওয়ার ভয় না থাকত।

একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া সন্দেশটা খাইয়া অনন্ত বলিল, জীবনটা দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছে মাধুরী!

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা ওঠার পরেই জীবন সম্বন্ধে তার এই আকস্মিক মন্তব্যে মাধুরী একটু বিস্মিত হইল। মৃদুস্বরে বলিল, জীবন দুর্ব্বোধ্য বৈকি।

একচুমুক জল পান করিয়া অনন্ত বলিল, শুধু অসামঞ্জস্য, কেবল খাপছাড়া বিধান। উচিত অনুচিতে এতটুকু মিল নেই। প্রমাণ ছাখো, শরীরে স্বাস্থ্য নেই, তোমার তৈরি সন্দেশ একটার বেশী খেতে পারি না, মনে শক্তি নেই, সামান্য উত্তেজনার সূত্রপাতে আতঙ্ক হয়। তবু তো জীবন আমার নিঃস্ব নয়।

নয়? মাধুরীর কণ্ঠস্বর যেন অনুযোগ করিল, আপনি তো উদাসীন, সন্ন্যাসী।

অনন্ত করুণ ভাবে হাসিয়া বলিল, উদাসীন নই, ভীরু; সন্ন্যাসী নই, দুর্ব্বল। ছেলেবেলা চোর চোর খেলায় আমার ছিল বুড়ী ছুঁয়ে বিশ্রামের খেলা। আজও আমি তেমনি অশক্ত হয়ে আছি মাধুরী! নিজে চুরি হয়ে গেলেও ঠেকাবার ক্ষমতা আমার নেই। যে খেলা শক্তিমানের, আমার কি উচিত সে খেলায় যোগ দেওয়া?

মাধুরীর সমস্ত মুখ আবার সাদা হইয়া গিয়াছিল, নতচোখে অস্ফুটস্বরে সে বলিল, জানিনে। কিন্তু দুর্ব্বলের সঙ্গে ছাড়া যে খেলতে পারে না সে তবে কি করবে?

সে সকলের খেলা দেখবে, একটা মোটা বই টানিয়া নিয়া অনন্ত বলিল, হাল্কা মানুষ ভেসে উঠবে আকাশে। সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকবে। মর্ত্ত্যের সুখদুঃখের সঙ্গে ওছাড়া তার আর সম্পর্ক কি?

আকাশ ছোঁয়া কথা! অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্ত মোটা বইটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে মাধুরী বলিল, আপনার ওষুধ আনব? কিছু খেয়ে সেটা খেতে হয়?

অনন্ত মুখ তুলিয়া বলিল, আনো। কিন্তু একটা কথা শুনে যাও। সুশীলকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলাম বলে কমলার সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া হয়েছে।

আর ঝগড়া করবেন না।

বলিয়া মাধুরী ওষুধ আনিতে চলিয়া গেল।

ওষুধ খাইবার সময় অনন্তের মনে হইল একবার উপরে গিয়া গোপনে আর্শিতে দেখিয়া আসিবে তার চোখ দুটিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কিনা, কপালের একটা শিরা দপ্ দপ্ করিতেছে কিনা। সেও কি আজ অসুস্থতার কবি নয়?

প্রথমদিন কমলা খালি পায়ে কাঁকর-বিছানো পথে হাঁটিতে পারে নাই। এখন কোনই অসুবিধা হয় না।

পথের দু'দিকে ফুলের চারাগুলি যেন ফুল ফোটানোর প্রতিযোগিতা সুরু করিয়াছে। পট্ পট্ করিয়া কয়েকটা রক্তগোপাল ছিঁড়িয়া কমলা খোকার হাতে দিল। ফুলগুলির দিকে হাত বাড়াইয়া খোকা অস্ফুট আবেদন জানাইয়াছিল বলিয়া নয়, ফুল ছিঁড়িতে আজকাল আর তার দ্বিধা হয় না।

সুশীলের ঘর তিনখানার পিছনে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়ার ডগায় পড়ন্ত রোদ বিবর্ণ সোনার রঙ্ মাখাইয়াছে। আকাশে মেঘ নাই কিন্তু কার্ত্তিকের কুয়াশার ইঙ্গিতে শূন্য ভরাট। রোদের রঙ তা আংশিক আত্মসাৎ করিয়াছে।

তিনটা সিঁড়ি ভাঙিলে একেবারে সুশীলের শয়নকক্ষে পৌছানো যায়। সুশীল শুষ্কমুখে বিছানায় বসিয়াছিল। একটু নিঃশব্দ হাসি দিয়া সে কমলাকে অভ্যর্থনা করিল।

খোকাকে নিয়ে এলাম।

তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওটাকে ফেলে এলেই ভাল

করতেন। ওকে দেখলে জীবনে আমার যত ক্ষতি হয়ে গেছে সব একসঙ্গে মনে পড়ে।

কমলা চমকাইয়া উঠিল। জীবনে যার বোধ হয় সবটাই ক্ষতি, জীবনের সমস্ত ক্ষতির কথা তার একসঙ্গে মনে পড়া কি ভয়ঙ্কর!

সজল চোখে সে বলিল, আপনার কাছে মাপ চাইতেও আমার লজ্জা করে। জানেন, সব দেখে শুনে দিন দিন আমার স্নেহ মমতা পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। আপনার ছেলে আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচতাম।

খোকাকে সে বিছানায় নামাইয়া দিল। ক্ষীণ শিশুটি যেন ক্রমেই তার অপরাধের মত অসহ্য ভারি হইয়া উঠিতেছিল।

কমলা টুলটাতে বসিলে সুশীল বলিল, আপনাকে বলাই ভাল। খোকার জন্য আমার কোন নালিশ নেই।

কমলা সংশয় ভরে বলিল, কেন?

আপনার মধ্যে ও যে আমার আপন হয়ে রইল এই আমার পরম লাভ। না, কোন কিছুর জন্যেই আমার নালিশ নেই।

কমলা নীরব হইয়া রহিল। নালিশ নাই! বালিশের তলা হইতে একটি ক্ষুদ্র ছিটের জামার যে অংশটুকু বাহির হইয়া আছে সে যেন সেটা চেনে না, তাকে আসিতে দেখিয়া সুশীল যে জামাটি বালিশের নীচে লুকাইয়াছিল এ যেন সে অনুমান করিতে পারে না! কি ভাবে তাকে সুশীল?

কমলার মনে হইল, এ তার শাস্তি। স্ত্রী-পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে শূন্য ঘরে শূন্য মনে এর দিন কাটে, ঘরের বিশৃঙ্খলতায়, ঘরের দেয়ালে দেয়ালে, ওই মলিন শূন্য শয্যায়, বিষাদের প্রলেপ পড়িয়াছে। এ ঘরে এ ভাবে বসিয়া থাকার বাড়া শাস্তি আর কি হইতে পারে মানুষের?

অপরাধই বা তার কম কি? কিছুই তো তার অজানা নাই। প্রতিকার প্রথম হইতেই সুশীলের আয়ত্তে ছিল। যেদিন খুসী ওই রঙচটা তোরঙ্গে জামা কাপড় ভরিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বিদায় নিলে কে তার পথ আটকাইত? এ বিপদ এমনি শ্রীহীন এমনি ভয়ানক যে পলায়নে লজ্জা ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত সর্বনাশকে সে নীরবে স্বীকার করিয়া নিয়াছে, আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র করে নাই। তা যে অকারণে নয় তার চেয়ে কে তা ভাল করিয়া জানে?

এলোচুলে মুখ প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছিল, কমলা তাহা সরাইবার চেষ্টা করিল না। ঘোমটার মত কালো চুল তার মুখের লজ্জা ঢাকিয়া রাখুক।

চালে আগুন লাগার সুযোগে গৃহস্থের ঘরের ভিত্তিতে যে সিঁদ কাটিয়াছে এ ভাবেই তাহাকে লজ্জা গোপন করিতে হয়। কমলা তা জানে। অনেকদিন ধরিয়া অনেক রাত্রি জাগিয়া বাদামী রঙের তিনখানা ঘরে অনেক স্বপ্নের সংসার পাতিয়া এ বিষয়ে তার পুরাপুরি জ্ঞান জন্মিয়াছে।

ঘরের আলো আবছা হইয়া আসার সঙ্গে সুশীল কখন শুইয়া পড়িয়াছিল কমলা টের পায় নাই। মুখ তুলিয়া দেখিয়া তার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। এতক্ষণ চুপ চাপ বাপের কাছে থাকিয়া তার দুই বাহুর আবেষ্টনীতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

খোকা বুঝি ঘুমালো?

সুশীল ক্লিষ্টস্বরে বলিল, হ্যাঁ। আমার গায়ের গরমে বোধ হয় আরাম পেয়েছিল।

গায়ের গরম! জ্বর বাড়ল আপনার?

জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া কাছে গিয়া কমলা তার কপালে হাত রাখিল। জ্বর বাড়িয়াছে।

অসুস্থ শরীরে সারাদিন কেন কবিতা লিখলেন?

সুশীল মৃদুস্বরে বলিল, অসুখ শরীরে বিনা কাজে দিন যে কাটে না। আলোটা জ্বালুন তো, অন্ধকার হয়ে এল। তারপর খোকাকে নিয়ে যান। অসুস্থের সঙ্গ ওর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

কমলার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, অসুস্থের সঙ্গ কার পক্ষে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু কণ্ঠস্বর কেমন শুনাইবে জানা না থাকায় কথা বলিতে সে সাহস পাইল না।

আলোটা খুঁজিয়া নিয়া দেশলাই জ্বালিতে সে অনাবশ্যক দেরী করিয়া ফেলিল। একটু বদল না করিয়া মুখের ভাবটা সে সুশীলকে দেখাইতে চায় না।*

*হাত মক্স করার সময় লেখা।

ধাক্কা

দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুমতি কম্পিত পদে দুরু-দুরু বুকে অক্ষয় ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, আজ সে সংসারের সর্ব্বত্র মূল্য বিস্তার করিয়াছে, প্রয়োজনের কল্যাণে এত মূল্য পাইয়াছে নিজের, পরগাছা যার স্বপ্নই শুধু ছাখে।

আসিয়াছিল দুটি কাজের জন্য—ছেলে রাখা ও রুগ্না গৃহিণীর সেবা করা। আর এখন বাড়ীতে প্রত্যেকটি মানুষ আহার আরাম বিশ্রামের সমস্ত ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারই যেন জন্ম-জন্মান্তরের দায়িত্ব।

অলকার হইয়াছে পক্ষাঘাত। অর্দ্ধাঙ্গ অবশ।

দিবারাত্রি বিছানায় শুইয়া থাকে, কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবে, বিড় বিড় করিয়া নিজের অদৃষ্ট-দেবতাকে শাপে আর প্রতিরাত্রে শান্ত স্বামীর সঙ্গে কলহ করে।

বলে, 'তুমি? তুমি ছাইএর ডাক্তার, কচুর ডাক্তার।'

'তুমি নির্লজ্জ। স্ত্রী যার এক বছরের বেশী বিছানায় পড়ে, কোন লজ্জায় সে পরের চিকিৎসা করতে যায় শুনি!'

উপসংহারটা করুণ!

'একটিবার খোকাকে কোলে নিতে পারি না এমনি অদেষ্ট!'—বলিয়া সছিদ্র হাপরের মত নিশ্বাস নিতে নিশ্বাস ফেলিতে সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া অলকা কাঁদে।

এদিকের ঘরখানা সুমতির। তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। খোকাকে বুকে ফেলিয়া গালে গাল রাখিয়া ঘুম পাড়ানোর কায়দাটা অবশ্য অলকার চোখে পড়ে নাই, ঘুমপাড়ানো ছড়াটাই শুধু কানে গিয়াছে। তাহাতেই এত।

আধ ঘুমন্ত খোকাকে কোলে নিয়া সুমতি ওঘরে যায়।

'আপনার পাশে খোকাকে একটু শুইয়ে দেব দিদি?'

অলকার শরীর বলিতে শুধু হাড় আর চামড়া। কোটর-গত চোখে অনেকখানি জল জমিলে তবেই গড়াইয়া পড়িতে পারে। চোখ মুছিতে গিয়া তাহার সমস্ত মুখ চোখের জলে মাখা হইয়া যায়।

সে রাগিয়া বলে, 'আড়ি পেতে শোনা হ'ল বুঝি কথা? না হল না! কচি খুকী কিনা আমি, বুঝিনে কিছু। লজ্জা করে না? বেহায়া!'

তাহার শীর্ণ দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। একটানা দুঃখ শ্রেয় জানিয়া সে যেন সংযম অভ্যাস করে, সুমতি প্রলোভনটা সামনে ধরিয়াছে বলিয়া তাই তার এত রাগ।

দক্ষিণের জানালার কাছে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অক্ষয় মোটা ডাক্তারি বই পড়ে। বায়েকের জন্যও সে মুখ তুলিয়া তাকায় না। ঘরে যে বেদনার একটা স্থূল অভিনয় হইয়া গেল সে বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিবার মত অনুভূতিও তাহার যেন নাই।

তা অক্ষয় এমনি বটে,—নির্ব্বিকার, নিস্পৃহ। কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গৃহে শয্যাগত স্ত্রীর আনন্দহীন বৈচিত্র্যহীন বোঝা, বাহিরে কেবল রুগ্ন ও আহত মানুষের সাহচর্য্য এবং মরণের সঙ্গে অন্তহীন বোঝাপড়ার ক্ষুব্ধ স্তিমিত বিষাদ,—সবই যেন তাহার কাছে একান্ত তুচ্ছ। সুপ্রাপ্য বলিয়াই বেদনা যেন মূল্য হারাইয়াছে।

দিনটা এক প্রকার বাহিরেই কাটে।

সকাল সাতটায় ডিসপেন্‌সারীতে যায়, সেখান হইতে কলে। বাড়ী ফিরিতে একটা বাজিয়া যায়। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার আগে সে সুমতিকে জিজ্ঞাসা করে,—'ও খেয়েছে?'

সুমতি বলে, 'হ্যাঁ।'

'তুমি?'

মুখের দিকে তাকায় না বলিয়া প্রশ্নটা নিছক ভদ্রতাসূচক মনে হয়।

'আপনি তো জানেন আমি শেষবেলায় হবিষ্য করি।'

'ও ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ বেলায় হবিষ্য করার কি দরকার? রাত্রে কিছু খাও না বুঝি সুমতি?'

'খাই।'

'তবে?'

বলিয়া জবাবের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া অক্ষয় উপরে উঠিয়া যায়।

জবাব যে সুমতি দিতে পারে না এমন নয়, ইচ্ছা করিয়াই দেয় না। রাত্রে সে 'অবশ্য কিছু জলযোগ করে কিন্তু এগারটার আগে নয়, তার আগে তাহার সময় হয় না। খাওয়ার সময়-বিভাগ সম্বন্ধে অক্ষয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে তাহার লজ্জা করে, জবাব না দিবার ইহাই কারণ।

নাওয়া খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য দু'ঘণ্টার বেশী সময় অক্ষয় পায় না। বাহিরে রোগী ডাকাডাকি করে, টেলিফোনের যন্ত্রটা বার বার শব্দিত হইয়া উঠে, তিনটা না বাজিতেই আবার সে বাহির হইয়া যায়। ফেরে রাত্রি আটটা নটায়।

তখনও কিন্তু সে নিজেকে বিশ্রামের অবকাশ দেয় না। পড়ার ঘরে বসিয়া মোটা মোটা ডাক্তারি বই পড়িতে আরম্ভ করে। সুমতির মনে হয়, শোবার ঘরে ঢুকিবার সময় পিছাইয়া দেওয়ার ইচ্ছার কাছে তাহার শ্রান্তি হার মানিয়াছে।

এমন খারাপ কথা মনে হয় বলিয়া মনে মনে নিজের উপর সুমতি রাগ করে।

অলকা এদিকে নিত্যকার কলহ ও কান্নার জন্ম থাকে ব্যাকুল হইয়া, বেচারীর জীবনে এখন ওইটুকুই বৈচিত্র্য; অক্ষয় ফিরিয়াছে টের পাইলেই এমন কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দেয় যে, ও ঘরে উঠিয়া না গিয়া অক্ষয়ের আর উপায় থাকে না।

অলকা বলে, 'ও ঘরে এত কি মধু? এঘরে বসে পড়।··· ছাখো গো, গালে আমার একটা ব্রণ উঠেছে। বড় ব্যথা।'

চটচটে ঘামে ভেজা অলকার গাল—কে যেন আঠা মাখাইয়া রাখিয়াছে। অক্ষয় আদর করিয়া তাহার গালে হাত বুলাইয়া দেয়, দুই গালে একটি ব্রণও সে খুঁজিয়া পায় না, সস্নেহে বলে, 'ইস, বড্ড ঘেমেছ যে!'

জীবন্ত পত্নীর শবের মত শীতল ক্লেদাক্ত স্পর্শ আঙুল বাহিয়া উঠিয়া অক্ষয়ের মানে ধাক্কা দেয় কিনা কে জানে! বোধ হয় দেয় না। শব ঘাঁটা অক্ষয়ের বহুদিনের অভ্যাস।

ইহার পর খানিকক্ষণ অলকা চুপ করিয়া থাকে, তারপর প্রথমে ভালভাবেই কথা বলিতে আরম্ভ করে এবং তাহা নালিশ ও কান্নায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অক্ষয় এমনি নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িয়া যায় যে সে একটা কথাও শুনিতেছে না এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে।

অলকা সহসা ক্ষেপিয়া যায়।

'—বকে মরছি, শুনছ না যে? কেনই বা শুনবে, আমি মরলেই যে তোমার হাড়ে বাতাস লাগে।'

অক্ষয় মুখ তুলিয়া নিদ্রাতুর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। বলে, 'আহা, অলক, এমন করে রাগ ক'রো না, কিছু না জেনে শুনে। তোমার কথা শুনছি বৈকি, শুনছি।'

'ছাই শুনছ! পড়া তোমার পালাবে না গো, আমি কিন্তু পালাব। আমি চিতায় উঠি তারপরেই না হয় ওসব ছাই-পাঁশ পোড়ো? কদিন বাকী আর!'

অক্ষয় শান্তকণ্ঠে বলে, 'দেখ দিকি তুমি কি সব বলছ! এসব বই ছাইপাঁশ মোটেই নয় অলক, সব তোমার অসুখের বই। তোমায় সারিয়ে তুলতে হবে না?'

'হবে?,

অলকা যেন স্তম্ভিতা হইয়া যায়। উত্তেজনায় মাথা উঁচু করিবার চেষ্টা করিয়া সে বলে, 'হবে? আমাকে সারিয়ে তুলতে হবে? এ তুমি কি বলছ গো! রাত জেগে আমার অসুখের বিষয়ে তুমি বই পড়! আমায় মাপ কর গো, মাপ কর।'

মাথাটা সে বেশীক্ষণ উঁচু করিয়া রাখিতে পারে না, থপ্‌ করিয়া বালিশে পড়িয়া যায়। বিড় বিড় করিয়া কতবার সে যে 'মাপ কর, মাপ কর' বলে তাহার ঠিকানা নাই।

কিন্তু দেখা যায় তাহার এই কৃতজ্ঞতা অস্থায়ী। চোখের জল ভাল করিয়া শুকাইবার পূর্ব্বেই স্বামীর ভালবাসার এতবড় প্রমাণও তাহার নিকট মর্য্যাদা হারায়।

হতাশ কণ্ঠে সে বলে, 'ছাই! তুমি আবার আমায় সারিয়ে দেবে। আমি কি আর বুঝতে পারি না, কিসের জন্ম তুমি বই পড়।'

'আমার মরাই ভাল,'—এই বলিয়া সাঁ সাঁ করিয়া কাঁদে।

ও ঘরে সুমতির মনে হয়, এতক্ষণে তাহার সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি আসিয়াছে। পৃথিবীর মত খারাপ গ্রহ সৌরজগতের যে আর নাই একথা টের পাইবার পর আর জাগিয়া থাকা চলে না। এবার ঘুমানো দরকার।

কিন্তু সুমতি ঘুমোয় না। সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া খোলা বারান্দায় দাঁড়ায়। দেখিতে পায়, নীচে অন্ধকার উঠানে নন্দর ঘরের জানালা দিয়া আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

সুমতির ইচ্ছা হয় ওই আলোয় কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া থাকে। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ওই আলোর দিকে চাহিয়া না ওই আলোয় দাঁড়াইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছাখে।

নন্দ—অক্ষয়ের কম্পাউণ্ডার। অক্ষয়ের কম্পাউণ্ডার আছে দু'জন। তিন বছর মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের মধ্যে নন্দর মানও বেশী, মাহিনাও বেশী।

সে অক্ষয়ের বাড়ীতেই থাকে ও খায়। কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ভোর পাঁচটায় উঠিয়া ডিসপেনসারীতে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হয়। ঘরের ভিতর তখন আলো-অন্ধকারের মেশামেশি।

· খাবার ও খাবার জল পৌছাইয়া দিতে ঘরে ঢুকিতে গিয়া সুমতির গা একটু ছম ছম করে। সকলের ঘুমের আড়ালে এই কর্ত্তব্য পালনে কেমন যেন গোপন অভিসারের আমেজ আছে, অনুভূতির মধ্যে সেটুকু ধরা পড়া কোন মতে নিবারণ করা যায় না।

নন্দর যত কাব্যও কি এই ভোরকে নিয়াই।

'কাল ঘুম আস্‌তে একটা বেজে গিয়েছিল, সুমতি। তবু এত ভোরে উঠলাম। হয়ত আজ এখন দোকানে যাব না। তুমি চলে গেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ব।'—বলিয়া নন্দ হাসে।

সুমতি রাগ করিয়া বলে, 'আজ থেকে রাত্রেই আপনার ঘরে খাবার রেখে যাব। ভোরে ওঠার কষ্ট পেয়ে কাজ নেই।'

ন॰ তথাপি হাসে—'তাতে আমার ঘরের রাত-অতিথি ইঁদুরগুলিরই উপকার হবে আর কিছু হবে না। আমি ক্ষুধার্ত্ত হয়েই দোকানে যাব।'

'তাতে আমার ক্ষতিটা কি?'

কথাটা বলিয়াই নিজের বোকামিতে সুমতির মন অনুশোচনায় ভরিয়া যায়, সবটুকু রাগ নিজের উপরে গিয়াই ড়ে। ফাজলামি করিবার এমন সুযোগ অবহেলা করিবে

নন্দর কি সে উদারতা আছে? কথাটা বলা তাহার কোন মতেই উচিত হয় নাই।

নন্দর সত্যই উদারতা নাই, সকৌতুকে হাসিয়া সে জবাব দেয়, 'সত্যি কোন ক্ষতি নেই? তবু যদি শেষরাত্রে উঠলেও খাবার হাতে হাজির না হতে!'

'আমি রোজ এমনি সময় উঠি।'

'ওঠই তো! কে তা অস্বীকার করছে? কেন ওঠ তাই নিয়ে প্রশ্ন।'

কথায় নন্দর সঙ্গে পারিবার যো নাই। সুমতি মুখ গোঁজ করিয়া বাহির হইয়া আসে। দুপুরে নন্দ খাইতে আসিলে সামনে বসিয়া খাওয়ায় না। রাত্রে এক ফাঁকে ঘরে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসে। ইঁদুরের কথাটা সে ভোলে না। ঢাকনির উপর একটা দশসেরি শিল চাপাইয়া দেয়। রান্নাঘর হইতে শিলটা নন্দন ঘরে বহিয়া নিয়া যাইতে তাহার যে রীতিমত কষ্ট হয় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাকরকে বলিলে সে অবশ্য কাজটা করিয়া দিতে পারে, কিন্তু চাকরকে সুমতি বলে না। নন্দর সঙ্গে তাহার কলহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে চাকরকে টানিতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

পরদিন সকালে খাবারের খবর নিতে গিয়া ছাখে অমন ভারি শিলটা সরাইয়া ঢাকনি উল্টাইয়া ঘরময় খাবার ছড়াইয়া রাতারাতি ইঁদুরে কল্পনাতীত অত্যাচার করিয়া গিয়াছে! ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া সুমতি হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। কি ছেলেমানুষ নন্দ! কি করিয়া রাগের জবাব দিতে হয় আজও তা শেখে নাই। ঘরময় মিনতি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে,—আমায় প্রশ্রয় দিও করুণাময়ী!

অথচ এ যেন খাপ খায় না, এ হেন অর্থহীন। সুমতির চোখে সহসা জল আসিয়া পড়ে। ঘরের কোণে ওই রঙচটা তোরঙ্গ, দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো আধ ময়লা একটা পাঞ্জাবী, তক্তপোষে পুরাণো তোষকের বিছানা আর বালিশের পাশে ওই এক তাড়া মনিঅর্ডারের রসিদ—ছড়ানো খাবারগুলির সঙ্গে এই সবের সামঞ্জস্য নাই যে একেবারেই। সুমতির মনে হয় বজ্রের মত কঠোর ফুলের মত কোমল এই লোকটি যে তাহার জীবনে পদার্পণ করিয়াছে তার মধ্যে প্রচুর অমঙ্গলের সম্ভাবনা লুকানো আছে, ইহাকে তাহার ভয় করিয়া চলা উচিত। এ একদিন তাহাকে বিপন্ন করিবে।

নন্দর প্রকৃতির গভীর দিকটার সঙ্গে সুমতির পরিচয় বেশী দিনের নয়।

এক সপ্তাহও হয় নাই একদিন ভোরবেলা খাবারের বাটি ও জলের গ্লাসটা টেবিলের উপর ঠক্ করিয়া নামাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ফস করিয়া সুইচ টিপিয়া নন্দ আলো জালিল।

সুমতি চমকাইয়া বলিল, 'ইস্! এ আবার কি?'

'একটা কথা আছে সুমতি। আলো না জাললে তো তুমি দাঁড়াবে না। অথচ একটা ভয়ানক দরকারী কথা তোমাকে এখন না বললেই নয়।'

এ ভূমিকা সুমতি চিনিত। নন্দর বক্তব্য অনুমান করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে বলিল, 'পাঁচটা টাকা চাই, এই ত কথা?'

নন্দ অবাক হইয়া বলিল, 'কি করে জানলে?'

যেন জানাটা সুমতির পক্ষে আশ্চর্য্য ব্যাপার। নন্দর যে দু'টার বেশী জামা নাই, ক্রমাগত তালি লাগাইয়া এক জোড়া জুতাই সে যে আজ এক বৎসর ব্যবহার করিতেছে, মাসের দশ দিন না কাটিতে জলখাবারের কটা পয়সাও যে তাহার হাতে থাকে না, এসব যেন সুমতির অজানা!

'যেমন করেই জানি, টাকা চাই কি না বলুন!'

'চাই।'

'দিচ্ছি এনে। কিন্তু মাইনের টাকাগুলো কি করলেন?'

নন্দর চোখ দুটি সহসা স্তিমিত হইয়া গেল।—'জুয়া খেলেছি।'

'ষাট টাকা জুয়া খেললেন?'

'না, পঞ্চাশ। দশ টাকা একজন ধার নিয়েছে।'

সুমতি গম্ভীর হইয়া বলিল 'শেষটা সত্যি হতে পারে, প্রথমটা খাঁটি মিথ্যা।'

'মিথ্যা নয়। রূপক।'

'রূপক না ছাই!' বলিয়া সুমতি বালিশের তলা হইতে মনিঅর্ডারের রসিদের তাড়াটা টানিয়া বাহির করিল। বলিল, 'কেদার মুকুয্যেকে আপনি প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠান। মুখুয্যেটি কে?'

নন্দ সংক্ষেপে জবাব দিল, 'ভগ্নীপতি।'

'আমিও ওই রকম একটা কিছু অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এ তো ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার! সীতা থাকে আপনার কাকার কাছে, মাসে মাসে মাইনের সব টাকাগুলি আপনি পাঠিয়ে দেন ভগ্নীপতিকে। পণে'র টাকা শোধ হচ্ছে নাকি? শোধ না হলে সীতা স্বামীর ঘর করতে পাবে না?'

'না। সীতাকে যে স্বামীর ঘর করতে হয় না ও তার দাম সুমতি।'

ইহার পর নন্দ সব কথা খোলসা করিয়াই বলিয়াছিল। কেদার মুখুয্যে ছিল নন্দর পিতৃবন্ধু—নেশার বন্ধু;—মদের। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর নন্দর বাবার মাথাটাও বোধ হয় একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আর কোন যোগাযোগ ঘটিয়াছিল কিনা এখন খার জানিবার নাই, জানিয়া লাভও নাই। কেদারের সঙ্গে হঠাৎ একদিন সীতার বিবাহ হইয়া গেল।

নন্দ কিছুই জানিত না। যে রাত্রে সীতার বিবাহ হয় সে রাত্রে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে সে মহানন্দে থিয়েটার দেখিতেছে।

'জানো সুমতি, ওদিকে সীতাহরণ হচ্ছে, আর আমি

দেখেছি থিয়েটার। থিয়েটার!—শিশির ভাদুড়ীর সীতা প্লে দেখেছি।'

কাহিনী শুনিয়া সুমতি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া ছিল। শেষে আস্তে আস্তে একটা অতি ছেলেমানুষী প্রশ্ন করিয়াছিল, 'সীতাকে আপনি খুব ভাল বাসেন, না?'

নন্দ সহজ ভাবেই ইহার জবাব দিয়াছিল 'বাসি। কিন্তু একটি মাত্র বোনের অমন অবস্থা হলে কোন ভাই তা সইতে পারে না। সিঁথির লাল ঘায়ের যন্ত্রণায় সীতার ছটফটানি তুমি যদি দেখতে সুমতি!'

সিঁথীতে লাল ঘা! কি বর্ণনা! সুমতি আর কথা কহিতে পারে নাই। অথচ তাহার অনেক বক্তব্যই ছিল। স্বামী বৃদ্ধ হোক মাতাল হোক হিন্দু মেয়ের স্বামীর ঘর না করিয়া কেমন করিয়া চলে নন্দকে একথাটা সে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল। বৃদ্ধ মাতাল স্বামীও যে স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিতে পারে, অন্তত বিবাহের পর কয়েকটা বছর; মাতাল স্বামীর ছেলেমেয়ে নিয়াও যে একটা নারী-জীবন এক দিক দিয়া সার্থক হইতে পারে এই ধরণের কয়েকটা কথা আভাষে ইঙ্গিতে নন্দকে জানাইয়া দিবে কিনা মনে মনে সুমতি নাড়া চাড়া করিয়া দেখিতেছিল।

কিন্তু সীতার সিঁথীর বর্ণনা শুনিয়া কিছু বলিতে তাহাকে ভরসা হয় নাই। নিজের সিঁথী তাহার বড় বেশী সাদা হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালেই সুমতি খাবার নিয়া আসে।

নন্দ সঙ্গে সঙ্গে অভদ্র রকমের খুসী হইয়া উঠে। হাসিয়া বলে 'আঃ, খাবারে আজ ক্ষমার অমৃত। দোকানে গিয়া খানিকটা সায়ানাইড খেয়ে দেখব মরি কিনা।'

'খাবেন না, মরবেন। এ ক্ষমা নয়। দয়া।'

নন্দর মুখ ঘনাইয়া আসে—'দয়া?'

'তবে কি ভাবেন আপনি?'

দু'জনের উদ্ধত দৃষ্টি নীরবে খানিকক্ষণ কলহ করে।

সহসা বাটিটা তুলিয়া নিয়া নন্দ মেঝের উপর আছড়াইয়া ফ্যালে। আঙুল বাড়াইয়া খোলা দরজাটা দেখাইয়া চাপা গলায় বলে 'যাও। দয়াবতী দয়া করে যাও।'

ক্ষমা চায় দুপুরে খাইতে আসিয়া। অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল করিয়াই আসে।

হাত জোড় করিয়াই হাসিয়া ফ্যালে। বলে, 'ক্ষমা সুমতি।'

ইহাতে নন্দকে ক্ষমা করিবার সুবিধাই হয়। কারণ সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া সে আর হাসিতে পারে না! তাহার চোখ দুটি ছল ছল করিতে থাকে।

বলে 'এবারকার মত ক্ষমা করে ফেল সুমতি, সত্যি বলছি আর কোন দিন তোমাকে ঠাট্টা করব না।'

ঠাট্টা! সুমতি গম্ভীর মুখে বলে 'আচ্ছা।'

'না।'

খুসী হইয়া শিস্ দিতে দিতে নন্দ চলিয়া যায়। কি অপরাধে সুমতির কাছে হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল, বাকী দিনটুকুর মধ্যেই সে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়।

রাত্রে সে যখন ফেরে অক্ষয় হয়ত খাইতে বসিয়াছে, অদূরে বসিয়া সুমতি তাহার আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছে; খাইতে বসিয়া অক্ষয় কথা বলেনা, কখন কি প্রয়োজন খেয়াল রাখিয়া চাহিয়া নিতে পারে না, সুতরাং তাহার খাওয়ার উপর সুমতিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হয়। উঁকি দিয়া দেখিয়া নন্দ নিজের ঘরে চলিয়া যায়। আহারান্তে আঁচাইয়া অক্ষয় উপরে চলিয়া না গেলে সে খাইতে আসে না।

আসনে বসিয়া বলে 'ওর সঙ্গে কেন খেতে বসি না জান?'

নন্দর ছলো ছলো চোখদুটির কথা সুমতির মনে ছিল, সে সদয়ভাবে হাসিয়া বলে 'জানি বৈকি। যতই হোক উনি মনিব তো।'

'ওঃ ভারি মনিব! আর তিনটা বছর পড়লে আমি ওর চেয়ে বড় ডাক্তার হ'তাম এ্যাদ্দিনে, তা জান? বলতে পারলে না।'

সুমতি একটু ভাবিবার ভাণ করিয়া বলে 'তবে ওঁকে দেখতে পারো না বলে বোধ হয়।'

নন্দ ভাবিয়া বলে 'তাও নয়। ভাগের পূজায় আমার রুচি হয় না বলে।

'ভাগের পূজা! পূজা! সুমতির যেন চমক ভাঙ্গে। এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখ তাহার রাগে লাল হইয়া উঠে।

এমনিভাবে দিন কাটে। মনের জোরে যে দুরন্ত সুমতি বজায় রাখিতে পারে না, বিষাদ ও বেদনার মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহার সৃষ্টি হয়। নিজের দুর্ব্বলতার অপরাধটা ধীরে ধীরে নন্দর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তাহার উপর একটু বিতৃষ্ণাও সে বোধ করে। নন্দর পরিহাসে আর সে রাগ করেন', নীরবে উপেক্ষা করিয়া যায়, পরিহাসস্পৃহাও নন্দর সুতরাং আপনা হইতেই কমিয়া আসে।

'জেনে শুনে যত দোষ করেছি সব তুমি ক্ষমা করেছ সুমতি। না জেনে এমন কি দোষ করলাম—'

সুমতি কিছুমাত্র মমতা বোধ করে না। ইহাকে আবার ভাব জমাইবার হীন প্রচেষ্টা মনে করিয়া তাহার গা জলিয়া যায়, রুক্ষ স্বরে সে বলে 'আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি?'

নন্দর মন সরল, সে তথাপি হাল্কা সুরে বলে 'আমার শত্রুর অসুবিধা হচ্ছে। তবে খাওয়ার সময় তুমি উপস্থিত থাক না বলে অসুবিধাই বল দুঃখই বল একটু হচ্ছে।'

'আমার সময় হয় না।'

শেষ পর্য্যন্ত নন্দ রাগিয়া উঠে, বিশ্রী কথা বলে:

'ভালই, ভালই। আমি শুধু কম্পাউণ্ডার যে!'

ইহার একটা কড়া জবাব নন্দ প্রত্যাশা করে কিন্তু সুমতি নীরবে আপনার কাজ করিয়া যায়, সে রাগ করিয়াছে কিনা তাহা পর্য্যন্ত নন্দ অনুমতি করিতে পারে না।

ইহার পর সেও সাবধান হইয়া যায়, হাসি খুসী কম করিয়া গম্ভীর হইয়া থাকে। সুমতিকে জানাইয়া দেয়—'তোমার জন্ম নয়, সীতার অসুখ করেছে।'

সুমতি বুঝিয়াও না বোঝার ভাণ করিয়া বলে, 'কিসের? কি বলছেন?'

'আমি যে আজকাল গম্ভীর হয়ে থাকি তার কথা বলছি। তোমার জন্ম নয়।'

সুমতি ভাবে, বাঁচিয়া গেলাম। ভাবে, ভগবানের অনেক দয়া তাই মনের গায়েও একটা কালির আঁচড় পড়া নিবারণ করা গেল।

আহ্নিকে বসিয়া সে যেন আবার ভুলিয়া যাওয়া স্বামীকে স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারে। জীবন যেন জীবনের সীমা ছাড়াইয়া আলো ও আনন্দ ভরা একটি অভিনব স্বর্গে উঠিয়া যায়।

নন্দ নিজের ঘরে বসিয়া রাত জাগিয়া মনিঅর্ডারের রসিদ গোণে আর সীতাকে চিঠি লেখে। লেখে—

'আর ভাবনা নেই দিদি, শীগ্‌গিরই একটা বাড়ি ভাড়া করে তোকে আনাচ্ছি। ঘর সংসারের সব কাজ কিন্তু তোকে করতে হবে। তোর দাদা—গরীব মানুষ, ঝি চাকর রাখতে পারবে না। বুঝলি? তবে তুই যদি খুব জোর বায়না নিস, উঠতে বসতে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার 'বৌদি চাই' 'বৌদি চাই' আব্দার করিস তাহলে দেখে শুনে খুব খাটতে পারে এমন একটা বৌদি তোকে এনে দিতে রাজী আছি।

আচ্ছা, তোর বৌদি যদি ধর বিধবাই হয়—'

অর্থাৎ নন্দ লিখিতে চায় যে সে যদি একটি বিধবা মেয়েকে বিবাহ করে, তাহাকে বৌদি হিসাবে পাওয়া বিষয়ে সীতার মতামত কি, বাক্য যোজনার দোষে জিজ্ঞাসাটা নিজের মৃত্যু বিষয়ক হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে আর লেখে না; হাসিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

অবশেষে একদিন অলকা মরিয়া গেল। রাত্রি তখন ন'টা।

মরণকে যে কোন সংসারে এমন বিনা আড়ম্বরে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে সুমতির সে অভিজ্ঞতা ছিল না। শোকের কলরব নাই, বেদনার বাহুল্য নাই, ঘরের আবহাওয়া শুধু অতি মাত্রায় শুব্ধ হইয়া গিয়াছে। মনে হয় এবাড়ীর কর্ত্রী যেন আজ মহাপ্রস্থান করে নাই, সুদীর্ঘ কালের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র। ঘুম ভাঙ্গিবার পরেই সকলের এই নীরবতা, অন্য কোন কারণে নয়।

বার কয়েক উঃ আঃ করিয়া দাসদাসী শোকপ্রকাশের অন্ত করিয়াছে। অক্ষয় গম্ভীর মুখে তাহার আরাম কেদারার দুই বাহুতে কনুই ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছে। কয়েকবার অশ্রু মার্জ্জনা করিতে সুমতির নিজের চোখের জলও গিয়াছে ফুরাইয়া। নন্দ কোথায় যেন গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

খাটের উপর চাদর ঢাকা অলকার মৃতদেহ।

নীচে ঝির কাছে খোকা কাঁদিতেছিল, সুমতির মনে হইতেছিল, খোকার কান্নার শব্দটুকু শুধু ভিতরে নিয়া সে কানে ছিপি আঁটিয়া দিয়াছে, ঘরের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কেহ যদি মড়া কান্নাও কাঁদিয়া ওঠে সে শুনিতে পাইবে না।

কিন্তু মড়া কান্না কাঁদিবে কে? সে? সে আর সবই পারে, নিজের কান্নায় শব্দ যোজনা করিতে পারে না। নন্দর কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। মুখখানা তাহার আজ একটু অতিরিক্ত শুকনো মনে হইতেছে বটে, কিন্তু সুমতি শপথ করিয়া বলিতে পারে তাহার কারণ অলকার উপস্থিত মরণ নয়, অনুপস্থিত আঘাত অথবা দুশ্চিন্তা।

ঘরে ঢুকিবার পর ঠিক কতক্ষণ সময় নন্দ সীতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল জানিবার জন্য সহসা সুমতির মন কেমন করিয়া উঠিল।

মানুষের মরণ বাঁচন যাহার ব্যবসা, ঔষধ ও আশ্বাস নিয়া যাহার দোকানকারী কান্না তাহার একেবারেই সাজে না। তবু অক্ষয়ের আরাম কেদারার সন্নিকটে একটি তেপায়ার উপর রক্ষিত মোটামোটা বইগুলির দিকে চাহিয়া সুমতির বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বইগুলির নৈকট্য সম্বন্ধে অক্ষয় যে কি করিয়া এমন উদাসীন হইয়া আছে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই সুমতির বার বার মনে পড়িতে লাগিল। অক্ষয় যে বইগুলি দেখিতে পায় নাই সুমতি কোনমতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

অক্ষয় সুমতির দৃষ্টিকে অনুসরণ করিতেছিল। হঠাৎ সে বলিল 'খোকা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে, সুমতি। ওকে নিয়ে এসো।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। খোকাকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়া অবাক হইয়া দেখিল তেপায়ার উপর হইতে বইগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে।

নন্দর কাছে সরিয়া গিয়া সুমতি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখান থেকে বই সরালে কে?'

নন্দ বলিল 'আমি। ডাক্তারবাবু ওঘরে রেখে আসতে বললেন।'

সুমতির মুখ পাংশু হইয়া গেল।

'ভয় করছে নাকি সুমতি?'

'ভয়? কিসের ভয়?'—বলিয়া সুমতি সরিয়া গেল। ভয়! অলকার মরণে তাহার ভয়! মৃত্যুর সঙ্গে এ যেন তাহার প্রথম পরিচয়! সর্ব্বাঙ্গে সে যে একজনের মরণের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে নন্দ কি তাহা দেখিতে পায় না?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, না বুঝিয়া সেই অনেকক্ষণ মার মরণের মান রাখিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। অক্ষয় বলিল 'খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে সুমতি, ওকে শুইয়ে দিয়ে এসো।'

খোকার উপর আজ যেন তাহার দরদের সীমা নাই।

খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিয়া সুমতি দেখিল এবার স্বয়ং নন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে।

'নন্দ লোক ডাকতে গিয়াছে সুমতি।'

সুমতি প্রশ্ন করে নাই, আপনা হইতে বলিল বলিয়া অক্ষয়ের কথাটা একটু যেন কৈফিয়তের মতই শোনাইল।

সুমতি বলিল 'ও।'

'ওকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলতে চাই সুমতি।'

অলকার শবকে শোনাইয়া তাহাকে অক্ষয়ের কি বলিবার থাকিতে পারে সুমতি ভাবিয়া পাইল না। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিল 'কি কথা?'

অক্ষয়ের স্বর অচঞ্চল, মুখের ভাব নির্ব্বিকার। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সে যেন সাক্ষ্য দিতেছে।

'ও যে বাচবে না, প্রথম থেকেই আমি তা জানতাম সুমতি।'

'জানতেন। না না, জানতেন না।'

'কিন্তু ওকে বাঁচাবার চেষ্টা যে আমি প্রাণপণেই করেছি, তুমি তার সাক্ষী।'

অক্ষয় এতক্ষণ সোজা হইয়া বসিয়া ছিল, এইবার আরাম কেদারায় ঠেস দিল।

যত নিঃশব্দেই চুকিয়া গিয়া থাক অলকার মরণ যে তুচ্ছ হইয়া নাই বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না।

সেদিন রাত্রে মুমূর্ষুর ঘরের আবহাওয়ায় যে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দেখা গিয়াছিল সমস্ত বাড়ীতে তাহা যেন ব্যাপ্তি নিয়াছে।

অক্ষয় বাহিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। রোগী অন্য ডাক্তার সংগ্রহ করে, অক্ষয় নিজের ঘরে খোকাকে নিয়া দিন কাটায়। ইজি চেয়ারটা সে এ ঘরে আনাইয়া নিয়াছে।

বলে, 'আলস্য নয় সুমতি, এ আমার বিশ্রাম। আর কিছুদিন ওভাবে চললে মারা পড়তাম।'

সুমতি কিছুই বলে না। নীরবে খোকাকে দুধ খাওয়ায়।

এঘরে অলকার স্মৃতির আমেজটুকুও নাই। কবে যে সে এ ঘরে আসিত, আলমারি খুলিয়া গুছানো জামা কাপড়-গুলি মেঝেতে নামাইয়া আবার গুছাইয়া তুলিত, বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধা শেষ হইলে হাই তুলিয়া ঘাড় তাকাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিত, অক্ষয়ের বিশ্বাস সে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে।

সুমতি কেন যে ঘরের সর্ব্বত্র অলকার অবলুপ্ত স্মৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে অক্ষয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

বাহিরে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘরের বাতাস ভিজিয়া ভারি, আলো ম্লান। খোকাকে নিতে গিয়া কেমন করিয়া সুমতির হাতশুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চাপিয়া ধরিয়াছিল অক্ষয় জানে না। ইচ্ছা করিয়া যে নয় সুমতি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই অক্ষয়ের অনুমান। তথাপি কয়েক মিনিট পরেই আলমারির উপরের তাকে লুকানো একতাড়া চিঠি সে খুঁজিয়া পাইল।

অলকাকে লেখা অক্ষয়ের প্রেমপত্র। একখানা নয় দু'খানা নয় পঁচিশ ত্রিশখানা। সে যেন রঙিন সুতায় বাঁধা একরাশি পুরাতন, ব্যবহৃত, বিবর্ণ প্রেম।

আজ নিশ্চয় নয়। কবে যেন সুমতি চিঠিগুলি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। নহিলে সোজা আলমারি খুলিয়া ভাঁজ করা শীতের পোষাকগুলির পিছনটা এখন সে হাতড়াইবে কেন?

চিঠির তাড়াটা নিয়া গম্ভীর হইয়া অক্ষয় বলিল, 'মরা মানুষের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য, একথা তুমিও জান আমিও জানি।'

সুমতি কিছুই বলিল না।

'কিন্তু তার অত্যাচারটাও স্বীকার করে নেওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে আমার রীতিমত সন্দেহ আছে সুমতি।'

এবারেও সুমতি নীরব হইল।

'ওটা ভূতের উপদ্রবেরই সামিল। আত্মীয় পর কোন ভূতের উপদ্রব গ্রাহ্য করা উচিত কি? সে কত বড় ভীরুতার লক্ষণ বলত।'

এ যেন বিশেষ করিয়া তাহাকেই তিরস্কার করা। বড় আয়নার মধ্যে নিজের বিধবা বেশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়া সুমতির চোখে জল আসিল।

মাঝে মাঝে স্থগিত হইতে লাগিল বটে কিন্তু বৃষ্টি একেবারে কমিল না। দিনগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিতে উঠিতে আবার জলে ভিজিয়া যাইতেছে, এ বাদল আশীর্ব্বাদের মতই। কিন্তু সুমতির ভাল লাগিতেছিল না। দ্বিপ্রহরে খোকাকে কোলে নিয়া নিজের ঘরে সে বসিয়াছিল, সকাল হইতে যে স্তিমিত বেদনা পীড়া দিতেছিল এখন তাহা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। নন্দ আজ সারাদিন খায় নাই। দোকান হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া সেই যে সে শুইয়াছিল আর ওঠে নাই। ডাকিতে গিয়া সুমতি শুনিয়াছিল তাহার শরীর ভাল নয়, সে খাইবে না। শরীরের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব মেলে নাই।

অথচ কোথায় যে তাহার অপরাধ সুমতি ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার বয়স তেইশ, সে যুবতী সে সুন্দরী তাহার স্বামী নাই ইহা যদি সকলে তাহার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে, এবার তাহার মরাই ভাল। কিন্তু কিছুই তো সে করে নাই। প্রাণপণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার চেষ্টার কবে তাহার ত্রুটি ঘটিয়াছে? তাহাকে নিয়া নন্দর অনধিকার চর্চ্চায় শুধু ততটুকু রাগই সে করিয়াছে যতটুকু রাগ না হইলে মানায় না, সে রাগের জের টানিয়া চলিবার চেষ্টাও সে করে নাই। সকলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সহজ ও সাধারণ করিয়া রাখিতে সারাদিন ব্যাপৃত থাকিয়াছে।

অথচ ইহাদের কল্যাণে জীবন তাহার আজ অকথ্য জটিলতায় ভরা। সব বিষয়ে সেই হইয়া উঠিতেছে অপরাধী।

সীতার দুর্ভাগ্য উপলক্ষে ষাট টাকার কম্পাউণ্ডারি করাই যে নন্দ জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছে সে অপরাধ তাহারই। এক সাহেবের ‹ কাণ্ড ওষুধের দোকানে একশ দশ টাকার চাকরীটা যে নন্দ পছন্দ করিল না সে জন্য সুমতি ভিন্ন আর কেহ দোষী নয়। স্বাস্থ্য যে নন্দর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সে দায়িত্বও সুমতির।

অলকা যে বাঁচিল না, মরিয়াও স্বামীর দু'ফোঁটা চোখের জলের তর্পণ পাইল না, এ জন্য স্বয়ং ভগবানও হয়ত একদিন সুমতিরই বিচার করিবেন।

এমনি সব কটু চিন্তায় সুমতি ব্যাপৃত ছিল, ও ঘর হইতে অক্ষয় তাহাকে আহ্বান করিল। অনুযোগ করিয়া বলিল 'একা একা দুপুরটা যে কাটে না সুমতি!'

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল খোকাকে রেখে যাব?'

'খোকার সঙ্গে এক তরফা আলাপ করব কতক্ষণ? তাছাড়া দুপুর বেলা আর রাত্রিটা তোমার কোল দখল করে থাকা ওর অভ্যাস, আমার কাছে কাঁদবে।'

সুমতি নতমুখে বলিল 'কিন্তু দুপুরে একটু না শুয়ে যে আমি পারব না। কাল একাদশী করেছি।'

অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া বলিল 'ও, আচ্ছা, তবে তুমি যাও সুমতি, শোবে যাও। কাল তোমার একাদশী গেছে জানতাম না। তুমি বুঝি নির্জ্জলা একাদশী কর?'

সুমতি নীরবে স্বীকার করিল। অক্ষয়ের আর কিছু বলিবার আছে কিনা ক্ষণকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল নন্দও একদিন নির্জ্জলা একাদশীর কথাটা তুলিয়াছিল। কিন্তু অক্ষয়ের মত এমন ভদ্র ও সংযতভাবে নয়। সে নির্জ্জলা একাদশী করে শুনিবামাত্র একটুকরা কাগজ টানিয়া নিয়া মোটা মোটা হরফে লিখিয়াছিল 'নির্জ্জলা', তারপর কাগজটা সামনে ধরিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল 'হঠাৎ দেখলে কথাটাকে 'নির্লজ্জ' মনে হয় না? হয়, কি বল? বলই না ছাই হয় কি না হয়, তাতে আর তোমার এমন কিছু মহাপাপ হবে না?'

বিছানায় শুইয়া সুমতির মনে হইল অক্ষয়ের ভদ্রতার চেয়ে নন্দর সেই অসংযত হাসিতে যেন কুটিলতা কম ছিল। নন্দর বিশ্রী মন্তব্যটার মধ্যেই যেন সহানুভূতি ছিল বেশী।

বিকালের দিকে বৃষ্টি কমিয়া গেল। অনেক ভাবিয়া সুমতি নন্দর খবর নিতে গেল। বলিল 'উপোস করছেন কেন?'

নন্দ সবগুলি জানালা বন্ধ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটা ভোরবেলার মতই আবছা।

'আমার জ্বর হয়েছে।'

'বেশী জ্বর?'

'কপালে হাত দিলেই টের পাবে জ্বর বেশী কি কম।'

কপালে হাত দিতে সুমতির সাহস হইল না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল 'একটু দুধ খান্।'

নন্দ ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

'সমস্ত বাড়ীতে পচা ঘিয়ের গন্ধ, লুচি ভাজছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে এসো খানকত লুচি, লুচিই খাব।'

'জ্বরের মধ্যে লুচি খাওয়া কি ঠিক হবে?'

নন্দ হাসিল।

'কপালে হাত দিয়ে যে জ্বর দেখতে পারে না তার সে ভাবনা কেন?'

ইহার জবাব অবশ্য সুমতি দিতে পারিল না, কিন্তু লুচিও সে নন্দকে খাইতে দিল না। এক বাটি গরম দুধ আনিয়া কড়া সুরে বলিল 'খান, ছেলেমানুষী করবেন না।'

কি মনে করিয়া নন্দ আর গোলমাল না করিয়া দুধ খাইল।

রাত্রে আবার দুধ খাইবার পালা। অন্ধকার গাঢ় বলিয়া এখন আর আলো জ্বালিতে কোন বাধা নাই।

আলো জ্বালিয়াই সুমতির চমক লাগিল। নন্দর অভূতপূর্ব্ব ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া সে একটা পা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়াছে, দুই হাতের দশটা আঙ্গুলে টেবিল ঠুকিয়া অত্যন্ত জলদ একটা ধ্বনি তুলিয়া তাহারি তালে তালে মাথা নাড়িতেছে। রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলের মধ্যে ঢেউ খেলিয়া যায়, কপালের একটা শ্রীহীন কুঞ্চনের বারংবার লয় ও আবির্ভাব ঘটে, মুখখানি অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ও নিষ্প্রভ মনে হয়।

সুমতি ভীত হইয়া উঠিল। 'কি হয়েছে? কি হয়েছে আপনার?'

পা নামাইয়া নন্দ সোজা হইয়া বসিল। চোখ খুলিতেই বোঝা গেল দু'চোখ তাহার জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে।

অথচ কথা সে কহিল রসিকতা করিয়া।

'আমার প্রবল আনন্দ হয়েছে সুমতি!'

আনন্দই বটে! বিবর্ণ মুখে সুমতি বলিল 'কেন? কেন আপনার এমন আনন্দ হ'ল?'

'পড়'—ন একটা দুমড়ানো পত্র সুমতির হাতে গুঁজিয়া দিল। সুমতি পড়িল। নন্দর কাকার পত্র। সংবাদ সংক্ষিপ্ত। বিগত সতরই শ্রাবণ সীতার বৈধব্য ঘটিয়াছে। নৌকা করিয়া কেদার গ্রামান্তরে যাইতেছিল। নৌকাতেই সে প্রাণ ভরিয়া মদ খায়। সুতরাং বর্ষার নদীতে টলিয়া গিয়া আর উঠিতে পারে নাই।

কেমন করিয়া কেদার নদীর মধ্যে টলিয়া পড়িয়াছিল চিঠিতে সে কথা লেখে নাই।

সুমতি বহুক্ষণ মুখ তুলিতে পারিল না। শুষ্ক চোখ দেখিয়া নন্দ কি ভাবিবে কে জানে! নন্দর মধ্যস্থতার অচেনা সীতার জন্য সুমতি সত্যই একটু একটু মমতা বোধ

করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা দুফোঁটা চোখের জল ফ্যালে। কিন্তু অশ্রু আজ দুর্লভ। জীবনটা সম্প্রতি নানাবিধ নাটকীয় উপাদানে এমনি অভিনব হইয়া উঠিয়াছে যে চোখে জল আনা আর সহজ নয়।

মণিঅর্ডারের রসিদগুলি খাঁচা-ছাড়া পাখীর মত সর্‌সর্‌ করিয়া ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সুমতির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নন্দ বলিল 'জান সুমতি, উত্তেজনায় আমার যে জ্বর এল সে শুধু মুক্তির আনন্দে নয়। নিজেকে খুনী বলে জানলে—'

'খুনী কি গো?' সুমতি ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল।

'না না, চমকাবার কিছু নেই সুমতি। সে খুনের কথা বলছি না। তিন বছর ধরে মনে মনে যে কেদারের মারণ যজ্ঞ করেছিলাম সে তো আর অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাই কেবলি মনে হচ্ছে সে লোক যে অপঘাতে মরল তার দায়িত্বটা আমারই। ইব্‌সেনের একটা নাটকে—আচ্ছা, থাক ইব্‌সেনের কথা।'

সুমতি চুপ করিয়া রহিল।

'শরীরটা এমন দুর্ব্বল মনে হচ্ছে। যেন কতকাল রোগে ভুগেছি।'

সুমতি তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

নন্দ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল 'বিশ্বাস করছ না? কিন্তু সত্যি এরকম হয়। A sudden shock to the mind and its subsequent disturbances may result in severe physical sickness. কেন হয় তাও বলছি শোন। আনন্দ ব্যথা ভয় এই সব উত্তেজনা মনে দেখা দিলেই শরীরের অনেকগুলি গ্ল্যাণ্ড থেকে রসস্রাব সুরু হয়। আনন্দ কম আর স্বাভাবিক হলে যে রস বার হয় শরীরের তাতে উপকার হয়, কিন্তু অস্বাভাবিক প্রবল আনন্দের রস ঠিক বিষের মত কাজ করে, ঠিক—'

'চুপ করুন।'

বলিতে বলিতে নন্দ বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল, থতমত খাইয়া চুপ করিল। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া বলিল 'অক্ষয় বাবুকেই জিজ্ঞাসা কোরো কথাগুলি সত্য কি মিথ্যা। তিন বছর ওর্নান মেডিকেল কলেজে পড়িনি সুমতি, কিছু কিছু সবই জানি।'

'আচ্ছা! দুধটা খেয়ে ফেলুন।'

নন্দ মুখ ভার করিয়া দুধ খাইয়া বলিল 'এবার কি করতে হবে? লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমোব? না ক খ শিখব?'

'আপনার খুসী' বলিয়া সুমতি চলিয়া যাইতেছিল, নন্দ ডাকিয়া ফিরাইল।

'চলে যাও যে? আমায় ঘুম পাড়িয়ে যাও। আমার আনন্দে বৈচিত্র্য দিয়ে যাও ভাল চাও ত', নইলে রাতারাতি হার্টফেল করব।'

সুমতি উদ্ধতভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু যে জবাব সে দিতে চাহিয়াছিল নন্দর মুখ দেখিয়া তাহা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। শান্ত কণ্ঠে বলিল 'কি করতে হবে বলুন।'

নন্দ আঙ্গুল বাড়াইয়া বিছানাটা দেখাইয়া বলিল, 'বালিশ সরিয়ে বিছানায় বোস, তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি শোব। ব্যস্‌, আর কিছু না। আমি ঘুমিয়ে পড়লে চলে যেও।'

সুমতি বিবেচনা করিয়া দেখিল, নন্দর দাবী যে অসঙ্গত নয় তাহার সপক্ষে যুক্তি আছে। আনন্দে তাহার বৈচিত্র্য না আসিলে রাত্রে সত্যই সে ঘুমাইতে পারিবে না। সমস্ত রাত্রি এই উত্তেজনায় ছটফট করিয়া কাটাইলে আজিকার সামান্য অসুখ কাল বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া এতরাত্রে এই উত্তেজিত মানুষটির মাথা কোলে নিয়া ইহার বিছানায় সে বসে কি করিয়া?

ভাবিয়া চিন্তিয়া সুমতি বলিল 'না। বোন বিধবা হয়েছে এই অজুহাতে এতবড় অন্যায় করতে আপনার না বাধুক, আমার বাধবে।'

কথাটার সমস্তটুকুর অর্থ বুঝিতে কয়েক মুহূর্ত্ত সময় নিয়া নন্দ চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

'তোমার সঙ্গে আর কোন দিন যদি আমি কথা বলি—আচ্ছা তুমি যাও। আর এক মিনিট দাঁড়ালে তোমায় আমি সত্যি অপমান করে বসব সুমতি। এক্ষুণি তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। নন্দ অপমান করিবে বলিয়া নয়, আর দাঁড়াইয়া থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া। নন্দকে চানিতে তো তার বাকী ছিল না। নন্দ ছেলেমানুষী করিতে জানে ভাল করিয়াই, অপমান করিতে শেখে নাই আজও।

উপরে উঠিয়া বারান্দায় পা দিতেই অক্ষয় খপ করিয়া সুমতির হাত ধরিয়া ফেলিল।

'তুমি নন্দর ঘরে ছিলে?'

দুর্বিনীত প্রশ্ন। সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'ছিলাম।'

'কেন ছিলে?'

'নন্দ বাবুর ভগ্নীপতি মারা গেছে খবর এসেছে, খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, তাই—'

অক্ষয় তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল 'কিছু মনে কোরো না সুমতি।'

সুমতি অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিল 'না।'

অক্ষয় কৈফিয়ৎ দিল:

'মনটা ভাল নাই সুমতি। খোকা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল আর তুমি ওদিকে গল্পে মেতে আছ ভেবে হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল।'

সুমতি বলিল 'খোকা কেঁদেছিল? কই শুনিনি ত।'

'কেঁদেছিল বৈকি। আমি কি তোমায় মিথ্যে বলছি সুমতি ?'

অক্ষয় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সুমতি ভাবিতে লাগিল সকাল বেলা চিঠির তাড়া খুঁজিয়া পাওয়ার প্রতিক্রিয়াটা যে অক্ষয়ের দিক হইতে প্রতিশোধের রূপ নিয়া আসিবে এ তাহার জানিয়া রাখা উচিত ছিল। নন্দর মত অক্ষয় ছেলে-মানুষ নয়। অলকা তাহাকে প্রচুর নারী-অভিজ্ঞতা দিয়া গিয়াছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অক্ষয়কে তাহা কাজে লাগাইতেই হয়।

সে রাত্রির অপমানে রাগ করিয়া থাকার সুযোগ নন্দ পাইল না কারণ সুমতি তাহার উত্তেজনার জোরালো প্রতিষেধক দিয়া গেলেও পরদিন তাহার ভালমতেই জ্বর আসিল। মাথা কোলে তুলিয়া না নিলেও সুমতি সারাদিন তাহার মাথায় বরফ দিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর অক্ষয় নিজেই ওষুধ দিয়া গেল। সুমতির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল 'এর মধ্যে বিষ আছে, বুঝলে ?'

সুমতিও বোধ হয় সেই প্রকার কিছু অনুমান করিতেছিল, সভয়ে বলিল 'বিষ ?'

'হ্যাঁ। ভাল করে দাগ দেখে খাইও'

সুমতি ছল ছল চোখে বলিল 'বিষ কেন ?'

অক্ষয় হঠাৎ হাসিয়া বলিল 'সে তো তোমায় আমি এক কথায় বুঝিয়ে দিতে পারব না। ওর যা অসুখ একমাত্র বিষেই তা সারে।'

'একদাগের বেশী পড়লে মরে যাবে ?'

'না, বেশীরকম নেশা হবে। শিশির সমস্ত ওষুধ খেলেও মরবে না, দিন তিনেক নেশায় অজ্ঞান হয়ে থাকবে বড় জোর। ডাক্তার অনেক মানুষ মারে, কিন্তু ইচ্ছা করে একজনকেও মারে না সুমতি।'

তা নিশ্চয় মারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি এরূপ মন্তব্য করিবার অধিকার ডাক্তারের জন্মায় ? সুমতির বয়স ত কম হয় নাই যে ইহাকে হেঁয়ালি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে, কোন জবাব দিবে না। একান্ত অবিচলিত ভাবেই সুমতি বলিল, 'তা বৈকি। কর্ত্তব্যের সঙ্গে সব সময় হৃদয়ের যোগ থাকবে তার তো কোন মানে নেই।'

অক্ষয় ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সুমতির মুখখানি অনেকক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "কিন্তু কোনমতে একটা কর্ত্তব্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ঘটে গেলেই আর সব কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেয়।'

ইহাও হেঁয়ালি নয়। সুমতি বলিল 'তা দেয়, কিন্তু কোন কর্ত্তব্যের সঙ্গে কার হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটেছে অন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা দেখেই সব সময় সেটা ধরা যায় না। কর্ত্তব্যের তো ছোট বড় আছে।

ওষুধের শিশি হাতে আকাশের সন্ধ্যার নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া আত্মসমর্থন করিতে সুমতির গলা বুজিয়া আসিতেছিল। অথচ এ সমস্ত অক্ষয়কে জানানো প্রয়োজন। হৃদয়ের হিসাব-নিকাশ যে চিরকালের মত সে চুকাইয়া ফেলিয়াছে অক্ষয়কে ইহা বিশ্বাস করাইতে না পারিলে তাহার আর উপায় নাই।

বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা টাকার কাছে হার মানিতে পারে ;—একটি মরণাপন্ন শাঁসালো রোগীর জীবন মরণের ভার নিতে অক্ষয় আপত্তি করে নাই।

রাত বারোটা অবধি তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া অক্ষয় বাড়ী ফিরিতেছিল। দারোয়ান প্রভুর প্রতীক্ষায় ঢুলিতে ঢুলিতে রামায়ণ পাঠ করিতেছিল, সেই অক্ষয়কে দরজা খুলিয়া দিল।

নন্দর ঘরের সামনে দিয়া অন্দরে যাইবার পথ। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, দরজা খোলা। জেলখানার আধ ঘুমন্ত শাস্ত্রীর মত বুকে চিবুক ঠেকাইয়া নন্দ লম্বালম্বি ঘরটা পরিক্রমণ করিতেছিল, গতি অত্যন্ত মন্থর, যে কোন মুহূর্ত্তে ঘুমাইয়া পড়িয়া মেঝের উপর ঢলিয়া পড়া যেন আশ্চর্য্য নয়।

মেঝেতে লাঠি ঠুকিয়া অক্ষয় বলিল 'তুমি যে যাওনি হে ?'

নন্দ দাঁড়াইল।

'না, যাইনি।'

'কেন ? যাওনি কেন ?'

'একটু দরকার ছিল তাই যাইনি। কাল যাব।'

অক্ষয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল 'কাল যাবে, কাল !—কাল আমার নতুন কম্পাউণ্ডার আসবে সকালবেলা, সে কোথায় থাকবে শুনি ?'

'সে আসবার আগেই আমি যাব অক্ষয়বাবু।'

অক্ষয় বিরক্ত হইয়া বলিল 'আমার মাইনে করা কম্পাউণ্ডার আমায় অক্ষয়বাবু বলে এ আমি পছন্দ করি না নন্দ। চিরকাল ডাক্তারবাবু বলে এসেছ, যাবার আগে আজ অকারণে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি কোরো না। তা তুমি ঘরের মধ্যে এত রাত্রে পাক খাচ্ছ কেন ?'

নন্দ ক্ষীণভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল 'পরিশ্রম করছি। ঘুম আসে না ডাক্তার বাবু।'

'কোথাও যাবার সময় এরকম হয়' বলিয়া অক্ষয় অন্দরের দিকে পা বাড়াইল।

সিঁড়িটা অন্ধকার—নিবিড় জমাট অন্ধকার। অক্ষয়ের চোখ যেন অন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সুইচের অবস্থান জানা সত্ত্বেও আলো সে জ্বালিল না। বরং সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠিয়া অন্ধকারে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া রহিল।

অক্ষয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দুয়ারের সামনে পুরা পাঁচ মিনিট কাল দাঁড়াইয়া আলোটা চোখে না সহাইয়া সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না। কাল যে আহার্য্য আগলাইয়া

জাগিয়া বসিয়া থাকে নাই তাহারি কৈফিয়তের মতে খোকাকে বুকের কাছে নিয়া মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া সুমতি জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া আছে।

সিঁড়ি দিয়া নামা, উঠান পার হওয়া এবং নন্দর ঘরের দুয়ারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সংযত ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢোকা এই তিনটি কাজ করিতে সুমতির এক মিনিটের বেশী সময় লাগে না। অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া সে যে একবারও পড়িয়া যায় নাই এইটুকুই আশ্চর্য্য।

ওপরে খোকার চীৎকার শোনা যাইতেছিল, ঘুমের চোখে সুমতি তাহার হাত মাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে। কান পাতিয়া খোকার কান্না শুনিয়া সুমতি অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। অমন করিয়া দিশেহারা হইবার কোন কারণ ছিল না। খোকার হাত যদি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে? এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়া এমন ভাবে খোকার কাছে বিদায় নিতে হইল তাহার!

নন্দ বলিল 'কি সুমতি, শেষ বিদায় নিতে এলে বুঝি?'

জোর বাতাসে যেমন আকাশের মেঘ কাটিয়া যায় নন্দর মুখের কালো ছায়াটা তেমনি ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। পরিষ্কার নীলাকাশে পাশাপাশি দুই টুকরা সাদা মেঘ যেমন সূর্য্যালোকে ঝক-ঝক করে নন্দর চোখ দুটি তাহার সঙ্গে তুলনীয়।

সুমতি ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরময় এত ছেঁড়া কাগজ উড়িতেছে যে মনিঅর্ডারের রসিদগুলি এখনো মেঝেতে ছড়ানো আছে কি না বোঝা যায় না। চৌকীর উপর দড়ি দিয়া বাঁধা বিছানা, জিনিষ বোঝাই তোরঙ্গটা এদিকে হাঁ করিয়া আছে।

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'না, বিদায় নিতে আসি নি। আপনার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলাম। সকালে লজ্জা করবে, এখনি বেরিয়ে পড়ি চলুন।'

রাত দুপুরে তাহার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে নন্দর চমক লাগার কথা। কিন্তু বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে তাহার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

'সে হয় না সুমতি!'

সুমতি বিহ্বলের মত বলিল 'হয় না?'

নন্দ মাথা নাড়িল 'না। এতবড় অনুচিত কাজে আমার আর প্রবৃত্তি নেই। কি জান, আমি ভয় পেয়ে গেছি। তাছাড়া, আমার সময় নেই।

ভয় পাইয়াছে। সময় নাই। সুমতি আগাইয়া গিয়া নন্দর চৌকীতে বসিয়া পড়িল। সম্বৎসর সাধনা করিয়া নন্দয় আজ সিদ্ধিলাভের সময় নাই।

বহুকষ্টে সুমতি শান্ত হইয়া রহিল। কি ঘটিয়াছে জানা দরকার। কিছু যে ঘটিয়াছে—ভয়ানক একটা কিছু যে না ঘটিয়াই পারে না সুমতির তাহাতে সংশয় ছিল না। এভাবে হঠাৎ মানুষ বদলায়—নিজেকেই সে কি এখন চিনিতে পারিতেছে?—কিন্তু অকারণে বদলায় না।

নন্দ আবার বলিল 'রাগ কোরো না সুমতি, সত্য আমার সময় নেই। আমার এমন বিপদ হয়েছে বলবার নয়। সকাল বেলাই আমার সীতাকে খুঁজতে যেতে হবে—কতদিনে খুঁজে পাব ভগবানই জানেন।'—বলিয়া সে একটু থামিল, 'কিন্তু আজকের জন্যে তুমি যেন লজ্জিত হয়ো না সুমতি। তোমার এই মাঝরাত্রির দুর্ব্বলতা আমি ভুলে যাব। সত্যি, এ আমার মনেও থাকবে না। সীতাকে যদি খুঁজে পাই, সীতা সাবিত্রীর উপাখ্যানের সঙ্গে তোমার কাহিনীও তাকে আমি শোনাব সুমতি।'

বলিতে বলিতে নন্দ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

'তাতে তুমি আপত্তি করবে? তোমার জীবন কাহিনী শুনবার অধিকার কি সীতার আর নেই? তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না?'

নন্দ পায়চারি আরম্ভ করিল। সীতাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলে তাহার সহিত কথা কহিতে সুমতি যেন অস্বীকার করিয়াছে এমনি ভাবে বলিতে লাগিল 'তুমি কথা না কইলে অভিমানে সে কি করে বসবে কে জানে? ছেলেমানুষ তো, তোমার চেয়ে অনেক ছোট,—ভাল মন্দ বোঝে না। ছেলেটাকেও আমি চিনি সুমতি, কচি মেয়ে ভোলবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। কতকাল ধরে সীতার মন ভাঙছিল কে জানে।

'অন্ততঃ আজ রাত্রির কথা মনে করে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারবে না?'

বলিয়া নন্দ করুণ চোখে সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওমিলনাইন

একুশ বছর বয়েসের সময় সুনীতি নামে একটি প্রায় একুশ বছর বয়সী মেয়ের সঙ্গে প্রমথের কয়েকমাসের জন্য খুব ভালবাসা হয়। সেই তার প্রথম বাস্তব ভালবাসা, সুতরাং, ব্যাপারটা তার পক্ষে একটু প্রচণ্ডই হইয়াছিল। বাকী জীবনটা সুনীতিকে ভালবাসিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে নিজেকে সে ধন্য জ্ঞান করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সুনীতি নিজের বেলা পাতলা একগাছি চুল আর প্রমথের বেলা জাহাজ-বাঁধা কাছি দিয়া পরস্পরের বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা করায় তৃতীয় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটামাত্র বাঁধনটা গিয়াছিল ছিঁড়িয়া। প্রমথ বীভৎস রকম বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে সুনীতির জীবনে এই তৃতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব যেন তারই আবির্ভাবের পুনরভিনয় এবং বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থাটাও অবিকল একই রকম। তৃতীয় ব্যক্তিটির প্রতি প্রমথ তাই হিংসার লেশটুকুও অনুভব করে নাই। তার বরং মনে হইয়াছিল যে কয়েকমাস পরে নিজের ভালবাসার দড়িতে বেচারীর যে ফাঁসি লাগিবে সে জন্য ওকে তার মায়া করাই উচিত।

এখন, এধরণের দু'চারটা ছেলেমেয়ে সংসারে থাকিবেই একঘেয়ে জীবনযাপনের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য, ছুটিছাটায় বেড়াইতে যাওয়ার মত মাঝে মাঝে জীবনে যারা প্রেমের বৈচিত্র্য আনে। টানিয়াই আনে, মন অথবা গায়ের জোরে : অর্থাৎ, কালচার অথবা রূপের আকর্ষণে। এই আকর্ষণে যখন সেই ধরণের ছেলেমেয়েরা সাড়া দেয় বেহিসাবী আত্মসমর্পণ যাদের স্বভাব, তখন হয় একটু মুস্কিল। মিলন তাদের প্রেমকে আরও জোরালো, আরো ঘনীভূত করিয়া দেয় এবং তার পর যথাসময়ে যখন আসে বিচ্ছেদ তখন সামলানো হয় কঠিন। ব্যর্থ প্রেম কিছু নয়, বিরহ শুধু মনের কষ্ট, ও-সমস্তের জন্য মানুষের খুব বেশী আসিয়া যায় না,— ছেলে স্বর্গে গেলে মাকেও তো তা সহিতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক মনে হয় ট্র্যাজিডিটা, যখন বুঝিতে পারা যায় যাকে ভালবাসিয়াছিলাম তার হৃদয় হৃদয়ের রীতিনীতি মানে না, আমাকে সরল সহজ ভালমানুষ পাইয়া, আমার প্রথম যৌবনের অমূল্য সম্পদটুকু সে আমাকে ঠকাইয়া গ্রহণ করিয়াছে —শুধু একটু মজা করার জন্য। বিবাহের আগেই সুনীতির সঙ্গে তার যে অন্যায় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল এই অপরাধটা প্রমথ নিজের বলিয়াই জানিত : ও দোষটা কখনো মেয়েদের হয় না। তার লজ্জা, দুঃখ ও অনুতাপের পরিমাণ দেখিয়া সুনীতি হাসিত।

বলিত তুমি বড় ছেলেমানুষ।

প্রমথ ভাবিত, তার অনুতাপ দেখিয়া মমতার বশে সুনীতি তাকে সান্ত্বনা দিতেছে। তারপর যখন সে জানিতে পারিল চিরদিনের জন্য তাকে জীবনের সাথী করিবার সাধ সুনীতির কোনদিনই ছিল না, তখন সে হইয়া গেল একেবারে স্তম্ভিত। আত্মসম্বরণ করার জন্য সে একেবারে সাড়ে চারশো মাইল তফাতে কিছুদিনের জন্য চলিয়া গেল বটে কিন্তু সেখানেও সময়ে অসময়ে সুনীতির মাথার চুলের ওমিলনাইন তেলের মৃদু গন্ধ অনুভব করিয়া মাথা-ধরা ও গা বমি বমি আরম্ভ হওয়ায় সে আরও বেশী হতভম্ব হইয়া গেল। সাড়ে চারশো মাইল বাতাসে গন্ধ ভাসিয়া আসিবে এমন ম্যাজিক তো ওমিলনাইন কেশতৈলের নাই! যে বাড়ীতে সে অতিথি হইয়া আছে সে বাড়ীর মেয়েরা ওমিলনাইন তেলের নামও জানে না, সুনীতি ভিন্ন ন'রকম দেশী ও বিলাতি কেশতৈল একত্র মিশাইয়া ব্যবহার করিতে পারার মত টাকা অনেকের থাকিতে পারে কিন্তু সখ কারো আছে কিনা সন্দেহ। সুনীতির সাড়ী, ব্লাউজ, খোঁপা, চালচলন প্রভৃতি অনেক মেয়ে নকল করার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তার কেশতৈলের সুবাসটি চিরদিন হইয়া থাকিয়াছে অননুকরণীয়। সুনীতির আরেকটা নাম ছিল ওমিলনাইন হেয়ার অয়েল।

সুনীতির স্মৃতি যে একটা কেশতৈলের গন্ধ হইয়া রহিল প্রমথের কাছে, এ একধরণের মানসিক বিকার। নারীসংক্রান্ত না হোক এরকম অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনেই আছে। বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ দশ-পনের বছর কিম্বা তারও বেশী পুরানো দিনের এক অবর্ণনীয় অনুভূতি দু'একবার কে না অনুভব করে জীবনে ? পৃথিবীর রূপ, বাতাসের স্পর্শ ও গন্ধ, হৃদয়ের রসানুভূতি সমস্ত মিলিয়া জীবনের বহু পুরাতন ক্ষুদ্র এক অংশকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া দেয়। কচুবনে বৃষ্টি পড়িতে দেখিলে এখনো প্রমথ হইয়া যায় বারো বছরের বালক, বসিয়া থাকে নবাবদের আমলের পুরানো এক সহরে একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা একটা ঘরে ইটের স্তূপের আড়ালে, শোঁকে ঝাঁটি, কুকুরশোঁকা প্রভৃতি বুনোচারার গন্ধ আর অনুভব করে মৃত্যুবিষাক্ত বাচ্চা একটা সাপের কামড়। সুনীতির স্মৃতি তেমনি পরিপূর্ণ হইয়া আছে ওমিলনাইন তেলের গন্ধে। এখন, সুনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার চার বছর পরে সুনীতির স্মৃতি আর সবদিক দিয়াই প্রায় প্রমথের কাছে মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে, শুধু একটা গভীর অবসন্নতা ও মেয়েদের প্রতি একটা গভীরতর বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে করিতে ওমিলনাইন তেলের গন্ধ শুঁকিবার জন্য সুনীতিকে সে মনে করে।

এতকাল পরেও মেয়েদের প্রতি প্রমথের এই বিতৃষ্ণার ভাব বজায় থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তার এই ভাবটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সুনীতির কাছে তার দেহ-মন একদিন যে ভীষণ আঘাত

পাইয়াছিল জীবনে তার পুনরাবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা রদ করিবার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন তার ভিতরে আপনা হইতে সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই আভ্যন্তরিক প্রতিবাদ তার এত জোরালো যে ভ্রান্তি টুটিয়া যাওয়ার মত ঘনিষ্ঠতা আর কোন রক্তমাংসের মেয়ের সঙ্গে তার জন্মানো সম্ভব নয়। সব মেয়েই যে সুনীতির মত এ বিশ্বাস প্রমথের জন্মে নাই, সাধারণভাবে মেয়েদের সে অশ্রদ্ধা করে না। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া নারীবিদ্বেষের সমর্থক যুক্তিতর্কের আবিষ্কার করার চেষ্টাও সে করে না। মেয়েদের বিচার করিতে সে একবারেই ভালবাসে না, ওবিষয়ে মাথাঘামানোকে সে মনে করে ছেলেমানুষী। তবু সেই আঘাতটির পরবর্তী বিকারে যে অন্ধ আতঙ্ক তার হৃদয়-মনে বাঁচিয়া আছে, এই বয়সে তরুণী নারীর ভালবাসা লাভ করার স্বাভাবিক পিপাসার স্থানে সে আতঙ্ক জাগাইয়া রাখিয়াছে ততোধিক স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। মেয়েরা ভাল, মেয়েরা দেবী। মেয়েরা ভালবাসিলে মানুষ ধন্য হইয়া যায়। কিন্তু কাজ নাই বাবা কারো ভালবাসায় প্রমথের।

এই সময় পাইবে না পাইবে না করিয়া প্রমথ একটা হাকিমী চাকরী পাইয়া গেল এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিবাহ করিবে না করিবে না ঘোষণা করিতে করিতে প্রায় হইয়া উঠিল পাগল। কোনদিন বিবাহ না করার ইচ্ছা প্রমথের ছিল না, আর দশটি সাধারণ সুস্থচেতা মানুষের মত জীবনটা কাটাইয়া দিবার দিকেই বরং তার ছিল বেশী ঝোঁক। কিন্তু চিত্ত তো এখন তার সুস্থ নয়। এখন মন্ত্রপড়া সামাজিক বিবাহের পবিত্র বাঁধনে বাঁধিয়া একটি মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী করিলে যদি মনের অসুস্থতা বাড়িয়া যায়, রূপান্তর নেয়। নিজের বৌকে আদর করিতে গেলেই যদি নাকে আসিয়া লাগে ভায়লনাইনের গন্ধ, মাথা ঘুরিয়া উঠে, গা করে ঝাম ঝাম, আর মনে হয় যে এই রক্তমাংসের জীবটির মুখ-চোখ হাসি-গল্প মান-অভিমান চাল-চলন সব সুনীতির প্যারডি? তার চেয়ে আর কিছুদিন মনটাকে সুস্থ হইবার সময় দিয়া একটু ভারিক্কি বয়সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করাই নিরাপদ।

এগারমাস মফস্বলে একা একা হাকিমী করিয়া ভারিক্কি বয়সের ভাবনা-চিন্তাগুলি প্রমথ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিল কিনা বলা যায় না, এক মাসের ছুটি লইয়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে আসিয়া তিনদিন স্পষ্ট 'না' ও চারদিন আমতা আমতা 'না' বলিয়া, গম্ভীর চিন্তিত মুখে সে হইয়া গেল মৌন। সুতরাং যথাসময়ে তার একটি বৌ আসিল। ঠিক বৌ নয়, সহধর্মিণী অথবা জীবন-সঙ্গিনী,—সংসারযাত্রা নির্বাহের উপায়স্বরূপিণী। কারণ, এই বয়সে প্রথম বৌকে প্রথমদিকে মানুষ সচরাচর যে ভাবে চায়,—প্রিয়া বা প্রেমিকা হিসাবে, বিশেষ আত্মবিস্মৃত অবস্থাতেও প্রমথ কখনো বৌকে সেভাবে চাহিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

নাম হাসিরাশি। একটু বেঁটে কিন্তু দেখিতে বেশ, শুনিতে আরো। অর্থাৎ গলাটি তার ভারি মিষ্টি। মাথা-ধরার অসুখ থাকার জন্য যদিও হাসিরাশি খুব বেশী হাসিখুসি নয়, স্বভাবটি ভারি শান্ত, প্রকৃতিটি কোমল। এবং বোধ হয় ওইজন্যই বয়সের তুলনায় সে একটু বেশীরকম ভারিক্কি। মেয়েটার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিলেই বুঝিতে পারা যায় সংসারে বাঁচিয়া থাকাটাকে সে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করে, জীবনধারণের যে-সব রীতি নীতি সে এতকাল জানিয়াছে ও মানিয়াছে অথবা এবার হইতে জানিবে ও মানিবে সেগুলি চিরকাল পাইয়াছে তার গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্মান এবং চিরকাল তাই পাইবে।

প্রথমবার প্রমথ যখন তার সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিল তখন হাসির ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া দেহ-মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিয়া প্রমথ সুরুতেই হঠাৎ আলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সে কিছু মনে করে নাই। পরের বার তার মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকায় ভাই যে-ভাবে বোনের সঙ্গে গল্প করে প্রমথ তার সঙ্গে তেমনি ভাবে গল্প জুড়িয়া দিতে অবাক হওয়ার বদলে সে খুসীই হইয়াছিল। এইসব আবেগবিহীন সহজ মানুষকেই হাসিরাশি ভালবাসে। ব্যস্ততার বদলে নিজের বৌ-এর সঙ্গেও যে এইরকম আস্তে আস্তে ভদ্রভাবে প্রথম চেনা-পরিচয়টা ঘটিয়া উঠিতে দেয় সে কত ভাল লোক। একবার সে যে পায়ে হাত দিয়াছিল সেটা সত্যসত্যই পিঁপড়া ঝাড়িয়া ফেলার জন্যই। এবং সেজন্য সলজ্জভাবে পায়ে হাত দিয়া তাকে প্রণাম করার সময়ও আচমকা হাত ধরিয়া সে যে তাকে খানিকটা আদর করিয়া বসে নাই এ-ও কি তার সহজ ভদ্রতার পরিচয়।

বিবাহের পর হইতেই অনেক বিষয়ে প্রমথ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল, হাসিরাশিকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের একটা সহরে প্রথম সংসার পাতিয়া বসিবার পর আরও বেশী আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল যে মানুষের জীবনের অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই একপেশে ও অসম্পূর্ণ, অধিকাংশ ধারণা ও মতবাদ অসম্বদ্ধ ও অযৌক্তিক। তা না হইলে হাসিরাশির সাহচর্য্য তাকে কেন এভাবে বদলাইয়া দিবে? কেন রসালো হইয়া উঠিবে আগেকার নীরস মুহূর্ত্তগুলি, কেন তুচ্ছ ও অর্থহীন মনে হইবে না এতদিন যে সমস্তকে সে ছেলেখেলা বলিয়া মনে করিত? যে নিজেটাকে সে এত ভালভাবে জানিত বলিয়া তার ধারণা ছিল এখন সেই নিজেরই এত সব অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত পরিচয় কোথা হইতে তার কাছে ধরা পড়িতে থাকিবে? কি বোকার মতই এতগুলি বছর ওরকম বিশ্রীভাবে সে জীবন-যাপন করিয়াছিল। সুনীতির

সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিবামাত্র সে যদি হাসিরাশির মত একজনকে বিবাহ করিয়া এইরকম পবিত্র মধুর গার্হস্থ্য-জীবন আরম্ভ করিয়া দিত, যাতে, কোন বেলা কি রান্না হইবে সেটা পরামর্শ করিয়া ঠিক করার মধ্যে পর্য্যন্ত অনায়াসে যত খুশী প্রণয়ের আমদানী করা যায়, জীবনের এতগুলি বছর তবে তার ব্যর্থ হইয়া যাইত না।

ওগো', শুনছ?—প্রমথ বলে।

হাসি বলে, না, শুনছি না। একশোবার এমন বুড়ো মানুষের মত ডাকবে কেন শুনি?

কি বলে ডাকব তবে?

কেন, এই!—বলে ডাকবে, শিস্ দিয়ে ডাকবে, নয় তো একটা আদরের নাম দিয়ে তাই বলে ডাকবে।

প্রমথ গম্ভীর মুখে বলে, তুমি যেচে সোহাগ নিচ্ছ, হৃদয়রাণী?

হাসি আরও বেশী গম্ভীর হইয়া বলে, নিজের জিনিষ আমি যেভাবে খুসী নেব, তোমার তাতে কি? তা ছাড়া যারা ভাল মেয়ে হয় তারা বুঝি ছল ক'রে সোহাগ নেয়? স্পষ্ট দাবী করে।

সুনীতির সঙ্গে আরও ঢের বেশী সূক্ষ্ম হাসি তামাসা চলিত, সুনীতি আরও ঢের বেশী আর্টিষ্টিক ভঙ্গির সঙ্গে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কবিত্বের সৃষ্টি করিতে পারিত, তবু স্ত্রীর হাসির ভঙ্গি ও কথাই প্রমথের বেশী উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। হঠাৎ সুনীতির প্রতি সে একটা স্পষ্ট জোরালো ঘৃণার ভাব অনুভব করে। এতকাল পরে তার আজ প্রথম আপশোষের সঙ্গে মনে হয় যে ক্লীবের মত, দার্শনিকের মত সুনীতির অপরাধকে তার উপেক্ষা করা যেন উচিত হয় নাই, ওই ক্ষমাটা পর্য্যন্ত সুনীতি তাকে বোকা পাইয়া আদায় করিয়া লইয়াছিল। সুনীতিকে একটা ভাল রকম শাস্তি দিলে বড় ভাল হইত,—মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হইত।

স্ত্রীর সঙ্গে এই তুচ্ছ কথোপকথনটি তার সকালবেলার। কাল হাসি সোডা দিয়া চুল সাফ করিয়াছিল, আজ তেল দিয়া স্নান করিবে। তার রুক্ষ ফাঁপানো চুলে একফোঁটা তেলের চিহ্নও নাই। তবু এই অসময়ে কোথা হইতে যে প্রমথ ঘ্রাণ পাইতে লাগিল কেশতৈলের! সেই চির পরিচিত ওমিলনাইনের গন্ধ!

হাসি হাসি বন্ধ করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হল? কি হল তোমার হঠাৎ?

প্রমথ বলিল, তোমার তেলের শিশিটা নিয়ে এসে তো চট্ করে!

কেন?

আগে আনো, বলছি।

হাসি তেলের শিশি আনিয়া দিল।

দেশী তেল। গন্ধটা চড়া। ছিপি খুলিয়া শিশিটা নাকের সামনে ধরিয়া প্রমথ জোরে জোরে শ্বাস টানিতে লাগিল, হাসি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল তার বিবর্ণ কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের আবির্ভাব। আগেও সে দু'একবার স্বামীর এরকম আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু কোনবারই এত স্পষ্ট ও প্রবলভাবে নয়। জিজ্ঞাসা করিতে প্রমথ ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, মাথা নাড়িয়া বলিয়াছে, ও কিছু না।

আজ প্রমথ শান্ত হইলে কারণ জানিবার জন্য হাসি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। প্রমথ বলিল, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল!

মাথা ঘুরে উঠল বলে তেলের গন্ধ শুঁকবে কেন?

তেলের গন্ধ শুঁকলে আমার মাথাঘোরা সেরে যায়।

কি বলছ পাগলের মত? তাই কখনো হয়? কি হয়েছে তুমি বলছ না আমায়।

ওই তো বললাম!

আবোল-তাবোল কতগুলি কৈফিয়তে তখনকার মত হাসিকে শান্ত করা যায় বটে কিন্তু তার কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না। পরদিন সে আবার একথা তোলে। তারও পরের দিন। একবার প্রমথের মনে হয় সুনীতির কথা সব সে শোনাইয়া দেয়। কিন্তু এতকাল পরেও সুনীতির মাথার চুলের কাল্পনিক ঘ্রাণ নাকে লাগিয়া সে অতদূর অসুস্থ হইয়া পড়ে একথা জানিলে হাসি ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে গ্রহণ করিবে বুঝিতে না পারিয়া তাকে সব কথা জানাইতে তার সাহস হয় না। কে জানে হাসি বিশ্বাস করিবে কি না যে আজকাল সুনীতির প্রতি আকস্মিক ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগের চেয়েও জোরালো ভাবে সে ওমিলনাইনের গন্ধ পায়, আগের চেয়েও বেশী বিচলিত হইয়া পড়ে। হয়ত ধীরে ধীরে হাসির সঙ্গে তার যে গভীর অন্তরঙ্গতা জন্মিতেছে এসময় হাসিকে সুনীতির কাহিনী জানাইয়া দিলে সব নষ্ট হইয়া যাইবে। সুখে শান্তিতে জীবন-যাপনের যে সম্ভাবনা তার দেখা দিয়াছে চিরদিনের জন্য তাহা হইয়া যাইবে অসম্ভব।

এতদিন পরে সুনীতির সম্বন্ধে নিজের মানসিক পরিবর্ত্তন প্রমথকে আশ্চর্য্য ও চিন্তিত করিয়া রাখে। ব্যক্তিগতভাবে একজনের সম্বন্ধে এতকাল উদাসীন থাকিবার পর, একটা বিষাদময় বৈরাগ্যে জীবনের সুখ-দুঃখকে মৃদুভাবে উপেক্ষা করিয়া দশজনের মাঝখানে এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়া আবার বাস্তবজীবনকে ভালবাসিয়া নূতনভাবে জীবনটা আরম্ভ করিবার পর সেই একজনের প্রতি এমন ভয়ানক বিদ্বেষ ও ঘৃণা আসিবার অর্থ কি? এসব মানসিক বিকারের কি আবির্ভাব ঘটা উচিত ছিল না তখন, সুনীতির ব্যবহার যখন তাকে আধমরা করিয়া দিয়াছিল? সুনীতিকে প্রায় ভুলিয়া যাওয়ার পর সে কি তার জন্য নূতন করিয়া বিরহের জ্বালা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল? এ তো বড় খাপছাড়া কথা!

মাঝে মাঝে কি ভাব এত?—হাসি জিজ্ঞাসা করে।

তোমার কথা ভাবি।

হাসি খুসী হইয়া বলে, সত্যি? কিন্তু আমি যখন কাছে থাকব না তখন আমার কথা ভেবো,—এখন থেকে কেন? মা তো কদ্দিন থেকে লিখছেন যাবার জন্য, এসেছিও তো অনেকদিন হল, মাসখানেকের জন্যে দাও না পঠিয়ে আমাকে মার কছে?

প্রমথ অস্বাভাবিক ব্যাকুলতায় সঙ্গে বলে, না না, এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। তোমায় ছেড়ে আমি এখন একদিনও থাকতে পারব না।

আগে প্রথমে নাকে লাগিত ওমিলনাইন তেলের গন্ধ তারপর আসিত অন্য উপসর্গ। আজকাল প্রথমে প্রমথ সুনীতির কথা ভাবিয়া মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া তোলে তারপর আসে ওমিলনাইনের সুবাস ও পরবর্ত্তী কষ্টগুলি। ব্যাপারটা প্রমথকে বেশীরকম দুশ্চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে এইজন্য যে এই অস্বাভাবিক আক্রমণ ঘটিবার সময় ছাড়া বাকী প্রায় সব সময়েই সে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে করিতে মহানন্দে বাঁচিয়া থাকে। আগে সে তার বিকারকে গ্রাহ্যই করিত না, এখন এরকম কেন হয় বুঝিবার চেষ্টা করে, এরকম হওয়া বন্ধ করাও কোন উপায় আছে কি না বসিয়া বসিয়া তাই ভাবে।

তবে, মোটামুটি তাকে সুখীই বলা যায়। পাচবছরের বেশী সময়ের ব্যবধান ও কে জানে কতখানি দুরত্ব পার হইয়া সুনীতির মাথায় ওমিলনাইন তেলের গন্ধ তার নাক ও মনের সঙ্গে যে রসিকতা করিতে আসে, সেটা অল্প সময়ের জন্যই। কিছুক্ষণ একটা দুর্ব্বোধ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার পরেই সে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে। তখন আর বুঝিবার উপায়ও থাকে না যে তার শান্ত হাসিখুসী মুখের পিছন দিকে, চুলে-ঢাকা খুলির শক্ত হাড়ের তলে যে নরম মগজটা আছে তার মগ্ন-চেতনার অংশটুকুতে বাস করে এমন খাপছাড়া একটা বিকার।

হাসিরাশিকে প্রমথের এতই ভাল লাগিয়াছে যে, কয়েকদিনের জন্যও তাকে ছাড়িয়া থাকিবার কথা ভাবিলে সত্যসত্যই তার কষ্ট হয়। এ রকম সরলা, স্নেহময়ী, বুদ্ধিমতী ও সদ্বংজাত সু-ভাবাপন্না স্ত্রী পাওয়ার জন্য নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করে। বিবাহ করার আগে যা ছিল শুধু অসম্ভব কল্পনা; যে সুখ ও শান্তির স্বরূপ সে প্রায় ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল, জীবনের নিরপেক্ষ সদয় দেবতার কল্যাণে আজ সে প্রায় সবই ফিরিয়া পাইয়াছে। শুধু ওমিলনাইনের অত্যাচার সহ্য করিবার দুর্ভাগ্যটা যদি তার না হইত! আদর্শ জীবন হইত তার, কোন দিকে এতটুকু খুঁত থাকিত না।

এমনিভাবে দিন কাটিতে কাটিতে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ছুটিটা কাটাইবার জন্য প্রমথ সস্ত্রীক আসিল কলিকাতায়। কলিকাতায় পৌছিবার দিনই সন্ধ্যার পর তার রহস্যময় মোহের রাজ্য হইতে ওমিলনাইনের গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া তাকে ভয়ানক উতলা করিয়া দিল।

পরদিন সকালে সে হাসিকে বলিল, তুমি মাথায় যে তেল মাখো ওটার গন্ধ ভারি বিশ্রী। আমি একটা আশ্চর্য্য তেল এনে দিলে মাখবে?

আশ্চর্য্য তেল আবার কি জিনিষ গো, এঁ্যা?

কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন তেল মিশিয়ে আমি নিজেই তৈরী করে দেব, মাখবে তো?

ওমা, কেন মাখব না? চুল উঠে গেলে কিন্তু মজা দেখাবো তোমায়। সে দায়িত্ব তোমার।

প্রমথ বলিল, উঠে যাবে? চুলের ভারে হাঁটতেই পারবে না দেখো। কি নাম জান তেলটার? ওমিলনাইন।

কিছুকাল হইতে এই কথাটা প্রমথ ভাবিতেছিল। অস্তিত্বহীন ওমিলনাইনের যদি তাকে এরকম ভাবে বিরক্ত করে, নিজের চারিদিকে আসল ওমিলনইনের গন্ধ ছড়াইয়া রাখিয়া ক্রমেক্রমে গন্ধটা অভ্যস্ত করিয়া আনিলে হয়তো আর সে বিচলিত হইবে না? সব সময় যে গন্ধ সে অনুভব করিবে সে গন্ধের কাল্পনিক আবির্ভাব হয়তো সে টেরও পাইবে না? প্রথমটা হয়তো সর্ব্বদা এই গন্ধ শুঁকিতে তার খুবই খারাপ লাগিবে, হয়তো অল্প সময়ের ব্যবধানে বারংবার তার মনের বিকার জাগিয়া উঠিবে, মাথা-ঘোরা গা বমি বমি করার আর বিরাম থাকিবে না। তবু, আসল ওমিলনাইনকে অভ্যাস করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নকল ওমিলাইনকে যদি জয় করিতে পারা যায়, একবার সে চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল।

একবার সুনীতিকে প্রমথ ওমিলনাইনের উপকরণগুলি উপহার দিয়াছিল। শুধু এইজন্য ন'টি বিভিন্ন তেলের নাম এতকাল পর্য্যন্ত কারো মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রমথের জীবনে ওমিলনাইন কেবল একটা মিশ্রিত কেশ-তৈল নয়, সুনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুনীতির চেয়ে এই তেলটার কথাই বোধ হয় তাকে ভাবিতে হইয়াছে বেশী, এখনো না ভাবিলে চলে না। ন'টি তেলের প্রত্যেকটির নাম আজও তার নিজের নামের চেয়েও স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সেইবেলাই ওমিলনাইনের উপকরণ আসিল। ছোট-বড় দেশী-বিলাতী ন'টি বিভিন্ন কেশতৈলের শিশি। তাকে তেল মাখানোর জন্য স্বামীর আয়োজন ও আগ্রহ দু'টারই পরিমাণ দেখিয়া হাসিরাশ হাসিতে লাগিল।

এতগুলি তেল মাখব?

দাঁড়াও না, এমন তেল তৈরী করে দেব, গন্ধে সবাই মূর্চ্ছা যাবে। বিকেলে এই তেল দিয়ে চুল বেঁধো, কেমন?

দুপুরে একটা কাচের পাত্রে তেলগুলি মেশানো হইল। তখন প্রমথ আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল তার এতদিনকার কাল্পনিক ওমিলনাইনের সঙ্গে এই আসল ওমিলনাইনের গন্ধের কিছু পার্থক্য আছে। যতক্ষণ এই পার্থক্যটুকু খেয়াল করিয়া সে বিস্মিত হইয়া রহিল

ততক্ষণ তার আর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। মাথা ধরিল না প্রমথের, গা বমি বমি করিতে লাগিল না, একটা নূতন ধরণের অস্বস্তিকর রহস্যময় যন্ত্রণা বোধ করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ানক একটা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও কি ঘটে দেখিবার জন্য বাধ্য হইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইলে মানুষের যেমন লাগে সেইরকম একটা ক্লেশদায়ক বিপন্নতার অনুভূতি। এক একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ থাকে, তামাসা করিয়া একটা ছোট ঘরে কয়েক মিনিটের জন্য বন্দী করিয়া রাখিলেও যাদের দম আটকাইয়া আসে, ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ওমিলনাইনের গন্ধের আবেষ্টনী তেমনি পীড়ন করিতে লাগিল প্রমথকে। সে জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিল।

প্রথমটা হাসিরাশি পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, কি হোল তোমার? তেলের গন্ধে নিজেই মূর্চ্ছা যাচ্ছ নাকি সত্যি-সত্যি?—গন্ধটা সত্যি ভারি অদ্ভুত!

তারপর ভয় পাইয়া সে কাচের পাত্রটা প্রমথের সম্মুখ হইতে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই সেখানে বসিয়া পড়িল, প্রমথকে নাড়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, কি হোল? কি হোল তোমার হঠাৎ? এমন করছ কেন?

প্রমথ কাতরভাবে বলিল, কিছু হয় নি।

হাসিরাশি ব্যাকুল হইয়া বলিল, হয়নি। তোমার মুখ দেখে বুকের মধ্যে কাঁপছে আমার। কি হয়েছে বল না?

প্রমথ একথার কোন জবাব দিল না। উঠিয়া জামা গায়ে দিল।

হাসি জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাচ্ছ?

ভবানীপুর যাব।

ভবানীপুর সে গেল বটে কিন্তু গেল পার হইয়া। হাজির হইল বালীগঞ্জে, সুনীতির গৃহে। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে যে-ভাবে সোজা ওখানে গিয়া পৌঁছিল তাতে একথা মনে করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল যে সুনীতিকে দেখিবার জন্যই সে বাড়ীর বাহির হয় নাই!

সুনীতি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য! কি ভাগ্য আমার! বোসো, বোসো। কবে এলে কলকাতায়? তুমি এখন কুমিল্লায় পোষ্টেড আছ, না? তুমি অবিশ্যি আমায় ভুলে গেছ, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি কত খবর রাখি দেখছো! বিয়ে করেছ নাকি?

প্রমথ বলিল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব সুনীতি। তুমি এখনো চুলে ওমিলনাইন তেল মাখো? গন্ধ পাচ্ছি না তো?

সুনীতি আরও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এ্যাদ্দিন পরে এসে, প্রথমেই এই কথা জিজ্ঞাসা করলে? না, ওমিলনাইন ফোমিলনাইন মাখি না আর। ও সব আর ভাল লাগে না। মানুষ কি চিরদিন একরকম থাকে?

হঠাৎ সুনীতি গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া গেল।—তুমিই বল, চিরদিন কি মানুষ একরকম থাকে? তখন ঐরকম স্বভাব ছিল, খাপছাড়া কাজ করতেই ভালবাসতাম। মাথার তেলটা পর্য্যন্ত নতুন কিছু না হলে চলত না। সে স্বভাব অনেকদিন গেছে। এখন—

আচ্ছা, আজকে উঠলাম সুনীতি।

আসতে না আসতে উঠলে কি রকম? এরকম আসার মানে? বোসো না একটু, খানিক কথাবার্ত্তা বলি?

প্রমথ সহজ ভাবেই বলিল, না, বসার সময় নেই। বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে সঙ্গে করে সিনেমায় যেতে হবে।

সুনীতি বলিল, ও, এবার বুঝতে পারছি। একটি স্ত্রী সংগ্রহ করেছো এই খবরটা দিতে এসেছিলে। তিনি কি রকম রূপসী আর গুণবতী সে বর্ণনাও দাও, মন দিয়ে শুনছি। একটা কিছু করতে এসে কাজটা অসম্পূর্ণ রেখে যেতে নেই।

প্রমথ বলিল, রূপ-গুণ তেমন কিছু নেই সুনীতি। তবে মনটা খুব সরল আর চরিত্রটা ভাল।

সুনীতির বাড়ী হইতে প্রমথ নিজেদের বাড়ী ফিরিল না, এদিক-ওদিক খানিক ঘুরিয়া একাই সিনেমা দেখিতে গেল। মানুষের সরলতা ও সুচরিত্রতা তার কাছে হঠাৎ মূল্যহীন, অর্থহীন, অকারণ মনে হইতেছিল। কি আসিয়া যাইত সে সময় সুনীতিকে ক্ষমা করিলে, তার চাকরীর খবর গেজেটেড্ হওয়ার পর সুনীতি যখন তাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিল?

হাসিরাশি ওমিলনাইন তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, সারারাত তার মাথাটি থাকে প্রমথের মাথার পাশে। ভাল ঘুম হয় না প্রমথের। দিনের বেলা বাড়ীর যেখানে যায় সেখানেই যেন প্রমথ ওমিলনাইনের গন্ধ পায়, আত্মীয়-স্বজনেরা যেন ঘুরিয়া বেড়ায় ওমিলনাইনের গন্ধ ছড়াইয়া। ওমিলনাইনের সুবাসে বাড়ীর সকলে মূর্চ্ছা যায় নাই কিন্তু মোহিত হইয়া গিয়াছে। সকলে আগ্রহের সঙ্গে ওই তেলটাই ব্যবহার করে। হাসিরাশি নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই তেলটা বিলায়। স্নানের আগে প্রমথকেও মাখিতে দেয়।

প্রমথ হঠাৎ বলে, ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি আমার সঙ্গে?

হাসিরাশি স্তম্ভিত হইয়া বলে, ইয়ার্কি? কি বলছ তুমি?

প্রমথ মুখ ফিরাইয়া বলে, আমি সর্ষের তেল ছাড়া কিছু মাখি না জান না তুমি?

একদিন অন্য তেল মাখতে বললে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

হাসিরাশি অভিমান করিয়া থাকে। স্ত্রীর অভিমান ভাঙাইতে গিয়া এবার প্রমথের মন ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইয়া যায়। আর একজন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিয়া ভাঙাইবে শুধু এই জন্য যে অভিমান, এবার সে অভিমানকে তার অতি কদর্য্য বলিয়া মনে হয়। সরলতা না ছাই। একরঙা ছবির মত শুধু বৈচিত্র্যের অভাব। হাসিরাশি আগে যে সাধারণ একটা তেল মাখিত, ওমিলনাইন তেলের তুলনায় সে তেল যেমন, কুটিল ও জটিল সুনীতির তুলনায় হাসিরাশিও তেমনি।

ছুটি শেষ হওয়ার দু'দিন আগে প্রমথ একদিন হঠাৎ হাসিরাশিকে বলিল, তোমাকে নেবার জন্যে ওরা খুব ব্যস্ত হয়েছে, না?

হাসিরাশি বলিল, হবে না? প্রায় আট মাস হল এসেছি।

তোমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে তো?

ওমা, বাপের বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না কার?

সুদীর্ঘ শ্বাস টানিয়া হাসিরাশির মাথার ওমিলনাইন তেলের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া প্রমথ বলিল, তা'হলে চল কাল আমরা বেরিয়ে পড়ি। তোমাকে বাপের বাড়ী পৌছে দিয়ে আমি একা কুমিল্লা চলে যাব। একা একা আমার খুব কষ্ট হবে বটে, তবু—

জন্মের ইতিহাস

খোকার আসার যখন মাস কয়েক বিলম্ব ছিল মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত দুজনের জল্পনা কল্পনার আর বিরাম থাকিত না। তার অর্দ্ধেক বাস্তব অর্দ্ধেক অবাস্তব এবং প্রায় সমস্তটাই স্বপ্নবৎ মনোরম। এ হেন আশ্চর্য্য সম্ভাবনা যেন জগতের আর কোন নরনারীর জীবনে আজ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। তিন বছর ধরিয়া তাহাদের যে অনন্যসাধারণ প্রেম বসন্তের ফুলবনে পথ-ভোলা পথিকের মত লক্ষ্যহীন দায়িত্বহীন বাধাহীন অবস্থায় ঘুরিতেছিল আজ লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া মাত্র সে প্রেম তাহাদের স্বর্গে মর্ত্ত্যে অতীত ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সকল প্রেমের মধ্যে অতুলনীয় হইয়া গিয়াছে।

লণ্ঠন নিবাইয়া সুলতা তেলের প্রদীপ জালিয়াছে, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িবার পরেও ঘরের কোণে এ দীপ জ্বলতে থাকে। খানিক আবোল তাবোল বকিবার পর বিকাশ বলে, 'বৌ অনেকের থাকে সুলতা, কিন্তু তোমার মত বৌ—'

সুলতা মনে মনে বলে, 'কত জন্মের তপস্যা আমার সেটাতো দেখতে হবে?'

বিকাশের একটু উচ্ছ্বাস জাগে, আন্তরিক নাটকীয় সুরে সে বলে 'না সুলতা, তুমি শুধু আমার প্রিয়া নও, প্রিয়ারও বেশী। ঠিক যে তুমি কি তা অবশ্য আমি বলতে পারি না কিন্তু বেশ বুঝতে পারি তুমি প্রিয়ারও অতিরিক্ত কিছু।'

লজ্জায় সুলতা হাসে, বলে 'ভাখো, এত বাড়িও না। এতদিন বাইরের লোক স্ত্রৈণ বলেছে, এবার তাহলে আমিও বলতে সুরু করব।'

বিকাশ বলে 'হু বল না। গলা বুজে আসবে। স্ত্রীকে যে দুভাগারা ভালবাসতে পারে না তারাই পরকে স্ত্রৈণ বলে গাল দেয়। তুমি কি ও কথা বলতে পার?'

সুলতার চোখ ছল ছল করিয়া আসে। স্ত্রীকে যে দুভাগারা ভালবাসিতে পারে না তাহারা সুলতার অজানা জগতের মানুষ নয়। পাশের বাড়ীতেই চরম দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কি কান্নাই বৌটা এক একদিন কাঁদে? ভালবাসুক আর না বাসুক স্ত্রীকে যার অমন ভাবে কাঁদতে হয় সে দুর্ভাগ্য বৈ কি!……

ভালবাসার ভবিষ্যৎ ভাগবাটোয়ারা নিয়া রোজ তাহাদের তর্ক হয়।

সুলতা স্বীকার করে না তার ভালবাসার সীমা আছে। ছেলেকে ভালবাসা দিতে হইলে স্বামীর ভাগটা ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে,—একথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

'তোমার জন্তে যে ভালবাসা সে তোমারি থাকবে গো, খোকার জন্য নতুন ভালবাসা জন্মাবে। তুমিই বরং আমাকে আর তেমন,—

'দেখো! খোকাকে নিয়ে আমার দিকে যখন তাকাবারও সময় পাবে না—'

এমনি সব অর্থহীন কথার খেলা। অথচ ইহারি ভিতর দিয়া—দুজনের যে অনির্ব্বচনীয় মিলন ঘটিয়া চলে প্রেরণার মুহূর্ত্তেও কি কোন কবি কোনদিন তার মানসীর সঙ্গে তেমন মিলনের স্বাদ পাইয়াছে?

—'যে কাঁথাটা ধরেছিলে শেষ হ'ল?'

একটু দেরী আছে। আজ হয়ে যেত, ঠাকুরঝি এমন ঠাট্টা সুরু করলে—'

—'মিনুর খোকার জন্য মা আর কাঁদে না দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি। কেন বলত?'

'তোমার খোকার পথ চেয়ে আছেন। তোমার যে খুকীও হতে পারে একথা কিন্তু মার মনেও পড়ে না!'

'তোমার পড়ে?—'

—'আমি হার দিয়ে খোকার মুখ দেখব সুলতা!'

'মা যে হার দেবেন ঠিক করেছেন।'

'ও, হ্যা। মনে ছিল না। আমি তবে কি দেব বলত?'

'ওর মাকে একটু ভালবাসা দিও।'

এমনি ভাবে তাহারা কথার পিঠে কথা গাঁথিয়া চলে, কখন যে তাহা হাস্য পরিহাসে দাঁড়াইবে কখন গম্ভীর আলোচনার রূপ নিবে কিছুরই স্থিরতা থাকে না। দুজনের মনেই যেন স্বয়ংক্রিয় গ্রামোফোন ও এক স্তূপ রেকর্ড আছে, কীর্ত্তনের পরেই কামক গান বাজিয়া যায় এবং গ্রামোফোনের প্রথম শ্রোতা বালকবালিকার মত তাহাতেই তাহাদের সবিস্ময় পুলকের অন্ত থাকে না।

শেষরাত্রে হঠাৎ সুলতার ঘুম ভাঙ্গাইয়া খোকা কার মত দেখিতে হইবে এবং কি নাম রাখিলে সমবেত ভাবে দুজনের পছন্দের মর্য্যাদা থাকিবে এ আলোচনা আরম্ভ করা বিকাশের কাছে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য মনে হয় না। কিন্তু দিন ঘনাইয়া আসার সঙ্গে তাহাদের ছেলেমানুষী আলোচনা কমিয়া যায়। একটা ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয় ঘটিবার প্রতীক্ষায় সুলতার দেহ যেমন অস্থির অস্থির করে মনে তেমনি একটা একটানা ভয় বাসা বাঁধে। স্বামীর একটা হাত বুকে চাপিয়া সে অনেক রাত্রি অবধি নীরবে জাগিয়া থাকে, বিকাশ তাহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করে।

'ভয় কি সুলতা?'

সুলতা আরও শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে। কথা বলিতে গিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না।

আত্মীয় পরিজন সকলের মুখে অল্পবিস্তর চিন্তার লক্ষণ দেখা দেয়, বয়স্কেরা মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে নানারকম পরামর্শ করেন, মন্থরগতিতে আগামী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আয়োজন চলিতে থাকে।

বিকাশের বিধবা মা, মা কালীর কাছে মানত করেন, ভালয় ভালয় একটি খোকা দিও মা, খোকা দিও। জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব।

কোথা হইতে গোটা তিনেক মাদুলি সংগ্রহ করিয়া পুত্র-বধূর বাহুতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শুধু কি মাদুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায়? মা কালীর ঘাড়েও দায়িত্ব চাপাইয়া তিনি স্বস্তি খোঁজেন।

কি জানি কি হইবে? একবার ভালয় ভালয় হইয়া গেলে পরের বার অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা চলে। প্রথমবারই যত ভয়।

আপিসের কাজে বিকাশের মন বসে না, চলিতে বার বার কলম থামিয়া যায়, সময় যেন ভ্রূণভারবাহী মন্থর-গমনা অলস বধূ। বাহিরে কোনদিন রোদ ওঠে কোনদিন মেঘের ছায়া পড়ে কোনদিন অবিশ্রাম ধারাপাত হয়। ফ্যানের বাতাসে কাগজপত্র মৃদুশব্দ করিয়া নড়িতে থাকে, চোখ বুজিলে মনে হয় কোরা তাঁতের সাড়ী পড়িয়া সুলতা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুলতার নিকট হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য দূরে থাকাটাও বিকাশের কাছে আজকাল অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভাবনার মধ্যে সুলতার সঙ্গ সে এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে পারে, মমতার এমন নব ও ভূতপূর্ব্ব অনুভূতির সন্ধান সে পায় যে তাহার মনে হয় শুধু সুলতার নয় নিজেরও অনেক আশ্চর্য্য গোপন পরিচয় ধরা পড়িতেছে।

এ অমৃত যে একদিন ভালবাসার ভিত্তিগত দৈহিক প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ ছিল বিকাশ আর তাহা বিশ্বাস করে না। তাহার মনে হয় বহুকাল ধরিয়া সে শুচিশুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিল এতদিনে সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের যুগধর্ম্মের প্রতি বিকাশের কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। স্ত্রীকে সে আজ সত্যই শ্রদ্ধা করে।

সুলতার মনে হয় সে যেন নেশা করিয়াছে। আনন্দের নেশা আতঙ্কের নেশা প্রাণধারণের নেশা।

স্বামীর অতিরিক্ত ভালবাসার কথা একান্তে বসিয়া ভাবিতে গেলে কোথায় যেন তাহার একটু বাধিত, মনে হইত ইহাকে প্রাপ্য মনে করা অনুচিত, এত বেশী করিয়া পাওয়া অন্যায়। আজ আর পাওনার কাছে দাবীকে ছোট মনে হয় না। নিজের মূল্য নিজের কাছেই সুলতার আজ অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে।

দুপুরটা ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অলসভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া সুলতা চোখ বোজে। এই ঘরে সে তিন বছর ধরিয়া বাস করিতেছে, তিন বছরের ইতিহাসে এ ঘর যেন ঠাসা, বাতাসে যেন পুরানো মাটির গন্ধ।

এই ঘরে তার প্রথম স্বামী-স্পর্শ জুটিয়াছিল।

সেদিনের বুক দুরু-দুরু পুলক আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আকাশের অশ্রু-ছাঁকা সূর্য্যালোক যেমন আকাশের গায়েই রামধনু আঁকিয়া দেয়, আত্মীয়-বিচ্ছেদ-বেদনায় পরমাত্মীয়দের সোহাগ মনে সেদিন তেমনি রঙ মিশাইয়াছিল; ভ্রূণস্পন্দনে যেন তাহারই চঞ্চল চেতনা।

তারপর একদিন দুপুরে খাইতে বসিয়া সুলতা খানিকক্ষণ মাথা ভাত নিয়া নাড়াচাড়া করিল, শেষে পাংশুমুখে হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

মৃন্ময়ী বলিল 'ওকি বৌ? খাও? ভারি মাসে আবার কিসের অরুচি।'

স্নেহলেশ-শূন্য কণ্ঠ। এবং তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! আর হৃদয়ে স্নেহ নাই, মমতা নাই, ঘুমানো আগ্নেয়গিরির মত তার বুকভরা শুধু জ্বালা। স্বামী তাহাকে নেয় না, এই সেদিন পাঁচ বছরের ছেলেটা মরিয়াছে। সহ্যের অতিরিক্ত বলিয়া তাহার শোক আজ আর বেদনার ব্যাপার নয়,—মনের বিকার,হৃদয়ের রুক্ষতা।

সুলতা বলিল 'আমার গা কেমন করছে ঠাকুরঝি—বড্ড খারাপ লাগছে'

'বলো কি বৌ' বলিয়া মৃন্ময়ীর যেন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ক্ষণকাল একাগ্র দৃষ্টিতে সে ভ্রাতৃবধূর মুখখানি নিরীক্ষণ করিল। কতকাল পরে তাহার শুষ্ক চোখ দুটি আজ আবার জলে ভরিয়া উঠিতে চায়।

মুখ ফিরাইয়া নিয়া হঠাৎ অনাবশ্যক শব্দ সহকারে মৃন্ময়ী হাঁকিল 'ওমা! মা! শুনছ? বৌএর শরীর কেমন করছে দেখে যাও।'

মা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সারিয়া উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন 'কি বৌমা, কি? কি রকম বোধ করছ?'

কি রকম যে বোধ করিতেছে সুলতা নিজেই তাহা বোঝে না, শাশুড়ীকে বলিবে কি। দেহের প্রত্যেকটি অণু যেন আপনাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, মাথাটা এমন ভারি যে মাটিতে না নামাইলে খসিয়াই পড়িবে বোধ হয়, অজস্র এলোমেলো চিন্তা জড়াজড়ি করিয়া মনের মধ্যে আসা যাওয়া সুরু করিয়াছে।

সে করুণস্বরে বলিল, 'কেমন যেন লাগছে মা অস্থির অস্থির করছে।'

মা চিন্তিত মুখে বলিলেন, 'কি জানি, এখনো কিছু বলা যায় না। ঘরে গিয়ে তুমি বরং শুয়েই থাক বৌমা, খেয়ে আর কাজ নেই। ব্যথা ট্যথা টের পাওয়া মাত্র আমায় কিন্তু

জানিয়ো বাছা, দাই ডাকতে হবে, বিষ্ণুর কাছে খবর পাঠাতে হবে—'

সুলতার ইচ্ছা হইল বলে, দাই ডাকিতে লোক যাক, বিকাশের কাছে লোক ছুটুক, যত কিছু আয়োজন দরকার সব সমাপ্ত হইয়া থাক। ডাক্তার ডাকার কথাটা তো শাশুড়ী কই উল্লেখ করিলেন না? শুধু দাই এর উপর ইহারা নির্ভর করিয়া থাকিবে নাকি?

বিকাশ বলিয়াছে দরকার হোক বা না হোক (ভগবান করেন যেন দরকার না হয়) প্রথম হইতে একজন ডাক্তার আনিয়া বসাইয়া রাখিবে। কিন্তু সে খবর পাইয়া আপিস হইতে আসিবার পূর্ব্বেই যদি ভয়ানক কিছু ঘটিয়া যায়? সে যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ে? যদি মরিয়া যায়?

মৃন্ময়ী তীব্র দৃষ্টিতে সুলতার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন দেখিতেছিল, ঠোঁট ভাঙ্গিয়া হাসিয়া বলিল 'বৌ-এর মুখ দেখেছ মা? যেন ফাঁসি যাচ্ছে। সারাজন্ম ছেলে বিইয়ে কাটবে. মেয়ে মানুষের এতে এত ভয় কিসের শুনি?'

মা বলিলেন 'আহা, তুই চুপ কর মিনু।'

মৃন্ময়ী উদ্ধত ভাবে বলিল 'কেন চুপ করব? হক্ কথা বলব তার আর চুপ করা করি কি!'

সুলতা ছল ছল চোখে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন, 'যাও বৌমা, তুমি শুয়ে থাকগে। ভাত তো মুখেও করলে না, একটু গরম দুধ খাবে?

সুলতা মাথা নাড়িল। মৃন্ময়ী বলিল, 'খোকা যখন হয়, আমার শাশুড়ী আমায় একবাটি দুধ গিলিয়েছিল মা। শেষে মরি আর কি বমি করে!'

সুলতা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বার দুই অকারণেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া সে ভাবিতে লাগিল, ও কি ঠিক সময়ে আজ আসতে পারবে? সকাল বেলাই শরীর ভাল ঠেকছিল না, কেন বললাম না তখন?

ছোট ননদ সুধাময়ী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সন্তর্পণে বিছানার একপাশে বসিল, কানে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিল 'বৌদি সেই যে বলবে বলেছিলে, এবার বল!'

সুলতা অবাক হইয়া গেল। কিশোরী মেয়ের একি কৌতূহল! বিবাহের কথায় যে এখনো ভাল করিয়া লজ্জা পাইতে শেখে নাই, সে জানিতে চায় পৃথিবীর আলোবাতাসের ডাকে খোকা সাড়া দিতে চাহিলে জননীর কেমন লাগে।

মাংসের সীমানায় আলোর জন্মেরও পূর্ব্বেকার যে আদিম অন্ধকার নিয়া মানুষ পৃথিবীতে আসে, পৃথিবীর আলো কোনদিনই যে অন্ধকারের নাগাল পায় না, চিতাগ্নির পথে যে অন্ধকার আবার আলোর যবনিকার ওপারে চলিয়া যায়, সেই অন্ধকারে শিশুর অস্তিত্ব সুধার মনে জিজ্ঞাসা জাগায় না। জীবনের আরম্ভ তাহার কাছে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর,—আঁতুড়ে। সে শুধু জানিতে চায়, ওই আরম্ভটা কেমন, শিশুর কাছে উহা কেমন লাগে। অকস্মাৎ চারিদিকে আলো ও শব্দের সমারোহ তাহার নিজের একদিন কেমন লাগিয়াছিল? যে মা হইতে বসিয়াছে তাহার অনুভূতির মধ্যে সে এই দুর্ব্বোধ্য ঝাপসা কৌতূহলের সমাপ্তি খোঁজে।

গতকল্য বেশ মনে পড়ে, গতবৎসর এতটুকু অস্পষ্ট নয়। এই উজ্জ্বলতা কমিয়া কমিয়া সীমান্তের কাছে স্মৃতি শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাহার পরেই এক অদ্ভুত রহস্য ভরা কুয়াশা।

সুধা জানিতে চায় ওই রহস্যের মধ্যে সে কি ছিল।

জবাব না পাইয়া তাহার রাগ হইয়া গেল। বলিল 'বলবে না তো? আচ্ছা, নাই বললে।'

সুলতা বলিল, 'বলছি। বড় মাথা ধরেছে।'

সুধা হতাশ হইয়া বলিল 'এই শুধু?'

'আর ভয় করছে।'

ভয়! মনে হইল এবার যেন সুধা তাহার প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছে। চোখ বড় বড় করিয়া সে বলিল 'ভয় করছে বৌদি? ভারি আশ্চর্য্য তো!' বলিয়া কিশোরী মেয়েটি এক মুহূর্ত্তে গম্ভীর বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া উঠিল।

বিকালের দিকে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, আজ রাত্রির অন্ধকারেই আকাশে একটি নূতন জন্ম-তারকা দেখা দিবে।

ক্লিষ্টস্বরে সুলতা বলিল, 'সুধা ভাই, মাকে বল ওঁর কাছে লোক যাক্।'

সুধা বলিল, 'দাদার আসবার সময় হয়েছে, এক্ষুণি এসে পড়বে।'

সুলতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল: বাড়াবাড়ি করিতে লজ্জা বোধ হয় কিন্তু কি করিয়াই বা চুপচাপ থাকা যায়? ছেলের চেয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকাটাই তাহার কাছে অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এই কথাটা ইহাদের সে বোঝায় কেমন করিয়া?

খানিক পরেই সুলতা আবার বলিল, 'কিন্তু আপিস থেকে ও যদি কোথাও চলে যায় ভাই? কোন বন্ধু যদি বায়স্কোপে ধরে নিয়ে যায়? কি হবে তা'হলে?

মৃন্ময়ী সারা দুপুর বার বার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, এ কথাটা সে শুনিতে পাইল। উঁকি দিয়া বলিল, 'কি আর হবে তা হোলে, পৃথিবী রসাতলে যাবে! সে পুরুষ মানুষ এসে তোমার কাছে কি করবে শুনি? আমরাও ছেলে বিইয়েছি বৌ, এমন বেহায়াপনা কখনও করিনি!'

সে অতীত কথা। মনে হয়, এ জন্মে বোধ হয় ঘটে নাই। কী যন্ত্রণার মধ্যেও বাহিরে স্বামীর অস্থির পাদচালনার

বিষয়ে সচেতন হইয়াছিল আজ তাহা অস্পষ্ট মনে পড়ে মাত্র।

সেই খোকা আজ নাই, সেই স্বামী আর খবর নেয় না। অস্পষ্ট ভাবেও সেই শীতের রাত্রির কথা যে স্মরণ আছে ইহাই যেন আশ্চর্য্য। হয় ত আজ রাত্রে আর অস্পষ্ট থাকিবে না,—কে বলিতে পারে? বৌ যখন ব্যথায় কাতরাইতে আরম্ভ করিবে তাহার চিত্তেও হয় ত অচেতনার স্পর্শ লাগিবে, বুকের মধ্যে চঞ্চল পদে একজন হাঁটিয়া বেড়াইবে, বিনিদ্র রজনী আর পোহাইতে চাহিবে না।

মৃন্ময়ীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার পা দুটি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রোয়াকে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল আজ রাত্রিটা কোথাও কাটাইয়া আসা যায় না? পাড়ার কাহারো বাড়ীতে হোক, ভবানীপুরে পিসিমার বাড়ীতে হোক, এবাড়ীর সমারোহের সংবাদ যেখানে আজ পৌঁছিবে না?

ছোটবাড়ী, অন্দরের গা ঘেঁষা বৈঠকখানা। ভিতরের দিকে দরজায় একটি মুখ উঁকি দিতেছিল, মৃন্ময়ীকে চাহিতে দেখিয়া চাপা গলায় বলিল, 'বিকুদা বাড়ী আছে?'

মৃন্ময়ী তীব্রকণ্ঠে বলিল 'যান, যান আপনি। চাষা।'

এতক্ষণ অবধি ছাদে রোদের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুখে কালিমার ছাপ পড়িয়াছিল, আরও একটু কালো হইয়া মুখখানা সরিয়া গেল। মৃন্ময়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া দোতালায় গেল,—কপালে সিঁদুর পরিতে। সিঁদুরের ফোঁটার অভাবে তাহার কপাল খুর খুর করিতেছিল। কপালই বটে। সাদা হাড়ের উপরে খানিকটা টান করা সাদা চামড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সিঁদুরের টিপ পরিয়া মৃন্ময়ী আয়নায় মুখ দেখিল। মনে হইল কপালটা তাহার এমনি সাদা যে লাল সিঁদুরের চেয়ে কালো কাজলের ফোঁটা হইলেই যেন মানাইত ভাল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র পাঁচু টের পাইল বাড়ীর আবহাওয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। বারান্দায় ষ্টোভ জ্বলে নাই, বৈকালিক জলযোগের কোন আয়োজন দেখা যায় না। একটা চাপা চাঞ্চল্য যেন চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া আছে, প্রাইজ বিতরণের দিনে স্কুলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিবার আগে যেমন হয়, তেমনি। পশ্চিমের ছোট অন্ধকার ঘরখানা ইতিপূর্ব্বে একদিন পরিষ্কার করা হইয়াছিল, এই অবেলায় দিদিমা আবার সে ঘরের মেঝে পুঁছিতেছেন, দিদিমার মুখের ভাব অন্ধকার ঘরখানার মতই সন্দেহ-জনক। বড়মাসীর মুখের রুক্ষতা যেন বাড়িয়াছে, ছোটমাসী বসিয়া আছে মামীর শিয়রে।

কি শিথিল অবসন্ন মামীমার পা গুটাইয়া শুইবার ভঙ্গি। কাহাকেও প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না, পাঁচু মুহূর্ত্তমধ্যে সব বুঝিতে পারিল। বইখাতা হাতে বিস্ফারিত চোখে সে সুলতার দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তেজনায় তাহার ছোট বুকখানির মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। ঘরে সে ঢুকিতে পারিল না। চৌকাঠ ডিঙাইবার ক্ষমতা সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সুধা বলিল 'কি রে পাঁচু?'

পাঁচু সলজ্জ হাসিয়া সরিয়া গেল। বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিয়া পাইল না কোন দিকে যাইবে, এ বাড়ীর কোন ঘরে আজ তাহার কি প্রয়োজন।

মার জন্য পাঁচুর আজ সহসা বড় কষ্ট হইতে লাগিল, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। তাহার মা থাকিলে মামীমা তাহাকে এমনভাবে শাস্তি দিতে পারিত না।

দাইএর কাছে খবর গিয়াছিল, একটা কাপড়ের পুঁটলি হাতে পান চিবাইতে চিবাইতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনের মোটা কাপড়খানা তাহার যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধ। তা, কাজটাও তাহার অতিশয় নোংরা বৈকি।

হাতে মুখে সে অনেকগুলি উল্কির ছবি আঁকাইয়াছে, গায়ের রঙ এত কালো যে আর একটু কালো হইলে উল্কিগুলি দেখা যাইত কি না সন্দেহ।

কোনদিকে দৃকপাত নাই, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিতে করিতে তাহার প্রচুর আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। আসিয়াই হাঁকিল, 'গিন্নিমা কুথায় গো?'

মা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন।

দাই বলিল, 'এস্‌লাম তো গিন্নিমা, উদিকে যে আবার ফ্যাকড়া বাঁধল।'

মা শঙ্কিতা হইয়া বলিলেন, 'কি আবার ফ্যাকড়া বাঁধল বাছা?'

'হোই ও পাড়ার ভূষণবাবুর মেয়েরও আজ ব্যথা উঠেছে। আমার হাত ধরে কি টানাটানিই না করলে!— দত্তমশায় নিজে, লজ্জায় মরি গিন্নিমা! বললে, তুমি থাকলে বুকে ভরসা পাই রাখীর মা, ভালয় ভালয় খালাস করে দাও, পঁচিশ টাকা নগদ আর তোমার যা রোজ বাঁধা আছে দু'টাকা করে—'

একটু নিরুপায় হাসি হাসিয়া দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাই মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা মুখ ভার করিয়া বলিলেন, 'ওইতো বাছা তোমাদের দোষ। একেবারে শেষ সময়ে মোচড় দিয়ে পাওনা বাড়িয়ে নিতে চাও। দেনা পাওনার কথা তোমার সঙ্গে তো হয়েই আছে কবে থেকে?'

দাই বলিল, 'কথা হয়ে থাকলেই কি গরীবের চলে মা! যেখানে দুটাকা বেশী মিলবে আমাদের সেইখানেই লাগতে হবে।'

মার সাংসারিক অভিজ্ঞতাও কম নয়, বলিলেন, 'তবে তুমি সেইখানেই যাও বাপু, আমরা অন্য লোক দেখছি। সিধুর বোনকে বলা আছে, ডাকলেই আসবে।'

শুনিয়া ঘরে সুলতার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিয়া । এমন বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিবে, বংশধর ভূমিষ্ঠ

হইবে, ছেলের বৌ বাঁচিবে কি মরিবে ঠিক নাই, শাশুড়ী তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্য এমন করিতেছেন! যে টাকা তারই স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করে। প্রথমেই পাওনা নিয়ে গোল বাধিলে দাই কি আর মন দিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিবে? আর্থিক ক্ষতির প্রতিশোধটা দাই যদি তার উপরেই নেয়?

সুলতার মনে হইল, পরমাত্মীয়ের মৃত্যুকালে এ যেন জীবনের মূল্য নিয়া ধন্বন্তরির সঙ্গে দর কষাকষি করা!।

মনে মনে সে স্থির করিয়া ফেলিল, দাইকে এক সময় চুপি চুপি জানাইয়া দিবে, টাকার ব্যাপারে তাহার কোন দোষ নাই। দাই যত টাকা চায় সুলতা গোপনে তাহার হাতে দিবে, সে যেন তাহার সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ করিতে কৃপণতা না করে, এবারের মত সে যেন তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়। ভবিষ্যতে—

মা আর মরিয়া গেলেও হইবে না।

বায়স্কোপ নয়, বিকাশ খেলা দেখিতে গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিতে তাহার সাতটা বাজিয়া গেল।

কালও যে খেলা দেখিয়া এমনি সময়ে সে বাড়ী ফিরিয়াছিল সে কথা বিকাশের মনে পড়িল না, বিশেষ করিয়া আজকার দিনটিতে দেরী করার জন্য মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিরক্তি গোপন করিবার কোন চেষ্টাই সে করিল না।

'আমায় একটা খবর পাঠাতে পারলে না কেউ? কি যে সব ব্যবস্থা তোমাদের।'

মা বলিলেন 'খবর পাঠাবার যখন দরকার হ'ল বাবা, তোর ছুটির সময় হয়েছে। কোথায় তোকে খুঁজে বেড়াত?'

বিকাশ যেন এই কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিল!

মা আবার বলিলেন 'এই তো গেল আঁতুড়ে, এখনো কিছুই নয়।'

বিকাশ জামা কাপড় ছাড়িল না, বিরস মুখে জলচৌকীতে বসিয়া রহিল। এখনো কিছুই নয় সত্য, কিন্তু তাহার দুঃখ অন্য কারণে। সুলতার সঙ্গে একটা কথা বলিবার সুযোগও তাহার হইল না এমন ক্ষতি এ জীবনে আর সম্ভব নয়। ও ঘরে ঢুকিবার আগে তাহার নিকট হইতে শেষ সান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়া নিবার কি অধীর ভাবেই না জানি সুলতা প্রতীক্ষা করিয়াছিল! তাহাকে এতখানি প্রয়োজন আর কোনদিন একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত্তের জন্যও কি সুলতার হইবে?

সুলতার নির্ভরশীলতার চরম অভিব্যক্তি অগোচরে ব্যর্থ হইয়া গেল ভাবিয়া বিকাশের ক্ষোভের সীমা রহিল না।

ও ঘর হইতে সুলতা বাহির হইবে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া, সন্তানের জননী এই পরিচয়ের কাছে তাহার প্রিয়া ও পত্নী সংজ্ঞা তুচ্ছ হইয়া যাইবে। যাক্, তাহা অপ্রিয় নয়, কিন্তু এই মহেন্দ্রক্ষণ সন্নিকট হইলে প্রিয়ার বিবর্ণ কপোলে যে ক্ষুদ্র একটি চুম্বন দেওয়া হয় নাই সে আপশোষ এ জীবনে আর ঘুচিবে না।

সুধাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বিকাশ বলিল 'বৌদিকে বলগে আমি এসেছি।' সুধা আঁতুড় ঘরে ঢুকিল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল 'বৌদি জানে।'

জানে! কেমন করিয়া জানিল? সে জোরে কথা বলে নাই, শব্দ করিয়া হাঁটে নাই, তবু খবর পৌছিল? বিকাশ চাহিয়া দেখিল ঘরে কি আলো জ্বালা হইয়াছে জানালাটা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া আলো হয় নাই। আলোর কার্পণ্যে তাহার রাগ হইয়া গেল। সে ভাবিল, আর আধঘণ্টার মধ্যে ও ঘর যদি ইহারা ভাল ভাবে আলোকিত না করে সে নিজে ডে লাইট ভাড়া করিয়া আনিবে।

'তেরে কে আছে রে সুধা?'

'মা ও বাড়ীর পিসীমা আর দাই।'

'মিনু?'

'দিদির শরীর ভাল নয়, শুয়েছে।'

বিকাশের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ শুভ নয়! মৃন্ময়ীকে সে ভালবাসে, তাহার জীবন সবদিক দিয়া ব্যর্থ হইবার পর করুণার রসে সে মমতা বাড়িয়াই গিয়াছিল। সুলতার সন্তান-সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পাইবার পর তাহার মধ্যে যে ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল অন্য কাহারো কাছে ধরা না পড়িলেও তাহা বিকাশের চোখ এড়ায় নাই। আজ হঠাৎ মৃন্ময়ীর শরীর খারাপ হওয়ায় সবটুকু ইতিহাস অনুমান করিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। সুলতার শুভকর বিপদে একি অমঙ্গলের ছায়াপাত!

জুতা খুলিয়া বিকাশ বারান্দার একপাশে রাখিয়া দিল। জামা খুলিয়া কলতলায় মুখহাত ধুইয়া আবার জলচৌকীটাতেই বসিল। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে। তামাকের তৃষ্ণাও যেন ক্ষুধার মতই অবুঝ। আপিস যাওয়ার সময় সুলতাকে সে নারকেল কোরাইতে দেখিয়া গিয়াছিল। তক্তি টক্তি কিছু করিতে পারিয়াছিল কিনা কে জানে! করিয়া থাকিলেও চাহিয়া খাইতে বিকাশের ইচ্ছা হইল না। ক্ষুধার জ্বালা সামান্য, সুলতা যেমন কষ্ট পাইতেছে সামান্য ক্ষুধার জন্য সে ব্যস্ত হইবে? সুলতার যন্ত্রণা তাহার খাওয়া না খাওয়ার উপর নির্ভর করে না, খাওয়ার স্বপক্ষে এ ছাড়া আর কি যুক্তিই বা আছে।

রান্নার ভারটা এবেলা সুধার উপরেই পড়িয়াছিল। মুখ তাহার গম্ভীর ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত। একটা বাটিতে মুড়ি আর কয়েকটা নারকেল সন্দেশ আনিয়া সে দাদার হাতে দিল, তামাকও সাজিয়া আনিল। তার পর অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল 'বৌদিকে একবার দেখবে দাদা? সারাক্ষণ তোমায় খুঁজছিল।'

বলিতে বলিতে দাদার প্রতি উচ্ছ্বসিত মমতায় কচি মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বিকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল 'থাক।'

'আচ্ছা।' বলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সুধা চোখ মুছিতে লাগিল।

দাদার দুঃখ এ বাড়ীতে তাহার চেয়ে কে ভাল করিয়া বোঝে! সারাদিন খায় নাই, কিন্তু কেমন অনিচ্ছার সঙ্গে দাদা মুখে খাবার তুলিতেছিল? হুঁকা হাতে নিয়া কতক্ষণ টান দিতে খেয়াল থাকে নাই? সমবেদনায় সুধার বুক ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ডালে কাঁটা দিতে দিতে মুখ চোখ বিকৃত করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া সে উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগ ঠেকাইয়া রাখিল। মনোবৃত্তির এমন ভয়ানক বিপর্যয় তাহার ক্ষুদ্র জীবনে আর দেখা দেয় নাই। প্রথমে এতটা হয় নাই, দাদার ম্লান মুখ ও ছলছল চোখ দেখা অবধি সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে তামাক টানিতে টানিতে চারিদিকে চাহিয়া বিকাশ ক্রমাগতই মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল। এই সময়টির যে কল্পনা সে মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল তার সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নাই। সে রকম ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি হইতেছে কই? সমস্তই ধীর মন্থর গতিতে ঘটিয়া চলিয়াছে। পুরাতন কাপড় নিতে আসিয়া মা পরম নিশ্চিন্ত মনেই যেন চাকরকে জিনিষের ফর্দ্দ লিখিয়া পয়সা বুঝাইয়া দিলেন, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোসগিন্নির সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করিলেন, রান্না সম্বন্ধে সুধাকে কয়েকটা উপদেশও দিলেন। মৃন্ময়ী উপরে শুইয়া আছে, পাঁচু বোধ হয় তার ছোট আলোটি জ্বালিয়া অঙ্ক কষিতে বসিয়া গিয়াছে, বেচারীর হাফইয়ারলি পরীক্ষা আসন্ন। আঁতুড়ের দিক হইতে কাঠকয়লা পুড়িবার একটা গাঢ় গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। দাইয়ের অবিশ্রান্ত বকুনি ও মাঝে মাঝে সুলতার মৃদু কাতরাণি ছাড়া ও ঘরে শব্দ নাই চাঞ্চল্য নাই।

অথচ এ কি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার! পুরা দশটি মাস ধরিয়া বিধাতা স্বয়ং যে ক্লাইম্যাক্সের আয়োজন করিয়াছেন এই কি তাহার উপযুক্ত সমারোহ? বিধাতার খেলায় তাড়াহুড়া নাই বলিয়াই কি সকলে চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া কোন মতে ধৈর্য্য ধরিয়া আছে?

এই চিন্তার শেষটা নিয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে যাহা ঘটিবার ধীর সুস্থে তাহা ঘটিবেই একথা মানিয়া নেওয়ার মধ্যে যে কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য আছে বিকাশ নিজেও সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

বিকাশের মনে হইল তাহার দুশ্চিন্তা ও সুলতার যন্ত্রণা যে অশেষ নয় এই কথাটাই সে বাড়ীতে পা দেওয়া অবধি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাত বারোটা একটার মধ্যে সব চুকিয়া যাইবে আশা করা যায়। যত কষ্টই পাক সুলতা বারোটা একটা তো একসময় বাজিবেই আজ! সাতাশ বৎসর ধরিয়া তাহার জীবনে সংখ্যাহীন রাত্রি পোহাইয়াছে আজিকার রাত্রিও পোহাইবে বৈকি!

আগামী কল্যের যে সূর্য্যালোকে সে সন্তানের মুখ দেখিবে, সে সূর্য্যকে মাটির পৃথিবী কয়েক ঘণ্টার জন্য আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

জোরে জোরে হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া বিকাশ জামাটা তুলিয়া নিয়া দোতালায় গেল। নিজের ঘরে পা দিয়াই তাহার চমক লাগিল। এখানেও কে যেন অস্ফুটস্বরে কাঁদিতেছে।

ঘরের মেঝেতে আলোটা কমানো ছিল, বাড়াইয়া দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া বিকাশ দেখিতে পাইল, একটা বালিশ আঁকড়াইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া পাঁচু থর থর করিয়া কাঁপিতেছে এবং মাঝে মাঝে অস্ফুট শব্দ করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার পিঠে হাত দিয়া বিকাশ বলিল, 'তোর আবার কি হল রে পাঁচু?'

পাঁচু তৎক্ষণাৎ মামাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল, বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া বলিল 'ভয় করছে মামা।'

'কেন ভয় করছে কেন? যা ভয়ের কিছু নেই।'

পাঁচু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে 'একটা শাঁকচুন্নী ছাদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে চুল বাঁধছিল একটা ভূত এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।'

ছেলেটা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, ভয় সে সত্যই পাইয়াছে, কিন্তু কারণটা বিকাশ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। খোলা জানালা দিয়া ছাদের খানিকটা দেখা যায়, অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় মন্দ আলো হয় নাই। ওই ছাদের কিসের উপলক্ষে আজ শাঁকচুন্নীর আবির্ভাব হইল, তাহার চুল বাঁধা দেখিতে ভূতই বা আসিল কোথা হইতে? কিন্তু যে কারণেই ভয় পাইয়া থাক পাঁচুর ভয় ভাঙানো দরকার।

'তুই ছায়া দেখেছিস পাঁচু। চল্ দেখবি, ছাদে কিচ্ছু নেই।'

পাঁচু সভয়ে বলিল 'না মামা।' কিন্তু বিকাশ তাহা শুনিল না, পাঁচুকে শক্ত করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া ছাদের দিকে চলিতে চলিতে হাসিয়া বলিল, 'আমার সঙ্গে যাচ্ছিস, তোর ভয় কিরে? ভূতের আমি কাণ মলে দেব।'

ছাদে গিয়া দেখা গেল শাঁকচুন্নীর কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। চুল এলাইয়া দিয়া মৃন্ময়ী অসম্বৃত বেশে ছাদের আলিসার সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে। পায়ের শব্দেও সে মুখ তুলিল না।

'তুই যে এখানে মিনু?'

মৃন্ময়ী কলহের সুরে বলিল 'কেন এখানে কি আমার থাকতে নেই নাকি?'

বিকাশ বলিল 'মিথ্যে চটিস্ কেন? পাঁচু বড় ভয় পেয়েছে। মাথা ধরা কমাতে তুই ছাতে বেড়াচ্ছিলি, ও মনে করলে আমাদের বাড়ীতে আজ একটা শাকচুন্নীই বা এলো। যে ফর্সা কাপড় তুই পরিস্।'

মিনু ঝাঁঝালো সুরে বলিল 'এবার থেকে ময়লা কাপড়

পরব। ধোপার পয়সা দিতে তোমার কষ্ট হয় জানতাম না দাদা।'

বিকাশ অবাক হইয়া গেল। মৃন্ময়ীর মেজাজ সব সময় ভাল থাকে না, কিন্তু এ ভাবে কলহ করাও তাহার স্বভাব নয়। তথাপি সকৌতুকে হাসিয়াই বিকাশ বলিল 'হয়ই ত কষ্ট। তোর জন্য একটা পয়সা খরচ করতেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু তোর ভূতটা কই রে?'

মৃন্ময়ী চমকাইয়া উঠিল 'ভূত! ভূত কি?'

'পাচু দেখেছে। তুই বেড়াচ্ছিলি, একটা ভূত এসে তোকে জড়িয়ে ধরল।'

মৃন্ময়ী হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া গেল 'তুই দেখেছিস্ পাঁচু? মিথ্যেবাদী হারামজাদা, দেখেছিল্ তুই।'

চাঁদের আলোয় তাহার গালে জলের দাগ চকচক করে, চোখ যেন পাগল মেয়ের রাগ করা চোখ। মনে হয়, পাঁচুকে সে আঘাত করিবে। কিন্তু হঠাৎ সে স্বর বদলাইল।

'ওটাকে ভূত মনে করেছিল বোধ হয়।'

মৃন্ময়ী নিজের ছায়াটি দেখাইয়া দিল। একটি হ্রস্ব বাহু বাড়াইয়া ছায়াও তাহার কথায় সায় দিল।

পাচুকে নীচে নামাইয়া দিয়া বিকাশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিল "কি ভাবছ শুনি!"

'ভাবছি পাঁচু কেন ভয় পেল। তোকে তো ও কতদিন অন্ধকার ছাতে ঘুরতে দেখেছে, আর আজ এমন জ্যোৎস্না। এও কি সুলতার দোষ রে?'

মৃন্ময়ী শুষ্কস্বরে বলিল 'তা ছাড়া কি?'

বিকাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'চল্ মিনু, আমরা নীচে যাই।'

'নীচে গিয়ে কি করব? তোমার বৌএর সেবা?'

'করলে কি তোর পাপ হবে? বড় নির্লজ্জ তুই। বড় ছোট মন তোর।'

এমন কঠিন কথা দাদার কাছে মৃন্ময়ী জীবনে আর শোনে নাই। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

'বৌকে আমি হিংসা করি না দাদা, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি একটুও হিংসা করি না।' বিকাশ তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না, সংক্ষেপে শুধু বলিল 'তা জানি। চল নীচে।'

রাত নটায় সুলতা চ্যাচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, থামিল এগারোটার সময়; একেবারে অজ্ঞান হইয়া। বিকাশ সভয়ে বলিল 'ওকি হ'ল? মরে গেল নাকি ডাক্তার বাবু?'

ডাক্তার বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, বলিলেন 'যান মশাই, আপনি রাস্তায় যান।' বিকাশ মিনতি করিয়া বলিল 'আপনি আর একবারে দেখে আসুন ডাক্তার বাবু। এমন আচমকা চুপ করে গেল, আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।

ডাক্তার উঠিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিলেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই, সুলতা শুধু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

'অজ্ঞান!'

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'আচ্ছা পাগল তো আপনি! আপনার জন্য দরকার মত উনি অজ্ঞানও হতে পারবেন না?'

বিকাশ ছটফট করিতেছিল, এবার বসিল। কোলাহল সমারোহ নাই বলিয়া সন্ধ্যায় সে বিস্মিত হইয়াছিল, এখন আর ও বিষয়ে নালিশ করিবার কিছু নাই। সুলতা একাই সমারোহের সীমা রাখে নাই।

সমস্ত বাড়ীটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুলতা হয়ত আর শব্দ করিবে না, এ স্তব্ধতা ভাঙ্গিবে একেবারে শঙ্খধ্বনিতে,—যদি ছেলে হয়। শাঁখ সম্ভবতঃ মৃন্ময়ীই বাজাইবে। শঙ্খ হাতে সেই যে সে প্রহরীর মত আঁতুড়ের দরজায় বসিয়াছিল, একবারও সেখান হইতে নড়ে নাই।

ভীত পাচুর সঙ্গে সুধাকেও শুইতে হইয়াছিল, তাহারা দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাঢ় অবসাদের গাঢ় ঘুম, কাল সকালের আগে টানিয়া তুলিলেও তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিবে না। সুস্থ সানন্দ-চিত্তে কাল তাহারা নবাগতকে দেখিবে। কিন্তু আজিকার অভিজ্ঞতা তাহারা ভুলিবে না কোনদিন। জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে খাপ খাইতে হয়ত ক্রমাগত রূপান্তর নিবে, কিন্তু কখনো বিস্মৃতিকে তলাইয়া যাইবে না।

হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিয়া বিকাশ ভাবিতে লাগিল, সমস্ত জীবন মানুষ দুঃখ ভোগ করে, রোগে শোকে কষ্ট পায় কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তাহার জন্মগ্রহণ। কিন্তু কেন? এই অনাবশ্যক বীভৎসতার মধ্য দিয়া কে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠায়?

খোকা আসিবে আসুক, কিন্তু এ যে বর্গী আসারও বাড়া।

ফাঁদ

সুভদ্রার বাবা একটি নাম করা যাত্রার দলে তবলা বাজাইত। সেই যাত্রার দলেই বার তের বছর বয়স পর্য্যন্ত সুভদ্রা কৃষ্ণ সাজিয়াছিল। কৃষ্ণ সাজিয়া গোপিনীদের পাকা পাকা কথা ও মিষ্টি মিষ্টি গান শোনানো বন্ধ করিতে করিতে সুভদ্রার বয়সটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অভিনয় বন্ধ করিয়া বাড়ী পাঠানোর কথা তুলিলেই সুভদ্রা ক্ষেপিয়া যাইত। শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী অবশ্য তাকে পাঠাইয়া দিতে হইল। বিবাহের আয়োজনও চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ না সাজিয়াই একসঙ্গে পাড়ার তিনটি ছেলের সঙ্গে প্রেম আরম্ভ করায় কলঙ্কের আর সীমা রহিল না। আরেকজনের সঙ্গে সুভদ্রা তখন একদিন গেল পালাইয়া। পালানোর সময় কোন আপনজনের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা অবশ্য তার ছিল না, কিন্তু পালানোর আগে যার সঙ্গ ছাড়া সে একটা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না ভাবিয়াছিল, দু'দিনের মধ্যে তাকে দেখিলেই তার সমস্ত শরীর রাগে সিরসির করিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গীটিকে ছাড়িয়া সে তাই গিয়া হাজির হইল দূরের এক গ্রামে তার দিদির কাছে। সেখানে মিষ্টি মিষ্টি গান গাহিয়া সকলকে সে মুগ্ধ করিয়া দিল, আর একটু ভাব করিল ভগ্নীপতির সঙ্গে। সে খেলা ভগ্নীপতি বুঝিত না, যে খেলায় শুধু পরস্পরের মন ভুলানো আর সব আছে কিন্তু ধরা দেওয়া নাই। একদিন তাই অসময়ে জোর করিয়া সুভদ্রাকে জড়াইয়া ধরায় সেটা দিদির চোখে পড়িয়া গেল।

কিছু দূরের একটি গ্রামে মহেন্দ্র নামে ভগ্নীপতির একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সদ্য সদ্য বৌ মরিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে তার সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিয়া দিল।

মহেন্দ্রের সঙ্গে বড ভাব হইয়া গেল সুভদ্রার। ভয়ানক বদমেজাজী মানুষ মহেন্দ্র, লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড তার শরীর আর শরীরে ষাঁড়ের মত জোর। মেয়েমানুষ যে মোলায়েম জীব, এটা বোধ হয় তার জানাই ছিল না। তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠুর পৌরুষ, বীভৎস ভালবাসা আর বাস্তব দরদ যেন সাবান দিয়া আছড়াইয়া কাপড় কাচার মত সুভদ্রার মনের ছেলেমানুষী ময়লা সাফ করিয়া দিল। মনের আনন্দে সুভদ্রা বৌ হইয়া কাটাইয়া দিল কয়েকটা বছর।

তারপর আবার তার মনটা কেমন করিতে লাগিল একটা অজানা কিছুর জন্য। মহেন্দ্রের আলিঙ্গনে শিহরণ জাগার বদলে দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তার মনে হইতে লাগিল, রসিক নামে যে রোগা লম্বা ভীরু ছেলেটা মাঝে মাঝে আসে, তার কাছে কি মন কেমন করার ওষুধ আছে? সাধন বৈরাগী নামে যে রূপবান পুরুষটা তার মন ভুলানোর চেষ্টায় নাওয়া খাওয়া ছাড়িয়াছে, সে কি তাকে দিতে পারিবে সে যা চায়?

একদিন মাঝরাত্রে সুভদ্রা ধরা পড়িয়া গেল। রাশি রাশি মেঘে ঢাকা আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল টিপি টিপি. মোলায়েম একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সারাদিনের গা জ্বালানো গরমের পর, একেবারে অচেতন হইয়া ঘুমানো উচিত ছিল মহেন্দ্রের। আগের রাত্রে গরমে সিদ্ধ হইতে হইতেও সে মরার মত ঘুমাইতেছিল, সুভদ্রা কখন উঠিয়া গিয়া কখন বিছানায় ফিরিয়া আসিয়াছিল কিছুই টের পায় নাই। দু'চারটি রাত্রি বাদ দিয়া তার আগের আরও পাঁচ সাতটি রাত্রেও টের পায় নাই। আজ যে কেন তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

হয় তো জাগিয়াই ছিল, কে বলিতে পারে। একবার ঘুমাইলে মহেন্দ্রের ঘুম সহজে ভাঙ্গে না। উঠিয়া যাওয়ার সময় সুভদ্রা আস্তে তার গায়ে একবার ঠেলাও দিয়াছিল; গায়ে ঠেলা দেওয়ায় যে জাগে নাই কয়েক মিনিট পরে আপনা হইতে তার ঘুম তো ভাঙ্গিবার কথা নয়।

রসিক গায়ে জড়াইয়া আসিয়াছিল ছেঁড়া একটা সস্তা কম্বল। ভয় পাওয়ার অভ্যাস থাকিলে কম্বল জড়ানো সেই চেনা মানুষটিকে দেখিয়া সুভদ্রা হয় তো মূর্চ্ছা যাইত। তার বদলে বর্ষা বাদলের রাত্রে ভালবাসিয়া জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে বলিয়া রসিকের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া তাকে সে টানিয়া নিয়া গেল উঠানের দক্ষিণে ধানের মরাইটার গা-ঘেঁষা ছোট আটচালার নীচে। আটচালার অর্দ্ধেকটা ভরিয়া ছিল চ্যালানো আম কাঠে আর বাকী অর্দ্ধেকটা ভরিয়া ছিল চাষের যন্ত্রপাতি আর ভাঙ্গা গরুর গাড়ীর চাকা হইতে আরম্ভ করিয়া দুমড়ানো কেনেস্তারা পর্য্যন্ত রকমারি জঞ্জালে। তার মধ্যে একটু স্থান করিয়া রসিকের গায়ের কম্বল বিছাইয়া তারা বসিয়াছিল।

তারপর রসিকের বুকে মাথা রাখিয়া ভৎর্সনার সুরে সুভদ্রা সবে বলিয়াছে, 'আজ আবার কেন এলে শুনি মুখপোড়া?'

আর আবেগ ও আবেদনে কাঁদ কাঁদ গলায় রসিক সবে

জবাব দিয়াছে, 'না এসে থাকতে পারলাম না, মাইরি বলছি—'

এমন সময় সেখানে মহেন্দ্র আসিয়া হাজির। দু'জনকেই মহেন্দ্র সম্ভবত খুন করিয়া ফেলিত কিন্তু নাগাল সে পাইল না একজনেরও। লম্বা রোগা বাইশ বছরের ছোকরা রসিক চোখের পলকে উধাও হইয়া গেল, আর স্বভাব খারাপ হইলেও ঘরের বৌ এত রাত্রে ঘরেই থাকিবে জানিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া গেল রসিকের পিছনে। সেই অবসরে গোয়ালের পিছন দিয়া সুভদ্রা পলাইয়া গেল উল্টা দিকে।

সেদিকেও ঘুমন্ত গ্রাম ছিল অনেক দূর অবধি ছড়ানো, কুকুর ডাকিতেছিল এদিকে ওদিকে, দূরে শোনা যাইতেছিল চৌকীদারের হাঁক আর জমকালো ভেজা অন্ধকার ভরাট করিয়া গোয়ালের নাগাল ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল ব্যাঙের গানের একটানা আওয়াজ। সোহাগী বৌ রঙীন শাড়ী পরিতে পায় বলিয়া আর রঙীন কাপড় অন্ধকারে সাদা কাপড়ের মত সহজে চোখে পড়ে না বলিয়া নিজেকে সুভদ্রার মনে হইতেছিল ভাগ্যবতী।

গ্রামের শেষ বাড়ীটি শুধু গোটা দুই ভাঙ্গা ঘর, তারই একটিতে এত রাত্রে একজন গান গাহিতেছিল। চেনা চল্‌তি গান, সুভদ্রার নিজের গান। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে গান শুনিল। খণ্ডিতা রাধার মানভঞ্জনের জন্য তখন সে যে গানটি গাহিত তাই। মোটা গলায় ভুল সুরে কথা বদলাইয়া গাহিতেছে বটে অদৃশ্য গায়ক, কিন্তু আবেগ আছে লোকটার।

আবেগভরা লোকগুলি বড় অধীর হয়। ভিজা শাড়ীখানা গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে, দেখিবামাত্র হয় তো সাপটাইয়া ধরিবে। ওভাবে কেউ সাপটাইয়া ধরিলে বড় খারাপ লাগে সুভদ্রার। গা বমি বমি করে, দম আটকাইয়া আসে, মনে হয় সে যেন হঠাৎ এগার বছরের মেয়ে হইয়া গেছে আর যাত্রা দলের সেই যুধিষ্ঠির শেষরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বেশধারী তাকে আসরের খানিক তফাতে একটা ছোট আটচালার নীচে ডাকিয়া নিয়া গিয়া এক হাতে তার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে আর আরেক হাতে তাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে কাছি দিয়া বাঁধার মত।

কিন্তু উপায় ছিল না। এত রাত্রে কে আর তাকে খাতির করিবে? সুভদ্রাকে ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। সাধন বৈরাগী মূর্চ্ছা গেল না, দু'চোখ বড় বড় করিয়া গানের বদলে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করিতে লাগিল।

সুভদ্রা বলিল, 'আমি গো আমি।'

তখন সাধন বৈরাগী শান্ত হইল। কিন্তু আবার অশান্ত হইয়া উঠিল অল্পক্ষণের মধ্যেই, আনন্দ ও উত্তেজনায়।

প্রথমে সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, রসিকের জন্য বোধ হয় একটু মন কেমন করিবে। একটু যেন পছন্দ হইয়াছিল রসিককে তার, দু'একদিন গভীর রাত্রে তার যেন মনেও হইয়াছিল, বেতালা বাঁশীর সুরে জানান দিয়া আজ কি রসিক আসিবে? ভাসা ভাসা একটু রসজ্ঞান ছিল রসিকের, দুপুর রাতের গোপন মিলনে মাঝে মাঝে একটু রসের সঞ্চারও যেন সে করিতে পারিত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া যে ভাবে তার মন কেমন করিয়া আসিয়াছে এখনও তেমনিভাবে মন কেমন করিতে লাগিল বটে, সেটা রসিকের জন্য না। স্বামীর ঘরে ফেলিয়া আসা শাড়ী গয়নার মত রসিকও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, এতটুকু আপশোষও সুভদ্রার নাই। রসিক বলিয়া কেউ কি কোনদিন তার মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে বর্ণনা করিত আসিবার সময় কোন বাড়ীতে নতুন বর ও বধূর ঘরে বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়া একজনকে কি ভাবে আর একজনের পায়ে ধরিয়া সাধাসাধি করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, শুনিতে শুনিতে তার মনে হইত সে যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে, মুক্তি পাইয়াছে, চাঁচের বেড়ায় ঘেরা চারকোণা জেলখানায় জোরালো দু'টি বাহুর বন্ধন যেন তার আর নাই।

মনটা সুভদ্রার খুঁতখুঁত করে, এরকম হওয়া উচিত ছিল না। রসিকও শেষ পর্য্যন্ত তাকে ফাঁকি দিল, এতটুকু স্থান দাবী করিতে পারিল না তার মনে।

সাধন বৈরাগীর চেহারাটি বড় সুন্দর। প্রথম দিন তাকে দেখিয়াই সুভদ্রা তীব্র বিদ্বেষ আর হিংসা অনুভব করিয়াছিল, মনে হইয়াছিল এই লোকটাই বুঝি জীবনযুদ্ধে তার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী। তারপর সাধনের অনেকদিনের প্রাণপাত সাধনার পুরস্কারস্বরূপ দূর হইতে একটু একটু ভাব করিয়া এতকাল তাকে শুধু সে যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে। এখন হঠাৎ একেবারে ধরা দিয়া, অনেক দূরের অচেনা এক সহরে অজানা মানুষের মধ্যে ছোট একটি টিনের ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে বসবাস করিবার মত ভয়ানকভাবে ধরা দিয়া, সুভদ্রা দেখিল লোকটাকে সে যেরকম ভাবিয়াছিল সে মোটেই সে রকম নয়। বিদ্বেষ বা হিংসার কোন কারণ নাই, বরং রীতিমত অবজ্ঞা করা চলে। যে জোরালো আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আশঙ্কা সে করিয়াছিল সেটা জোয়ারের মত নয়, কলের ফোয়ারার মত। তাও আবার সে উৎসের ভাণ্ডারে সঞ্চয় বড় কম, কলটাও গিয়াছে বিগড়াইয়া, হঠাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে উথলাইয়া উঠিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিমাইয়া পড়ে। শুধু চেহারার টানে অনেক মেয়ে আসিয়া তার রসটুকু শুষিয়া নিয়া গিয়াছে বুঝা যায়। আর রাখিয়া গিয়াছে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা আর পাগলামি, যে সব কোনদিন কোন মেয়ের কোন কাজেই লাগে না।

সুভদ্রা হতাশ হইয়া ভাবিল, তাইতো।

সে রাত্রে ভিজা রঙীন শাড়ীটি ছাড়িয়া সুভদ্রা সাধন বৈরাগীর গেরুয়া লুঙ্গি আর আলখাল্লা দিয়া নিজেকে

ঢাকিয়াছিল। পরদিন পথে তার জন্য দু'সেট শাড়ী ও সেমিজ কিনিয়া গেরুয়া রঙে ছাপাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। তখন দু'জনকে দেখিয়া মানুষের মনে হইয়াছিল, স্বর্গের কোন দেবতা বুঝি একটি অপ্সরাকে সেবাদাসী করিয়া মর্ত্যলোকে বেড়াইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

এখানে ওখানে যে ক'টা দিন তারা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত লোক সাগ্রহে তাদের সেবা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, প্রণামীও দিয়াছে। সুভদ্রার বড় ভাল লাগিয়াছিল সে জীবন। কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, কি খাইবে, কে জানে! পথ চলিতে আলস্য বোধ করিলে একটা গরুর গাড়ীকে থামাইয়া উঠিয়া বসিলেই হইল। বাঁধানো বড় সড়কে একদিন দামী একটা মটরগাড়ী দাঁড় করাইয়া দুজনে উঠিয়া বসিয়াছিল, হাওয়ার বেগে চল্লিশ মাইল পথ পার হইয়া গিয়া পৌঁছিয়াছিল সদরে। ক্ষুধা পাইলে ময়রার দোকানে খাবার চাহিয়া খাইলেই হয়, মুদীর দোকানে চাল-ডাল চাহিয়া গাছতলায় রাঁধিলেই হয়, নয়তো গৃহস্থের বাড়ী গিয়া বলিলেই হয়, আমরা আসিয়াছি অন্ন দাও। পয়সা দরকার হইলে, দু'চার দশজনের কাছে চাহিলেই চলে। আশ্রয় তো আছে সর্বত্র, মুচির ভাঙা ঘরে নোংরা মেঝেতে সঙ্গের কম্বল বিছাইয়া চামড়ার গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, ফুল ও চন্দনের গন্ধভরা মন্দিরের বাহিরে অতিথশালায় জীবন্ত মানুষের ভাপসা গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, চোর ডাকাতি কি খুনির আস্তানা সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আশ্রয় নেওয়া যায় বড়লোক গৃহস্থের বাড়ীতে। গেরুয়াধারী নরনারীর তো সম্পদ কিছু থাকে না পুণ্য ছাড়া, যা থাকে তার উপরেও তো লাভ করা চলে না, কামনাও করা চলে না সুন্দরী সন্ন্যাসীকে। তাতে পাপ হয়, পাপ করিলে মানুষ নরকে যায়। এমন নির্ভর নিশ্চিন্ত বাধাবন্ধনহীন সহজ সরল জীবন যাপনের সুযোগ থাকিতে মানুষ যে কেন দম আটকাইয়া পচিয়া মরে ঘরের মধ্যে!

কিন্তু সাধন বৈরাগী বলিয়াছে, 'উঁহু, এক যাগায় স্থিতি হয়ে না বসলে কি চলে?'

সুভদ্রা যদি বলিত খুব চলে, সাধনকেও অবশ্য তা মানিয়া নিতে হইত। কিন্তু মন মরা বিরক্ত আর নিরুৎসাহ সঙ্গী যদি সারাদিন প্যান প্যান করে কাণের কাছে আর মুখ ভার করিয়া থাকে চোখের সামনে, মুক্তিও কি মানুষের ভাল লাগে? এই সহরে তাই তারা নীড় বাঁধিয়াছে।

সুভদ্রা ভাবিয়াছে, আর যাই হোক, যা খুসী তো করা চলিবে এখানে, পরের কর্তালি, পরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বিধি নিষেধ তো তাকে ঘেরিয়া থাকিবে না।

ঘর বাঁধিলে রোজগারের ব্যবস্থা করা দরকার।

সাধন বৈরাগী বলিল, 'ভিক্ষে করা চলবে না কিন্তু।'

কোন রকমে দিন কাটানোর সঙ্গতি সাধন বৈরাগীর ছিল, তার মা রাখিয়া গিয়াছে। জীবনে সে প্রথম একতারা হাতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে সুভদ্রার জন্য। বাহির হইয়াছে অসময়ে, মানুষ যখন ভিখারীকে তাড়াইয়া দেয়। সুভদ্রা তাকে বঞ্চিত করে নাই, নিজেই ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে, মুচকি হাসিয়া বলিয়াছে, 'একটা গান কর তো বৈরিগি ঠাকুর।'

সুভদ্রা তাই তামাসা করিয়া বলিল, 'কেন, ভিক্ষে তো তুমি করতে বৈরিগি ঠাকুর?'

অনেক তামাসাতেই সাধন বৈরাগী পুলকিত হইতে জানে না, এদিক দিয়া মানুষটা সে একটু ভোঁতা।

রোজগারের উপায়টা ঠিক করিল সুভদ্রা। বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে যে হাত তিনেক চওড়া বারান্দাটুকু আছে সেখানে দু'টি দোকান খোলা হইল, পান-বিড়ি আর তেলে-ভাজার দোকান। পানবিড়ির দোকানের ভার রহিল সাধনের, তেলেভাজার দোকানের ভার রহিল সুভদ্রার। বাড়ীওয়ালা এবং বাড়ীর আরও তিন ঘর ভাড়াটের কাছে চাওয়ামাত্র অনুমতি পাওয়া গেল।

দোকান খোলার আগের দিন সুভদ্রা বলিল, 'সবাইকে বলে এসো, আজ সন্ধোবেলা কৃষ্ণলীলা গান গেয়ে শোনাব। দোকান যে খুলছি জানানো তো চাই সবাইকে?'

আসর করা হইয়াছিল উঠানে, সন্ধ্যাবেলা সেখানে মানুষ আর আঁটে না। কৃষ্ণলীলার অনেক গান সুভদ্রা জানিত, একাই সে তিন ঘণ্টা আসর জমাইয়া রাখিল। অনেকদিন এ সব গান সে গায় নাই, একটু ভয় তার ছিল গানগুলি ঠিকভাবে গাহিতে পারিবে কি না। কিন্তু আরম্ভ করা মাত্র আগের মতই গানের মোহ কখন যে তাকে মাতাল করিয়া পৃথিবী ভুলাইয়া দিল। এ বাড়ীর একজন ভাড়াটে গিরিন সাউ চমৎকার বেহালা বাজায়, হারমোনিয়াম আর তবলা বাজানোর লোকও সেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, শুধু বসিয়া থাকিয়াই গানগুলি গাহিয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম গানের অর্দ্ধেকটাও বসিয়া বসিয়া গাওয়া চলিল না। রাধার কাছে যাওয়ার সময় পথে চন্দ্রাবলী তাকে ধরিয়া নিজের কুঞ্জে টানিয়া আনিয়াছে, রাধার জন্য মন আকুল হইয়া আছে কিন্তু বাহিরে সে চতুরালি করিতেছে চন্দ্রাবলীর সঙ্গে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া এ কি প্রকাশ করা যায়? একটি হাঁটু পাতিয়া বসিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পায়ে না ধরিলে কি খণ্ডিতা রাধার কাছে নিবেদন করা যায়, হৃদয়ে যার শুধু রাধার চিহ্ন আঁকা বাহিরের অঙ্গে তুচ্ছ নখচিহ্ন দেখিয়া তার উপর রাগ করা রাধার উচিত নয়?

গানের শেষে সুভদ্রা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। সাধন ঘরে গেল অনেক পরে। খোলা দরজার বাহিরে এখনও মানুষকে চলাফিরা করিতে দেখা যাইতেছে, কলরব শোনা যাইতেছে। সাধন ঘরে আসিবামাত্র সুভদ্রা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া তার সামনে এক হাঁটু মাটিতে নামাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া দু'হাতে তার পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'সত্যি বলছি আমি'

তুমি ছাড়া আমি কাউকে জানি না। কোন দিন কোন পর-পুরুষের দিকে আমি তাকাই নি—'

সাধন তার গালে টোকা দিয়া বলিল, 'সত্যি?'

সুভদ্রা কাতর হইয়া বলিল, 'কেন সন্দেহ করছ? রসিককে যে মাঝে মাঝে আসতে দিতাম তাও তো তোমার জন্যেই? মাইরি বলছি, যখন আর সইতে পারতাম না, মনে হত আর একটু'খন তোমায় না পেলে বুক ফেটে যাবে, শুধু তখন একটু সময়ের জন্যে—'

বিছানায় গিয়া এলাইয়া পড়িয়া বলিল, 'উঃ, মাগো! আমি আর বাঁচব না।'

বেহালা-বাদক গিরীন সাউ-এর বৌ কালিদাসী আসিয়া বলিল, 'খাবে না বষ্টুম দিদি? কি গানটাই গাইলে বষ্টুম দিদি!'

সুভদ্রা উঠিয়া খাইতে গেল এবং পেট ভরিয়াই খাইল। সে রাত্রে সাধনকে সে আর কাছে ঘেঁষিতে দিল না। কালিদাসী যে সম্মান করিয়া তাকে আজ প্রথম বষ্টুম দিদি বলিয়া ডাকিয়াছে তাতে তার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল।

পরদিন সকালে এত খদ্দের আসিয়া জুটিল যে সাধনের দোকানের অল্প বিড়ি সিগারেট ফুরাইয়া গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে, বেগুনি ফুলুরি ভাজিয়া সুভদ্রা অর্দ্ধেক লোকের দাবী মিটাইয়া উঠিতে পারিল না। সকলেই সুভদ্রার গানের প্রশংসা করিতে চায়, বলিতে চায় যে বেগুনি ফুলুরির এমন স্বাদ তো জীবনে তারা পায় নাই। সঙ্কীর্ণ বারান্দায় উবু হইয়া বসিয়া আর বারান্দার সামনে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া সকলে যেন একটি বৈঠক বসাইয়া দিল। লোচন কামার প্রতিমা গড়িতে ওস্তাদ, একটি মাত্র বেগুনি খাইয়া যেন নেশা হইয়াছে এমনি ভাবে সে আধঘণ্টা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল সুভদ্রার বুকের দিকে, আর ভাবিতে লাগিল, একটিবার মুহূর্ত্তের জন্য কাপড়ের নীচে সুভদ্রার স্তন দু'টি দেখিতে পাইলেই সে ঠিক বুঝিতে পারিত তার প্রতিমার বুকের মাটির ঢিপিগুলির চেয়ে ও দু'টি নিটোল বর্ত্তুলাকার কি না। সতীশ গোয়ালা ভাবিতে লাগিল, ইনি নিশ্চয় সাক্ষাৎ ভগবতী। বংশী হালদার সারাদিন মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আদায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সুভদ্রা গেরুয়া বেশ যেন রোদে ঝলসানো সহরের সুরকির পথের মত চোখে তার ধাঁধা লাগাইয়া দিতে লাগিল। নটবর একজন বড়লোকের খাতিরের খানসামা, সে ভাবিতে লাগিল, সুভদ্রার সঙ্গে একবার যদি ঘনিষ্ঠতা করাইয়া দেওয়া যায়, কি খুসীই বাবু হইবেন। এই চারজন ছাড়া সকলেই কম বেশী কথা বলিতেছিল, দু'একজন কথা বলিবার চেষ্টায় গিলিতেছিল ঢোঁক।

'এবার আমি রাঁধতে যাই?' বলিয়া এক সময় সুভদ্রা ভিতরে চলিয়া গেল। আবার দোকান খুলিল একেবারে সেই বিকালে। একবেলাতেই দোকানদারিতে তার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। লোকগুলি বড় ভোঁতা, বড় নীরস। বেগুনি ফুলুরি কিনিতে আসিয়া তাকে যেন সকলেই বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তার সাহচর্য্যে ভুলিয়া যাইতে চায় নিজেদের।

বিকালেও খদ্দের আসিল অনেক এবং দিন দিন খদ্দের-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বেগুনি ফুলুরি ভাজিবার জন্য একজন লোক রাখিয়া দেওয়া হইল। সুভদ্রা মাঝে মাঝে আসিয়া পাঁচ দশ মিনিট বারান্দায় বসিতে লাগিল আর নিজের হাতে বিক্রী করিতে লাগিল ভাজা জিনিষগুলি। বৈঠক তাই ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু সেজন্য বিক্রী কমিল না। বেগুনি ফুলুরিও কম মুখরোচক জিনিষ নয়।

বৈঠক না বসুক, লোচন, সতীশ, বংশী আর নটবর নিয়মিত ভাবে আসে। কেউ সকালে, কেউ বিকালে। সুভদ্রা না থাকিলে গল্প করে সাধনের সঙ্গে, সুভদ্রা আসিলে দু'এক পয়সার বেগুনি কেনে আর দু'একটি কথা কয়।

নটবর একদিন তাকে বাবুদের বাড়ী গান গাহিবার বায়না দিয়া গেল। শুনিয়া লোচন বলিল, 'না, না, অমন কম্মোও কোরো না। ওর বাবু বড় খারাপ লোক।'

সতীশ এবং বংশীও সায় দিয়া বলিল, 'যেও না, বিপদ হবে।'

সুভদ্রা বলিল, 'বিপদ হবে? কিসের বিপদ?' তারপর হাসিয়া বলিল, 'বেশ তো, তোমরা তবে দশটা টাকা দাও আমায়, যাব না। তোমাদেরি না হয় গান শুনিয়ে দেব।'

পরদিন সত্যই তারা দশটা করিয়া টাকা নিয়া হাজির। দশটা করিয়া টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে এমনিই সহজ নয়, প্রতিদানে কিছু পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ থাকিলে সেটা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বুঝিয়া সুভদ্রা খুসী হইল বটে, মন কিন্তু তার ভিজিল না। এসব ফাঁকি সে জানে। সাত-দিন একত্র বসবাস করিবার পর সে একটি টাকা বাজে খরচ করিলে এরা প্রত্যেকে তার সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করিবে। তা ছাড়া, এবেলা টাকাটা নিলে ওবেলা এরা একা পাওয়া মাত্র তার হাত ধরিয়া টানিবে। তার চেয়ে নটবরের বাবুর বাড়ী গান গাহিতে যাওয়া অনেক ভাল।

গান কিন্তু সেখানে জমিল না,—সুভদ্রার গান। আসরে ঝালরবসানো তাকিয়ায় হেলান দিয়া উপস্থিত ছিল শুধু বাবুর কয়েকটি বন্ধু এবং তবলচি ও সেরাজীর কাছে সহজ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসিয়াছিল আরেক জন মানুষ। তার চোখে কাজল আর ছোট নুরটি লালচে রঙে রাঙানো। ধৈর্য্যের প্রতীকের মত সে স্থির হইয়া বসিয়াছিল, আর বাঁ হাতের আঙুলের সন্তর্পণ স্পর্শ ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেছিল নুরে। সুভদ্রা প্রথম গানটি আরম্ভ করার পরেই বাবু আর তার বন্ধুদের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল কিন্তু এ লোকটি চোখের একটি বাড়তি পলকও ফেলিল না। সুভদ্রা তিনটি গান গাহিবার পর বাবু বলিল, 'এবার তুমি বিশ্রাম কর। ওস্তাদজি, আপনি এবার মেহেরবানি করুন তবে?'

ওস্তাদ এবার একটু হাসিয়া মাথাটি সামনের দিকে সামান্য নীচু করিল।—'সোজা সুরের একটা বাংলা গান গাই?'

'বলেন কি ওস্তাদজি, আপনি বাংলা গান জানেন?' সিগারেটের ধোঁয়া না ছাড়িয়াই সবিস্ময়ে কথাটা বলিয়া বাবুর এক বন্ধু কাসিতে লাগিল।

সুভদ্রা মৃদুস্বরে বলিল, 'জল খান, দু'ঢোক জল খেলেই সেরে যাবে।'

বন্ধুর কাসি থামিলে ওস্তাদ বলিল, 'জানি কিনা সে তো মালুম হবে শুনলে?'

ঠুংরীতে হাফেজের বাংলা ভাবার্থ অনুবাদ। শুনিতে শুনিতে সুভদ্রার মনে হয়, ওস্তাদের অমন সুন্দর ফুলকাটা পাঞ্জাবীর তিন চার যায়গা ছেঁড়া কেন? আরও শুনিতে শুনিতে মনে হয় যে পাৎলা পাঞ্জাবী, ছুঁচ সুতায় সে কি ছেঁড়াগুলি রিপু করিয়া দিতে পারিবে? গান শেষ হইলে তার মনে পড়ে, রিপুর কাজ সে জানে না, যাত্রার দলে যে ছেলেটি তার রাধা সাজিত সেই যেন কোথা হইতে খুব ভাল রিপুর কাজ শিখিয়াছিল।

ওস্তাদ সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগল?'

সুভদ্রা নির্ব্বিবাদে বলিল, 'আরেকটা শুনি?'

ওস্তাদের কয়েকটি গান শুনিয়া সকাল সকাল সুভদ্রা বাড়ী ফিরিয়া গেল। বেশ বুঝা গেল, তার গানও বাবুর পছন্দ হয় নাই, তাকেও পছন্দ হয় নাই।

পরদিন ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়া ওস্তাদ সুভদ্রার বাড়ী আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'সুভদ্রা গান শিখিবে কি, গান? ভাল ভাল গান?' সেই ফুলকাটা জামা পায়জামা পরিয়াই ওস্তাজ আজ আসিয়াছে, মাথায় শুধু আজ একটি জরি বসানো টুপি, আর চোখের কাজল আরও একটু স্পষ্ট সুর্ম্মা নয়, কাজল। কালিদাসীর ছেলের কাজলপরা চোখের মতই আশ্চর্য্যরকম কচি কচি দেখাইতেছে ওস্তাদের চোখে।

দেখিয়াই সাধন একটা কুৎসিত প্রশ্ন করিল, 'নটবরের বাবু বুঝি গান শিখাইতে পাঠাইয়াছে ওস্তাদকে?'

ওস্তাদ বলিল, 'তোবা তোবা, নটবরের বাবু আমার কে?'

জগতে এমন বড়লোক কে আছে যে ওস্তাদকে মনিবের মত হুকুম দিবে? বাবু তো শুধু তার সাকরেদ, ওস্তাদের বাড়ীতে যে দু'চারজন গান শিখিতে আসে তাদের সঙ্গে বাবুর তফাৎ এই যে, বাবু গাড়ী পাঠায় আর ওস্তাদ তার বাড়ী গিয়া গান শিখায়।

তার পর প্রতি সন্ধ্যায় সুভদ্রা ওস্তাদের কাছে গান শিখিতে লাগিল। কালিদাসী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'মোছলমানের কাছে গান শিখছ বষ্টুম দিদি?'

সুভদ্রা বলিল, 'মোছলমান-ই ভাল।'

কিন্তু গান শিখতে ভাল লাগে না সুভদ্রার, কিছুই ভাল লাগে না। দোকানে নিয়মিত কেনা-বেচা চলিতেছে, ভিতরে নিয়মিত ঘর-কন্না চলিয়াছে, নিজেই সে নিজের চারিদিকে সৃষ্টি করিতেছে নিয়মের ফাঁকি আর বন্ধন। যা-খুসী সে করিতে পারে, কিন্তু যা-খুসী করিবে কি? কি আছে যা-খুসী করার? পথে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিবে? সহরের পাশে যে নদী আছে তার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে? না, বিষ খাইবে?

সাধনকে সে মিনতি করিয়া বলে, 'এখান থেকে পালাই চলো, এ্যা? তেমনিভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াব দু'জনে, কি মজাটাই হবে।'

সাধন বলে, 'দূর পাগলি! ঘুরে বেড়ানোতে আবার মজা কি?'

তা ঠিক, ঘুরিয়া বেড়ানোতে হয় তো মজা লাগিবে না। সুভদ্রা এখন টের পাইয়াছে, সাধন বৈরাগীর সঙ্গে ক'দিন পথে পথে কাটানোর আসল মজাটা কি ছিল। কি সুখ ছিল সে ঘুরিয়া বেড়ানোর? কিছুই না। শুধু একটা উত্তেজনা ছিল, প্রতি মুহূর্ত্তের উত্তেজনা, পর মুহূর্ত্তে বুঝি কিছু ঘটিবে, জীবনে কিছু আবির্ভাব ঘটিবে কোন কিছুর। ক্ষণে ক্ষণে তখন সব বদলাইয়া যাইত, মাটির পথের পরে আসিত সুরকির পথ, হাট বাজারের পরে আসিত মাঠ, তাড়িখানার পরে আসিত দেব মন্দির, একজনের কুৎসিত মন্তব্যের পর আসিত আরেক-জনের সভক্তি প্রণাম, মুচির ঘরের আশ্রয়ের পরে আসিত বড়-লোকের বাগানবাড়ীর আশ্রয়। এই পরিবর্ত্তন যেন প্রমাণের মতই আশা জাগাইয়া রাখিত, এ সমস্তের অতিরিক্ত আরও একটা নতুনত্ব নিশ্চয় আসিবে। সুভদ্রা কৃতার্থ হইয়া যাইবে। আর তার মন ছটফট করিবে না, উল্লাসে গদগদ হইয়া সেই নতুনত্বকে বরণ করিয়া বলিবে, এতদিন আসোনি যে বড়, আচ্ছা খামখেয়ালী নিষ্ঠুর মানুষ তো তুমি?

মানুষ? সে নতুনত্ব কি তবে মানুষ সুভদ্রার? ফাঁপরে পড়িয়া সুভদ্রা এদিক ওদিক তাকায়। কত মানুষ চলিতেছে পথ দিয়া, সকলেই একরকম, দেহকাণ্ডের সঙ্গে দু'টি হাত আর পা আঁটা, এবং উপরে একটা মাথা বসানো। কোন নতুনত্ব তো নাই এদের মধ্যে। এদের মধ্যে যাকেই সে বরণ করুক, মুখে হাত চাপা দিয়া সে শুধু তাকে জড়াইয়া ধরিবে। সে যা চায়, কি চায় তা অবশ্য সে জানে না, কিন্তু যা সে চায় মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে তো তার চলিবে না।

সুভদ্রার মনে তাই সন্দেহ জাগিয়াছে, সাধনের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে আর ভাল লাগিবে কিনা। জ্ঞান বাড়িয়াছে, প্রত্যাশার উত্তেজনাটুকু পর্য্যন্ত হয়তো এবার জুটিবে না।

কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গে যদি নিরুদ্দেশ যাত্রা করে? কাছাকাছি গ্রাম আর সহরে ঘুরিয়া বেড়ানোর বদলে যদি আজ যায় দিল্লীতে আর কাল যায় বোম্বায়ে এবং তার পরদিন যায় দিল্লী বোম্বায়ের মত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অরেও যে সব জায়গা আছে, যার নামও সে কোনদিন শোনে নাই?

কদিন পরে তাই গেল সুভদ্রা, তবে দিল্লী বা বোম্বায়

নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পারের অন্য কোন যায়গাতেও নয়। সুভদ্রার অত পয়সা কই? ওস্তাদ গরীব মানুষ। তাই ক'দিন এখানে ওখানে ভাসিয়া বেড়াইয়া দু'জনে কলকাতা সহরে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। তবে ওস্তাদ ভরসা দিয়া বলিল, তাতে কি আসে যায়? যেখানে খুসী যাওয়ার সাধ মনে থাকে, যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে যেখানে খুসী যতদিন খুসী দিন কাটিয়া যাক, একদিন তো তারা যাইবেই যাইবে। তার বেশী আর কি চাই মানুষের? যাওয়ার চেয়ে যাওয়ার আয়োজন তো তুচ্ছ নয়, মনটাই তো যায় মানুষের মাটির পৃথিবীর বুকে এখান হইতে ওখানে! নাই যদি যাওয়া হয় এখানকার ঘরবাড়ী যানবাহন লোকজন দেখার বদলে ওখানকার ঘরবাড়ী যানবাহন দেখিতে, এখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটার বদলে ওখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটিতে, একটা যাত্রা তো একদিন তাদের সুরু করিতেই হইবে, অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশে সব যাত্রার চরম একটা যাত্রা?

তা বটে। সজোরে ওস্তাদকে জড়াইয়া ধরিয়া সুভদ্রা বলে, 'তবে তাই চলো ওস্তাদ, সেখানেই আমরা যাই। তুমি আমার গলাটা টিপে ধরো, আমি তোমার গলাটা টিপে ধরি।'

ওস্তাদ কি বলিতে যায়, বাঁ হাতটি আলগা করিয়া সুভদ্রা তার মুখে চাপা দেয়। দেহের ভারে মুসাফিরখানার ছেঁড়া নোংরা মাদুরের বিছানায় তাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তার বুকের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে।

নরম কোমল হাতটি মুখ হইতে সরাইয়া স্ফূর্তির সঙ্গে ওস্তাদ বলে, 'বহুৎ আচ্ছা, মেরাজান! কেয়াবাৎ!'

সুভদ্রা আবার তার মুখে হাত চাপা দেয়।

শেষরাত্রে ওস্তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাদের দু'জনের বড় পুঁটুলিটি খুলিয়া সুভদ্রা তার শাড়ী-সেমিজের একটি ছোট পুঁটুলী করিতেছে।

মুখ ফিরাইয়া ওস্তাদকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সুভদ্রা বলিল, 'পালাচ্ছি ওস্তাদ। চুপি চুপি পালাচ্ছিলাম, তুমি জাগলে কেন?'

ওস্তাদ বাজে কথা কিছু বলিল না, ব্যস্ত হইল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

'সেখানে ফিরে যাবে?'

'দূর! ফিরে গেলে সাধন বৈরাগী রক্ষা রাখবে আমার? যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।'

ওস্তাদ উৎসুক হইয়া বলিল, 'বেশ তো, চলো না আমিও সাথে যাই? পিছে পিছে যাব, খুশ হলে কাছে ডাকবে, নয়তো ডাকবে না?'

সুভদ্রা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, এবার একা পালাব ওস্তাদ। পুরুষকে সঙ্গে নেব না। পুরুষ জাতটাই বড় খারাপ, কেবল জড়িয়ে ধরে।'

ওস্তাদ মাথাটা সামনে একটু হেলাইয়া সায় দিল, মুখে কিছু বলিল না। বাঁ হাতে সন্তর্পণে নিজের ছোট লালচে নূরটিকে আদর করিতে লাগিল। একাই যাইতেছে বটে, তবে সে থাকিবে না, ওস্তাদ তা জানে। পুরুষ মানুষ একা থাকিতে পারে না, ও তো মেয়েমানুষ। একজন কেউ আসিবেই, সুভদ্রা নিজেই যাকে জড়াইয়া ধরিবে, আর ছাড়িবে না। আর সেই একজন যদি কখনো আনমনে জড়াইয়া ধরিতে ভুলিয়া যায় চোখে সুভদ্রার জল আসিবে, রাগে সে ফোঁসফোঁস করিতে থাকিবে।

সুভদ্রার পুঁটলি বাঁধা হইলে ওস্তাদ একটি প্রস্তাব করিল। চুপি চুপি যখন পালানো গেল না, বাকী রাতটুকু বসিয়া গল্প করিলে হয় না, ভোরবেলা সুভদ্রা চলিয়া যাইবে? ভোর হইতে বেশী বাকী নাই।

'তুমি জ্বালালে ওস্তাদ।'

সুভদ্রা কাছে আসিয়া বসিল। গল্প তেমন জমিল না। একটিবার তাকে জড়াইয়া ধরার জন্য মনটা ওস্তাদের আঁকুপাঁকু করিতেছিল। টের পাইয়া সুভদ্রাও প্রতীক্ষা করিতেছিল, কখন ওস্তাদ একটু ভয়ে ভয়ে তার হাত ধরিয়া মৃদু সলজ্জ হাসির সঙ্গে চোখে চোখে চাহিয়া নীরবে জড়াইয়া ধরিবার অনুমতি চাহিবে। বাহিরে ভোর হইয়া আসিল, রাস্তার আলো নিবিয়া গেল, ওস্তাদ কিন্তু কিছুই করিল না।

তখন সুভদ্রা নিজেই বলিল, 'একবারটি জড়াবে না ওস্তাদ? শেষ বারের মত?

ওস্তাদ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বেশ বুঝা যায়, ধৈর্য্য আর সংযমের তলে চাপা পড়িয়া ভিতরের উত্তেজনা ওস্তাদকে থরথর করিয়া কাঁপাইয়া দিতেছে, দম-আটকানো উদ্বেগে নিঃশ্বাস পড়িতেছে ছোট ছোট। ক'দিন কাজল পরা হয় নাই, তবু কাজলের একটু আভাস ওস্তাদের চোখে পাওয়া যায়। আশা, হতাশা, ঈর্ষা, উদারতা, রাগ, দুঃখ, অভিমান, ক্ষমা ও ত্যাগের ভাব মিশিয়া তার মুখে প্রলেপের মত মাখা হইয়া গিয়াছে, আর চোখ দুটি যেন পলকে পলকে বদল করিয়া ওই ভাবগুলি এক একটি বাছিয়া বাছিয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

সুভদ্রা চিন্তিত হইয়া বলিল, 'তুমি সত্যি জ্বালালে ওস্তাদ। যাব না নাকি?' একটু ভাবিয়া সে আবার বলিল, 'না পালাই, তোমার সঙ্গেও আমার বনবে না।'

ওস্তাদের চোখের ঔৎসুক্য নিবিয়া গেল, আটকানো নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বাহিরের আলো আরেকটু স্পষ্ট হইয়াছে। সুভদ্রা চলিয়া গেল, ওস্তাদ আর একটি কথাও বলিল না। শেষ চেষ্টা কাজে লাগিল না, আর কি বলিবার আছে? এখন আপনা হইতে ফাঁদটি খসিয়া গিয়াছে ভাবিয়া খুসী হওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। কিন্তু সে চেষ্টা করিতে গিয়া ওস্তাদ দেখিল, ফাঁদ খসিয়া গেলেও ফাঁদে পড়া বেকুব প্রাণীর মতই ছটফট না করা অসম্ভব।

ভাঙা ঘর

আকাশ-ভাঙা বর্ষার মধ্যে আমাকে পথহারা পথিক হিসাবে কল্পনা করতে হবে। পথ দিয়ে হাঁটছি না মাঠ দিয়ে হাঁটছি মাঝে মাঝে তাও ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। কারণ, জলের নীচে পথ আর মাঠ একাকার হয়ে গিয়েছে। পথটাও অবশ্য ছিল নামেই পথ, মাঠের বুকে পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা একটা রেখা। তবু, সে রেখা ধরে চলবার একটা সুবিধা থাকে যে শেষ পর্য্যন্ত লোকালয়ে পৌছানো যায়, অন্ধের মত আধ হাত জলে ছপ্-ছপ্ পা ফেলে যেদিকে খুসি চলতে থাকলে ডোবা পুকুরে পড়বার সম্ভাবনা থাকে বেশী এবং শ্মশানে বা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হবার সম্ভাবনা থাকে তার চেয়ে কিছু কম।

তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কোন লাভ নাই, সমস্ত রাত বৃষ্টি না ধরলে সমস্ত রাত্রিটাই তার ফলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হয়। তাই, আন্দাজে এগিয়ে চলছিলাম। সামনে অথবা পিছনে, তা বলতে পারব না।

এমনিভাবে চল্‌তে চল্‌তে ভাঙা ঘরখানার সন্ধান পেলাম। আকাশ অবশ্য মাঝে মাঝে আলো সরবরাহ করছিল, সেই আলোতে চোখে পড়ল খড় অথবা শণের প্রকাণ্ড একখানা কাঁচা ঘর ভেঙে পড়ে আছে। আশে পাশে আর ঘর না দেখে একটু বিস্ময় আর বিরক্ত বোধ করলাম। এক ভিটার এত বড় একখানা ঘর তুলে সাধারণতঃ কেউ বাড়ী করে না, চার ভিটায় না হোক্ এবং প্রত্যেক ভিটায় এত বড় না হোক্, অন্ততঃ তিন ভিটায় তিনখানা ঘর তোলা হয়। বিদ্যুৎ চমকাবার প্রতীক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এটা কি তবে গৃহস্থের বাড়ী ছিল, না কোন বিশেষ প্রয়োজনে কোন একদিন মাঠের মাঝখানে কেউ একখানা ঘর তুলেছিল, তারপর প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ায় ঘরখানা মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াতেও কেউ খেয়াল করেনি? কিন্তু তাহ'লে তো চারিদিকে আগাছার জঙ্গলের মথা তুলবার কথা।

ভাঙা ঘরের পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে যাবার পর এ সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে গেল। বাড়ীটা যে গৃহস্থের, চার ভিটাতে সে চারখানা ঘরই তুলেছিল বটে। ভাঙা ঘরের দু'পাশের ভিটায় আরও দু'খানা ঘর ভেঙে পড়ে আছে এবং বিপরীত দিকের ভিটায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট একখানা ঘর। প্রথম ভাঙা ঘরখানার কাত হ'য়ে পড়া প্রকাণ্ড চালাটার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকায় এতক্ষণ চোখে পড়েনি। এবার সহজেই বুঝতে পারলাম এতক্ষণে বাড়ীর ভিতরের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছি, যে অঙ্গনের অর্ধেকের বেশী দখল করেছে পাশের ভিটায় ভাঙা ঘরখানা। একটু দ্বিধা করলাম। তিনখানা ঘর—বড় আর ভাল তিনখানা ঘর—ভাঙা; দাঁড়িয়ে আছে শুধু টিনের চালের ছোট ঘরখানা, সামনে যার একটু রোয়াক পর্যন্ত নেই। ওখানে আশ্রয়ের খোঁজ করার চেয়ে গাছতলায় নিরাশ্রয় হ'য়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?

যা কিছু দেখছিলাম, সমস্তই কয়েক মিনিট পরে পরে চোখের পলকে—প্রায় না দেখারই সামিল। তাই বুদ্ধির ওপর বেশী নির্ভর না করে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ ঝাঁপের দরজা ঠেলে গলা ফাটিয়ে ডাকলাম, 'কে আছেন? ও মশায়! শুনছেন?'

ভয়ার্ত পুরুষ কণ্ঠে সাড়া এল: 'কে?'

প্রথমে বললাম, 'আমি।' তারপর সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললাম যে পথহারানো একজন পথিক—ভদ্রলোক। ঝাঁপে কাণ লাগিয়ে ভিতরের শব্দ শুনবার চেষ্টা করছিলাম, চাপা মেয়েলি গলার প্রশ্ন শুনতে পেলাম: 'খুলবে? যদি চোর ডাকাত হয়?' চাপা পুরুষ গলার জবাব শুনলাম: 'চোর ডাকাত হ'লে কি ঝাঁপটা খুলতে পারবে না?'

একটু পরে ঝাঁপ খুলে গেল, সন্তর্পণে ভিতরের অন্ধকারে এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভিজা জামা-কাপড়ের জলে সমস্ত মেঝে ভাসিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না। ঘরের ভিতরের ভাপ্‌সা গরম আর গন্ধে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। আমার মনে পড়ে গেল, অনেকদিন আগে একবার একটা মালগুদামে কয়েক ঘণ্টা সময় নিশ্বাস নিতে আমার ঠিক এই রকম কষ্ট হইয়াছিল আর ঠিক এই রকম অকথ্য অস্বস্তির সঙ্গে মনে হয়েছিল আমারই পেটের ভিতরের সিক্ত উষ্ণতা বাইরে এসে চারিদিক থেকে আমার সর্বাঙ্গে মাখা হ'য়ে যাচ্ছে।

কালিপড়া একটা লণ্ঠন জলবার পর টের পেলাম, ঘরে অনেকগুলি নানাবয়সী মানুষ বাস করলেও এটাকে মালগুদামও বলা চলে। তবে পৃথিবীর কোন মালগুদামেই এত রকমের বিভিন্ন আর বিচিত্র মাল থাকে কি না সন্দেহ। আর ঘরে তিলধারণের স্থান নেই। ঘরের অর্দ্ধেক জুড়ে আছে সেকেলে একটা খাট আর একেলে চৌকা, খাটের ছেঁড়া ময়লা বিছানায় শুয়ে আছে একগাদা ছেলেমেয়ে। চৌকাতে গোটা দুই তোরঙ্গ, পিতল ও মাটির হাঁড়ি-কলসী, বস্তা বাঁধা লেপ, কাপড়-জামার পুঁটুলি এবং সাধারণ গৃহস্থের ঘরকন্নার অসংখ্য টুকিটাকি জিনিষ। কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের অর্দ্ধেকটাতে ছেলেদের স্কুলের ছেঁড়া বই-খাতা, বাকী অর্দ্ধেকটাকে শিশি-বোতল, টিনের কৌটা, কাগজের ঠোঙা—ইত্যাদি। একদিকের বেড়ার গায়ে কাঠের থামে ঠেসান্ দেওয়া একটি পুরানো ভাঙা সাইকেল

গোটা চারেক রঙচটা লোহার আর গোটা দুই বেতছেঁড়া কাঠের চেয়ার, একটা পায়া ভাঙা টুল আর সাত আটটি ছোট বড় কাঠের পিঁড়ি প্রভৃতি বসবার সরঞ্জামেরও অভাব নেই। একখণ্ড তক্তার উপরে বোধ হয় তিনটি চালের বস্তা, কাছেই তিনটি তরকারীর ঝুড়ি। চৌকীর তলে অসংখ্য আবছা জিনিষপত্রের একপাশে মস্ত একটা বঁটির ফলা চকমক করছে। খাটের তলাটাও জিনিষে ঠাসা, কিন্তু সেখানে বোধ হয় নিজেকে ঘোষণা করতে পারে এরকম ঝকমকে কিছু নেই। এককোণে পুরানো ভাঙ্গা জিনিষপত্রের স্তূপ—আবর্জ্জনার সামিল। অন্য কোণে বিরাট একটা কাঠের সিন্দুক, ছোটখাট একটা চৌকীর সমান। সিন্দুকের উপরে বিছানা পাতা, বিছানায় বসে আছে বছর পঞ্চাশেক বয়সের শীর্ণ-দেহ একটি লোক। দুয়ারের কাছে একটু স্থান ছাড়া মেঝে আর চোখে পড়ে না, যে জায়গাটুকুতে জিনিষ নেই সেখানে বিছানা পাতা হয়েছে। কেবল মেঝেতে ন, টিনের চাল থেকে দড়ি বেঁধে যত কিছু ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব তাও রাখা হয়েছে। ঘরের সমস্ত জিনিষের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, তা হলে মস্ত এক সম্পন্ন গৃহস্থের শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, আর রান্নাঘরে যত জিনিষ থাকে তার প্রত্যেকটির নাম করতে হয়।

মাথার উপরেও যে জিনিষ ঝুলছে এটা আমাকে আবিষ্কার করতে হল বাধ্য হয়ে। মেঝের বিছানাতেও চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, তাদের মধ্যে একটি মেয়ের বয়স পনের ষোলর কম হবে না। ছোট ভাইবোনদের মত পরণের শাড়ীখানাকে সেও একেবারে ত্যাগ করেছে। নজরে পড়ামাত্র চোখ তুলে মাথার উপরে ঝুলানো একটা বেতের ঝাঁপির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বেতের ঝাঁপি তো ঝুলানো থাকেই না, এই বয়সের মেয়ে দম আটকানো গরমেও ঘুমের মধ্যে অঙ্গের আবরণ ঘুচিয়ে দেয় না।

সাত আট মাসের একটি শিশুকে কাঁখে নিয়া যে মহিলাটি কালিপড়া লণ্ঠন জ্বালিয়েছিল দরজার ঝাঁপও বোধ হয় খুলেছিল সে-ই, কারণ সিন্দুকের উপরের বিছানা ছেড়ে লোকটি যে নীচে নামেনি বুঝতে কষ্ট হয় না। এতক্ষণ উবু হয়ে বসে সে বোধ হয় আমাকেই দেখছিল, এবার মহিলাটিকে উদ্দেশ করে বলল, 'দেখেছ? হারামজাদি মেয়ের কাণ্ডখানা দেখেছ?'

মহিলাটি মেঝের পাতা বিছানার কাছে এগিয়ে গেল নীরবেই কিন্তু মেয়েটির গালে একটা চড় বসিয়ে দিল সশব্দে। চড়ের শব্দ না শুনলে আমি হয় তো ঝাঁপি থেকে চোখ নামাতাম না। আর্তনাদ করে জেগে উঠে মেয়েটি কাঁদবার উপক্রম করছিল, মহিলাটির উদ্যত চড় দেখে কান্না বন্ধ করে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায় ঘুম তার তখনও ভাঙেনি, আরও বোঝা যায় যে মস্তিষ্কের যে অঞ্চলটিতে জীবনের সাড়া ওঠে সেখানটা তার খুঁত-ধরা। মহিলাটি পায়ের তলা থেকে শাড়ীখানা কুড়িয়ে এনে তাকে ঢেকে দিতে গেল কিন্তু ততক্ষণে সচেতন হয়ে ওঠায় নিজেই সে কাপড়টিকে ছিনিয়ে নিয়ে চোখের পলকে নিজেকে ঢেকে ফেলল।

'মরণ হয় না তোর?'—ঘোমটার ভেতর থেকে মহিলাটির তীব্র ধমক শুনতে পেলাম।

আমি এদিকে ভিজা জামা কাপড়েই দাঁড়িয়ে আছি আর জল ঝরে ঝরে পায়ের তলায় জমা হচ্ছে। এ কোন্ দেশী আতিথ্য? আমাকেই কি বলতে হবে, ভিজা কাপড় ছাড়বার জন্য আমাকে একখানা কাপড় দেওয়া দরকার?

'এই বিষ্টির মধ্যে এতরাত্রে মশায় এদিকে—?' সিন্দুকের ওপর থেকে প্রশ্ন এল।

আমি বললাম, 'আপনাদের এখানে তো জায়গা হওয়া মুস্কিল, আশেপাশে কারও বাড়ী আছে বলতে পারেন?'

'আছে বৈকি, আমবাগানটার ওপাশে ঢের বাড়ী আছে।'

আটহাতি কিন্তু পরিষ্কার একখানা কাপড আমার দিকে এগিয়ে ধরে ঘোমটার ভেতর থেকে মহিলাটি বলল, 'কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন। আপনি বাড়ী খুঁজে পাবেন না।'

সিন্দুকের ওপর থেকে সায় এল, 'তা বটে, বাড়ী এখন খুঁজে পাওয়া শক্ত বটে। কি বাদলাটাই নেমেছে, বাপ্!'

জামা কাপড় ছেড়ে দিতে মহিলাটি সেগুলি চিপে মেলে দিল,—মেলবার স্থান যে ঘরে পাওয়া গেল তাই আশ্চর্য। আমি সিন্দুকে লোকটির পাশে উঠে বসলাম। মহিলাটি খাটে উঠে আমার দিকে পিছন ফিরে বসল, বোধ হয় কোলের শিশুটিকে মাই দিতে।

'খান্, বিড়ি খান্—'

বালিশের তলা হাতড়িয়ে বিড়ি আর দেশলাই বার করে লোকটি আমার হাতে দিল। বিড়ি টানতে গেলেই আমার কাসি আসে, সিগারেট কেসে সিগারেটগুলিও সম্ভবতঃ ভিজে যায় নি, তবু আমি বিড়িই ধরালাম। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ির মধ্যে লোকটির মুখের ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা কঠিন কিন্তু এমন যে গাম্ভীর্য নেমে আসতে দেখলাম গোঁফদাড়ির জঙ্গলেও বোধ হয় তা আড়াল হয় না।

'বাড়ীর কথা জিগ্যেস্ করলেন তাই বললাম বাগানের ওপাশে বাড়ী আছে। আপনি যেতে চাইলেও কি আপনাকে যেতে দিতাম মশায়! আজ পর্য্যন্ত এ বাড়ী থেকে একজন অতিথি ফিরে যায় নি।'

ব্যাখ্যা, কৈফিয়ৎ এবং আত্মসমর্থন। বিড়িতে টান দিয়ে আমি কয়েকবার কাসলাম।

'ঘর তিনটে না হয় পড়েই গিয়েছে, তাই বলে জল-ঝড়ের মধ্যে বাড়ীতে লোক এলে তাড়িয়ে দেব! একটা ঘর তো আছে!'

আমিও একটু কৈফিয়ৎ দিয়ে বললাম, 'আহা, তাড়িয়ে

দেবেন কেন— ঘরে তো আপনি ঢুকতেই দিয়েছিলেন। তবে এইটুকু ঘরে আপনাদেরি শোবার জায়গা নেই—'

লোকটি সংক্ষেপে বলল, 'আপনি ওই খাটে শোবেন। ওদের সরিয়ে এখুনি বিছানা ঠিক করে দিচ্ছে—পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

ক'মাইল পথ হেঁটেছি ঠিক নেই, পা আমার টন টন করছিল, গা আমার ব্যথা করছিল, চোখ আমার জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। তবু এ প্রস্তাবটিতে সায় দিতে পারলাম না। খাটে যতগুলি ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে, ঘরকন্নার জিনিষের মত তাদের গাদা করে রাখবার উপযুক্ত একটু স্থানও ঘরের কোথাও চোখে পড়ল না। বললাম, 'না আমি শোব না। আপনারা শোন্, আমি এই সিন্দুকের ওপরে ওই খানাটাতে ঠেস্ দিয়ে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব।'

লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'তা কি হয় মশায়। আপনি থাকবেন আর আমরা দিব্যি শুয়ে নাক ডাকাব! নরকেও তো আমাদের ঠাঁই হবে না।'

'কিন্তু খোকা খুকীরা যাবে কোথায়?'

'আহা, ওদের একটা ব্যবস্থা হবে বৈকি। তোমরা যে বসেই রইলে চুপচাপ? ভদ্রলোককে কিছু খেতে দাও, বিছানাটা ঠিক করে দাও?'

বড় মেয়েটি মুখের কাছে হাঁটু তুলে দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিল আর থেকে থেকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। আমার মত শ্রান্ত ক্লান্ত ঘুমকাতুরে মানুষের দৃষ্টিকেও পীড়ন করে মুখে তার এমন গভীর ক্লিষ্টতার ছাপ। খাটের ওপর থেকে মহিলাটি তাকে ডেকে বলল, 'ছোট একটা থালায় লাড়ু আর নারকেলের সন্দেশ দে— দুটো আম কেটে দে।'

আমি হাত জোড় করে লোকটিকে বললাম, 'দোহাই আপনার, এত রাত্রে আর খেতে বলবেন না, মরে যাব। আশ্রয় যে পেয়েছি তাই ঢের—'

লোকটি ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'কিছুই খাবেন না, সামান্য কিছু?'

ঘোমটার ভেতর থেকে উৎসুক কণ্ঠে শব্দ এল, 'সব ঘরেই আছে, হাঙ্গামার কথা মনে করে যেন—'

যে চোখে দশ মিনিট আগে তাকে উলঙ্গ দেখেছিলাম আমার সেই চোখের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'দিই না?'

আমি ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিলাম, এ বাড়ীতে আমিই প্রথম অসময়ের অতিথি নই, হয়তো এই ছোট ঘরখানাতে এরকম অবস্থাতেও আরও অতিথি বাস করে গিয়েছে। কর্তা, গিন্নি, বা মেয়ে, কারও কাছে আমি অনভ্যস্ত বিপজ্জনক আবির্ভাব নই। আমার খাওয়া এবং শোয়ার ব্যবস্থা করার ভাবনায় তলে তলে এদের পাগল হওয়ার উপক্রম হয় নি—এদের পরিচর্যার ভূমিকাটুকুই আমাকে যা করে ফেলার উপক্রম করেছে।

মুখ গম্ভীর করে বললাম, 'পেটের অবস্থাটা ভাল নয়, কিছু খেলে সইবে না।'

তখন কর্তা আর গিন্নি প্রায় একসঙ্গেই সায় দিয়ে বলল, 'তবে থাক্।'

কিন্তু ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ে কয়েকটিকে টানা-হেঁচড়া করার ব্যবস্থাটা যে কি করে রদ করা যাবে ভেবে পেলাম না। অতবড় একটা খাট দখল করে আমি একা শুয়ে থাকব আর ওরা কেউ শোবার যায়গা পাবে না। ওদের সঙ্গেই খাটে শোয়া চলে কিনা একবার বিবেচনা করে দেখলাম, কিন্তু সেটাও সম্ভব মনে হল না। কাঠের সিন্দুকের উপরে বসে খাটের জোরালো গন্ধটা অনুভব করছিলাম, ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নতুন চাদর বিছিয়ে দিলেও গন্ধটা অন্তর্ধান করবে বলে ভরসা হল না।

ভেবে চিন্তে বললাম, 'এক কাজ করা যাক আসুন। আপনি খাটে খোকাখুকীদের কাছে শোবেন যান, আমি এখানে শুয়ে থাকি।'

'আপনি কি এখানে শুতে পারবেন মশায়! পা বেরিয়ে যাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'একটু পা বেরিয়ে থাকলে কিছু আসবে যাবে না।'

লোকটি গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'তা'ছাড়া সে বড় হাঙ্গামা।'

অতগুলি ঘুমন্ত ছেলেমেয়েকে তুলে খাট খালি করার চেয়ে এ ব্যবস্থার হাঙ্গামা বেশী হওয়া কি করে সম্ভব কোন মতেই ভেবে পেলাম না। লোকটি অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগল, 'কি জানেন, আমাকে তাহলে আপনার ধরাধরি করে খাটে নিয়ে যেতে হবে, উনি একা পারবেন না।'

কাপড় তুলে ধরতে দেখলাম হাঁটুর নীচে থেকে দুটি পা-ই ভদ্রলোকের কাটা।

'সিন্দুকের ওপরে শুতে আমার অসুবিধে নেই, পা বেরিয়ে যায় না। আপনি অবিশ্যি এতক্ষণ ভাবছিলেন, বাড়ীতে অতিথি এলো আর এ ব্যাটা দিব্যি আরাম করে সিন্দুকের ওপর গাঁট হয়ে বসে আছে। কি করব মশায়, নামবার ক্ষমতা থাকলে তো নামব।'

আমি বললাম, 'আহা, আপনার তো বড় কষ্ট। ঘর চাপা পড়ে পা ভেঙেছিল বুঝি?'

'আজ্ঞে না, ট্রেণে কাটা গেছে, দশ বার বছর আগে। ঘর তো আমার ভেঙে পড়েছে গত বছর—সেই যে ভীষণ ঝড় হয়েছিল সাতই আশ্বিন?—সেই ঝড়ে। বড় ঘর তিনখানাই পড়ে গেল, খাড়া রইল শুধু এই ছোট ঘরখানা।'

ঝড়ে বড় ঘরই পড়ে। বড়র পতনের এই বিধানটা চিরদিন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। মহিলাটির সাহায্যে লোকটিকে খাটে চালান করে দিয়ে আমি সিন্দুকের ওপর পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম—বেড়ার দিকে মুখ করে। ঘোমটা টানা মহিলা এবং তার বড় মেয়েটিও তো শোবে। আলোটা জলতে লাগল, সম্ভবতঃ ঘরে অজানা অচেনা মানুষ থাকার জন্য।

শুয়ে শুয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের উচিত হয়েছে? আশ্রয় না দেওয়ার অধিকার তো এদের ছিলই, কেবল তাই নয়, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের অন্যায় হয় নি?

অন্ধ ও ধাঁধা

নিদ্রাপুরীর সদর গেটটা প্রত্যহ ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া খুলিয়া যায়। ভোরে ঘুম ভাঙিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে বলিয়াই যেন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ রাস্তায় জল দিবার গাড়ীতে প্রচুর শব্দেরও ব্যবস্থা রাখিয়াছে।

সমস্ত বিছানা হাতড়াইয়া বালিশের পাশে চশমার খোঁজ মিলিল। কাল ঘুমের চোখে খাপে ভরিয়া রাখিতে মনে ছিল না, কখন মাথার চাপে চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে। টিপিয়া টিপিয়া ডাঁটগুলি যথাসম্ভব সোজা করিয়া চশমা নাকে লাগাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। মন্দ হয় নাই। অস্বাভাবিক চাকচিক্যে ভোরের আলো একেবারে অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া হেরম্ব পথের উপরে খোলা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। ধুলা ভিজাইবার সমারোহ সমাপ্ত করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ী বিদায় নিয়াছে। পথের ওদিকে ছোট গলিটির মুখে দাঁড়াইয়া আছে একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী।

গলির ভিতরে বোসেদের একতলা বাড়ীটি খালি পড়িয়াছিল, কোন অজ পাড়াগাঁ হইতে তাহার ভাড়াটে আসিল বোধ হয়। গাড়ীর ছাদে যে জিনিষগুলি হেরম্বের চোখে পড়িল, গ্রাম্য গৃহস্থের সংসার ছাড়া কুত্রাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। রঙ-চটা টিনের তোরঙ্গ, বাক্সহীন সিঙ্গল রীড্ হারমোনিয়াম ও ময়লা কাপড়ের বোঁচকা হইতে আরম্ভ করিয়া চালের বস্তা, ডালের হাঁড়ি, মসলা রাখা টিন, ঝুড়ি ভরা কড়াই, খন্তি হাতা প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম, এক পোঁটলা অর্দ্ধ শুষ্ক পুঁইশাক এমন কি গোবর মাখা গরু বাঁধা দড়ি পর্য্যন্ত গাড়ীর ছাদে স্থান পাইয়াছে।

ক্ষুদ্র এক টুকরি কয়লাও ইহারা মমতা বশে ফেলিয়া আসে নাই।

ঘুম ভাঙিয়া চোখের সামনে এ যেন পরম উপভোগ্য দ্রষ্টব্যের আবির্ভাব। সকাল বেলার আলস্য এ হেন উপলক্ষ্য পাইয়া সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। মন্থর চিন্তাযুক্ত মন দিয়া স্তিমিত নেত্রে হেরম্ব আরোহীর অবতরণ দেখিতে লাগিল।

প্রথমে নামিল একটি দৈত্য। গায়ের রঙ নিকষ কালো, মাথার চুল ধবধবে সাদা। বয়স বড় কম হয় নাই, কিন্তু যে গ্রামে ইহার বাস তার আশে পাশে ডাকাতি হইলে এখন পর্য্যন্ত পুলিশ সর্ব্বপ্রথমে ইহাকে ধরিয়া নিঃসন্দেহ টানাটানি করে। গায়ের বিবর্ণ খাকী সার্টটা শরীরের চাপে ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে, পরণে ছয় হাত মলিন ধুতি, নিজেও সে পাঁচ হাতের কম লম্বা নয়, পায়ে ধুলি-মলিন চটি।

তুচ্ছ মানুষ, দেহের মানুষ। শক্তি যতই থাক, রূপের সীমা নাই। শুধু হেরম্বের দু'চোখে ঈর্ষা ঘনাইয়া আসিল।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। এক হাতে গাড়ীর দরজা চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে শাড়ীর প্রান্ত উঁচু করিয়া (হাঁটুর কাছে একটি লম্বা ক্ষতের দাগ হেরম্বের চোখে পড়িল ; বহুদিন পরে মেয়েটির কথা ভাবিতে গেলে এই চিহ্নটি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার স্মরণে আসিত) এবার যে সন্তর্পণে অবতরণ করিল তাহাকে দেখিলে চোখের পলক বন্ধ হইয়া যায়।

দৈত্যের পিছনে এ যেন অপহৃতা রাজকন্যার আবির্ভাব।

আধ হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকা পাছাপাড় কোরা সাড়ী পরা দৈত্যবধূর পরিবর্ত্তে ইহাকে নামিতে দেখিয়া হেরম্বের চুরুট টানা বন্ধ হইয়া গেল। দৈত্যকে গাড়ীর ছাদের জিনিষগুলির কর্ত্তা বলিয়া অনায়াসে ভাবা যায়, কিন্তু এই মেয়েটির ভর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করা চলে কেমন করিয়া? রূপার হাঁসুলিতে হীরার পদকের মত তাহা একান্ত অবিশ্বাস্য।

ভর্ত্তা নিশ্চয়ই নয়,—ভৃত্য। স্বামী গাড়ীতে আছে, এইবার নামিবে। হেরম্ব উগ্র কৌতূহলের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নামিল শুষ্ক শীর্ণ এক বৃদ্ধ। ঠিক যে নামিল তাহা নয়, দৈত্য তাহাকে একপ্রকার কোলে করিয়াই নামাইয়া দিল। মেয়েটি তাহার হাত ধরিয়া এক পাশে সরাইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া জিনিষ নামানোর তদ্বিরে ব্যাপৃত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ নড়েনা চড়েনা সেইখানে ঠায় দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপায়। হেরম্ব বুঝিতে পারিল সে অন্ধ।

অন্ধ! গত রাত্রির জ্যোৎস্নার চেয়ে বিস্ময়কর আলো চারিদিকে খেলা করিতেছে, হাত বাড়াইলে দু'চোখের একটি জীবন্ত তৃপ্তিকে স্পর্শ করিতে পারে তবু বেচারা অন্ধ! হেরম্ব সভয়ে দেখিল, বৃদ্ধের চোখের পাতার তলে চোখ নাই, আছে চামড়া ছাড়ানো তাজা মাংসের রক্তাক্ত বীভৎসতা! অদৃশ্য জগতের শব্দকে অনুসরণ করিয়া দৃষ্টিহীন গহ্বর দুটি এদিক ওদিক ফিরিতে লাগিল, হেরম্ব অভিভূতের মত তাকাইয়া রহিল।

পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না। জিনিষগুলি নামানো হইলে মেয়েটি কি ভাবিয়া বারান্দার নীচে আগাইয়া আসিল। মধ্যাহ্নের সূর্য্যমুখীর মত ঊর্দ্ধমুখী হইয়া বলিল, একবার নীচে আসবেন?

যাই, এখুনি যাচ্ছি।

একটু সময় লাগিল। জামাটা গায়ে দিতে হয়, চোখের ও মুখের রাত্রি জাগরণ জনিত ক্লিষ্টতা ধুইয়া ফেলিতে হয়, প্রভা চায়ের জল চাপাইয়াছে তাহাকে এখনই ফিরিয়া আসার আশ্বাস জানাইতে হয়।

বাহিরে গিয়া হেরম্ব দেখিল মেয়েটি পথ ছাড়িয়া রোয়াকে উঠিয়া আসিয়াছে। দু'পাশে প্রত্যেকটি বাড়ীর জানালা খুলিয়া গিয়াছে, কিষণ মুদীর দোকানে ক্রেতাদের মুখ এই দিকেই ফেরানো, পথের কয়েকজন পথিকও হঠাৎ চলিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

মেয়েটি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, এও দেখছি আমাদের গাঁয়েরি মতন। মানুষ দেখতে মানুষ ভিড় করে।

এতক্ষণ সেও যে ওই কাজই করিতেছিল হেরম্বের তাহা মনে পড়িল না। বলিল, সব ছোটলোক। আপনি বরং ভিতরেই চলে আসুন। আমার স্ত্রী—

মেয়েটি বলিল, আপনার স্ত্রীকে আর বিরক্ত করব না। আপনার কাছেই আমার একটু সাহায্যের প্রার্থনা। আমার ওই চাকরটার শরীর যত বড় বুদ্ধি তত কম। তাছাড়া বাজার হাট পথ ঘাটও চেনে না। আপনার চাকরকে যদি দয়া করে এক ঘণ্টার জন্য ধার দেন—

সারাদিনের জন্য চাকরকে ধার দিতে স্বীকার করিয়া হেরম্ব বলিল, আপনাদের এবেলার খাওয়ার ব্যবস্থা আমার এখানে হতে পারে না।

মেয়েটি একটু ভাবিল।—না, রান্না আমিই করে নেব। তোলা উনুন কয়লা সব সঙ্গে আছে অসুবিধা হবে না।

হেরম্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, জোর করা আমার পক্ষে অশোভন। আমার স্ত্রীকে ডেকে আনি। সে পীড়াপীড়ি করতে পারবে।

মেয়েটি হাসিল, তা তিনি করবেন না। আমার সঙ্গে যে বুড়োমানুষটি আছেন ওর জন্যে বিশেষ কায়দা করে রাঁধতে হবে। আমি ভিন্ন সে কায়দা কারো জানা নেই। কিন্তু আমরা ক্ষুধাতুর হ'য়ে আছি, মুড়ি চিড়া সুজি যাহোক কিছু জলখাবার আর একটু দুধ যদি পাঠিয়ে দেন—

বৃদ্ধকে নির্দেশ করিয়া হেরম্ব বলিল, উনি কে?

উনি আমার আত্মীয়, অভিভাবক।

হেরম্ব মনে মনে হাসিল। অভিভাবকই বটে। চিরন্তন গাঢ় অন্ধকারে বসিয়া চক্ষুষ্মতীর সম্বন্ধে কি অভিনব ভাবনাই না জানি ও ভাবে?

এক ঘণ্টার জন্য চাকরকে ধার দিয়া অভ্যাগতা প্রতিবেশিনীর প্রতি কর্ত্তব্য শেষ করা গেল না। বাড়ীটার সবে সংস্কার হইয়াছিল, চুণ সুরকি, ভাঙ্গা ইট ও নানাবিধ আবর্জ্জনায় এমনি নোংরা হইয়াছিল যে, পরিষ্কার করিতেই দৈত্য ও হেরম্বের চাকরের একদিন লাগিয়া যাইত। হেরম্বই দু'জন কুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাড়ী পরিষ্কারের কাজে লাগাইয়া দিল, নিজের বাড়ী হইতে একটা তক্তপোষ আনাইয়া বৃদ্ধের শয়নের বন্দোবস্ত করিল এবং নিজেই কুয়ার ধারে গোটাতিনেক খুঁটি পুতিয়া কাপড় দিয়া ঘেরিয়া রাধার স্নানের অস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিল। রাধা মৃদু হাসিয়া বলিল, গাঁয়ের মেয়ে, পুকুরে স্নান করি, ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরি। সহরে এসেই মানুষের দৃষ্টিকে অপমান করব?

এ অবশ্য প্রকারান্তরে কৃতজ্ঞতা জানানো, কিন্তু হেরম্বের মনে হইল এ ভাবে ঘুরাইয়া বলিবার আরও একটা অতিরিক্ত উদ্দেশ্য আছে। রাধার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ওদিকে দাঁড়াইয়া তীব্র দৃষ্টিতে দৈত্য তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে। দু'চোখে তাহার অকথ্য বিতৃষ্ণা।

হেরম্বকে চাহিয়া দেখিয়া দৈত্য সরিয়া গেল।

ও ডাকাতটাকে সঙ্গে এনেছেন কেন?

রাধা হাসিল, আত্মরক্ষার জন্য। অতখানি অনুগত অন্ধ শক্তি আর কোথায় পাব?

শক্তির অন্ধতা বিপজ্জনক।

অন্যের পক্ষে হতে পারে, আমার পক্ষে নয়। বিপজ্জনক অন্ধশক্তি পৃথিবীতে আছে বলেই ওকে সঙ্গে এনেছি। নইলে—

কথা সে শেষ করিতে পারিল না। বারান্দার শেষপ্রান্তে কোণের ঘরখানা অন্ধ বৃদ্ধের, সেদিক হইতে কড়া তামাকের দুর্গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। অকস্মাৎ সে-ঘরে এমন বীভৎস একটানা কাসির শব্দ আরম্ভ হইয়া গেল যে, হেরম্ব চমকাইয়া উঠিল।

ওকি? কে কাসে অমন করে?

রাধা পাংশু মুখে বলিল, আমার সেই অভিভাবক। বলিয়া সে দ্রুতপদে অন্ধের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। হেরম্ব স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওই শীর্ণকায় মুমূর্ষু বৃদ্ধ এমন ভয়ানক শব্দ করিয়া কাসে!

কাসি যেন আর থামিতে চায় না। একটা প্রকাণ্ড বকযন্ত্রের মধ্যে তোড়ে জল প্রবেশ করিবার চেষ্টায় মুহুর্মুহু থামিয়া থামিয়া গর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছে। হেরম্বের মনে হইল আর খানিকক্ষণ এভাবে কাসিলে বৃদ্ধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি খসিয়া চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া পড়িবে।

খানিক পরে দম আটকানোর মত একটা বিশ্রী আওয়াজ হইয়া কাসি থামিয়া গেল। রাধা ফিরিয়া আসিলে হেরম্ব বলিল, এ তো দেখছি সাংঘাতিক কাসি?

রাধার ফ্যাকাসে মুখে ধীরে ধীরে রক্ত ফিরিয়া আসিতেছিল, মৃদুস্বরে সে বলিল, হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে' ভুগছেন। ভুগে ভুগেই ওঁর এমন চেহারা হয়েচে, নইলে বয়স খুব বেশী নয়। মোটে চল্লিশ।

হেরম্ব অবাক হইয়া বলিল, কাসির অসুখে মাথার চুল সাদা হয়ে যায়?

তাইতো গিয়েছে দেখছি। জানেন, ওর চুলের দিকে তাকালে আমার ভয় করে। এমন হঠাৎ সব চুল সাদা হয়ে গেল! তিন চার মাস আগেও সব চুল কালো ছিল। সেই থেকে স্বভাবও বদলে গেছে। কেসে কেসে মরবার দাখিল হয়েছে, তবু তামাক খাওয়া চাই। এমনি পায় না, আজ চাকরের হুঁকো কল্কে খুঁজে নিয়ে—

কি ক'রে খুঁজলেন?

তাই ভাবছি। চোখ নষ্ট হবার পর থেকে ওর কতগুলি আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মেছে।

উনি আপনার কে হন?

সে তো আপনাকে বলেছি। আমার আত্মীয়।

কি রকম আত্মীয়?

পরমাত্মীয়। বলিয়া রাধা হাসিবার চেষ্টা করিল।

এ বিষয়ে হেরম্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাসির পক্ষে এ যায়গাটা খুব উপকারী। মাসখানেকের মধ্যে ওঁর অনেক উপকার হবে।

সেই জন্যেই তো এখানে এলাম। ওর বেঁচে থাকা বড় দরকারী, বড় দরকারী। এই বলিয়া রাধা এমন এক প্রকার রহস্যময় দৃষ্টিতে হেরম্বের মুখের পানে চাহিয়া এত বেশী অন্যমনস্ক হইয়া গেল যে হেরম্বের মনে হইল শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য নয়, একটা অন্যতম বৃহৎ কারণে অকাল-বৃদ্ধের বাঁচিয়া থাকাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। চেষ্টা করিয়াও সে এই উদ্যত প্রশ্নটাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিল না; বেঁচে থাকা দরকারী কেন?

অতর্কিতে একটা অতি বড় অপরাধ যেন ধরা পড়িয়াছে, এমনিভাবে চমকাইয়া উঠিয়া রাধা কেমন বিহ্বল হইয়া গেল।

সে আপনি বুঝবেন, আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেব। আপনি আজ আমার একটা ভিক্ষা দিন। ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাকে আপনার সাহায্য করতে হবে। করবেন?

হেরম্ব ব্যস্ত হইয়া বলিল, করব বৈ কি। নিশ্চয় করব।

পরম আশ্বস্ত হইয়া রাধা বলিল, ডাক্তার বলেন দু'এক বছরের মধ্যে ওর কিছু হবে না। আপনার কি মনে হয়?

আমার মনে হয় উনি সেরে উঠবেন।

না, সে আশা আর নেই। বলিয়া রাধা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেমিজ খুলিয়া চুল এলাইয়া দিয়া গামছা হাতে রাধা বাহির হইয়া আসিলে হেরম্ব বিদায় চাহিল।

রাধা বলিল, বিকালে ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসবেন।

হেরম্ব হাসিল, কার ছেলে মেয়ে? আমার? কোথায় পাবো!

ছেলে মেয়ে নেই আপনার!

এ যেন অকথ্য, অবিশ্বাস্য, কল্পনাতীত দুঃসংবাদ! হেরম্বের মনে হইল ইচ্ছা করিয়াই গামছাটা ফেলিয়া নিয়া কুড়াইবার ছলে রাধা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মুখখানা আড়াল করিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে দেখা গেল ওইটুকু সময়ের মধ্যে মুখের হতাশাব্যঞ্জক ভাবটা সম্পূর্ণ মিলাইয়া দিতে পারে নাই একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, আপনাকে দেখেই কিন্তু মনে হয়েছিল আপনার ঘরভরা ছেলেমেয়ে। এমন স্বাস্থ্য এমন রূপ এমন প্রতিভার জ্যোতি মুখে চোখে—

রাধা দ্রুতপদে স্নানের ঘেরা স্থানটুকুতে ঢুকিয়া পড়িল।

হেরম্ব খানিকক্ষণ নড়িতে পারিল না। রাধার মন্তব্য খুব বেশী অদ্ভুত ও আকস্মিক তাহা নয়, ছেলে মেয়ে নাই শুনিয়া যে আশ্চর্য্য মুখভঙ্গি সে করিয়াছিল এ মন্তব্যের জন্য তার চেয়ে বিশদ ও সুস্পষ্ট ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য রূপ ও প্রতিভার অপচয়ে রাধা এমন বিচলিত হইল কেন? পরিচয় তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার!

পাতলা কাপড়ের আড়ালে রাধাকে ছায়ার মত দেখা যাইতেছিল, একটুখানি বিদেহী সোণালী আভা। হেরম্ব বুঝিতে পারিল মাথায় জল দেবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া রাধা জলচৌকীতে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া হেরম্বও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

বারান্দা যেখানে বাহিরের ঘরের দিকে দিক্‌পরিবর্ত্তন করিয়াছে সেখান হইতে একটি সুদীর্ঘ কালো ছায়া উঁকি মারিতেছিল, হেরম্বকে চাহিতে দেখিয়া চোখের পলকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

চলিতে আরম্ভ করিয়া হেরম্বের মনে হইল, এ মন্দ নয়। সমুখে যখন স্বহস্ত-রচিত বস্ত্রাবাসে স্বর্ণাভ ছায়া জলজল্ করে পিছনে তখন বিপুল কালো ছায়া নিঃশব্দে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া থাকে।

বাহিরের ঘরে পা দিতে দৈত্য সোজা দাঁড়াইয়া গম্ভীর আওয়াজে বলিল, সেলাম বাবু।

সেলাম। তুমি মুসলমান নাকি?

গোলাম মোছলমান।

লোকটার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া হেরম্ব পথে নামিয়া পড়িল। ইহার লোমশ হাতের এক টিপুনিতে গলার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াইতে পারে কল্পনা করিতে গিয়া কৌতুকানুভূতির পরিবর্ত্তে তাহার গলার মধ্যে খুস্ খুস্ করিয়া উঠিল।

দিন যায় আর হেরম্বের মনে হয় রাধা নিজে যেন ধাঁধাঁ নয়, একটা অদ্ভুত রহস্য তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতেছে। বায়ুর মতই হয়ত তাহা স্বচ্ছ, কিন্তু ধুলাবালিতে এমনি আবিল হইয়া উঠিয়াছে যে রাধাকে ঝাপ্সা মনে হয়।

জীবনে একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বলিয়াই তাহার যতটুকু অভিনবত্ব, নহিলে রূপের হিসাব ছাড়া প্রভার সঙ্গে তাহার পার্থক্য সম্ভবতঃ এতখানি নয়।

বিকালের দিকে প্রভা রাধার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তোমার বর্ণনার সঙ্গে একেবারেই মিলল না। কেমন ভয়ে ভয়ে কথা কইল, খালি এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তোমার বৌকে দেখে ওর লজ্জা পাবার কি আছে?

হেরম্ব হাসিয়া বলিল, বোধ হয় কৌতুক। ওকে দেখে আমার বৌয়ের লজ্জা পাওয়া উচিত।

প্রভা ম্লান মুখে বলিল, পাড়ায় যে সব কথা উঠছে কাণে গিয়েছে বোধ হয়।

হেরম্ব হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, পাড়ার লোকের অজুহাত না দিয়ে যেদিন মনের কথাটা স্পষ্ট করে' বলবে সেদিন এ বিষয়ে আলোচনা করব প্রভা।

কিন্তু তুমি হতাশ হ'য়ো না। একদিক দিয়ে ভগবান যে তোমায় বঞ্চিত করেছেন সেইটাই বোধ হয় আর একদিক দিয়ে এবার তোমার কাজে লাগবে।

জামা পরাই ছিল, প্রভার বিস্ময়কে উপেক্ষা করিয়া হেরম্ব বাহির হইয়া গেল। চশমাটা সে বদলাইয়াছে এবং এখন সকাল নয়, অপরাহ্ন। তথাপি তাহার চোখে পড়ন্ত সূর্য্যালোক বড় অস্বাভাবিক ঠেকিল। এতকাল অলস বৈচিত্র্যহীন জীবনে সে যেন দেখিতে জানিত না, আজ দেখিতে শিখিয়াছে।

রাধা বলিল, আপনাকে আজ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ। পাড়ায় নাকি কি সব কথা উঠেছে শুনলাম। আপনি কি মনে করেন আমার আসা যাওয়া কমিয়ে দেওয়া উচিত?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া রাধা সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িল, ঠিক বুঝতে পারছি না। এ আমার কঠিন সমস্যা বিনামূল্যে সুনাম বিলিয়ে দিলে আপনার যে সবটাই ক্ষতি দাঁড়াবে।

আর আপনার?

রাধা করুণভাবে হাসিল, আমার আবার লাভ ক্ষতি! সে হিসাব চুকিয়ে ফেলেছি। কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলে যাব কেউ তা জানে না, কলঙ্ক কিনতে আমার ভয় কি? একটু ভাবিয়া নতমুখে বলিল, কলঙ্ক রটলে বরং আমার সাহায্যই হবে। আমি জোর পাব!

কথাটা হেঁয়ালির মত শোনাইল, কিন্তু হেরম্বের মনে হইল বিন্দুমাত্র বেমানান্ নয়। রাধা কবিত্ব করিতে বসে নাই, যে রহস্য নিয়ে সে জীবনে পদার্পণ করিয়াছে তাহাকে অর্থহীন ইঙ্গিতের সাহায্যে ঘনীভূত করিবার ইচ্ছাও রাখে না। বলিবামাত্র বুঝিতে পারার মত বক্তব্য তাহার নয়।

রাধা আবার বলিল, আপনি আমার এমন দ্বিধায় ফেলছেন! দশ বছর ধরে মনমরা হয়ে থেকে সেদিন যখন সকাল বেলা আপনার বাড়ীর সামনে নামলাম, মনে হল এতদিনে আমারও বুঝি কপাল ফিরল। কিন্তু দু'ঘণ্টার মধ্যে এমন কথাই শোনালেন যে প্রদোষের আধ' অন্ধকার আমি আর অতিক্রম করতে পারলাম না। আচ্ছা,—কম্পিত আঙুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে বলিল, আচ্ছা আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন?

সাত বছর।

সাত বছর! শিশু যে এল না সে অপরাধ তবে কার? লজ্জা করবেন না, বলুন। এ না জানলে আমার চলবে না।

সেটা এখনও নির্ণীত হয়নি।

নির্ণীত হয়নি! রাধা স্তব্ধ হইয়া গেল।

হেরম্বের চোখে পলক নাই, শিরার রক্ত চলাচলের মাঝখানে একবার একটা উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল আবার তাহা শান্ত হইয়া গিয়াছে। কথা হইতেছিল বারান্দায় বসিয়া, উঠানের একপাশে দৈত্য হাঁসের পালক ছাড়াইতেছিল,—বৃদ্ধের জন্য মাংসের জুস হইবে। দেখিতে দেখিতে হাঁসটা কদর্য্য মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া গেল। হেরম্বের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

প্রাণিহত্যা দেখলে কষ্ট হয়, না?

হেরম্ব উদাসভাবে বলিল, না।

আশ্চর্য্য! আমারও হয় না। তবে হয়ত আমার যে জন্য কষ্ট হয়—

আমারও সেজন্য কষ্ট হওয়া উচিত? হেরম্ব মৃদু হাসিল, তা হয়। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেই আমার সীমা, এ চিন্তা সুখদায়ক নয়।

ইহার পর দু'জনে বহুক্ষণ কথা বলিল না। আকাশে বিকাল হইয়াছে, প্রভা যে বৈকালিক জলখাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে বারংবার সে কথা হেরম্বের মনে পড়িতে লাগিল। এবং তাহাতে বিস্ময়ের তাহার সীমা রহিল না। ক্ষুধার সাড়া নাই, প্রভার খাবারের কথা এত করিয়া মনে পড়ে কেন? বিশেষ করিয়া আজিকার এই অপরাহ্নে, এই রহস্যময়ীর সান্নিধ্যে চিন্তার জটিল পাক খাওয়ায়?

মাংস কাটিয়া দৈত্য উঠিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ হেরম্ব সচেতন হইয়া উঠিল, কড়া তামাকের দুর্গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

রাধা চকিতভাবে বলিল, তামাকের গন্ধ পাচ্ছেন?

পাচ্ছি। দৈত্য খাচ্ছে বোধ হয়।

রাধা শঙ্কিত হইয়া বলিল, তা কি ও খাবে! বাড়ীতে তামাক টানতে ওকে আমি নিষেধ করে' দিয়েছি।

দৈত্য যে তামাক খাইতেছে না প্রমাণ পাইতে দেরী হইল না। উভয়ের চোখের সামনে উঠান পার হইয়া সে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। রাধা ত্বরিৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

হেরম্ব বলিল, যান কেড়ে নিন গিয়ে,। আজ সারাদিন

যদি কেসে থাকেন এ তামাকের ধোঁয়া ফুসফুসে গেলে বাঁচবেন না।

রাধা বিবর্ণমুখে বলিল, ক'মাস আগে মরবার ভয়ে ও দিশেহারা হ'য়ে যেত, এখন এমনভাবে তামাক খেতে আরম্ভ করেছে কেন হেরম্ব বাবু? এতো নেশা নয়।

না, নেশা নয়। বোধ রোগযন্ত্রণায়—

রোগযন্ত্রণা? কি জানি কিসের যন্ত্রণা। আমার গা কাঁপছে হেরম্ব বাবু। রাধার মুখ অস্বাভাবিক সাদা হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ সে যেন ভয়ঙ্কর ভয় পাইয়াছে। হতাশ কণ্ঠে বলিল, ও টের পেয়েছে—কি করে ও যেন টের পেয়েছে। নিজে মরে' আমায় তাই মেরে রেখে যেতে চায়।

রাধা অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িবার শক্তি যেন তাহার লোপ পাইয়াছে। প্রথম দিনের কথা হেরম্বের মনে পড়িল, এমনি বিহ্বলভাবে অন্ধকে বাঁচাইয়া রাখিতে রাধা তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। অধরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া সে বলিল, আসুন, পরে শুনব।

ঘরে ঢুকিয়া দেখা গেল তামাকে টান দিবার সুযোগ তখনো অধর পায় নাই, হুঁকা হাতে উঠিয়া বসিবার পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিল।

হুঁকা কাড়িয়া নিতে চোখের রক্তবর্ণ গহ্বর দুটি উন্মুক্ত করিয়া অধর বলিল, দুটো টান দিতে দাও রাধা। অনেক কষ্টে ধরিয়েছি। দাও, দাও বলছি আমায় হুঁকো কল্কি!

অমন প্রচণ্ড শব্দ করিয়া কাসিলেও অধর কথা কয় ফিস্ ফিস্ করিয়া। হেরম্বের মনে হইল কথাকে বঞ্চিত করিয়া সে যেন কাসির জন্য শব্দ সঞ্চয় করে।

রাধা বলিল, তুমি মরতে চাও কেন?

চোখের গহ্বর আরও বেশী উন্মুক্ত করিয়া অধর বলিল, আমি বাঁচতে চাইব কেন?

এ প্রশ্নের জবাব নাই, বিছানার পাশে বসিয়া রাধা চুপ করিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কাণ পাতিয়া থাকিয়া অধর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, ঘরে কে নিশ্বাস ফেলছে? কে এসেছে আমার ঘরে? সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টার সঙ্গে আন্দাজে হেরম্বের দিকে তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া সে যেন অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কে ও? চোরের মত আমার ঘরে কে এল?

রাধার ঠোঁট কাঁপিল কিন্তু কথা বাহির হইল না। হেরম্ব নিজের পরিচয় দিতে যাইতেছিল, ইঙ্গিতে রাধা বারণ করিল।

অধরের মাথা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বিছানার চাদরটা দুই হাতের শীর্ণ আঙ্গুলে মুঠা করিয়া ধরিয়া ভীতস্বরে অধর বলিল, ও যেই হোক, ওকে অত জোরে নিশ্বাস নিতে বারণ কর রাধা। না হয় তুমি কথা কও।

রাধা মৃদুস্বরে বলিল, উনি আমাদের প্রতিবেশী। তোমায় দেখতে এসেছেন।

অধর যেন এই সংক্ষিপ্ত জবাবটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। একমুহূর্ত্তে তাহার সকল উত্তেজনার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল। নির্জ্জীবের মত বালিশে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, আমার ঘরে ওকে কেন আনলে রাধা? এতো ওর প্রতিবেশীর ঘর নয়। এ ঘরে কথা নেই, হাসি নেই, চোখে চোখে চাওয়া নেই, শুধু আছে অন্ধকার। এ ঘরে উনি হাঁপিয়ে উঠবেন।

পরস্পরের চোখে চাহিয়া দু'জনে অন্ধের কথা শুনিতেছিল, রাধা চোখ নামাইয়া নিল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, উনি বুড়ো মানুষ, এ সব অসুখের বিষয়ে অনেক বোঝেন শোনেন, তাই এসেছেন। উনি এলে আমি অনেক ভরসা পাই।

অধর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অকাল-বৃদ্ধের অসুখ বুড়ো মানুষেরা বোঝে না রাধা। তাদের অভিজ্ঞতা নেই।

এই বলিয়া অভ্যস্ত ভাবে প্রথমে দুই হাতে বুক চাপিয়া হাঁ করিয়া নিশ্বাস নিবার চেষ্টায় হাঁপাইয়া উঠিয়া সে কাসিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেকটি কাসির সঙ্গে সমস্ত চৌকী এমন ভাবে নড়িতে লাগিল যে হেরম্ব বুঝিতে পারিল না রাধার সর্ব্বাঙ্গ ঠিক কি কারণে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

হুঁকাটা রাধা হেরম্বের হাতে দিয়াছিল। কলিকার আগুন নিবিয়া যায় নাই, পাক খাইয়া খাইয়া তাহা হইতে ধোঁয়া উর্দ্ধে উঠিতেছিল। হেরম্ব অকস্মাৎ খোলা দরজা দিয়া হুঁকা কল্কি উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য কাসি স্থগিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু একেবারে কমিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল অধরের সঞ্চিত শব্দ তখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কাসিতেছে হিক্কা ওঠার মত। কাসির বিরামের অবসরে মাথা উঁচু করিবার চেষ্টায় চোখের গর্ত্ত জলে ভরিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। প্রথম হইতে রাধার একটি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল, এখনো ছাড়ে নাই। যে দুর্নিবার স্রোত আজ তাহাকে মরণের পরপারে ভাসাইয়া নিয়া যাইতে চায়, নোঙরের মত রাধা যেন তাহাকে ব্যর্থ করিবে।

দেয়ালে ঠেস দিয়া রাধা মড়ার মত চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে।

দৈত্যের মুখখানা দেখিবার জিনিষ। অত বড় বিপুল দেহে অমন অসীম শক্তি নিয়া সে যে শিশুর মত ভীত অসহায় দৃষ্টিকে চারিদিকে সঞ্চালন করিতেছে অন্ধের যন্ত্রণার চেয়ে তাহা যেন সকরুণ। ওর অল্প পরিমাণ মস্তিষ্কে কি ক্রিয়া চলিতেছে কে জানে? হঠাৎ রাধা বলিল, হেরম্ব বাবু, ওকে বাঁচান; বেশী নয় আর কয়েকটা মাস—শুধু আর কটা মাস ওকে বাঁচিয়ে রাখুন।

ডাক্তার উপস্থিত থাকিতে তাহাকে এই মিনতি জানানোর মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর একটা ইঙ্গিত ছিল যে হেরম্ব কোন আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলিলেন, ভয় পাবেন না। উনি বাঁচবেন বৈ কি নিশ্চয় বাঁচবেন।

আশ্চর্য্য আশ্বাস, বিস্ময়কর মিথ্যা।

ডাক্তারের মুখের কথা শেষ হইবার এক মিনিট পরেই ভয়ঙ্কর একটা কাসির ধমকে একেবারে আধবসা অবস্থায় উঠিয়া অন্ধের মৃত দেহটা আবার শুইয়া পড়িল।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই ডাক্তার নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

সকলে নীরব। প্রত্যেকের নিশ্বাসের শব্দ যেন শোনা যায়। অকস্মাৎ এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দৈত্য হাউ হাউ করিয়া উঠিল। ঠিক যে কান্না তাহা নয়, এক প্রকার দুর্ব্বোধ্য ভয়ের শব্দ, আতঙ্ক-ভরা আর্ত্তি।

পাড়ার কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন, হেরম্ব একজনকে নিম্নস্বরে বলিল, ও লোকটি মুসলমান, ঘর থেকে বের করে দিন।

বাহিরে যাওয়ার আদেশটা দৈত্য প্রথমে বুঝিতে পারিল না, বোঝা মাত্র তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

প্রভা দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ভিতরে আসিয়া রাধার পাশে বসিয়া পড়িল। হেরম্বের বিধবা পিসীমাও আসিয়াছিলেন, রাধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাক বাছা, একজনের ছুঁয়ে থাকতে হয়।

কাসির শেষ ধাক্কায় রাধার কব্জি হইতে অধরের মুষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। তাহার পায়ে হাত রাখিয়' চোখ তুলিয়া পিসীমার বিধবা বেশ দেখিয়া রাধা যেন অবাক হইয়া গেল।

আমি তো কিছুই জানি না, এখনি কি সিঁদূর শাঁখা খুলে ফেলতে হবে ?

তাহার এই কথার কল্পনাতীত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সকলের সময় লাগিল। হেরম্ব বলিল, এখন নয়, ফেরার সময়, শশ্মানে।

শশ্মান কোথায় হেরম্ব বাবু ? সহরের বাইরে ? লোকালয় ছাড়িয়ে ?

দু'জনের মধ্যে শুধু মৃতদেহের ব্যবধান। সামনে ঝুঁকিয়া সকলের আশ্রাব্য স্বরে রাধা আবার বলিল, এবার থেকে শ্মশানে বাস করব—জীবনের শেষ সীমায়। মানুষের মধ্যে বাস করার অধিকার আমার ঘুচল।

রাধার দাদা আসিয়াছিলেন, হেরম্বের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতায় তিনি একেবারে উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিলেন।

কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাইনা হেরম্ববাবু দু'দিনের জন্য বাড়ী গিয়েছি, ফিরে দেখি রোগা স্বামীকে নিয়ে রাধা কোথায় যে গেছে কেউ বলতে পারে না। আপনার তার পাওয়া পর্য্যন্ত কি দুর্ভাবনাতেই যে দিন যাচ্ছিল।

হেরম্ব বলিল, আপনার খবর দেওয়ার মধ্যে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আপনার বোন তার করতে বলেছিলেন।

অ! বলিয়া দাদার কৃতজ্ঞতার উচ্ছাস জুড়াইয়া গেল।

বিকালেই বিদায়ের আয়োজন। ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া গলির মুখে দাঁড়াইল। রাধার দাদা গাড়ীতে জিনিষ তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

রাধা বলিল, এ বেশে ফিরতে হ'বে জানতাম, এ ভাবে ফিরব জানা ছিল না।

হেরম্ব নীরব হইয়া রহিল।

রাবণের অবস্থা হ'ল আমার। দ্বিধা করে' করে' স্বর্গের সিঁড়ি আর তৈরী হল না। আজ থেকে দশমাস সময় এখনো মানুষ আমায় দিয়েছে, মানুষ খুব বিবেচক, নয় ?

এ আলোচনা হেরম্বের আজ সহ্য হইতেছিল না। প্রসঙ্গান্তরের প্রত্যাশায় জিজ্ঞাসা করিল, দৈত্যকে দেখতে পাচ্ছি না যে ?

ওকে বিদায় করে' দিয়েছি।

কেন ?

সন্দেহে। ওর বুদ্ধি খুবই কম, কিন্তু কেসে কেসে যে মরতে বসেছে চাইলেই তাকে তামাক দিতে নেই, এটুকু কি আর ও বোঝেনি ? প্রথমটা মনে করেছিলাম বোকামী, শেষে সন্দেহ হ'ল শয়তানী হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

শয়তানী! হেরম্ব চাহিয়া দেখিল উঠানে হুঁকো-কলিকাটা এখনও পড়িয়া আছে।

হলুদ পোড়া সমাপ্ত

চ তু ষ্কো ণ

বেলা তিনটার সময় রাজকুমার টের পাইল, তার মাথা ধরিয়াছে। এটা নূতন অভিজ্ঞতা নয়, মাঝে মাঝে তার ধরে। কেন ধরে সে নিজেও জানে না, তার ডাক্তার বন্ধু অজিতও জানে না। তার চোখ ঠিক আছে, দাঁত ঠিক আছে, ব্লাড্-প্রেসার ঠিক আছে, হজমশক্তি ঠিক আছে,—শরীরের সমস্ত কলকব্জাগুলিই মোটামুটি এতখানি ঠিক আছে যে, মাঝে মাঝে মাথাধরার জন্য তাদের কোনটিকেই দায়ী করা যায় না। তবু মাঝে মাঝে মাথা ধরে।

অজিত অবশ্য এক জোড়া কারণের কথা বলিয়াছে: আলসেমি আর স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতিতে অবহেলা। রাজকুমার তার এই ভাসা ভাসা আবিষ্কারে বিশ্বাস করে না। প্রথম কারণটা একেবারেই অর্থহীন, সে অলস নয়, তাকে অনেক কাজ করিতে হয়। দ্বিতীয় কারণটা যুক্তিতে টেঁকে না, স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতি না মানিলে স্বাস্থ্য খারাপ হইতে পারে, মাথা ধরিবে কেন?

অজিত খোঁচা দিয়া বলিয়াছেন: তোর স্বাস্থ্য খুব ভালো, না?

অসুখে তো ভুগি না।

মাথা ধরাটা—

মাথা ধরা অসুখ নয়।

মাথা খারাপ হওয়াটা?

আজ গোড়াতেই মাঝে মাঝে সাধারণ মাথাধরার সঙ্গে আজকের মাথাধরার তফাৎটা রাজকুমার টের পাইয়া গেল। দু'চার মাস অন্তর তার এরকম খাপছাড়া মাথাধরার আবির্ভাব ঘটে। নদীতে জোয়ার আসার মত মাথায় একটা ভোঁতা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার সঞ্চার সে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, তারপর বাড়িতে বাড়িতে পরিপূর্ণ জোয়ারের মত যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে থমথম করিতে থাকে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম আসে না। মাথাধরা কমানোর ওষুধে শুধু যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়ে, ঘুমের ওষুধে যন্ত্রণাটা যেন আরও বেশী ভোঁতা আর ভারি হইয়া দম আটকাইয়া দিতে চায়।

খাটের বিছানায় তিনটি মাথার বালিশের উপর একটি পাশবালিশ চাপাইয়া আধশোয়া অবস্থায় রাজকুমার বসিয়া ছিল। তৃষ্ণায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। মাথা ধরিলে রাজকুমারের এরকম হয়। সাধারণ জল, ডাবের জল, সরবৎ কিছুতেই তার তৃষ্ণা মেটে না। এটাও তার জীবনের একটা দুর্বোধ্য রহস্য। শুকনো মুখের অপ্রাপ্য রস গিলিবার চেষ্টার সঙ্গে চাষার গরু তাড়ানোর মত একটা আওয়াজ করিয়া সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

চারকোণা মাঝারি আকারের ঘর, আসবাব ও জিনিষপত্রে ঠাসা। এই ঘরখানাই রাজকুমারের শোয়ার ঘর, বসিবার ঘর, লাইব্রেরী, গুদাম এবং আরও অনেক কিছু। অনেক কালের পুরাণো খাটখানাই এক চতুর্থাংশ স্থান—আরও একটু নিখুঁত হিসাব ধরিলে ৪৫৭/১৭৭৬ স্থান, রাজকুমার একদিন খেয়ালের বশে মাপিয়া দেখিয়াছে,—দখল করিয়া আছে। বই বোঝাই তিনটি আলমারি ও একটি টেবিল, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ওষুধের শিশি, কাচের গ্লাস, চায়ের কাপ, জুতাপালিশের কৌটা, চশমার খাপ প্রভৃতি অসংখ্য খুঁটিনাটি জিনিষে বোঝাই আরেকটি টেবিল, তিনটি চেয়ার, একটি ট্রাঙ্ক এবং দুটি বড় ও একটি ছোট চামড়ার সুটকেশ, ছোট একটি আলনা, এ সমস্ত কেবল পা ফেলিবার স্থান রাখিয়া বাকী মেঝেটা আত্মসাৎ করিয়াছে।

তবে রাজকুমার কোনরকম অসুবিধা বোধ করে না। এ ঘরে থাকিতে তার বরং রীতিমত আরাম বোধ হয়। ঘরখানা যেমন জিনিষপত্রে বোঝাই, তেমনি অনেক দিনের অভ্যাস ও ঘনিষ্ঠতার স্বস্তিতেও ঠাসা।

এই ঘরে মাথাধরার যন্ত্রণা সহ্য করিবার মধ্যেও যেন মৃদু একটু শান্তি আর সান্ত্বনার আমেজ আছে। জগতের কোটি কোটি ঘরের মধ্যে এই চারকোণা ঘরটিতেই কেবল নির্ব্বিকার অবহেলার সঙ্গে গা এলাইয়া দিয়া সে মাথার যন্ত্রণায় কাবু হইতে পারে।

মাথাধরা বাড়িবার আগে এবং স্থায়ীভাবে গা এলানোর আগে কয়েকটি ব্যবস্থা করিয়া ফেলা দরকার। মনে মনে রাজকুমার ব্যবস্থাগুলির হিসাব করিতে লাগিল। রসিকবাবুর বাড়ী গিয়া গিরীন্দ্রনন্দিনীর মাকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ রাত্রে তাদের বাড়ী খাওয়া অসম্ভব। অবনীবাবুর বাড়ী গিয়া মালতীকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ সে তাকে

পড়াইতে যাইতে পারিবে না। স্যার কে, এল-এর বাড়ী গিয়া রিণিকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ তার সঙ্গে কারো পার্টিতে যাওয়া বা জলতরঙ্গ বাজনা শোনানোর ক্ষমতা তার নাই। কেদারবাবুর বাড়ী গিয়া সরসীকে বলিয়া আসিতে হইবে, সমিতির সভায় গিয়া আজ সে বক্তৃতা দিলে, সকলে শুধু 'উঃ আঃ' শব্দই শুনিতে পাইবে। রাজেনকে একটা ফোন করিয়া দিতে হইবে, কাল সকালে কাজে ফাঁকি না দিয়া তার উপায় নাই।

এই কাজগুলি শেষ করিতে বেশীক্ষণ সময় লাগিবে না, াগরি, মালতী, রিণি আর সরসী চার জনের বাড়ীই তার বাড়ীর খুব কাছে, একরকম পাশের বাড়ীই বলা যায়। পশ্চিমে বড় রাস্তার ধারে স্যর কে, এল-এর প্রকাণ্ড বাড়ীর পিছনে তার বাড়ীটা আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে, স্যর কে, এল-এর বাড়ীর পাশের গলি দিয়া দিয়া ঢুকিয়া তার বাড়ীর সদর দরজায় পৌঁছিতে হয়। উত্তরে গলির মধ্যে তার বাড়ীর অপর দিকে কেদার বাবুর বাড়ী। পূবে গলির মধ্যে আর একটু আগাইয়া গেলে ডান দিকে যে আরও ছোট গলিটা আছে তার মধ্যে ঢুকিলেই বাঁ দিকে অবনীবাবুর বাড়ী। দক্ষিণে ছোট গলিটা ধরিয়া খানিক আগাইয়া ডানদিকে হঠাৎ মোর ঘুরিবার পর রসিকবাবুর বাড়ী এবং গলিটারও সেইখানেই সমাপ্তি। রিণি আর সরসী দুজনের বাড়ীতেই ফোন আছে, রাজেনকে ফোন করিতেও হাঙ্গামা হইবে না।

কতকটা পাঞ্জাবী এবং কতকটা সার্টের মত দেখিতে তার নিজস্ব ডিজাইনের জামাটি গায়ে দিয়া রাজকুমার ঘরের বাহিরে আসিল।

বাড়ীর দোতলার অর্দ্ধেকটা দখল করিয়া আছে স্বামি-পুত্র এবং স্বামীর দু'টি ভাইবোন সহ মনোরমা নামে রাজকুমারের এক দূর সম্পর্কের দিদি। প্রথমে তারা ভাড়াটে হিসাবেই আসিয়াছিল এবং প্রথম মাসের বাড়ী ভাড়াও দিয়াছিল ভাড়াটে হিসাবেই। কিন্তু সেই এক মাসের মধ্যে প্রায়-সম্পর্কহীন ভাইবোনের সম্পর্কটা একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ানোয় মনোরমা একদিন বলিয়াছিল, ছাখো ভাই রাজু, তোমার হাতে ভাড়ার টাকা তুলে দিতে কেমন যেন লজ্জা করে।

শুনিয়া রাজকুমার ভাবিয়াছিল, সেরেছে! এই জন্য সম্পর্ক আছে এমন মানুষকে ভাড়াটে নিতে অজিত বারণ করেছিল!

মনোরমা আবার বলিয়াছিল, ভাড়া দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক তো তোমার সঙ্গে আমাদের নয়।

রাজকুমার কথা বলে নাই। বলিতে পারে নাই।

—তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না? একলা মানুষ তুমি, ঠাকুর চাকর রেখে হাঙ্গামা পোয়াবার তোমার দরকার? আমি থাকতে ঠাকুরের রান্নাই বা তোমাকে খেতে হবে কেন?

গজেন মন্দ রাঁধে না।

আহা, কি রান্নাই রাঁধে! কদিন খেয়েছি তো এটা ওটা চেয়ে নিয়ে। জিভের স্বাদ তোমার নষ্ট হয়ে গেছে রাজু ভাই, দু'দিন আমার রান্না খেয়ে ওর ডাল তরকারী মুখে দিতে পারবে না।

প্রস্তাবটা প্রথমে রাজকুমারের ভাল লাগে নাই। একে নিজের জন্য ঠাকুর চাকর রাখিয়া সংসার চালানোর যত হাঙ্গামাই থাক, যে ভাবে খুসী সংসার চালানো এবং যা খুসী করা, যখন খুসী আর যা খুসী খাওয়ার সুখটা আছে। কিন্তু এখন মনোরমা আর অজানা অচেনা প্রায় সম্পর্কহীনা আত্মীয়া নয়, এক মাসে সে প্রায় আসল দিদিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তার এ ধরণের প্রস্তাবে না-ই বলা যায় কেমন করিয়া?

সেই হইতে মনোরমা ভাড়ার বদলে রাজকুমারকে চার বেলা খাইতে দেয়, তার ঘরখানা গুছানো ছাড়া দরকারী অন্য সব কাজও করিয়া দেয়। রাজকুমার তার ঘর গুছাইতে দিলে যে মনোরমা নিজেই হোক বা তার ননদকে দিয়াই হোক এ কাজটা করিয়া দিত, তাতেও কোন সন্দেহ নাই।

রাজকুমার বাহিরে যাইতেছে টের পাইয়া মনোরমা ডাকিল কে যায়? রাজু? একবারটি শুনে যাবে রাজু ভাই, শুধু একটিবার?

দিনের মধ্যে রাজকুমারকে সে অন্ততঃ আট দশ বার ডাকে কিন্তু প্রত্যেকবার তার ডাক শুনিয়া মনে হয়, এই তার প্রথম এবং শেষ আহ্বান, আর কখনো ডাক দিয়া সে রাজকুমারকে বিরক্ত করিবে না। দক্ষিণের বড় লম্বাটে ঘরখানার মেঝেতে বসিয়া মনোরমা সেলাই করিতেছিল। এ ঘরে আসবার খুব কম। খাট, ড্রেসিং টেবিল আর ছোট একটি আলমারি ছাড়া আর যা আছে সে সবের জন্য বেশী যায়গা দিতে হয় নাই। পরিষ্কার লাল মেঝেতে গরমের সময় আরামে গড়াগড়ি দেওয়া চলে।

এত শীগগিরি যাচ্ছ কেন রাজু ভাই?

সেখানে খাচ্ছি না।

কোথায় যাচ্ছ তবে?

একটা ফোন করে আসব।

ও, ফোন করবে। পাঁচটার সময় ওখানে যেও, তা' হলেই হবে। কালী সেজে গুজে ঠিকঠাক হয়ে থাকবে, বলে দিয়েছি।

আজ যেতে পারব না দিদি।

মনোরমা হাসিমুখে বলিল, পারবে না? একটা কাজের ভার নিয়ে শেষকালে ফ্যাসাদ বাধানোর স্বভাব কি তোমার যাবে না, রাজু ভাই? কালীকে আজ আনাব বলে রেখেছি, কত আশা করে আছে মেয়েটা, কে এখন ওকে আনতে যাবে?

আমার মাথা ধরেছে—ধরেছে।

আবার মাথা ধরেছে? কতবার বললাম একটা মাদুলি নাও—না না, ওসব কথা আর আরম্ভ ক'রো না রাজু ভাই,

ওসব আমি জানি, আমি মুখ্যু গেঁয়ো মেয়ে নই। মাদুলি নিলে মাথাধরা সেরে না যাক, উপকার হবে।

ছাই হবে।

কিছু উপকার হবেই। ভূতেও তো তোমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু রাত দুপুরে একা একা শ্মশান ঘাটে গিয়ে দেখো তো, একবার ভয় না করলেও দেখবে কেমন কেমন লাগবে। অবিশ্বাস করেও তুমি একটা মাদুলি নাও, আমার কথা শুনে নাও, মাথার যন্ত্রণা অন্ততঃ একটু কম হবেই।

মনোরমা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

মাথা ধরুক আর যাই হোক, কালীকে তোমার আনতে যেতে হবেই রাজুভাই। না গেলে কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

বেশ বুঝা যায়, মনোরমা রাগ করে নাই, শুধু অভিমানে মুখ ভার করিয়াছে। স্নেহের অভিমান, দাবীর অভিমান।

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, দেখি। যেতে পারলে যাব'খন।

গিরীন্দ্রনন্দিনীর মা ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। গিরি নিজেই দরজা খুলিয়া দিল। রোগা লম্বা পনের ষোল বছরের মেয়ে, তের বছরের বেশী বয়স মনে হয় না। রাজকুমারের পরামর্শে রসিকবাবু মেয়েকে সম্প্রতি একটি পুষ্টিকর টনিক খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। টনিকের নামটা রাজকুমার অজিতের কাছে সংগ্রহ করিয়াছিল।

অজিত বলিয়াছিল, এমন টনিক আর হয় না রাজু। ভুল করে একবার একটা সাত বছরের মেয়েকে খেতে দিয়েছিলাম, তিন মাস পরে মেয়েটার বাবা পাগলের মত তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করল।

গিরি মাসখানেক টনিকটা খাইতেছে কিন্তু এখনও কোন ফল হয় নাই। তবু সেমিজ ছাড়া শুধু ডুরে শাড়ীটি পরিয়া থাকার জন্য গিরি যেন সঙ্কোচে একেবারে কাবু হইয়া গেল। যতই হোক, বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তো, পনের ষোল বছর বয়স তো তার হইয়াছে। ডুরে শাড়ী দিয়া ক্রমাগত আরও ভালভাবে নিজেকে ঢাকিবার অনাবশ্যক ও খাপছাড়া চেষ্টার জন্য গিরির মত অল্প অল্প বোকাটে ধরণের সহজ সরল হাসিখুসী ছেলেমানুষ মেয়েটাকে পর্য্যন্ত মনে হইতে লাগিল বয়স্কা পাকা মেয়েমানুষ।

ছোট উঠান, অতিরিক্ত ঘষা থাকায় ঝকঝকে, তবু যেন অপরিচ্ছন্ন। কলের নীচে ছড়ানো এঁটো বাসন, একগাদা ছাই, বাসন মাজা ন্যাতা, ক্ষয় পাওয়া ঝাঁটা, নালার ঝাঁঝরার কাছে পানের পিকের দাগ, সিঁড়ির নীচে কয়লা আর ঘুঁটের স্তূপ, শুধু এই কয়েকটি সঙ্কেতেই যেন সযত্নে সাফ করা উঠানটি নোংরা হইয়া যাইতেছে।

কোথা পালাচ্ছ? শুনে যাও?

একধাপ সিঁড়িতে উঠিয়া গিরি দাঁড়াইল এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজকুমার যা বলিতে আসিয়াছে শুনিল। তারপর কাতরভাবে অভিমানের ভঙ্গিতে খোঁচা দেওয়ার সুরে বলিল, তা খাবেন কেন গরীবের বাড়ীতে।

আমার ভীষণ মাথা ধরেছে গিরি।

মাথা আমারও ধরে। আমি তো খাই!

তুমি এক নম্বরের পেটুক, খাবে বৈকি।

আমি পেটুক না আপনি পেটুক? সেদিন অতগুলো ক্ষীরপুলি —গিরি খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। ডুরে শাড়ী সংক্রান্ত কুৎসিত সঙ্কেতের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের মন হইতে মিলাইয়া গেল রোদের তেজে কুয়াশার মত। একটু গ্লানিও সে বোধ করিতে লাগিল। নিজের অতিরিক্ত পাকা মন নিয়া জগতের সরল সহজ মানুষগুলিকে বিচার করিতে গিয়া হয়তো আরও কতবার সে অমনি অবিচার করিয়াছে। নিজের মনের আলোতে পরের সমালোচনা সত্যই ভাল নয়।

কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত করিয়া সে বলিল, সন্ধ্যা থেকে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকব কিনা, তাই খেতে আসতে পারব না।

খেয়ে গিয়ে বুঝি শুয়ে থাকা যায় না?

খেলে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। আজ উপোস দেব ভাবছি।

গিরি গম্ভীর হইয়া বলিল, না খেলে মাথাধরা আরও বাড়বে। শরীরে রক্ত কম থাকলে মাথা ধরে। খাদ্য থেকে রক্ত হয়।

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, তোমার সেই ডাক্তার বলেছে বুঝি যে তোমার নাড়ী খুঁজে পায় নি?

কয়েক মাস আগে গিরির জ্বর হইয়াছিল, দেখিতে আসিয়া ডাক্তার নাক তার কব্জি হাতড়াইয়া নাড়ী খুজিয়া পান নাই! হয়তো নাড়ী খুব ক্ষীণ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, গিরির পাল্‌স নাই। সেই হইতে গিরি সগর্ব্বে সকলের কাছে গল্প করিয়া বেড়ায়, সে এমন আশ্চর্য্য মেয়ে যে তার পাল্‌স পর্য্যন্ত নাই। সকলের যা আছে তার যে তা নাই, এতেই গিরির কত আনন্দ, কত উত্তেজনা। রাজকুমারের কাছেই সে যে কতবার এ গল্প বলিয়াছে তার হিসাব হয় না। রাজকুমার অনেকবার তাকে বুঝাইয়া বলিয়াছে, কি ভাবে মানুষের হার্টের কাজ চলে, কি ভাবে শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল করে—অনেক কিছু বুঝাইয়া বলিয়াছে। বোকা মেয়েটাকে নানা কথা বুঝাইয়া বলিতে তার বড় ভাল লাগে। কিন্তু গিরি বুঝিয়াও কিছু বুঝিতে চায় না।

সত্যি আমার নাড়ী নেই। আপনার বুঝি বিশ্বাস হয় না?

বাঁচিয়া থাকার সঙ্গে নাড়ীর স্পন্দন বজায় থাকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাটা রাজকুমার অনেকবার গিরিকে বুঝাইয়া বলিয়াছে, কোনদিন তার হাত ধরিয়া নাড়ীর অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে নাই। আজ সোজাসুজি গিরির ডান হাতটি ধরিয়া বলিল, দেখি, কেমন তোমার নাড়ী নেই।

গিরি বিব্রত হইয়া বলিল, না না, আজ নয়। এখন নয়।

রাজকুমার হাসিমুখে বলিল, এই তো দিব্বি টিপ্ টিপ্ করছে পাল্‌স্।

গিরি আবার বলিল, থাক না এখন, আরেকদিন দেখবেন।

গিরির মুখের ভাব লক্ষ্য করিলে রাজকুমার নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ছাড়িয়া দিয়া তফাতে সরিয়া যাইত এবং নিজের পাকা মনের আলোতে জগতের সহজ সরল মানুষ-গুলিকে বিচার করিবার জন্য একটু আগে অনুতাপ বোধ করার জন্য নিজেকে ভাবিত ভাবপ্রবণ। কিন্তু গিরির সঙ্গে তামাসা আরম্ভ করিয়া অন্যদিকে তার মন ছিল না।

হাসির বদলে মুখে চিন্তার ছাপ আনিয়া সে বলিল, তোমার পাল্‌স্ তো বড় আস্তে চলছে গিরি। তোমার হার্ট নিশ্চয় খুব দুর্ব্বল। দেখি—

ডুরে শাড়ীর নীচে যেখানে গিরির দুর্ব্বল হার্ট স্পন্দিত হইতেছিল, সেখানে হাত রাখিয়া রাজকুমার স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করিতে লাগিল। গিরির মুখের বাদামী রঙ প্রথমে হইয়া গেল পাঁশুটে, তারপর হইয়া গেল কালোটে। একে আজ গায়ে তার সেমিজ নাই, তারপর চারিদিকে নাই মানুষ। কি সর্ব্বনাশ!

ছি ছি! এসব কি!

রাজকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কি হয়েছে?

গিরি দমক মারিয়া তার দিকে পিছন ফিরিয়া, একবার হোঁচট খাওয়ার উপক্রম করিয়া তরতর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। রাজকুমার হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। একি ব্যাপার?

ব্যাপার বুঝা গেল কয়েক মিনিট পরে উপরে গিয়া। গিরির মা পাটিতে পা ছড়াইয়া হাতে ভর দিয়া বসিয়া আছেন। দেখিলেই বুঝা যায়, সবে তিনি শয়নের আরাম ছাড়িয়া গা তুলিয়াছেন,—বসিবার ভঙ্গিতেও বুঝা যায়, মুখের ভঙ্গিতেও বুঝা যায়। মানুষটা একটু মোটা, গা তোলার পরিশ্রমেই বোধ হয় একটু হাঁপও ধরিয়া গিয়াছে।

রাজকুমার বলিতে গেল, গিরি—

গিরির মা বাধা দিয়া বলিলেন, লজ্জা করে না? বেহায়া নচ্ছার কোথাকার!

এমন সহজ সরল ভাষাও যেন রাজকুমার বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

গিরির মা আবার বলিলেন, বেরো হারামজাদা, বেরো আমার বাড়ী থেকে।

গিরির মার রাগটা ক্রমেই চড়িতেছিল। আরও যে কয়েকটা শব্দ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল সেগুলি সত্যই অশ্রাব্য।

রাজকুমার ধীরে ধীরে রসিকবাবুর বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, ক্ষুব্ধ আহত ও উদ্‌ভ্রান্ত রাজকুমার। ব্যাপারটা বুঝিয়াও সে যেন ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ যেন একটা যুক্তিহীন ভূমিকাহীন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তার কেবলি মনে হইতে লাগিল, দামী জামা কাপড় পরিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল, হঠাৎ কি ভাবে যেন পচা পাঁক ভরা নর্দ্দমায় পড়িয়া গিয়াছে। এইরকম একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার পর্য্যায়ে না ফেলিলে এ ব্যাপারটা যে সত্য সত্যই ঘটিয়া গিয়াছে একথা কল্পনা করাও তার অসম্ভব মনে হইতেছিল।

নিছক দুর্ঘটনা,—কারও কোন দোষ নাই, দোষ থাকা সম্ভব নয়। ভুল বুঝিবার মধ্যেও তো যুক্তি থাকে মানুষের, ভুল বুঝিবার সপক্ষে ভুল যুক্তির সমর্থন? গায়ে কেউ ফুল ছুঁড়িয়া মারিলে মনে হইতে পারে ফাজলামি করিয়াছে, সহানুভূতির হাসি দেখিয়া মনে হইতে পারে ব্যঙ্গ করিতেছে, কিন্তু ফুল আর হাসির আঘাতে হত্যা করিতে চাহিয়াছে একথা কি কোনদিন কারো মনে হওয়া সম্ভব? কতটুকু মেয়েটা! বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করিবার সময় বুকটা তার বালকের বুকের মত সমতল মনে হইয়াছিল। যে মেয়ের দেহটা পুরুষের উপভোগের উপযুক্ত হইতে আজও পাঁচ সাত বছর বাকী আছে সেই মেয়ের মনে তার সহজ সরল ব্যবহারটির এমন ভয়াবহ অর্থ কেমন করিয়া জাগিল?

মাথা ধরার কথাটা কিছুক্ষণের জন্য রাজকুমার ভুলিয়া গিয়াছিল, বাকী যে কয়েকটা কর্ত্তব্য পালন করিবে ঠিক করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সেগুলির কথাও মনে ছিল না। নিজের বাড়ীর দরজার সামনে পৌঁছিয়া মাথাধরা আর দরকারী কাজের কথা একসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু ফিরিতে আর সে পারিল না, নিজের ঘরখানার জন্য তার মন তখন ছটফট করিতেছে। জিনিষপত্রে ঠাসা ওই চারকোণা ঘরে যেন তার মাথাধরার চেয়ে কড়া যে বর্ত্তমান মানসিক যন্ত্রণা তার ভাল ওষুধ আছে।

কে যায়? রাজু? একবারটি শুনে যাবে রাজু ভাই, এক মিনিটের জন্যে?

এবার দেখা গেল, মনোরমা তার দেড় বছরের ছেলেকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। কচি কচি হাত দিয়া খোকা তার আঁচলে ঢাকা পরিপুষ্ট স্তন দুটিকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। রাজকুমারের দৃষ্টি দেখিয়া মনোরমা মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, এমন দুষ্ট হয়েছে ছেলেটা! খায় না কিন্তু ঘুমোনোর আগে ধরা চাই। মনে মনে খাওয়ার লোভটা এখনো আছে আর কি।

তুমিই ওর স্বভাবটা নষ্ট করছ দিদি। ধরতে দাও কেন? মনোরমা আবার মৃদু হাসিল।

ত্যাখো না ছাড়াবার চেষ্টা করে?

সরল সহজ আহ্বান, একান্ত নির্ব্বিকার। পঞ্চাশ বছরের একজন স্ত্রীলোক যেন তার কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথা হইতে দু'টি পাকা চুল তুলিয়া দিতে বলিতেছে দশ বার বছরের এক বালককে। গিরীন্দ্রনন্দিনীর বাড়ী ঘুরিয়া আসিবার

আগে হইলে হয়তো রাজকুমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা অস্বস্তি বোধ করিত না, এখন মনোরমার প্রস্তাবে সে যেন নিজের মধ্যে কুঁচকাইয়া গেল।

মনোরমা একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, খোকাকে ছোঁয়ার নামেই ভড়কে গেলে! ছোট ছেলেপিলেকে ছুঁতেই তোমার এত ঘেন্না কেন বল তো রাজু ভাই?

রাজকুমার বিব্রত হইয়া বলিল, না না, ঘেন্না কে বললে, ঘেন্না কিসের!

তারপর অবশ্য মনোরমার স্তন হইতে খোকার হাত দু'টি ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা তাকে করিতে হইল। মনোরমা স্নেহের আবেশে মুগ্ধ চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল তার আধ ঘুমন্ত খোকার নির্ব্বিকার প্রশান্ত মুখে কান্না-ভরা প্রচণ্ড প্রতিবাদের দ্রুত আয়োজন আর জগতের অষ্টমাশ্চর্য্য দেখিবার মত বিস্ময়ভরা চোখ মেলিয়া রাজকুমার দেখিতে লাগিল মনোরমার মুখ। খোকার কচি হাত আর মনোরমার কোমল স্তনের স্পর্শ যেন অবিস্মরণীয় সুগন্ধি অনুভূতিতে ভরা তেজস্কর রসায়নের মত তার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিতে লাগিল। তার আহত মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল।

খোকার হাত বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখা গেল না, তীক্ষ্ণ গলার প্রচণ্ড আর্ত্তনাদে কাণে তালা ধরাইয়া সে তখন প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়িবার জন্য ছটফট করিতেছে।

মনোরমা বলিল, দেখলে?

রাজকুমার মেঝেতে বসিয়া বলিল, হুঁ, ছোঁড়ার সত্যি তেজ আছে!

মনোরমার হাসিভরা মুখখানা মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া গেল। ভুরু বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, ছোঁড়া বলছ কাকে শুনি?

রাজকুমার থতমত খাইয়া গেল।—আহা এমনি বলেছি, আদর করে বলেছি—

মনোরমার রাগ ঠাণ্ডা হইল না।—বেশ আদর তো তোমার! আমার ছেলেকে যদি আদর করে ছোঁড়া বলতে পার, আমাকেও তো তবে তুমি আদর করে বেশ্যা বলতে পার অনায়াসে! এ আবার কোন্ দেশী আদর করা, এমন কুচ্ছিৎ গাল দিয়ে!

ছোঁড়া কথাটা তো গাল নয় দিদি!

নয়? ছোঁড়া কাদের বলে শুনি? যারা নেংটি পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, পকেট মারে, মদ-গাঁজা ভাং খায়, মেয়েদের দেখলে শিস্ দেয়, বিচ্ছিরি সব ব্যারামে ভোগে—আমি জানি না ভেবেছ!

অনেক প্রতিবাদেও কোনও ফল হইল না, আহতা অভিমানিনী মনোরমার মুখের মেঘ স্থায়ী হইয়া রহিল! নিজেই অবশ্য সে কথাটা চাপা দিয়া দিল, বলিল যে যাকগে, থাক, ওকথা বলে আর হবে কি, আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার কথাই রইল রাজু ভাই, তুমি কিছু ভেবে কথাটা বলোনি,—কিন্তু বেশ বুঝা যাইতে লাগিল, মনে মনে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আছে।

ফোন করেছ?

না, এইবার যাব।

ফোন করতেই না গেলে?

না, গিরিদের বাড়ী গিয়েছিলাম। ফোন করার কথাটা মনে ছিল না।

খেয়াল খুসীর বাধা অপসারিত হওয়ায় একটু পরেই খোকা আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গম্ভীর মুখে অকারণে খোকার মুখে একটা চুমা খাইয়া মনোরমা বলিল, গিরিদের বাড়ী কেন?

গিরির মা রাত্রে খেতে বলেছিল, তাই বলতে গিয়েছিলাম, আজ আর খেতে যেতে পারব না।

কে কে ছিল বাড়ীতে? গিরি কি করছিল?

গিরি মার কাছে শুয়েছিল। ওরা দুজনেই বাড়ীতে ছিল, এসময় আর কে বাড়ী থাকবে?

দরজা খুলল কে?

এ রীতিমত জেরা। মনোরমার মুখের গাম্ভীর্য্য যেন একটু কমিয়াছে, গলার স্বরে বেশ আগ্রহ টের পাওয়া যায়।

রাজকুমারের একবার ক্ষণেকের জন্য মনে হইল, মনোরমাকে সব কথা খুলিয়া বলে। গিরি আর গিরির মা তাদের অসভ্য গেঁয়ো মনোবৃত্তি নিয়া অকারণে বিনা দোষে তাকে আজ কি অপমানটা করিয়াছে আর মনে কত কষ্ট দিয়াছে, সবিস্তারে জানাইয়া মনোরমার সহানুভূতি আদায় করিয়া একটু সুখ ভোগ করে। খোকাকে ছোঁড়া বলার জন্য মনোরমা এমন খাপছাড়া ভাবে ফোঁস করিয়া না উঠিলে সে হয়ত বিনা দ্বিধাতেই ব্যাপারটা তাকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দিত। এখন ভরসা পাইল না। খোকাকে উপলক্ষ করিয়া অসাধারণ ধীরতা, স্থিরতা, সরলতা আর সুবিবেচনার পরিচয় দিয়া মনোরমা তার মনে যে অগাধ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়াছিল, কয়েক মিনিট পরে খোকাকে উপলক্ষ করিয়াই মনোরমা নিজেই আবার সে শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সব কথার ঠিক মানেই যে মনোরমা বুঝিবে, সে ভরসা রাজকুমারের আর নাই। কে জানে নিজের মনে ব্যাপারটার কি ব্যাখ্যা করিয়া সে কি ভাবিয়া বসিবে তার সম্বন্ধে!

তাই সে বিরক্ত হওয়ার ভান করিয়া জবাব দিল, গিরি দরজা খুলল, কে আবার খুলবে?

মনোরমা কতক্ষণ কি যেন ভাবিল। মুখের গাম্ভীর্য্য ক্রমেই তার কমিয়া যাইতেছিল।

একটা কথা তোমায় বলি ভাই, রাগ কোরো না কিন্তু। তোমার ভালর জন্যই বলা। আমি কিছু ভেবে বলছি না কথাটা, শুধু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। জেনে শুনে যদি দরকার মত তোমার সাবধান করেই না দিলাম, আমি তবে তোমার কিসের দিদি? অত বেশী যখন তখন গিরিদের বাড়ী আর যেও না।

কেন ?

আহা, কেমন ধারা মানুষ ওরা তা তো জান ? গেঁয়ো অসভ্য মানুষ ওরা, কুলি মজুরদের মত ছোট মন ওদের, সব কথার বিচ্ছিরি দিকটা আগে ওদের মনে আসে। বড় হলে ভাই বোন যদি নির্জ্জনে বসে গল্প করে, তাতেও ওরা ভয় পেয়ে যায়। বড় সড় একটা মেয়ে যখন বাড়ীতে আছে, কি দরকার তোমার যখন তখন ওদের বাড়ী যাবার ? বিপদে পড়ে যাবে একদিন।

ওইটুকু একটা মেয়ে—

মনোরমা বাধা দিয়া বলিল, ওইটুকু মেয়ে মানে ? আজ মেয়ের বিয়ে দিলে ওর মা একবছর পরে নাতির মুখ দেখবার আশায় থাকবে। ওরা তো আর তোমাদের মত মানুষ নয় রাজু ভাই যে ওইটুকু দেখায় বলেই ভাববে আজও মেয়ের ফ্রক পরে থাকার বয়েস আছে। যেমন ধরো ও বাড়ীর রিণি, গিরির চেয়ে বয়সেও বড় এমনিও বড় দেখায় ওকে। সেদিন রিণিকে একা নিয়ে তুমি বায়স্কোপ দেখাতে গেলে, একদিন গিরিকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেখো তো ওর বাপ মা কি বলে ?

মনোরমার মুখের গাম্ভীর্য্য একেবারেই উপিয়া গিয়াছে, তার সুন্দর মুখখানিতে থম থম করিতেছে কথা বলার আবেগ।

তারপর ধর সরসী। ওর বাড়ন্ত গড়ন দেখলে আমারি ভয় করে, সে দিন তুমি ওর হাত ধরে টানছিলে—

তামাসা করছিলাম।

তামাসাই তো করছিলে। কিন্তু একদিন তামাসা করতে গিয়ে ওমনি ভাবে গিরির হাত ধরে টেনো দিকি কি কাণ্ডটা হয়। সরসীর বাপ মা হাসছিল, গিরির বাপ মা তোমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। তুমি তো আর সামলে সুমলে চলতে জান না নিজেকে, তাই বলছিলাম, নাই বা বেশী মেলামেশা করলে ওদের সঙ্গে ?

খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া নিজেও মনোরমা কাত হইয়া তার পাশে শুইয়া পড়িল।

কালীকে আনতে যাবে না রাজু ভাই ?

যাব।

ঘরে গিয়া রাজকুমার বিছানায় শুইয়া পড়িল। মাথা ধরার কথাটা আবার সে ভুলিয়া গিয়াছে। শুইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া সে আকাশ পাতাল ভাবিতে থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, তবে, তবে কি গিরি আর গিরির মার কোন দোষ ছিল না, সেই-বোকার মত একটা অসঙ্গত কাজ করিয়া তার স্বাভাবিক ফল ভোগ করিয়াছে ? মনোরমা পর্য্যন্ত জানে যে গিরির হাত ধরিয়া টানার অপরাধে তাকে জ্যান্ত পুড়াইয়া মারাটাই গিরির বাপ মার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। তাই যদি হয়, এমনি সব রীতিনীতি চালচলনের মধ্যে এমনি সব মনের সাহচর্য্যে গিরি যদি বড় হইয়া থাকে আর দশটি মেয়ের মত, তবে তো সে খাপছাড়া কিছুই করে নাই, ও অবস্থায় তার মত আর দশটি মেয়ে যা করিত সেও তাই করিয়াছে। এবং মনোরমার কথা শুনিয়া তো মনে হয় ওরকম আর দশটি মেয়ের অভাব দেশে নাই।

বুঝিয়া চলিতে না পারিয়া সেই কি তবে অন্যায় করিয়াছে ? কিন্তু রাজকুমারের মন সায় দিতে চায় না। ব্যাপারটা যদি সংসারের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত খাপছাড়া একটা দুর্ঘটনা নাও হয়, অসাধারণ কোন কারণে ভুল করার বদলে আর দশটি মেয়ের মত নিজের রুচি মাফিক সঙ্গত কাজই গিরি করিয়া থাকে, গিরির মার গালাগালিটাও যদি সংসারের সাধারণ চলতি ব্যাপারের পর্য্যায়ে গিয়া পড়ে তবে তো সমস্ত ব্যাপারটা হইয়া দাঁড়ায় আরও কদর্য্য। এমন বীভৎস মনের অবস্থা কেন হইবে মানুষের ? এমন পারিপার্শ্বিকতাকে কেন মানুষ মানিয়া লইবে যার প্রভাবে মানুষের মন এতখানি বিকারগ্রস্ত আর কুৎসিত হইয়া যায় ?

মাথাটা আবার ভার মনে হইতে লাগিল। সত্যই কি আজ তার মাথা ধরিবে, না, অনেক চিন্তা আর উত্তেজনার ফলে আজ মাথাটা এরকম করিতেছে ? একবার স্যর কে, এল-এর বাড়ী গেলে হয় না, সে যে আজ তার পার্টিতে যাইতে পারিবে না এই কথাটা রিণিকে বলিয়া আসিতে ? এবং একবার রিণির হাত ধরিয়া টানিয়া আসিতে ?

রাজকুমারের মনে হইতে লাগিল, একবার রিণিদের বাড়ী গিয়া খেলার ছলে রিণির হাত ধরিয়া টানিয়া আর ব্লাউসের একটা বোতাম পরীক্ষা করিয়া সে যদি আজ প্রমাণ না করে যে ভদ্র মানুষ সব সময় সব কাজের কদর্য্য মানে করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে না, তবে তার মাথাটা ধীরে ধীরে বোমায় পরিণত হইয়া ফাটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

রিণি চমৎকার গান গাহিতে পারে। অন্ততঃ লোকে তাই বলে। গলাটি তার মৃদু ও মিহি, সুরগুলি তার কোমল ও করুণ, গান সে শিখিয়াছে নামকরা এক ওস্তাদের কাছে। ওস্তাদের বুদ্ধি ছিল তাই তিনি শিষ্যাকে কিছুমাত্র ওস্তাদি শিখাইবার চেষ্টা করেন নাই, শুধু শিখাইয়াছেন মোলায়েম সুর। কেউ কেউ অবশ্য বলে যে রিণি গান করে না, বিড়াল ছানার ছাড়া ছাড়া করুণ আওয়াজটাকেই একটানা উচ্চারণ করিয়া যায়, তবু অনেকের কাছেই রিণির গান ভাল লাগে। মনটা উদাস হইয়া যায় অনেকের, ঘুমের বাহন ছাড়াই স্বগত স্বপ্ন নামিয়া আসে অনেকের চোখে, লজ্জা ও বেদনার সঙ্গে অনেকের মনে হয় যে এত ঘষামাজার পরেও তো তারা

মার্জ্জিত জীবনযাত্রার পথে বিনা চেষ্টায় পিছলাইয়া চলিবার মত মোলায়েম হইতে পারে নাই।

শুর কে, এল-এর বাড়ীর সদরের সুশ্রী দরজাটি পার হইয়া ভিতরে পা দেওয়া মাত্র টের পাওয়া যায়, বাহিরের রাস্তাটা কি নোংরা। কতবার রাজকুমার এ দরজা পার হইয়াছে কিন্তু একবারও দরজাটি পার হওয়ার একমুহূর্ত্ত আগে এই অভিজ্ঞতা তার মনে পড়ে না। শুর কে, এল-এর বাড়ীর ভিতরটা শুধু দামী ও সুশ্রী আসবাবে সুন্দরভাবে সাজানো নয়, সদর দরজার এপাশে এবাড়ীর বিস্ময়কর রূপ ও শ্রীর মহিমাটাই শুধু স্পষ্ট হইয়া নাই, কি যেন একটা ম্যাজিক ছড়ানো আছে চারিদিকে,—পার্থক্য ও দূরত্বের ইঙ্গিতভরা এক অহঙ্কারী আবেষ্টনীর দুর্ব্বোধ্য প্রভাবের ম্যাজিক।

বাড়ীতে ঢুকিলেই রাজকুমার একটু ঝিমাইয়া যায়। একটা অদ্ভুত কথা তার মনে হয়। মনে হয়, অনেকদিন আগে একবার এক পাহাড়ে একজন সংসারত্যাগী কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর গুহায় ঢুকিয়া তার যেমন গা ছমছম করিয়াছিল, এখানেও ঠিক তেমনি লাগিতেছে। আরাম উপভোগের আধুনিকতম কত আয়োজন এখানে, তবু তার মনে হয় এ বাড়ীতে যারা বাস করে তারা যেন ধূলামাটির বাস্তব জগতকে ত্যাগ করিয়াছে, রক্তমাংসের মানুষের হাসিকান্নায় ভরা সাধারণ স্বাভাবিক জীবনকে এড়াইয়া চলিতেছে।

উপরে গিয়া রাজকুমার টের পাইল, রিণি বড় হল ঘরে গান গাহিতেছে। আজ পার্টিতে যে গানটি গাহিবে খুব সম্ভব সেই গানই প্র্যাকটিস করিতেছে। ঘরে গিয়া রাজকুমার রিণির কাছে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। বড় কোমল গানের কথাগুলি, বড় মধুর গানের সুরটি। রাজকুমার হয়তো একটু মুগ্ধ হইয়া যাইত, কিন্তু সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে টের পাইয়াও রিণি টের না পাওয়ার ভান করিয়া আপন মনে গাহিয়া চলিতেছে বুঝিতে পারিয়া গানটা আর রাজকুমারের তেমন ভাল লাগিল না।

গান শেষ করিয়া রিণি মুখ তুলিল। রাজকুমারের উপস্থিতি টের পাইয়াও টের না পাওয়ার ভান করিয়া এতক্ষণ গান করুক, ভাবাবেশে কি অ রূপ দেখাইতেছে রিণির মুখ!

এ গানটা গাইলেই আমার এমন মন কেমন করে! মনে হয় আমি যেন একা, আমি যেন—

ধীরে ধীরে রাজকুমারের হাত ধরিয়া রিণি তাকে আরেকটু কাছে টানিয়া আনিল, নিজের মুখখানা আরও উঁচু করিয়া ধরিল তার মুখের কাছে। গান গাহিয়া সে সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। রাজকুমারের কাছে আর কোনদিন সে এভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ে নাই।

প্রথমটা রাজকুমার বুঝিতে পারে নাই, তবে রিণির চোখ ও মুখের আহ্বান এত স্পষ্ট যে বুঝিতে বেশীক্ষণ সময় লাগা রাজকুমারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। বুঝিতে পারিয়াই সে বিবর্ণ হইয়া গেল।

না, ছি।

ও!

রিণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু তফাতে সরিয়া গেল। চোখে আর আবেশের ছাপ নাই, মুখে উত্তেজনার রঙ নাই। চোখের পলকে সে যেন পাথরের মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে।

কি চাই আপনার?

কিছু চাই না, এমনি তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আমার বড় মাথা ধরেছে, আজ আর তাই তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে পারব না।

রিণি বলিল, তা নিজে অসভ্যতা করতে না এসে, একটা নোট পাঠিয়ে দিলেই পারতেন? যাকগে, মাথা যখন ধরেছে, কি করে আর যাবেন!

রাজকুমার মরিয়া হইয়া বলিল, তোমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করব ভেবেছিলাম রিণি!

রিণি যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল —আমার সঙ্গে গল্প! আচ্ছা বলুন।

গল্প তাই জমিল না। একজন যদি মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া সুকৌশলে অতি সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত ভাবে খোঁচা দিয়া জানাইয়া দেয় যে অপর জন মানুষ হিসাবে অতি অভদ্র, গল্প আর চলিতে পারে কতক্ষণ?

কয়েক মিনিট পরেই রাজকুমার উঠিয়া গেল।

বিদায় নিয়া রাজকুমার তো ঘরের বাইরে চলিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে রিণি আবার আরম্ভ করিয়া দিল তার গানের প্র্যাকটিস। রাজকুমার তখন সবে সিঁড়ি দিয়া কয়েক ধাপ নামিয়াছে। রিণির গানের সেই অকথ্য করুণ সুর কানে পৌঁছানো মাত্র সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এত তাড়াতাড়ি রিণি নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারিয়াছে! সে তবে লজ্জা পায় নাই, অপমান বোধ করে নাই, বিশেষ বিচলিত হয় নাই? ব্যাপারটা রাজকুমারের বড়ই খাপছাড়া মনে হইতে লাগিল। সাগ্রহে মুখ বাড়াইয়া দিয়া চুম্বনের বদলে ধিক্কার শোনাটা এমনভাবে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া তো মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

রেলিং ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজকুমার ভাবিতে থাকে। তার ব্যবহারকে রিণি অসভ্যতা বলিয়াছিল। লজ্জা পাওয়ার বদলে সমস্তক্ষণ রিণির কথায় ব্যবহারে ও চোখের দৃষ্টিতে একটা অবজ্ঞা মেশানো অনুকম্পার ভাবই স্পষ্ট হইয়া ছিল। তখন রাজকুমার ভাবিয়াছিল, ওসব প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া। এখন তার মনে হইতে লাগিল, তার মনের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়া প্রথমে একটু রাগ এবং তারপর বিরক্তি ও অনুকম্পা বোধ করা ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়াই বোধ হয় রিণির মনে ঘটে নাই। শ্রীমতী গিরিন্দ্রনন্দিনী ও তার মাকে আজ যেমন তার বর্ব্বর মনে হইয়াছিল, তার সম্বন্ধেও রিণির ঠিক সেই রকম একটা ধারণাই সম্ভবত জন্মিয়াছে।

এবং সেজন্য রিণিকে দোষ দেওয়া চলে না। সত্যই সে রিণির সঙ্গে ছোটলোকের মত ব্যবহার করিয়াছে। কি আসিয়া যাইত রিণিকে চুম্বন করিলে? চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার চেয়ে এমন কি গুরুতর নরনারীর আলগা চুম্বন? একটু প্রীতি বিনিময় করা, একটু আনন্দ জাগানো, মৈত্রীর যোগাযোগকে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্পষ্টতরভাবে অনুভব করা। রিণি তাই চাহিয়াছিল। কিন্তু নিজে সে গিরীন্দ্র-নন্দিনীর পর্য্যায়ের মানুষ কিনা, চুম্বনের জের চরম মিলন পর্য্যন্ত টানিয়া না চলাটাও যে যুবকযুবতীর পক্ষে সম্ভব এ ধারণাও তার নাই কিনা, তাই সে ভাবিতেও পারে নাই রিণির আহ্বানে সাড়া দিলেও তাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা বজায় থাকিবে, অসঙ্গত ঘনিষ্টতায় পরিণত হইয়া যাইবে না।

চুম্বন অবশ্য নরনারীর মিলনেরই অঙ্গ, সুপবিত্র কোন আধ্যাত্মিক মিথ্যার ধোঁয়া সৃষ্টি করিয়া রিণির সঙ্গে তার চুম্বন বিনিময়কে সে ব্যাখ্যা করিতে চায় না। কেন সে ভাবিতে পারে নাই চুম্বনের ভূমিকাতেই সমাপ্তি ঘটানোর মত সংযম তাদের আছে? চোখ মেলিয়া রিণির রূপ সে দেখিয়া থাকে, কাছাকাছি বসিয়া হাসিগল্পের আনন্দ উপভোগ করে, মাঝে মাঝে স্পর্শ বিনিময়ও ঘটিয়া যায় কিন্তু আত্মহারা হইয়া পড়ার প্রশ্নও তো তাদের মনে জাগে না। সে কি কেবল এই জন্য যে ওই পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠতা দশজনে অনুমোদন করে? চুম্বন বিনিময়ে অনুমতি দেওয়া থাকিলে তো আজ তার মনে হইত না রিণিকে চুম্বন করা বিবেকের গায়ে পিন ফুটানো এবং একবার পিন ফুটাইলে একেবারে ছোরা বসাইয়া বিবেককে জখম না করিয়া নিস্তার থাকিবে না!

কেবল সে একা নয়, সকলেই এই রকম। অনেক পরিবারে পনের বছরের মেয়েরও বাপ ভাই ছাড়া কোন পুরুষের সামনে যাওয়া বারণ। এমন একটি মেয়ে যদি কেবল চুপি চুপি দুটি কথা বলার জন্যও পাশের বাড়ীর ছেলেটাকে ডাকে, ছেলেটা কি ভাবিবে? রিণি চুম্বন চাওয়ার খানিক আগে সে যা ভাবিয়াছিল।

এমন একটা বিকৃত আবেষ্টনীর মধ্যে তারা মানুষ হইয়াছে যে, অস্বাভাবিক মিথ্যা অসংযমকেই তারা স্বাভাবিক সত্য বলিয়া জানিতে শিখিয়াছে। মানুষ কেবল পরের নয়, নিজেরও সংযমে বিশ্বাস করে না। অসংযমের চেয়ে সংযম যে মানুষের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক, এ যেন কেউ কল্পনাও করিতে পারে না।

হঠাৎ রিণির গান বন্ধ হইয়া যাওয়ায় রাজকুমার সচেতন হইয়া উঠিল যে, সিঁড়ির মাঝখানে সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি সে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে হলঘরের এক কোণে অবনীবাবুর মেয়ে মালতী বসিয়াছিল। সামনে ছোট টেবিলটিতে একটি বই ও খাতা। খুব সম্ভব কলেজ হইতে ফিরিবার সময় শুধু কে, এল-এর বাড়ীতে ঢুকিয়াছে। এখানে একা বসিয়া দু'হাতের আটটি আঙ্গুলে টেবিলের উপর টোকা দিয়া টুকটাক আওয়াজ তুলিবার কারণটা রাজকুমার ঠিক বুঝিতে পারিল না। আট আঙ্গুলে টোকা দেওয়ার কারণ নয়, এখানে একা বসিয়া থাকিবার কারণ। মালতী বড় চঞ্চল। চাঞ্চল্যটা শুধু আঙ্গুলে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সে যে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, এটা সত্যই আশ্চর্য্যের ব্যাপার।

রাজকুমারকে দেখিবামাত্র টোকা দেওয়া থামিয়া গেল। চোখে মুখে তার যে দুষ্টামি ভরা চকিত হাসি খেলিয়া গেল, বনের হরিণী হাসিতে জানিলেও তার নকল করিতে পারিত না। সোজাসুজি তাকানোর বদলে মাথা একটু কাত করিয়া কোণাকুণি রাজকুমারের দিকে তাকাইয়া বলিল, এর মধ্যে তাড়িয়ে দিল?

তাড়িয়ে দিল মানে?

ও, তাড়িয়ে দেয় নি? আপনি নিজে থেকে চলে যাচ্ছেন? আমি ভাবলাম আপনাদের বুঝি ঝগড়া হয়েছে, আপনাকে তাড়িয়ে দিয়ে রিণি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

কাঁদছে নাকি?

দিনরাত কাঁদে মেয়েটা, সময় অসময় নেই। আচ্ছা, অর্গান বাজিয়ে কাঁদে কেন বলুন তো? এ আবার কোনদেশী কান্না! আমি যদি কখনো কাঁদি, রিণির মত আপনার জন্যেই কাঁদি, আমাকে আবার একটা অর্গান কিনতে হবে নাকি?

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, রিণিকে জিজ্ঞেস করো অর্গান বাজিয়ে কাঁদে কেন। খুসী হয়ে তোমার একটা চোখ কানা করে দেবে'খন।

পুরোপুরি গম্ভীর হওয়া মালতীর পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার, যতটা পারে গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া সে বলিল, জিজ্ঞেস করিনি ভাবছেন বুঝি? ও যে আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, আমিও কখনো ওদের বাড়ী আসি না, সেটা তবে কি জন্যে?

ওদের বাড়ী এস না মানে? এই তো এসেছ সশরীরে।

আজকের কথা বাদ দিন। আজ না এসে উপায় ছিল না। কলেজ থেকে ফিরছি, দেখি আপনি সরাসর এ বাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। ব্যাপারটা ভাল করে না জেনে আর কি তখন বাড়ী ফিরতে পারি, আপনিই বলুন?

রাজকুমার রাগ করিয়া বলিল, ব্যাপার আবার কিসের? শরীরটা ভাল নেই, আজ ওর পার্টিতে আসতে পারব না, তাই বলতে এসেছিলাম।

মালতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার মত সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা ঠিক। শরীর খারাপ বলে যে পার্টিতে আসতে পারবে না, সে নিজেই খারাপ শরীর নিয়ে খবরটা দিতে আসে বটে। বাড়ীতে যখন একটার বেশী চাকর নেই।

অন্য দরকারও ছিল।

আমিও তো তাই বলছি।

দরকার ছিল মানে—

মানে বুঝিয়ে বলতে হবে না স্যর! এতো অঙ্ক নয় যে আপনি বুঝিয়ে না দিলে মাথায় ঢুকবে না। তার চেয়ে বরং—কাছে আসিয়া গলা নামাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, —সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ কি ভাবছিলেন তাই বলুন। বলুন না, কাউকে বলব না আমি, আপনার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

মালতী কখনো তাকে স্যর বলে না। রাজকুমার তাকে পড়ায় বটে রোজ, কিন্তু ঠিক গুরু শিষ্যার সম্পর্ক তাদের নয়। তার কথা বলার ভঙ্গি রাজকুমারকে আরও বেশী বিব্রত করিয়া তুলিল। রিণির সঙ্গে সত্যসত্যই কিছু না ঘটিয়া থাকিলে হয় তো সে রাগ করিতে পারিত, যদিও মালতীর উপর রাগ করা বড় কঠিন। মালতী তামাসা করে, সব সময়ে সব বিষয়ে এরকম হাল্কা পরিহাসের ভঙ্গিতেই কথা বলে, কিন্তু কখনো খোঁচায় না। পরিচিত সকলেই যেন তার কাছে নতুন জামাই আর সে তার মুখরা শ্যালিকা। মনে যদি কারও খোঁচা লাগে তার কথায়, সেটা তার মনের দোষ, মালতীর নয়।

হঠাৎ রাজকুমারের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।—কি দরকারে এসেছি, দেখবে? বলিয়া ঘরের একপাশে টেলিফোনের কাছে আগাইয়া গিয়া রিসিভারটা তুলিয়া নিল। কাল সে বাজে যাইতে পারিবে না রাজেনকে এই খবরটা দিয়া আরও কতগুলি আজে বাজে কথা বলিয়া রিসিভারটা নামাইয়া রাখিল।

দেখলে?

মালতী এতক্ষণ তার দুষ্টামির হাসি মুখে ফুটাইয়া রাখিয়াছিল, চার পাঁচবার মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, দেখলাম বৈকি, নিশ্চয় দেখলাম। অমন কত দেখছি রোজ! শ্যামল করে কি জানেন, যখন তখন আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হয় আর আমাকে ডেকে বলে,—একটা ফোন করব। অন্য সবাই রয়েছে বাড়ীতে, তাছাড়া ফোন করার জন্য কারও অনুমতি চাওয়ারও ওর দরকার নেই, কিন্তু আমাকে ডেকে ওর বলা চাই। আমি বলি, বেশ তো, ফোন করুন। তার পর একথা সেকথা বলতে বলতে গল্প জমে যায়, বেচারীর দরকারী ফোনটা আর করা হয় না।

কথার মাঝখানে রিণি ঘরে আসিয়াছিল। একবার বলিয়াছিল, মালতী নাকি?—কিন্তু মালতী তার দিকে চাহিয়াও ছাখে নাই। কথা শেষ হইতে সে তাই আবার বলিল, এই যে মালতী!

মালতী বলিল, হ্যাঁ, আমিই মালতী। চলুন রাজুদা, যাই। বড্ড দেরী হয়ে গেল।

এতক্ষণ রিণির মুখে মৃদু ও স্পষ্ট একটা বিরক্তির ভাবের উপর মাখানো ছিল সবিনয় ভদ্রতার প্রলেপ, এক মুহূর্তে সমস্ত মুছিয়া গিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। এমনভাবে একবার সে ঢোঁক গিলিল যেন কড়া কড়া কতগুলি অভদ্র কথাই গিলিয়া ফেলিতেছে। মন চিরিয়া দেওয়ার মত ধারালো দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড মালতীকে দেখিয়া হঠাৎ সে মুখ ফিরাইল রাজকুমারের দিকে।

শুনে যাও, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

মালতী ততক্ষণে আগাইয়া গিয়াছে বাহিরের দরজার কাছে, সেখান হইতে সেও তাগিদ দিয়া বলিল, শীগগির আসুন রাজুদা। দাঁড়াবেন না, চলে আসুন।

সুতরাং, রাজকুমারের বিপদের আর সীমা রহিল না। তরুণী দু'টির দৃষ্টি-বিনিময় দেখিয়া তার মনে হতে লাগিল, এই বুঝি একটা খুনোখুনি ব্যাপার ঘটিয়া যায়। রাগে আর আত্মসংযমের চেষ্টায় রিণির সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মালতীর মুখখানা এখনো হাসি হাসি বটে, কিন্তু সে হাসি যেন লড়াই করার ধারালো অস্ত্র। চোখের পলকে চোখের সামনে দু'টি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে যে এমন একটা নাটক সৃষ্টি করিতে পারে, রাজকুমারের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। আড়ালে আড়ালে ভূমিকার অভিনয়টা নিশ্চয় ঘটিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত সে টেরও পায় নাই। যত আয়োজনই হইয়া থাক, আকাশে তো প্রথমে মেঘ দেখা দেয়, তারপর বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্কেত পাওয়া যায়, তারপর বজ্রপাত। এ যেন ঠিক বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

কি করা যায় এখন? একজন তাকে ডাকিতেছে অন্দরে, একজন ডাকিতেছে বাহিরে। কারও ডাকে সাড়া দিবার উপায় নাই। নিজেকে যদি দু'ভাগ করিয়া ফেলা যায়, তবু দু'জনকে খুসী করা যাইবে না। এমন হাস্যকর অথচ এমন গুরুতর অবস্থায় কি মানুষ কখনো পড়ে? রাজকুমার বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, দু'জনের মধ্যে একটা সাময়িক ও কৃত্রিম আপোষ ঘটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। তার কাছে ছেলেমানুষী মনে হইতেছে, কিন্তু এটা ওদের ছেলেমানুষী নয় যে সমস্ত ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে। তার কথার কোন দাম এখন ওদের কাছে নাই। আর কিছুই তার কাছে এখন ওরা চায় না, শুধু চায় যে একজনের হুকুম মানিয়া আরেকজনের মাথা সে হেঁট করিয়া দিবে।

রিণি অধীর হইয়া বলিল, এসো?

মালতী হাসিমুখে বলিল, আসুন?

তখন রাজকুমার সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মালতীকে বলিল, এদিকে এসো তো একটু।

মালতী বলিল, আবার ওদিকে কেন? চলুন যাই।

কিন্তু মালতী কাছে আসিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক

ভীরু ও কাপুরুষ সৈনিকের মত রাজকুমার তার পাশ কাটাইয়া পলাইয়া গেল বাহিরে। বাহির হইতে দরজার পিতলের কড়া দুটিতে বাঁধিয়া দিল পকেটের নস্যমাখা ময়লা রুমালটি। গেট পার হইয়া রাস্তায় পা দিয়া তার মনে হইতে লাগিল, মাথাধরাটা একেবারে সারিয়া গিয়াছে। একটু যেন কেবল ঘুরিতেছে মাথাটা, ছেলেবেলায় নাগরদোলায় অনেকক্ষণ পাক খাইয়া মাটিতে নামিয়া দাঁড়াইবার পর যেমন ঘুরিত।

রিণি আর মালতী যে তারপর কামড়াকামড়ি করে নাই, সেটা জানা গেল সন্ধ্যার পর সরসীর মিটিং-এ গিয়া।

রাজকুমার বাড়ীতেই ছিল। শ্যামল একেবারে স্যর কে-এল-এর গাড়ী লইয়া আসিয়া খবর দিল, সরসী ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, অবিলম্বে যাইতেই হইবে।

মালতীর কাছে আপনি যাবেন না শুনে সরসী একদম ক্ষেপে গেছে। শীগগির চলুন।

রাজকুমারের অচেনা এক ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড বাড়ীতে মিটিং বসি' বসি' করিতেছিল। জন ত্রিশেক মেয়েপুরুষ উপস্থিত আছে। সকলে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে কিনা সন্দেহ, খুব সম্ভব সরসী সকলকে ঘাড় ধরিয়া টানিয়া আনিয়াছে। রিণি এবং মালতীও উপস্থিত আছে। কারও মুখে আঁচড় কামড়ের দাগ নাই।

রাজকুমার এক ফাঁকে মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কি হল?

মালতী হাসিয়া বলিল, কিসের পর?

আমি চলে যাবার পর?

কি আর হবে? ঘণ্টাখানেক গল্প করে আমিও চলে এলাম।

রাজকুমার বিশ্বাস করিল না। মাথা নাড়িয়া বলিল, উহুঁ, মিছে কথা।

তখন মালতী তার দুষ্টামির হাসিকে সরল হাসিতে পরিণত করিয়া বলিল, সত্যি মিছে কথা। ওর সঙ্গে এক ঘণ্টা গল্প করতে হলে আমি দম আটকে মরে যেতাম না। সত্যি সত্যি কি হল তারপর শুনবেন? চাকর পাশের দরজা দিয়ে গিয়ে রুমালটা খুলে দিল। রিণি বলল, যাচ্ছ নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ যাচ্ছি। বলে চলে এলাম। আপনার রুমালটা আমার কাছে আছে, ওটা আর ফেরত পাচ্ছেন না।

তা না পেলাম। কিন্তু রিণি শুধু যাচ্ছ নাকি বলেছিল, যাচ্ছ নাকি ভাই বলে নি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। ও বলল, যাচ্ছ নাকি ভাই, আর আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই যাচ্ছি।

সরসী খুবসম্ভব এ বাড়ীর মেয়েদের বুঝাইয়া সভায় আনিতে অন্দরে গিয়াছিল, লজ্জা সংকোচে একান্ত বিপন্না আটদশটি মেয়েবৌকে গরু তাড়ানোর মত সভায় আনিয়া হাজির করিল। রাজকুমারকে দেখিয়াই অনুযোগ দিয়া বলিল, বেশ মানুষ তো? তোমার বক্তৃতার জন্য মিটিং, তুমি বলে বসলে আসতে পারবে না?

সরসীর রঙ একটু কালো, দেহের গড়নটি অপরূপ। অতি অপরূপ। কালো মেয়েরও যদি রূপ থাকে, তার মত রূপসী মেয়ে সহজে চোখে পড়িবে না। সাধারণভাবে কাপড় পরার কোন এক নতুন কায়দা সে আবিষ্কার করিয়াছে কিনা বলা যায় না, আবরণ যেন তার দেহশ্রীকে ঢাকা দেওয়ার বদলে ছন্দ দিয়াছে।

সমিতি গড়িতে আর মিটিং করিতে সরসী বড় ভালবাসে। ঘরে তার মন বসে না, সারাদিন এইসব ব্যাপার নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনো ব্যস্ত হয় না। সব সময় তাকে ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া মনে হয়। এদিক দিয়া সে মালতীর ঠিক উল্টা। মালতী চঞ্চল কিন্তু অলস, তার চাঞ্চল্য নাচের মত, ছুটাছুটি বা কাজের নামেই তার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সরসী একদিন পঞ্চাশটি জায়গায় কাজে যাইতে পারে অনায়াসে, কিন্তু চলে সে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে কথা, শান্ত দৃষ্টিতে তাকায়, কখনো উত্তেজিত হয় না।

প্রথমে যাকে প্রেসিডেন্ট করা হইয়াছিল হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তিনি একেবারে সহর ছাড়িয়া পলাইয়া যাওয়ায় স্যার কে, এল-কে প্রেসিডেন্ট করা হইয়াছে। সরসী ছাড়া আর কেউ তাকে এতটুকু সভায় আরেকজনের বদলীতে সভাপতিত্ব করিতে রাজী করাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

সরসীই সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানাইল। গাম্ভীর্য্য ও সহৃদয়তাব্যঞ্জক একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া স্যার কে, এল এতক্ষণ যেখানে বসিয়াছিলেন, একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তারপর সরসী বক্তা ও বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচয়মূলক কয়েকটি কথা বলিয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

রাজকুমার এক দৃষ্টিতে এতক্ষণ সরসীর দিকে চাহিয়া ছিল, শুধু তার এই বসিবার ভঙ্গিটি দেখিবার জন্য। সরসীর ওঠা বসা চলা ফেরার মধ্যে কি যেন একটা আকর্ষণ আছে, কেবলি তার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। সরসীর আকর্ষণ তার কাছে খুব বেশী জোরালো নয়, কিন্তু সরসীর প্রত্যেকটি সর্ব্বাঙ্গীন অঙ্গ সঞ্চালন মৃদু একটা উত্তেজনা জাগাইয়া তাকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

উঠবেন না?

অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য লজ্জিত ভাবে রাজকুমার বক্তৃতা দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্প্রতি সে মাস চারেক মাদ্রাজে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ তাকে মাদ্রাজের নারীজাতির

সাধারণ অবস্থা ও প্রগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হইবে। একবার রাজকুমার মালতীর দিকে চাহিল। তাকে সচেতন করিয়া দিয়া মালতী ঘাড়ের পিছনটা খুঁটিতে খুঁটিতে দুষ্টামির হাসি মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এখনো সে হাসি তেমনি স্পষ্ট হইয়া আছে। মালতীর এই হাসি দেখিয়া হঠাৎ সরসীর উপর রাজকুমারের বড়ই রাগ হইয়া গেল। চার মাস একটা দেশে থাকিয়াই এ দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার মত জ্ঞান একজন সঞ্চয় করিয়া আসিতে পারে, এমন কথা সরসীর মনে হইল কেমন করিয়া? মাথার কি ঠিক নাই মেয়েটার? কি সে বলিবে এখন এতগুলি লোকের সামনে!

কি বলিবে আগে হইতেই কিছু কিছু সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু মনের মধ্যে সব এমনভাবে এখন জড়াইয়া গিয়াছে যে কি বলিয়া আরম্ভ করিবে ভাবিয়া পাইল না। তিনবার বক্তৃতা সুরু করিয়া তিনবার থামিয়া গেল। কান তার গরম হইয়া উঠিল। লজ্জায় নয়, আতঙ্কে। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই যদি বলিতে না পারে, এমনিভাবে তোতলার মত দুচারটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া যদি তাকে বসিয়া পড়িতে হয়!

অবরুদ্ধ উত্তেজনায় সভা থমথম করিতেছে, একটা অঘটন ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তারই প্রত্যাশার উত্তেজনা। মরিয়া হইয়া মনে মনে রাজকুমার বলিতে থাকে, একটা কিছু করা দরকার, দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যে তার কিছু করা দরকার, শুধু ওইটুকু সময় হয়তো তার এখনো আছে। বক্তব্য? নাই বা রহিল বক্তব্য তার বক্তৃতার? বড় বড় কথা নাই বা সে বলিতে পারিল? যা মনে আসে··বলিয়া যাক, অন্ততঃ বক্তৃতা তো দেওয়া হইবে। চুপ করিয়া এভাবে দাঁড়াইয়া থাকার চেয়ে সে অনেক ভাল।

একবার সে চাহিল রিণি মালতী সরসীর দিকে, তারপর বলিতে আরম্ভ করিল। মাদ্রাজের মেয়েদের সম্বন্ধে? কি সে বলিবে মাদ্রাজের মেয়েদের সম্বন্ধে? যে চিরন্তন রহস্য যুগে যুগে দেশে দেশে নারীজাতিকে দুর্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে, মাদ্রাজের মেয়েরা তো তার কাছে সে রহস্যের ঘোমটা খুলিয়া তাদের জানিবার বুঝিবার সুযোগ তাকে দেয় নাই। সুতরাং সাধারণ ভাবে দু'চারটি কথা বলাই ভাল। গরম কান ঠাণ্ডা হয়, কথার জড়তা কাটিয়া যায়, মৃদু মৃদু রহস্যের সুরে কখনো গম্ভীর ও কখনো হাসিমুখে রাজকুমার বলিয়া যায়। মাঝে মাঝে তার মনে হইতে থাকে বটে যে সে আবোল তাবোল বকিতেছে, কিন্তু নারীজাতি সম্বন্ধে তার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সভার মেয়েরা একেবারে অভিভূত হইয়া যায়।

রাজকুমার আসন গ্রহণ করিলে শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারের চেয়ে বয়সে দু'এক বছরের ছোট হইলেও লম্বা চওড়া চেহারা আর মুখের ভারিক্কি গড়নের জন্য তাকেই বড় দেখায়। এতক্ষণ সে মালতীর পাশে মুখ ভার করিয়া বসিয়া ছিল। তীব্র দৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড় বিড় করিয়া মন্তব্য করিতেছিল: পাগলের মত কি যে বকে লোকটা। মাথা খারাপ নাকি? যত সব চালবাজী!—

মালতী ছাড়া আর কেউ মন্তব্যগুলি শুনিতে পাইতেছিল কিনা বলা যায় না, একটা অত্যধিক কড়া কথা কাণে যাওয়ায় মালতী একবার শুধু বলিয়াছিল: কি বলছেন?

আপনাকে বলিনি। রাজুদা কি রকম আবোল তাবোল বকছেন, শুনছেন তো? দাঁড়ান, ওঁর বাহাদুরী ভেঙে দিচ্ছি। মেয়েদের ধোঁকা দিয়ে—।

কি করবেন?

দেখুন না কি করি।

ছোটছেলের স্বপ্ন কাম্য খেলনা পাওয়ার মত রাজকুমারকে জব্দ করার কি যেন একটা সুযোগ পাইয়া সে সযত্নে পুষিয়া রাখিতেছে, ফাঁক করিতে চায় না, ভাগ দিতে চায় না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইতে তার উদ্দেশ্য কতকটা আন্দাজ করিয়া মালতী চাপা গলায় বলিল, না না থাক, বসুন। তার পাঞ্জাবীর প্রান্ত ধরিয়া আলগোছে একটু টানও সে দিল, কিন্তু শ্যামল বসিল না।

আপনি কিছু বলবেন শ্যামলবাবু? এদিকে আসুন।— সরসী বলিল।

এখান থেকেই বলি?

আচ্ছা বলুন।

অনেকগুলি চোখের, তার মধ্যে বেশীর ভাগ মেয়েলি চোখ, প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টি মুখে আসিয়া পড়িয়াছে অনুভব করিয়া এক মুহূর্তের জন্য শ্যামলের উৎসাহ যেন উপিয়া গেল! এখন মালতী আরেকবার তার পাঞ্জাবীর কোণ ধরিয়া একটু টানিলেই সে হয়তো বসিয়া পড়িত। অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তার চোখে পড়িয়া গেল, রাজকুমারের মুখে মৃদু অমায়িক হাসি ফুটিয়া আছে, ছোটছেলে বাহাদুরী করিতে গেলে স্নেহশীল উদার গুরুজন যেমন প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন।

দেখিয়া শ্যামলের মাথা গরম হইয়া গেল।

—আমার কথা শুনে আপনারা অনেকেই ক্ষুণ্ণ হবেন। আমাকে···কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হবে। বিশ্বনারী বা মাদ্রাজী মহিলাদের সম্বন্ধে নতুন কিছু আপনাদের শোনাবার জন্য আমি উঠে দাঁড়াইনি, রাজকুমারবাবুর বক্তৃতার কয়েকটা মারাত্মক ভুল দেখিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগতভাবে রাজকুমারবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি, উনি আমার অনেক দিনের বন্ধু—

রাজকুমারের মুখে আর হাসির চিহ্নও ছিল না। কি সর্ব্বনাশ, এতগুলি লোকের সামনে তাকে অপদস্থ করার জন্য শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে! নিরীহ শান্ত ভালমানুষ

শ্যামল! রাজকুমারের কোন সন্দেহই ছিল না যে সে অনেক ভুল করিয়াছে। এখন তার আতঙ্ক জন্মিয়া গেল যে ভুলগুলি নিশ্চয় সাধারণ তুচ্ছ ভুল নয়, শ্যামল চোখে আঙুল দিয়া ভুলগুলি দেখাইয়া দিলে তার আর মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় থাকিবে না। সাংঘাতিক হাস্যকর ভুল না হইলে শ্যামল কি সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিত? না জানি কি ভাবিবে সকলে, মনে মনে কত হাসিবে, তার জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতার খোলসটা যখন শ্যামল ছিঁড়িয়া ফেলিতে থাকিবে। রাজকুমারের সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া গেল। এতদিন সে জানিত, তার সম্বন্ধে মানুষ কি ধারণা পোষণ করে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র মথাব্যথা নাই, এই সমস্ত অল্পবুদ্ধি অগভীর নরনারীর মতামতকে সে গ্রাহ্যও করে না। এক মুহূর্ত্ত আগেও সে নিজের কাছে স্বীকার করিত না বক্তৃতা না জমিলে মন তার খারাপ হইয়া যাইবে। এখন শ্যামলের উদ্যত আঘাতে নিজের বাহাদুরীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, লোকে তাকে কি ভাবে তা কত দামী তার নিজের কাছে। অবজ্ঞার ভয়ে মরণ কামনা করার মত দামী সকলের তাকে বাহাদুর মনে করা।

রাজকুমারের অপরিচিত একটি মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিলেই বুঝা যায় সে খাঁটি মাদ্রাজী মেয়ে। আর দশজন মেয়ের মধ্যে বসিয়াছিল বলিয়া এতক্ষণ সে রাজকুমারের নজরে পড়ে নাই, আসরে খাঁটি একজন মাদ্রাজী মেয়ে উপস্থিত আছে জানিলে রাজকুমারের বক্তৃতাটা আজ কি রকম দাঁড়াইত কে জানে!

মেয়েটি বলিল, রাজকুমারবাবু নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন। ভুল দেখিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে কি? এটা ডিবেটিং সোসাইটির মিটিং নয় আশা করি?

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ঠিক তো, রাজকুমার যাই বলিয়া থাক, তার বক্তৃতায় সমালোচনা করিবার কি অধিকার শ্যামলের আছে?

স্যর কে, এল হাসিমুখে বলিলেন, শ্যামল রাজকুমারের ভুল দেখিয়ে দিচ্ছে না, আমাদের যাতে ভুল ধারণা জন্মায় সেজন্য নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছে। কি বল শ্যামল?

শ্যামল তাড়াতাড়ি বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। যেমন ধরুন রাজকুমারবাবু বিশ্বের নারীজাতির বিস্ময়কর মিলের কথা বলেছেন। পৃথিবীর যে কোন একটি দেশের পুরুষের সঙ্গে অন্য যে কোন একটি দেশের পুরুষের যতটা পার্থক্য দেখা যায়, দুটি দেশের মেয়েদের পার্থক্য নাকি তার চেয়ে অনেক কম। কথাটা কি ঠিক? আমাদের দেশের পুরুষরা যখন বিলাতী পুরুষদের সাজপোষাক চালচলন অনুকরণ করে তখন অতটা খারাপ দেখায় না, কিন্তু মেয়েরা ওদেশের মেয়েদের অনুকরণ করলে সেটা উদ্ভট আর হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় পুরুষ সহজেই সাজপোষাক চালচলনে তো বটেই, প্রকৃতিতে পর্য্যন্ত সায়েব হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মেয়েরা কোনদিন মেমসায়েব হতে পারে না। রাজকুমারবাবু যে বিশ্বের নারীজাতির কথা বলেছিলেন তার কারণ বিশ্ব শব্দের একটা মোহ আছে, প্রথমে সকলে বিশ্বের কথাটা মনে পড়িয়ে দিলে সকলের মন উদার হয়ে যায়, বাজে কথাও সকলে বড় বড় অর্থে গ্রহণ করে। ও একটা প্যাঁচ ছাড়া কিছু নয়। রাজকুমারবাবু—

মাদ্রাজী মেয়েটি আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ জানাইল, এটা কি ব্যক্তিগত আক্রমণ হচ্ছে না?

স্যর কে, এল হাসিমুখেই সায় দিয়া বলিলেন খানিকটা হচ্ছে বৈকি!

শ্যামল জোর দিয়া বলিল, না না, ব্যক্তিগত আক্রমণ হবে কেন, রাজকুমারবাবুর সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই! আমি বলছিলাম, মাদ্রাজের নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে রাজকুমারবাবুর ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, তিনি তাই বিশ্বের নারীজাতির কথা তুলেছিলেন, সমগ্রতার অস্পষ্টতায় যাতে খুঁটিনাটির অভাবটা চাপা পড়ে যায়। মাদ্রাজের নারীরাও বিশ্বের নারীজাতীর অন্তর্গত বৈ কি। মাদ্রাজের নারীদের সম্বন্ধে রাজকুমারবাবু যে সব কথা বলেছেন তার অধিকাংশ বিশ্বের যে কোন দেশের নারীজাতির সম্বন্ধে বলা যায়। মাদ্রাজী মেয়েদের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা রাজকুমারবাবু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যুগোপযোগী সংস্কারকে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করবার অশিক্ষিত পটুতা তাদের নাকি বিস্ময়কর! স্কুল কলেজের শিক্ষার হিসাবে তারা নাকি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করে বাংলার তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছেন, কিন্তু জীবন-যাত্রাকে নতুন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় সব প্রদেশকে হার মানিয়েছেন। এ ধারণা রাজকুমারবাবু যে কোথায় পেলেন কল্পনা করা কঠিন। মাদ্রাজের মেয়েরা তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিশেষ কোন সংস্কারের আমদানী করেছেন, অথবা ও বিষয়ে তাঁদের উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা গিয়েছে বলে তো মনে হয় না। নতুন আলো চোখে লাগা আর সেই আলোয় নতুন দৃষ্টিতে জীবনকে যাচাই করার অসুবিধা ও সুযোগের অভাব অন্য সব প্রদেশের মত মাদ্রাজের মেয়েদেরও কিছুমাত্র কম নয়।

রাজকুমার চুপ করিয়া শুনিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, এইবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সব সময় তার মুখে যে মৃদু একটু বিবর্ণতার ছাপ থাকে, রাগে এখন তাহা মুছিয়া গিয়াছে। তবু সে শান্ত কণ্ঠেই বলিল, আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি শ্যামল। আমি বলেছি অন্য প্রদেশের চেয়ে মাদ্রাজে মেয়েরা পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করছে একটু ব্যাপকভাবে, সামান্য হলেও তার ব্যাপ্তি আছে। বাংলায় মেয়েদের খুব সামান্য একটা অংশ অনেক এগিয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা এত কম যে ধর্ত্তব্যের মধ্যে বলা চলে না। বাকী সকলে অর্থাৎ বাংলা দেশের মেয়ে বলতে যাদের বুঝায় তারা পড়ে আছে

একেবারে পিছনে। মাদ্রাজের মেয়েদের একটা ক্ষুদ্র অংশ-বিশেষ এভাবে এগিয়ে না গিয়ে সকলে মিলে অল্প অল্প অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাপারটা কেমন হয়েছে জান, বাংলায় একটুখানি নারীপ্রগতি যেন সঞ্চিত হয়েছে কাঁচের সরু নলে, গভীরতা আছে কিন্তু ব্যাপ্তি নেই আর মাদ্রাজের নারী-প্রগতিটুকু সঞ্চিত হয়েছে থালায়, গভীরতা নেই কিন্তু বিস্তার আছে। আমি মনে করি, মৃতদেহের একটা আঙুল প্রাণ পেয়ে যতই তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে জীবনের প্রমাণ দিক, তার চেয়ে সর্ব্বাঙ্গে একটুখানি প্রাণ সঞ্চার হয়ে শরীরটা যদি এক ডিগ্রিও গরম হয়, তাও অনেক ভাল।

রাজকুমার ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার ডবল উপমার ধাক্কায় শ্যামলের এতক্ষণের বড় বড় কথাগুলি যেন ধূলা হইয়া বাতাসে উড়িয়া গেল।

কিন্তু শ্যামল তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারকে জব্দ করিতে উঠিয়া নিজে জব্দ হইয়া আসন গ্রহণ করার মত মানসিক অবস্থা তার ছিল না। প্রাণপণ চেষ্টায় একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে বলিতে গেল, রাজকুমারবাবু যে সব—

রিণি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনো মাদ্রাজে গেছেন শ্যামলবাবু?

শ্যামল দমিয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, আমি—? না, যাইনি।

ও! কিছু মনে করবেন না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

শ্যামল বোধ হয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, সুযোগ পাইল না। পাঞ্জাবীর ডানদিকের পকেটে তার এমন জোরে টান পড়িল যে আপনা হইতেই সে বসিয়া পড়িল।

মালতী বলিল, চুপ করে বসে থাকুন।

কেন? আমার যা বলবার আছে—

চুপ্। একটি কথা নয়। মুখ বুঁজে বসে থাকুন।

না বসব না। আমি যাই।

বসে থাকুন। সকলের সঙ্গে যাবেন।

মালতীর চাপা গলার তীব্র ধমকে শ্যামল যেন শিথিল, নিস্তেজ হইয়া গেল।

তারপর রিণি যখন সভাশেষের গান ধরিয়াছে, মেয়েরা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা আরম্ভ করিয়াছে, মাদ্রাজী মেয়েটির সঙ্গে সরসী রাজকুমারের পরিচয় করাইয়া দিল। মেয়েটির নাম রুক্মিণী, সরসীর সঙ্গে পড়িত। এখন নিজে আর পড়ে না, একটি স্কুলে মেয়েদের পড়ান।

আপনি সুন্দর বলেছেন।

রাজকুমার সবিনয়ে হাসিল।

আমি ভাবছিলাম একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বলবেন, এতো ভারি আশ্চর্য্য, আমাদের দেশের মেয়েদের কথা তিনি ভাল করে জানবেন কি করে? খুব আগ্রহ নিয়ে তাই আপনার কথা শুনতে এসেছিলাম। ভারি খুসী হয়েছি আপনার বক্তৃতা শুনে। কেবল একটা কথা—দ্বিধা ও সঙ্কোচের ভঙ্গিতে রুক্মিণী এতক্ষণ ইতস্ততঃ করিল যে রাজকুমারের মনে হইল কথাটা বুঝি শেষ পর্য্যন্ত না বলাই সে ঠিক করিয়াছে,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে। আচ্ছা, মাদ্রাজের দু'চার জন মেয়েও কি বাংলার কাঁচের নলের মেয়েদের—মানে, যারা খুব এগিয়ে গেছেন তাদের সমান হতে পারেন নি?

রাজকুমার ব্যস্ত হইয়া বলিল, তা পেরেছেন বৈকি, অনেকেই পেরেছেন।

রুক্মিণী খুসী হইয়া বলিল, থ্যাঙ্কস।

তাই বটে। একজন মাদ্রাজী মেয়েও যদি চরম-কালচারী বাঙ্গালী মেয়েদের সমান না হইতে পারিয়া থাকে, রুক্মিণী তবে দাঁড়ায় কোথায়? রাজকুমার মনে মনে ভাবিল, রুক্মিণী মেয়েটি বেশ।

সকলের আগে স্যর কে, এল বিদায় নিলেন। তাঁর অম্বলের অসুখ, লাইট রিফ্রেশমেন্টও সহ্য হইবে না। তা ছাড়া, এই সব ছেলেমানুষদের সভায় যদি বা এতক্ষণ থাকা গিয়াছিল, সভা এখন বৈঠকে পরিণত হইয়াছে, এখন আর থাকা চলে না। তাঁর কাজও আছে।

রাজকুমার বলিল, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

পথে স্যর কে, এল আপন মনেই নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন, উপভোগ্য একটা রসিকতার রস যেন মন হইতে তাঁর কিছুতেই মিলাইয়া যাইতেছে না।

অনেকদিন আগে এমনি একটা আসরে উপস্থিত ছিলাম রাজু। বিলাতে।

এমনি আসর?

অবিকল এই রকম। ইয়ং বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস্। আমার মতই একজন আধবুড়োকে প্রেসিডেন্ট করেছিল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ রাজু? অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা সভা করে কিন্তু প্রেসিডেন্ট করে বুড়োকে? কম বয়সী কাউকে প্রেসিডেন্ট করতে বোধ হয় তাদের হিংসা হয়। কিম্বা হয়তো প্রেসিডেন্ট বলতেই এমন একটা গম্ভীর জবরদস্ত মানুষ বোঝায় যে বুড়ো ছাড়া প্রেসিডেন্টের আসনে কাউকে বসাবার কথা তারা ভাবতেও পারে না।

রাজকুমার হাসিল।—বর্ণনাটা কিন্তু আপনার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

স্যর কে, এল-ও হাসিলেন।—কিছু কিছু খাপ খায় বৈকি। বয়স তো হয়েছে, আমি হলাম অতীতের জীব, তোমাদের কাছে আমি এখন বুড়ো, স্থিতি লাভ করেছি। আমাকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চপলতা করা কত সুবিধা বলতো!

চপলতা স্যার কে, এল?

চপলতা রাজু, নিছক চপলতা। তোমাদের কপাল ভাল,

এত সহজে এত সস্তায় চপল হতে পার। আমার আধ বোতল শ্যাম্পেন দরকার হয়, তিন চারটা ককটেল। তাও কি তোমাদের মত চপলতা আসে! হয় দার্শনিক চিন্তা আসে, নয় ঘুম পায়।

স্যর কে, এল-এর বাড়ীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াইল। স্যর কে, এল কিন্তু নামিলেন না।

এক কাপ কফি খেয়ে যাবে রাজু ?

কফি ? কফি খেলে রাত্রে ঘুম হয় না।

রাজকুমার নামিয়া গেল। আসরে তার ভাল লাগে নাই, বক্তৃতা শুনিয়া সকলে খুব হৈ চৈ করিয়াছে বটে শেষের দিকে, নিজে কিন্তু সে ভুলিতে পারে নাই আগাগোড়া সবটাই তার ফাঁকি ; সকলকে ভাঁওতা দিয়া সে হাততালি পাইয়াছে এবং একটু চিন্তা করে এমন যারা আসরে ছিল তাদের কাছে তার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সাফল্যের আনন্দের সঙ্গে সে তাই লজ্জাও বোধ করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। শ্যামলের ব্যবহারেও মনটা বড় বিগড়াইয়া গিয়াছিল। সেখানে যেন বাতাসে পাখা মেলাইয়া উড়িয়া বেড়ানোর মত হাল্কা মনে হইয়াছিল নিজেকে। তখন বুঝিতে পারে নাই। এখন স্যার কে, এল-এর সঙ্গে এতটুকু পথ গাড়ীতে আসিয়া এমন ভারি বোধ হইতেছে নিজস্বতাকে যে সাধ যাইতেছে ফুটপাতে গা এলাইয়া শুইয়া পড়ে।

স্যার কে, এল ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, ক্লাব।

বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া স্যার কে, এল ফিরিয়া গেলেন ক্লাবে এবং কোথাও যাইবার কথা ভাবিতে না পারিয়া রাজকুমার ফিরিয়া গেল নিজের ঘরে।

আবার কি মাথা ধরিয়াছে তার ? কেমন একটা ভোঁতা যন্ত্রণা বোধ হইতেছে মাথার মধ্যে। চারকোণা ঘরের বাতাস যেন চারিদিক হইতে মাথায় তার চাপ দিতেছে।

রাজকুমার মালতীকে পড়াইতেছিল।

সারাদিন অবিরাম বর্ষণের পর বৃষ্টি থামিয়াছিল সন্ধ্যার একটু আগে, কিন্তু মেঘ তখনও আকাশ ঢাকিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। যে কোন মুহূর্ত্তে আবার ঝমাঝম ধরাপাত সুরু হইয়া যাইতে পারে।

প্রথমে মালতী ভাবিয়াছিল, আজ কি রাজকুমার এই বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাকে পড়াইতে আসিবে ? তারপর আবার তার মনে হইয়াছিল, পড়াইতে যে রকম ভালবাসে রাজকুমার, যতটুকু সময়ের জন্যই হোক বৃষ্টিটাও যখন থামিয়াছে, হয় তো সে আসিতেও পারে!

তাই, রাজকুমার আসিবে কি আসিবে না ঠিক না থাকায় দুপুরের গুমোটের স্বেদে আত্মগ্লানিময় শরীরটিকে সযত্ন প্রসাধনে একটু চাঙ্গা করিয়া তুলিয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে অপেক্ষা করিতেছিল।

না আসে রাজকুমার নাই আসিবে। যদি আসে—

রাজকুমার আসিল এবং কোন রকম ভূমিকা না করিয়াই পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কেবল পড়িতে নয় পড়াইতেও সে খুব পটু। মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অনেক সময় কথার অভাবে তাকে মূক হইয়া থাকিতে হয় কিন্তু আলাপ আলোচনার উপরের স্তরের চিন্তাগুলিকে খুব সহজেই শব্দের রূপান্তর দিতে পারে। কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার সময় সে মসগুল হইয়া যায়।

পড়ার সময় মালতীও কোন রকম দুষ্টামি করে না। ইচ্ছাও হয় না, সাহসও পায় না। এ সময় বাজে কথায় রাজকুমার বড় বিরক্ত হয়। একদিন স্বভাব দোষে অতি হাল্কা আর অতি সূক্ষ্ম একটা খোঁচা দেওয়া রসিকতা করিয়া বসায় রাগ করিয়া রাজকুমার তিন দিন তাকে পড়াইতে আসে নাই। পড়ানোর জন্য রাজকুমার বেতন পায়, তবু।

বৃষ্টি না নামিলে হয়তো রাজকুমার মালতীকে আজ পড়াইতে আসিত না।

বিশ্বজগতের সম্রাট আজ আর সে নয়, সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি আসার সময় পর্য্যন্ত সে যা ছিল। মানুষের মনের এটা কি জটিল রাজনীতির ব্যাপার কে জানে, সারাদিনের অবিরাম বর্ষণ হঠাৎ থামিয়া যাওয়াকে উপলক্ষ করিয়াই এক মুহূর্ত্তে রাজা ভিখারী হইয়া যায়। বেশ ছিল সে সারাদিন। সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছিল, রোদ নাই, জমাট বাঁধা কালো মেঘের গভীর ছায়া নামিয়াছে। কি যে তৃপ্তি বোধ হইয়াছিল রাজকুমারের। তারপর বৃষ্টি নামিতে জাগিয়াছিল উল্লাস, জীবনে ফাঁকি ছিল না, অপূর্ণতা ছিল না, নিজের ঘরটিতে বন্দী হইয়া থাকিয়াও মনে হইয়াছিল বাহিরের যে জগৎ জলে ভাসিয়া যাইতেছে তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের ? ঘরে বন্দী থাক দেহ, কোটি বছর অমনি তৃপ্তি আর আনন্দের সঙ্গে মন রাজত্ব করুক নিজের রাজ্যে।

তারপর বৃষ্টি থামিয়া গেল। মেঘের ওপারেও তখন রোদ নাই। মেঘের ছায়া ধীরে ঢাকিয়া যাইতেছে গাঢ়তর রাত্রির ছায়ায়। তখন মনে হইয়াছিল, বৃষ্টি যখন নাই, এবার বাহির হওয়া যাইতে পারে—বাড়ীর বাহিরে যে জগতে গিরি, রিণি, সরসী আর মালতী বাস করে সেই জগতে। কিন্তু এই বাদল দিনের শেষে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হওয়া যায়, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো যায় যত খুসী, ওদের কারো বাড়ী যাওয়ার অজুহাত তো তার নাই! যার কাছেই যাক, সে ভাবিবে ভিখারী আসিয়াছে : রাজাকে ভিখারী সাজিয়া আসিতে দেখিয়া শুধু কথা ও হাসি ভিক্ষা দিতেই কত সে কার্পণ্য করিবে কে জানে!

ওরা কেউ তো বুঝিবে না কি ভাবে সারাদিন ঘরে আটক থাকিয়াও একাই সে অনেক হইয়া নিজের জগৎ ভরিয়া রাখিয়াছিল, আবার কি ভাবে সে একা হইয়া গিয়াছে, চার জনের একজনের সঙ্গেও দুটী কথা বিনিময়ের সুযোগ পর্য্যন্ত নাই বলিয়া মন তার কেমন করিতেছে।

না বুঝিলে কি আসিয়া যায় ? নিজেকে সে যে ভুলিতে

আসিয়াছে একথা মনে করার বদলে যদি অন্যকে ভুলাইতে আসিয়াছে ভাবে, কি ক্ষতি আছে তাতে? মনে মনে না হয় ওরা কেউ একটু হাসিবে, না হয় বলিবে মনে মনে, হে আত্মভোলা মহাপুরুষ, তোমার এত দিনের উদাসীন অবহেলার ফাঁকিটা তবে আজ ধরা পড়িয়া গেল? হে সিনিক, শেষ পর্য্যন্ত আমিই তবে তোমাকে রোমান্সের মধুতে ডুবাইয়া দিয়াছি? এই হাসি হাসিবার এবং এই কথা বলিবার অধিকার ওদের চিরন্তন, একদিন না হয় অধিকারটা সে খাটাইতে দিল?

কিন্তু মন মানে নাই রাজকুমারের। উপযাচকের কলঙ্ক জুটিবার ছেলেমানুষী ভয়ের জন্য নয়, এই কলঙ্ক যে অরোপ করিবে তারই ভয়ে। যে জটিল সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে ওদের সঙ্গে তার জট খুলিবে না, কেউ সহজ হইতে পারিবে না। একা থাকিতে না পারিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু এ একাকীত্ব যে তার কাছে অর্থহীন, দুর্ব্বোধ্য রহস্যের মত, কাছে বসিয়া কথা বলিলে, কাছে আসিয়া এক হওয়ার খেলা খেলিলে যে এই একাকীত্বের দুঃখ তার ঘুচিবে না, এ সত্য অন্যের কাছে কোন মতেই সত্য হইয়া উঠিবে না। মানুষ দুটি থাকিবে আড়ালে, একের সভ্যতা শুধু পীড়ন করিবে অপরকে।

কেবল মালতীর কাছে যাওয়ার একটা বাস্তব অজুহাত আছে। মালতীও অনেক কিছু মনে করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু পীড়ন করার সুযোগ পাইবে না। বেতন পায় তাই বাদল অগ্রাহ্য করিয়া পড়াইতে আসিয়াছে, এই বর্ম্ম গায়ে আঁটিয়া কিছুক্ষণ মালতীর সঙ্গে কাটাইতে পারিবে। তা ছাড়া, কথা আর হাসি ওখানে দরকার হইবে না, বাড়তি অস্বস্তির যন্ত্রণা জুটিবে না। পড়ানো তার কাজ—বেতনভোগীর নিছক কর্ত্তব্য পালন করা। সেটুকু করিলেই চলিবে।

বাহিরে আবার যখন বৃষ্টি নামিল, ঘরের মধ্যে রাজকুমার বোধ হয় তখন ভুলিয়াই গেল কোথায় বসিয়া কাকে সে পড়াইতেছে। শুকনো কথার শব্দ জলের শব্দে খানিকটা চাপা পড়িয়া গেল। ভাল করিয়া শুনিবার জন্য টেবিলের উপর হাত রাখিয়া মালতী সামনের দিকে আরও ঝুঁকিয়া বসিল।

রাজকুমার হঠাৎ থামিয়া গেল, সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, তুমি কিছু শুনছো না মালতী।

শুনছি। সত্যি শুনছি। কি করে জানলেন শুনছি না?

আমি জানতে পারি।

মালতী নীরবে আস্তে আস্তে কয়েকবার মাথা নাড়িল। অর্থাৎ সেটা সম্ভব নয়, কিছু জানিবার ক্ষমতা রাজকুমারের নাই।

রাজকুমার শ্রান্তভাবে একটু হাসিল।—যাক্‌গে, আজ পড়াতেও ভাল লাগছে না।

ভাল লাগছে না?

মালতী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসু চোখ তুলিল। অর্থাৎ তাই যদি হয়, এতক্ষণ মসগুল হইয়া তুমি তবে কি করিতেছিলে?

রাজকুমার চেয়ারটা পিছনে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পুবের দেয়াল ঘেঁসিয়া দুটি বই-ভরা আলমারি অযথা গাম্ভীর্য্যের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, রাজকুমারের মনের গাম্ভীর্য্যের রূপধরা ব্যঙ্গের মত। হাজার মানুষের মনের যে গঞ্জনাকে প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়া সে মনকে ভারি করিয়াছে, আলমারির এই বইগুলির চেয়ে তার ওজন কম নয়। চাপ দেওয়া ওজন—বুকের উপর বইগুলি স্তূপ করিয়া রাখিলে শুধু কাগজের যে চাপে পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিবে, অদেহী অক্ষরের পেষণ তার চেয়ে ভারি।

এক দিকের দুটি জানালাই খোলা। এদিক দিয়া ছাট আসে না। পাশের একতলা বাড়ীর ফাঁকা ছাতে বৃষ্টি-ধারা আছড়াইয়া পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। বই-এর আলমারি ছাড়িয়া রাজকুমার জানালায় গেল, আবার ফিরিয়া আসিল।

এখন যাই মালতী।

বৃষ্টি পড়ছে যে?

তাই বটে, বৃষ্টি পড়িতেছে। মালতী যখন মনে পড়াইয়া দিয়াছে এখন বৃষ্টি মাথায় করিয়া চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। মালতীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া রাজকুমার বলিল, নোট নিয়েছ?

চতুষ্কোণ টেবিলের অন্য তিন দিকের যেখানে খুসী দাঁড়াইয়া এ প্রশ্ন করা চলিত, মালতীর খাতাও দেখা চলিত। কিন্তু চতুষ্কোণ ঘরের মতই চতুষ্কোণ টেবিলও মাঝে মাঝে প্রান্তরের বিস্তৃতি পায়, এত দূর মনে হয় একটি প্রান্ত হইতে আরেকটি প্রান্ত!

মালতীর খোলা খাতার সাদা পৃষ্ঠা দুটিতে একটি অক্ষরও লেখা হয় নাই, দুটি পৃষ্ঠার যোগরেখার উপর লিখিবার কলমটি পড়িয়া আছে। রাজকুমার হাত বাড়াইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে গেল অন্য পৃষ্ঠায় কিছু লেখা আছে কিনা। তার বুকে লাগিয়া মালতীর মাথাটিও নত হইয়া গেল। রাজকুমারের আঙুলে তারের মত সরু একটি আংটী, তাতে এক বিন্দু জলের মত একটি পাথর। দু'হাতে সেই আংটী পরা হাতটি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আরও মাথা নামাইয়া আংটীর সেই পাথরটিতে মুখ ঠেকাইয়া মালতী চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সে যেন পিপাসায় কাতর, জল-বিন্দুর মত ওই পাথরটি পান করিয়াই পিপাসা মিটাইতে চায়।

তখন এক কোমল অনুভূতির বন্যায় রাজকুমারের চিন্তা আর অনুভূতির জগৎ ভাসিয়া গেল, মনে হইল শুধু মমতায় এবার তার মরণ হইবে। মালতীর একটি চুলের জন্য তার একি মায়া জাগিয়াছে! এক মুহূর্ত্তের বেশী সহ্য করাও কঠিন এমন এই আত্মবিলোপ। মালতীকে বিশ্বজগতের রাণী করিয়া দিলে তার সাধ মিটিবে না, ফুলের দুর্গে লুকাইয়া

রাখিলে ভয় কমিবে না, তাই শুধু মালতী ছাড়া কিছুই সে রাখিতে চায় না, নিজেকে পর্য্যন্ত নয়।

কয়েক মুহূর্ত্তে শ্রান্ত হইয়াই সে যেন ধীরে ধীরে মালতীর চুলে মাথা রাখিল।

মুখ তোলো, মালতী।

মালতী মুখ তুলিল। তারপর ব্যস্তভাবে উঠিয়া সরিয়া গেল।

রাজকুমার বলিল, কি হয়েছে মালতী ?

মালতী মৃদুস্বরে বলিল, শ্যামল এসেছে।

কোথায় শ্যামল ?

মালতী ততক্ষণে খোলা দরজার কাছে আগাইয়া গিয়াছে। দরজার বাহিরে গিয়া সে ডাকিল শ্যামল ?

শ্যামল চলিয়া যাইতেছিল, বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। জামা কাপড় তার ভিজিয়া চুপ্‌সিয়া গিয়াছে! দরজার বাঁ দিকের আধভেজান জানালাটির নীচে মেঝেতে অনেকখানি জল জমিয়া আছে। শ্যামলের গা বাহিয়া তখনও জল পড়িতেছিল।

মালতী বলিল, এ কি ব্যাপার শ্যামল ?

শ্যামল বলিল, একটা ফোন করতে এসেছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি নামল—

রাজকুমার আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের আগে তার চোখে পড়িল জলে ভেজা শ্যামলের উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। শিশু যেন হঠাৎ ভয় পাইয়া দিশেহারা হয়ে গিয়াছে।

মালতী বলিল, বৃষ্টি নেমেছে অনেকক্ষণ, এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে কি করছিলে ? বৃষ্টি যখন নামল, বাড়ী ফিরে গেলে না কেন ? রাস্তায় ভিজে গেলে, তবু ফোন করতে এলে কি বলে ?

জেরায় কাতর শ্যামল বলিল, দরকারী ফোন কি না, ভাবলাম একটু ভিজলে আর কি হবে! একটা শুকনো কাপড় আর গেঞ্জি দেবে আমাকে ?

মালতী দ্বিধা করিল, যতক্ষণে দ্বিধার ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে, ততক্ষণ। তারপর বলিল, শুকনো কাপড় দিয়ে কি করবে, রাস্তায় নামলেই তো কাপড় আবার ভিজে যাবে। একেবারে বাড়ী গিয়ে কাপড় ছাড়ো। বড়ো ছেলেমানুষ তুমি,—সত্যি।

একখানা শুকনো কাপড় দিয়া বৃষ্টি ধরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না দিয়া ভিজা কাপড়ে তাকে এক রকম তাড়াইয়া দেওয়া হইল। শ্যামল হয় মালতীর কথার মানেই বুঝিতে পারিল না অথবা বুঝিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না, এমনি এক অদ্ভুত বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সে খানিকক্ষণ মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর নীরবে বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ঘরে গিয়া টেবিলের দুপাশের দুটি চেয়ারে বসিয়া দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল। মালতীর মুখখানি অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে-ই অস্ফুটস্বরে বলিল, শ্যামল সব দেখেছে।

সব ? সব মানে কি ? রাজকুমার আশ্চর্য্য হইয়া গেল। জানালা দিয়ে দেখছিল ?

হ্যাঁ তুমি যখন পড়াও, প্রায়ই এসে বারান্দায় কেউ না থাকলে জানালা দিয়ে উঁকি দেয়।

রাজকুমার আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। প্রাণপণে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, তার মানে —?

মালতী সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই। এমন ছেলেমানুষ আর দেখিনি। একটু বয়স বাড়লেই এ ভাবটা কেটে যাবে জানি তবু এমন বিশ্রী লাগে মাঝে মাঝে! এ সব নীরব পূজার ন্যাকামি কোত্থেকে যে শেখে ছেলেরা!

ছেলেরা! যাদের সঙ্গে কলেজে পড়ে মালতী তারা কচি ছেলের দলে গিয়া পড়িয়াছে, এতই সে বুড়ী! রাজকুমারের এবার আপনা হইতেই হাসি আসিল।

একখানা শুকনো কাপড় চাইল, তাও দিলে না ?

খুব অন্যায় হয়ে গেছে, না ? একটু উদ্বেগের সঙ্গেই মালতী জিজ্ঞাসা করিল। তারপর মাথা নীচু করিয়া বলিল, দিতাম, অন্যদিন হলে দিতাম। আজ কাপড় দিলে বসে থেকে আমাদের জ্বালাতন করত।

আর পড়বে ?

না। কি হবে পড়ে ?

বলিয়া অনেকক্ষণ পরে মালতী তার দুষ্টামি ভরা হাসি হাসিল।

বৃষ্টি থামিল রাত্রি দশটার পর।

রাস্তায় কিছু কিছু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, জুতা ভিজাইয়া বাড়ীর দিকে চলিতে চলিতে নিজেকে বড় নোংরা মনে হইতে লাগিল রাজকুমারের। পথের সমস্ত ময়লা যেন জলে ধুইয়া তারই পায়ে লাগিতেছে।

গলির মধ্যে তার বাড়ীর সামনে শ্যামলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রাজকুমার ঠিক আঘাত পাওয়ার মতই চমক বোধ করিল। এখনও শ্যামলের জামা কাপড় ভিজিয়া চপ্‌ চপ্‌ করিতেছে। মালতীর বাড়ী হইতে বাহির হইবার পর হইতে এতক্ষণ সে কি এখানে দাঁড়াইয়া আছে ? অথবা বাড়ী হইতে শুকনো জামাকাপড় পরিয়া আসিয়া আবার জলে ভিজিয়াছে ?

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে রাজকুমারবাবু।

এসো না, ভেতরে এসো।

না, এখানে দাঁড়িয়েই বলি।

রাজকুমার একটু রাগ করিয়া বলিল, শ্যামল, মালতীর কথা বলবে বুঝতে পারছি, কিন্তু ভিজে কাপড়ে জলকাদায় দাঁড়িয়ে না বললে কি চলবে না তোমার ? এমন ছেলে-মানুষ তো তুমি ছিলে না, কি হয়েছে তোমার আজকাল ? বলিয়া রাজকুমার দরজায় কড়া নাড়িল।

দরজা খুলিবার সময়টুকুর মধ্যে শ্যামল একবার কয়েক পা আগাইয়া আবার আগের জায়গায় গিয়া দাঁড়ায়। যেন ঠিক করিতে পারিতেছে না রাজকুমারের বাড়ীতে ঢুকিবে কি ঢুকিবে না। ভিতরে গিয়া তাকে রাজকুমারের একবার ডাকিতে হয়।

শ্যামল আগেও কয়েকবার রাজকুমারের কাছে আসিয়াছে, মনোরমা তাকে চিনিত। তাকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠে, ভিজে চুপচুপে হয়ে এত রাতে তুমি কোথা থেকে এলে ভাই? ও কালী, কালী, তোর রাজুদার ঘর থেকে একখানা শুকনো কাপড় এনে দে শীগগির।

গিরির সমবয়সী একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়ায়। গিরির চেয়ে তার স্বাস্থ্য ভাল, বোধ হয় সেইজন্যই তার মুখে কচি ভাবের খানিকটা স্নিগ্ধ লাবণ্য আছে। মনোরমার তাগিদ সহিতে না পারিয়া রাজকুমার সরসীর সভার পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বর গিয়া কালীকে নিয়া আসিয়াছে।

রাজকুমারের সঙ্গে এত বড় (বার তের কম বয়স নয় গৃহস্থ মেয়েদের) মেয়েকে পাঠানো সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া মনোরমা আগেই মাসীর কাছে পত্র দিয়াছিল, তবু কালীর মা, মেয়েকে একা ছাড়িয়া দিতে সাহস পায় নাই। কালীর সঙ্গে তার সাত বছরের একটি ভাইও আসিয়াছে।

কালী বলে, কি দিদি?

মনোরমা বলে, বললাম যে? শুকনো কাপড় নিয়ে আয় রাজুদার ঘর থেকে।

মনোরমার উদারতায় মনে মনে রাজকুমারের হাসি পায়। শ্যামলের জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, আহা, অসুখ যদি করে ছেলেটার?—ভাবিয়া বড় ব্যাকুল হইয়াছে, কিনা মনোরমা, তাই হাতের কাছে আলনাতে স্বামীর শুকনো কাপড় আলনাতেই থাক, রাজকুমারের ঘর হইতে কাপড় আনা হোক একখানা কালীকে দিয়া। এত হিসাব করিয়া অবশ্য মনোরমা কথাটা বলে নাই। তার মনেও আসে নাই এ মানে। এটা শুধু অভ্যাস।

থাক, আমার ঘরে গিয়েই কাপড় ছাড়বে'খন।

বলিয়া শ্যামলকে নিয়া রাজকুমার ঘরে চলিয়া যায়। কালী মুচকি মুচকি হাসিতেছে দেখিয়া মনোরমা রাগের স্বরে বলে, হাসছিস যে?

কালী তেমনি ভাবে হাসিতে হাসিতেই বলে, তুমি যেন কি দিদি। বলিয়া এক দৌড় দেয় ঘরের মধ্যে, সেখানে তার মুচকি হাসি শব্দময় হইয়া উঠে!

ঘরে একটিমাত্র চেয়ার, একটির বেশীকে স্থান দেওয়াও মুস্কিল। শ্যামল সেই চেয়ারে বসে, রাজকুমার পা ঝুলাইয়া বসে তার খাটের বিছানায়।

এখন তার মনে হইতে থাকে, রাস্তায় সংক্ষেপে কথা সারিয়া শ্যামলকে বিদায় দিলেই ভাল হইত। শ্যামলকে ওভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হঠাৎ অতখানি মমতা ও সহানুভূতি বোধ করিয়াছিল কেন কে জানে! মনে হইয়াছিল, ধীর স্থির শান্তভাবে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ওর মানসিক বিপ্লব যতটুকু পারা যায় শান্ত করার চেষ্টা করা তার কর্তব্য। মর্মাহত ছোট ভাইটির মত ছেলেটাকে কাছে টানিয়া সান্ত্বনা না দিলে অন্যায় হইবে। কারণ, তার বয়স বেশী, অভিজ্ঞতা বেশী, জ্ঞান বেশী, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বেশী।

এমন খারাপ লাগিতেছে এখন! উপদেশ দিয়া এই বয়সের দুরন্ত হৃদয়াবেগসম্পন্ন ছেলেমানুষটিকে শান্ত করা! সে তো পাগলামির সামিল।

একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া শ্যামল অন্যদিকে তাকায়, হঠাৎ কিছু বলিতে পারে না। এ তো জানা কথাই যে মনের মধ্যে তার ঝড় চলিতেছে, কথা আরম্ভ করা তার পক্ষে সহজ নয়। বাড়ীর সামনে রাস্তায় প্রথম ঝোঁকে অনেক কথাই সে বলিয়া ফেলিতে পারিত, এতক্ষণের ভূমিকার পর খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

আপনি ওকে বিয়ে করবেন?

শ্যামলের কথা শুনিয়া রাজকুমার কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইল না। এই রকম প্রশ্নই সে প্রত্যাশা করিতেছিল।

একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

আপনি তা বুঝতে পারছেন।

না, বুঝতে পারছি না। তুমি মালতীর অভিভাবক নও, আত্মীয়ও নও। আমাকে এ প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নেই।

আমার অধিকার আছে।

শ্যামল এমন জোরের সঙ্গে কথাটা ঘোষণা করিল যে কথাটার সহজ মানে বুঝিতে রাজকুমারের একটু সময় লাগিল। মনে হইল সত্য সত্যই মালতী সম্পর্কে অন্য অধিকারও বুঝি শ্যামলের আছে।

কিসের অধিকার তোমার? তুমি নিজে মালতীকে বিয়ে করতে চাও, এই অধিকার?

শ্যামলের মেরুদণ্ড সিধা হইয়া গেল। সোজা রাজকুমারের চোখের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট উচ্চারণে প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়া দিয়া সে বলিল, বিয়ে করি বা না করি, ওকে আমি স্নেহ করি। আপনাদের ওসব কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না, সোজাসুজি এই বুঝি যে মালতীর এতটুকু ক্ষতি হলে আমার সহ্য হবে না। সেই দাবীতে আমি আপনাকে স্পষ্ট একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি, সোজা ভাষায় জবাব দিন।

তুমি বড় ছেলেমানুষ শ্যামল।

বাজে কথা বলে লাভ কি?

তারপর দু'জনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া গেল।

শ্যামল খালি গায়ে বসিয়া আছে, রাজকুমারের শুকনো কাপড়খানা শুধু সে পরিয়াছে, জামা গায়ে দেয় নাই। প্রয়োজনের বেশী সামান্য একটু ভদ্রতাও সে যেন রাজকুমারের

কাছে গ্রহণ করিতে চায় না। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন তার দেহের, বোধ হয় অল্পদিন আগে ব্যায়াম আরম্ভ করিয়াছে, পেশীগুলি স্পষ্ট ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে কিন্তু এখনও কঠিন হয় নাই। প্রথম হইতেই রাজকুমার কেমন মৃদু একটু ঈর্ষা বোধ করিতেছিল। এতক্ষণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই; সুগঠিত মাংসপেশীর জন্য একজন তরুণকে সে হিংসা করিবে? এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কি হইতে পারে! কিন্তু ছেলেটার তেজ দেখিয়া রাগে ভিতরটা জ্বালা করিতেছে জানিয়া, গলা ধাক্কা দিয়া ছেলেটাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবার ইচ্ছা জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে হইতেছে বলিয়া, ঈর্ষার অস্তিত্বটা আর নিজের কাছে অস্বীকার করা গেল না।

একটু আগে যার উপর গভীর মমতা জাগিয়াছিল, এখন তাকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে, মালতীর প্রতি তার প্রথম যৌবনের ভাবপ্রবণ অন্ধ ভালবাসার সুযোগ নিয়া হীন কাপুরুষের মত অকারণ নিষ্ঠুর আঘাত করিবার সাধ জাগিতেছে।

শ্যামল বলিল, বলুন? জবাব দিন?

তুমি যাও শ্যামল।

আমার কথাটার জবাব দিন আগে? আপনার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দিন, আমি এক সেকেণ্ডও আপনাকে জ্বালাতন করব না।

মুখখানা শ্যামলের কালো হইয়া গিয়াছিল, রাজকুমারের সাড়া শব্দ না পাইয়া হাতের উল্টা পিঠ দিয়া সজোরে সে একবার কপালটা মুছিয়া ফেলিল। কপাল তার ঘামিয়া উঠিয়াছে।

বুঝতে আমি পারছি, উদ্দেশ্য ভাল হলে এত ইতস্তত: করতেন না। তবু আপনার মুখ থেকে একবার শুনতে চাই।

শুনে কি করবে?

প্রশ্নটা যেন বুঝিতেই পরিল না, এমনি ভাবে শ্যামল খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, কি করব? তা জানি না। আপনি তো জানেন আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

তুমি শুধু জানতে চাও?

একমুহূর্তে রাজকুমার যেন নিজেকে ফিরিয়া পাইল। কি ছেলেমানুষীই এতক্ষণ সে করিয়াছে এই ছেলেমানুষের সঙ্গে! জীবনের কেনাবেচার হাটে যাকে শুধু খেলনা দিয়া ভুলানো যায়, তার সঙ্গে এত সাবধানতার সঙ্গে সুরু করিয়াছে সুখ দুঃখ হাসি কান্নার পণ্য নিয়া বুঝাপড়ার তর্ক।

রাজকুমার একটা সিগারেট ধরাইল, কথা কহিল ধীরে ধীরে, অন্তরঙ্গ ভাবে, বন্ধুর মত।

তোমাকে একটা কথা বলি শ্যামল। মালতীকে তুমি ভালবাস। তোমার এ ভালবাসা দু'দিনের নয় নিশ্চয়? বিয়ে না হলেও চিরদিন তুমি মালতীকে ভালবেসে যাবে নিশ্চয়?

কিন্তু—

কিন্তু জানি। তুমি বলতে চাও, তোমার কথা আলাদা। মালতীর জীবনে এতটুকু দুঃখ আনার চেয়ে মরে যাওয়া তুমি ভাল মনে কর। কারণ, তুমি যে ভালোবাসো মালতীকে!—টোকা দিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া গলার সুর বদলাইয়া,—কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি না, তাই আমার সম্বন্ধে তোমার দুর্ভাবনার সীমা নেই। তোমার মতে, ভালবাসাটা তোমার একচেটিয়া সম্পত্তি, এ জগতে আর কেউ ভালবাসতে পারে না, আর কারও ভালবাসার অধিকার নেই।

অন্তত: আপনার নেই।

শুনিয়া আহত বিস্ময়ে রাজকুমারের মুখে কথা ফুটিল না।

শ্যামল একটু ইতস্তত: করিয়া আবার বলিল, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, সে শ্রদ্ধা বজায় থাকলে মালতীর সম্বন্ধে আমার এতটুকু ভাবনা হ'ত না। কিন্তু আপনি নিজেই আমায় শ্রদ্ধা ভেঙ্গে দিয়েছেন।

সেদিন সভায় তোমায় অপদস্থ করেছিলাম বলে?

না। গিরির সঙ্গে কুৎসিৎ ব্যবহার করেছিলেন বলে।

তারপর শ্যামল চলিয়া যাওয়ার আগে আরও যে দু'চারটি কথা বলিল, রাজকুমারের কাণে গেল না। যেমন বসিয়াছিল তেমনি ভাবে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন অকথ্য গালাগালি দিয়াই তবে গিরীন্দ্রনন্দিনীর জননী তাকে রেহাই দেয় নাই, প্রায়শ্চিত্তের জেরটা যাতে আরও টানিয়া চলিতে হয় তার ব্যবস্থাও করিয়াছে।

গিরীন্দ্রনন্দিনীর সঙ্গে তার কুৎসিৎ ব্যবহারের সংবাদ আরও কত লোকে জানিয়াছে কে জানে!

জীবনে এই প্রথম মিথ্যা দুর্ণামের সংস্পর্শে আসিয়া রাজকুমারের মন যেন দিশেহারা হইয়া গেল। কতবার ভাবিল যে, লোকে যা খুসী ভাবুক, তার কি আসিয়া যায়, সে তো কোন অন্যায় করে নাই! সে কেন জ্বালাবোধ করিবে তার সম্বন্ধে কে কোথায় কি মিথ্যা ধারণা পোষণ করিতেছে ভাবিয়া? কিন্তু জ্বালা সে বোধ করিতেই লাগিল। অন্যায় না করুক, সেদিন ভুল সে করিয়াছিল, বোকামি করিয়াছিল। ভুলের শাস্তিও মানুষকে পাইতে হয় বৈকি। গরম চায়ে পর্য্যন্ত মুখ পুড়িয়া যায়।

এ দুর্ণামের প্রতিবাদে তার কিছু বলিবার উপায় পর্য্যন্ত নাই। শ্যামলকে সমস্ত ব্যাপারটি খুলিয়া বলিলেও সে বুঝিত না, বিশ্বাসও করিত না। শ্যামলের মত অন্য সকলেও বুঝিবে না, বিশ্বাস করিবে না। নীরবে এ অপবাদ তাকে মানিয়া নিতে হইবে।

এমনি যখন মানসিক অবস্থা রাজকুমারের, অবরুদ্ধ নিরুপায় ক্রোধের উত্তেজনায় ভিতরটা যখন তার ফেনার মত ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছে আর সমস্ত জগতের উপর ভয়ঙ্কর একটা প্রতিশোধ নেওয়ার অন্ধ কামনা জাগিয়াছে, তখনকার মত জগতকে পাওয়া না গেলেও হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায়

তাকেই আঘাত করার জন্য ছটফট করিতেছে, ঘরে তখন আসিল কালী।

বলিল, দিদি ডাকছে, খেতে চলুন।

গিরির সমবয়সী কালী। গিরির মত সেও সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বর্ব্বরতার আবহাওয়ায় মেছুনি মায়ের কোলে মানুষ হইয়াছে। গিরিকে নিয়া একটা বদনাম যখন তার রটিয়াছে, কালীকে নিয়া আরেকটা বদনামও রটুক। রটুক, কি আসিয়া যায়? মনটা শান্ত হওয়ার সময় পাইলে নিজের খাপছাড়া খেয়ালে নিজেরই তার হাসি পাইত। এখন মনে হইল, খেয়ালটা না মিটাইতে পারিলে কোনমতেই তার চলিবে না।

কালী, শোনো।

কালী নির্ভয়ে কাছে আগাইয়া আসিল।—কি?

তোমার নাড়ী আছে কালী? অসুখ হলে ডাক্তাররা হাত ধরে যে পাল্‌স্‌ ছাখে, সেই নাড়ী।

আছে না? ও পাল্‌স সবারি থাকে।

কালীর মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তোমার পাল্‌স্‌ নেই। এক একটি মেয়ের থাকে না।

পাল্‌স না থাকলে কেউ বাঁচে? মরে গেলে তখন পাল্‌স থাকে না। এই দেখুন—কালী ডান হাতটি বাড়াইয়া দিল।

কব্জি ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষার সুবিধা দেওয়ার জন্য ঘেঁসিয়া আসিল আরও কাছে।

তখন খেয়াল করে নাই, কিন্তু মনের মধ্যে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তির সময় রাজকুমারের মনে পড়িয়াছে, হাত ধরা মাত্র গিরীন্দ্রনন্দিনী কেমন যেন শক্ত হইয়া গিয়াছিল। কালীর কৌতুকের হাসি আর নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব রাজকুমারের মনে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিল। এরকম হওয়ার তো কথা নয়!

ইস্‌! তোমার পাল্‌স্‌ তো ভারি দুর্ব্বল কালী?

কালীর হাসি মিলাইয়া গেল।

সত্যি?

তোমার হার্ট নিশ্চয় ভারি দুর্ব্বল।

আমি তো জানি না।

দেখি তোমার হার্ট—?

গিরির হৃদ্‌স্পন্দন শুধু সে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল, কালীর হৃদ্‌স্পন্দন সে পরীক্ষা করিতে গেল এক হাতে তাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়া যাইতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ কালী নিস্পন্দ হইয়া রহিল, তারপর রাজকুমারের হাত সরাইয়া দিয়া নিজেও একটু তফাতে সরিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া শঙ্কিত প্রশ্ন আর মৃদু ভয় ও ভৎসনা দু'চোখে ফুটাইয়া রাজকুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। এক মুহূর্ত্ত পরে ছুটিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রাজকুমার ভাবিল, এবার মনোরমা আসিবে। আসিয়া অকথ্য গালাগালি সুরু করিয়া দিবে।

মনোরমা আসিল। অনুযোগও দিল।

খাবে না রাজু ভাই?

হ্যাঁ, যাই।

কালী নিশ্চয় মনোরমাকে কিছু বলে নাই। কালী ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাওয়ার যতটুকু সময়ের মধ্যে মনোরমা তাকে খাইতে ডাকিতে আসিয়াছে তার মধ্যে এত বড় একটা গুরুতর কথা কালীর বলা ও মনোরমার শোনা সম্ভব নয়। গিরির মত একনিঃশ্বাসে সমস্ত বিবরণই তো কালী জানাইতে পারিবে না। ব্যাপারটার একটু আভাস দিয়াই তার মুখে আর কথা ফুটিবে না। মনোরমাকে তখন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জেরা করিয়া সব জানিতে হইবে। তাতে কিছু সময় লাগিবার কথা। মনোরমার গালাগালিটা তবে ভবিষ্যতের জন্য তোলা রহিল?

খাইতে বসিয়া রাজকুমার ঘাড় হেঁট করিয়া খাইয়া যায়। কাল মনোরমার হুকুমে কালী পরিবেশন করিয়াছিল। মনোরমা কি আজও তাকে ডাকিবে? ডাকিলে কালী যদি না আসে? ব্যাপার বুঝিতে গিয়া মনোরমা যদি সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝিয়া আসে? কি বিপদেই মনোরমা পড়িবে তখন! একটা মানুষকে খাওয়াইতে বসাইয়াছে, তার খাওয়াও নষ্ট করিতে পারিবে না; মনের রাগ চাপিয়াও রাখিতে পারিবে না।

কালীকে তোমার কেমন লাগে রাজু ভাই?

মুখের ভাতটা গিলিতে রাজকুমারকে তিনবার চেষ্টা করিতে হইল।

ভালই লাগে।

বড় লাজুক হয়েছে মেয়েটা। কিছুতে তোমার সামনে আসতে চায় না। তা বড় সড় হয়ে উঠছে, একটু লজ্জা হবে বৈকি। চোদ্দ পেরিয়ে পনেরয় পা দিয়েছে।

কালীর বয়সটা রাজকুমার জানিত, তার সাদাসিদে মা'টি রাজকুমারের কাছে বলিয়া ফেলিয়াছিল। কালীর বয়সটা মনোরমা একেবারে দু'বছর বাড়াইয়া দিতে চায় কেন প্রথমটা রাজকুমার বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তারপর একটা অবিশ্বাস্য কথা মনে আসায় অবাক হইয়া মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তোমার নামে কালী কিন্তু আমার কাছে একটা নালিশ করেছে রাজু ভাই!

মনোরমার মুখে কৌতুকের হাসি। চোখ দিয়া তার হাসি দেখিতে দেখিতে কান দিয়া তার কথা শুনিয়া রাজকুমারের যেন কিছুক্ষণের জন্য ধাঁধা লাগিয়া গেল। কালী তবে নালিশ করিয়াছে? কালীর নালিশ শুনিয়া মনোরমা তাকে অনুযোগ দিতেছে সকৌতুকে!

তুমি নাকি ওকে মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে যাবে বলেছিলে? বিকেলে আমায় বলছিল, তুমি নাকি ভারি খারাপ লোক, কথা দিয়ে কথা রাখো না। আমি বললাম,

যা না, বলগে না তুই তোর রাজুদা'কে? তা মেয়ে বলে কি, লজ্জা করে দিদি!

জলের গেলাস তুলিয়া রাজকুমার গেলাসের অর্দ্ধেকটা খালি করিয়া ফেলিল।

খাওয়ার পর অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসিয়া রাজকুমার সিগারেট টানিতেছে, দরজার কাছে বিছানো বারান্দার বাল্‌বের আলোয় একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। ছায়া আর নড়ে না। মনোরমার ছায়া নিশ্চয় নয়। ছায়া ফেলিয়া কারো ঘরের বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থাকার ধৈর্য্য মনোরমার নাই।

রাজকুমার সাড়া দিতেই কালী ঘরে আসিল।

মসলা নিন্।

প্রতিফলিত আবছা আলোয় হাত বাড়ানো দেখা যায়। রাজকুমারের হাতের তালুতে মনোরমার সযত্নে প্রস্তুত মসলা দিয়া কালী বলিল, আঁধার দেখে এমন ভয় করছিল! জানি আপনি আছেন, তবু ভাবছিলাম, যদি না থাকেন? আঁধারে আমি বড্ড ডরাই।

আলোটা জ্বালো।

জ্বালবো?

কালী বোকা নয়, কিছু শুধু জানে না। ইঙ্গিতে ও সঙ্কেতের ভাষা এখনো শেখে নাই। মালতী সরসী বা রিণি যদি ছুটিয়া ঘর ছাড়াইয়া চলিয়া যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া এভাবে ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত জ্বালবো?—একটি শব্দে কি মহাকাব্যই সৃষ্টি হইয়া যাইত! কালী শুধু প্রশ্নের ভঙ্গিতে তার কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে।

আলো জ্বালিয়া কালী চলিয়া গেল রাজকুমার ভাবে, অভিধান নিরর্থক। শব্দের মানে তারাই ঠিক করে, যে বলে আর যে শোনে। কাজ ও উদ্দেশ্যের বেলাতেও তাই। কি ব্যাপক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা!

বর্ষা শেষ হইয়াছে।

মাঝে মাঝে বাতাসে হঠাৎ যে শীতের আমেজ পাওয়া যায় এখনো তা ভিজা ভিজা মনে হয়, কান্নার শেষে তোয়ালে দিয়া মুছিয়া নেওয়ার পর মালতীর গায়ের শীতল স্পর্শের মত। কালী মার কাছে চলিয়া গিয়াছিল, কয়েকদিনের জন্য আবার আসিয়াছে। মনোরমার তাড়া নাই, বিফল হওয়ার ভয়ও যেন নাই। কালীর দেহে যৌবনের বিকাশে যেমন এতটুকু ব্যস্ততা দেখা যায় না অথচ বিকাশ তার অনিবার্য্য গতিতে ঘটিতেই থাকে, মনোরমার অভিযানও তেমনি ধীর স্থির মন্থর গতিতে গড়িয়া উঠে। খেলার ছলে হৃদ্স্পন্দন পরীক্ষা করার বিরুদ্ধে কালীর প্রতিবাদ যেমন রাজকুমারের অজ্ঞাতসারেই তিলে তিলে হুকুম হইয়া মাথা তুলিতে আরম্ভ করে, তাকে ঘিরিয়া মনোরমার জাল বোনাও তেমনি হইয়া থাকে তার অদৃশ্য।

কালীকে মনোরমা কখনো বেশী সাজায় না, তার ঘরোয়া সাধারণ সাজেই বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। কালীর একরাশি কালো চুল আছে, কোনদিন মনোরমা লম্বা বিনুনী ঝুলাইয়া দেয়, কোনদিন রচনা করে ফুলানো ফাঁপানো খোঁপা। সকালে ঘরের কাজ করার সময় কালীর গায়ে সাদাসিধে ভাবে জড়ানো থাকে নিমন্ত্রণে যাওয়ার জমকালো দামী শাড়ী, বিকালে সযত্ন প্রসাধনের পর তাকে পরিতে হয় সাধারণ মিলের কাপড়।

সকালে কালী কাতর হইয়া বলে, ভাল কাপড়খানা নষ্ট হয়ে যাবে যে দিদি?

মনোরমা বলে, হোক। আঁচলটা জড়া দিকি কোমরে, ঘর দোর ঝাঁট দে রাজুর। খাটের তলটা ঝাঁটাস ভাল করে।

বিকালে আরও বেশী কাতর হইয়া কালী বলে, এটা নয় দিদি, পায়ে পড়ি তোমার, ওটা পড়ি এখন, আবার খুলে রাখব একটু পরে?

মনোরমা বলে, না, অত ফ্যাশন করে কাজ নেই তোমার। গরীবের মেয়ে গরীবের মত থাকো।

কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলে, বোকা মেয়ে, ছেঁড়া কাপড়ে তোকে যে বেশী সুন্দর দেখায় রে!

রাজকুমারের কাছে, সে আপশোষ করে, বড় চপল মেয়েটা রাজু, বড় চঞ্চল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে, তাও বলি, মেয়ে যেন মানুষের মন কাড়তে জন্মেছে। কি দিয়ে এমন মায়া লাগায় ছুঁড়ি ভগবান জানেন। ডাইনী এসে জন্মায়নি তো মানুষের পেটে? ক'দিনের জন্যে তো এসেছে, সেখানে পাড়াশুদ্ধ সবাই অস্থির, রোজ সবাই জিজ্ঞেস করে, কালী কবে ফিরবে গো কালীর মা? যদুবাবু মস্ত বড়লোক ওখানকার, বংশ একটু নীচু, তার গিন্নি মাসীকে এখন থেকে সাধাসাধি করছে, ছেলে বিলেত থেকে ফিরলে কালীকে আমায় দিও কালীর মা।

তবে তো কালীর বিয়ের জন্য কোন ভাবনাই নেই।

কে ভাবে ওর বিয়ের জন্য?

মনোরমার কাছে এসব শোনে আর কালীকে রাজকুমার একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে। তার মনে হয়, কেবল কথাবার্ত্তা চালচলন শিক্ষা-দীক্ষার দিক হইতে নয়, কালীর গড়নটি পর্য্যন্ত যেন ঘরোয়া ছাঁচের, বহুকাল আগে মিসেস বেল্‌নসের আঁকা গত শতাব্দীর বাঙ্গালী নারীর ছবির আদর্শে কালীর দেহ গড়িয়া উঠিতেছে।

এরকম মনে হয় কেন? সাজ পোষাকের এমন কোন নূতনত্ব তো কালীর নাই যে জন্য এরকম একটা ধারণা জন্মিবে

পারে। সাধারণ বাঙ্গালী সংসারের আর দশটি মেয়ের মতই তার সাধারণ বেশভূষা। অন্য কোন মেয়েকে দেখিয়া তো আজ পর্য্যন্ত তার মনে হয় নাই, দেয়াল আর ঘোমটার আড়ালে শুধু একজনের দৃষ্টিকে বিহ্বল করার জন্য তার রূপযৌবন, দেহটি শুধু তার সেবা আর গৃহকর্ম্মের উপযোগী ?

রিণি, সরসী আর মালতীর সঙ্গে, আত্মীয় এবং বন্ধু পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, কালীকে মিলাইয়া দেখিয়া রাজকুমার রহস্যভেদের চেষ্টা করে। ট্রামে বাসে ঘোমটা টানা ঘোমটা খোলা বৌ আর স্কুল কলেজের মেয়ে উঠিলে তাদের সঙ্গেও মনে মনে কালীকে মিলাইয়া দেখিতে তার ইচ্ছা হয়।

নিজের এক অলস কল্পনার ভিত্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়া এমন এক বিস্ময়কর সত্য প্রথম আবিষ্কারের অস্পষ্টতায় আবৃত হইয়া তার মনে উঁকি দিতে থাকে যে রাজকুমার অভিভূত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তার উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তার এই খাপছাড়া গবেষণার যে একটি অতি বিপজ্জনক দিক আছে, এটা তার খেয়ালও থাকে না।

যে রাজকুমারের এতকাল দেখা পাওয়াই কঠিন ছিল হঠাৎ তার ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটিতে থাকায় এবং তার শান্ত নির্ব্বিকার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাড়ীর মেয়েদের চমক লাগিয়া যায়। রাজকুমারের ব্যগ্র উৎসুক চাহনি সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কেউ দারুণ অস্বস্তি বোধ করে, কেউ মনে রাখিয়া যায়, কেউ অনুভব করে রোমাঞ্চ। প্রত্যেকে তারা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবিতে থাকে, এতকাল পরে আমার মধ্যে হঠাৎ কি দেখল যে এমন করে তাকিয়ে থাকে ? কেউ তার সামনে আসাই বন্ধ করিয়া দেয়, কেউ কথা ও ব্যবহারে কঠিনতা আনিয়া দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করে, কেউ আরও কাছে সরিয়া আসিতে চায়।

রিণি, সরসী আর মালতী রাজকুমারের এই অদ্ভুত আচরণ ভিন ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে তিন জনেই, অস্বস্তিও বোধ করিয়াছে প্রায় একই রকম, কিন্তু ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টায় তাদের মনে এমন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার উদয় হইয়াছে যে জানিতে পারিলে মানুষের মন সম্বন্ধেও একটা নূতন জ্ঞান খুব সহজেই রাজকুমারের জন্মিয়া যাইত।

রিণি ভাবে : এতদিনে কি বুঝিতে পারা গেল সেদিন গান প্র্যাক্‌টিস করার সময় সে অমন আগ্রহের সঙ্গে মুখ বাড়াইয়া দিলে রাজকুমার তাকে কেন অপমান করিয়াছিল ? রাজকুমারের মন কবিত্বময়, বাস্তব জগতের অনেক উঁচুতে নিজের মানস-কল্পনায় জগতে সে বাস করে ; বড় ভাবপ্রবণ প্রকৃতি রাজকুমারের। তার মনের ঐশ্বর্য্য রাজকুমারকে মুগ্ধ করিয়াছে, তার হাসি কথা গান ভাবালোকের অপার্থিব আনন্দ দিয়াছে রাজকুমারকে, তার সান্নিধ্য অনুভব করিয়াই রাজকুমারের মন এমনভাবে অভিভূত হইয়া গিয়াছে যে একটি চুম্বনের প্রয়োজনও সে বোধ করে নাই। সেদিন রাজকুমার তাই চমকাইয়া গিয়াছিল, কি করিবে ভাবিয়া পায় নাই। গান শুনিতে শুনিতে যে মানুষটা স্বপ্ন দেখিতেছিল হঠাৎ সচেতন হওয়ার পর তার খাপছাড়া ব্যবহারে অপমান বোধ করিয়া সেদিন তার রাগ করা উচিত হয় নাই। হয়তো সেদিন রাজকুমারের প্রথম খেয়াল হইয়াছিল, সে শুধু মন আর হাসি গান কথা নয়, একটা শরীরও তার আছে। হঠাৎ যে রাজকুমার এমন অসভ্যের মত খুঁটিয়া খুঁটিয়া তার সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা হয়তো তার এই নূতন চেতনার প্রতিক্রিয়া। তার অপূর্ব্ব রূপ প্রথম দেখিতে আরম্ভ করিয়া রাজকুমারের চোখে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে।

সরসী ভাবে : এতদিন তার শরীরটাই ছিল রাজকুমারের কাছে বড়। তার দিকে তাকাইলে মানুষ সহজে চোখ ফিরাইতে পারে না, তার এই দেহের বিস্ময়কর রূপ মানুষের মধ্যে দুরন্ত কামনা জাগাইয়া দেয়। এতকাল রাজকুমার তার শরীরটা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে, তাই লজ্জা সঙ্কোচে তার দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পারে নাই। তারপর রাজকুমার বুঝি তার অন্তরের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের মন-ভুলানো মেয়েলি হাবভাবের সস্তা অভিনয় সে যে কখনো করে না, লজ্জাবতী লতা সাজিয়া থাকে না, নাকি সুরে কথা বলে না, ভাবপ্রবণতা পছন্দ করে না, বাজে খেয়ালে হাল্কা খেলায় সময় নষ্ট করে না, এসব বোধ হয় রাজকুমারের খেয়াল হইয়াছে। খুব সম্ভব সেদিনের সভায় রাজকুমার তার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তার ভিতরের গভীরতার জন্য রাজকুমার তাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। ভালবাসে বলিয়া এখন আর রাজকুমার তার দিকে চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়।

মালতী ভাবে : ছি ছি, রাজকুমার কেমন মানুষ ? সে তো স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই রাজকুমারের এমন পরিচয়ও তাকে পাইতে হইবে। সে ভালবাসে জানা গিয়াছে কিনা তাই রাজকুমার এখন তাকে যাচাই করিতেছে। তাকে নয়, তার দেহকে। কোথায় তার কোন খুঁত আছে রূপের, খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাই এখন বাহির করিতেছে রাজকুমার। ভালবাসার দৃষ্টিতে যদি এমন মনোযোগের সঙ্গে রাজকুমার তাকে দেখিত! কিন্তু চোখে তার ভালবাসা নাই। মনে মনে কি যেন সে হিসাব করিতেছে আর যাচাই করার দৃষ্টিতে তার সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলাইতেছে!

কালীও অনেক কথা ভাবে। কিছু সে বুঝিতে পারে না, তার ভয় হয়, লজ্জায় সে আড়ষ্ট হইয়া যায়। আপনা হইতে কখনো সে ডাকিত না, হঠাৎ এতবার সে কেন অকারণে কাছে ডাকে ? সামনে দাঁড় করাইয়া কেন বলে, এদিক মুখ করো, ওদিকে মুখ করো, পিছন ফিরে দাঁড়াও ?

মনোরমাও রাজকুমারের ভাবান্তরে আশ্চর্য্য হইয়া

গিয়াছে। এমন বোকা সে নয় যে মনে করিবে কালীকে হঠাৎ বড় বেশী পছন্দ হইয়া যাওয়ায় সর্ব্বদা তাকে কাছে ডাকিয়া রাজকুমার তার সঙ্গে ভাব করিতে চায়। পছন্দ হইয়া থাকিলে আর ভাব করার ইচ্ছা জাগিয়া থাকিলে এভাবে যখন তখন বিনা কারণে ডাকার বদলে সে বরং বিশেষ দরকার হইলেও কালীকে ডাকিত না। রাজকুমারকে অন্য সকলে যতটা চেনে মনোরমা তার চেয়ে অনেক বেশীই চিনিয়াছে। গিরীন্দ্রনন্দিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহারই রাজকুমার করিয়া থাক, যদি ধরিয়াও নেওয়া যায় যে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সে অন্যায় ব্যবহারই করিয়াছিল, গিরির টানেই সে যে সেদিন তাদের বাড়ী গিয়াছিল, মনোরমা তা বিশ্বাস করে না। গিরির জন্য যাইতে ইচ্ছা হইলে সে কথনো সে বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইত না।

মনোরমা ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছিল না, রাজকুমার তার সমস্ত ভাবনা মিটাইয়া দিল। সকাল বেলা রাজকুমার তাকে বলিল, কালীকে রিণিদের বাড়ী একটু নিয়ে যাচ্ছি দিদি।

ওমা, কেন?

শুধু ঘরে বসে থাকবে? দু'চারজনের সঙ্গে একটু ভাবসাব করে আসুক?

মনোরমার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

বেশ তো নিয়ে যাও, আমায় আবার জিজ্ঞেস করা কেন?

কালীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য মনের মধ্যে বহিয়া নিয়া গিয়া রিণি, সরসী, মালতী আর অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে রাজকুমারের বড় অসুবিধা হইতেছিল। ওরকম আন্দাজী গবেষণায় এত বড় একটা তথ্য কি যাচাই করা চলে? পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কালীর সঙ্গে অন্য মেয়ের দেহের গড়নের তুলনা না করিলে অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না।

কালীকে সঙ্গে করিয়া সে দু'বেলা বাহির হয়, এক এক জনের বাড়ী গিয়া কালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেয়। সকলে তারা ভাবে, এ আবার কি খেয়াল রাজকুমারের? মনোরমা খুব খুসী হয়। এতদিন তার শুধু আশা ছিল, এবার তার ভরসা জাগে যে আশা হয়তো তার মিটিবে।

ধীরে ধীরে রাজকুমারের কাছে তার অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট অনুমান স্পষ্ট প্রমাণিত সত্য হইয়া উঠিতে থাকে। দ্বিধা সন্দেহ মিলাইয়া যায়। মাঝে মাঝে তার মনে হইতেছিল, মাথাটা বুঝি তার খারাপ হইয়া গিয়াছে, পাগলের মত সে অনুসরণ করিতেছে নিজের বিকৃত চিন্তার। এই আত্মগ্লানির বদলে এখন সে অনুভব করিতে থাকে আবিষ্কারকের গর্ব্ব।

কালীকে দেখিয়া তার মনে হইয়াছিল, তার দেহের গড়ন ঘরোয়া, অন্তঃপুরের একটি বিশেষ আবেষ্টনীতে একটি বিশেষ জীবনের সে উপযোগী। এখন সে জানিতে পারিয়াছে কেবল কালী একা নয়, সকলের দেহের গড়নেই এই সঙ্কেত আছে, দেহ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় সমাজের নানা স্তরে জীবনের বহু ও বিচিত্র পরিবেশের কোনটিতে সে খাপ খাইবে।

শুধু মন নয়, দেহের গঠন দেখিয়াও বিচার করিতে হয় কোন জীবন কার পক্ষে স্বাভাবিক, কোন জীবনে কার বিকাশ বাধা পাইবে না।

দেহ? এতকাল রিণি, সরসী আর মালতীর মনের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল, আজ তাদের দেহ কি বিস্ময়কর সংবাদই তাকে জানাইয়াছে! শুধু মনের হিসাব ধরিয়া সংসারে নিজেদের স্থান বাছিয়া নিতে গেলে জীবন ওদের ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অসংখ্য নারী ও পুরুষের যেমন গিয়াছে।

একদিন সরসীকে রাজকুমার বলিল, রিণি আর মালতীকে নেমন্তন্ন কর না?

কেন?

এমনি। তোমাদের একটা গ্রুপ ফটো নেব;

কবে?

কাল সকালে।

হঠাৎ আমাদের ফটো নেবার সখ হল কেন?

সখের কি কেন থাকে সরসী?

এসব সখের থাকে। আচ্ছা বলব। কিন্তু সকালে কেন, বিকেলে বললে হবে না?

তাই বোলো। তিনটে চারটের মধ্যে যেন আসে।

রাজকুমার একটু ভাবিল, খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আচ্ছা, জ্যোস্না মমতা ওদের বললে হয় না? আর তোমার সেই রুক্মিণীকে?

ওদেরও ফটো নেবে নাকি?

দোষ কি?

সরসী হাসিল, না দোষ কিছু নেই। হঠাৎ এতগুলি মেয়েকে একত্র করে ফটো নিতে চাইলে একটু খাপছাড়া মনে হবে, আর কিছু নয়। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। কিন্তু জ্যোস্না, মমতা আর রুক্মিণীকে নয় চিনলাম, 'ওদের' কারা?

লিষ্ট করে দিচ্ছি।

লিষ্ট? প্রকাণ্ড গ্রুপ হবে বলো? এত সব অদ্ভুত সখ চাপে কেন তোমার? দু'দিন যদি কিছু তুমি না কর, তিন দিনের দিন একটা কিছু করে অবাক করে দেবেই দেবে। এমনি চালচলন ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় বয়স বুঝি সত্তর পেরিয়েছে, হঠাৎ যে তোমার কি হয় বুঝি না।

রাজকুমার সতরটি মেয়ের নাম লিখিয়া লিষ্ট করিয়া দিলে সরসী ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, এতগুলি মেয়েকে বলতে হবে? কি ধরণের গ্রুপ হবে এটা? বান্ধবী গ্রুপ, না শুধু চেনা মেয়ের গ্রুপ? কুমারী গ্রুপ বলা চলবে না, তিনজনের বিয়ে হয়েছে।

কি যেন বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে চিন্তিতভাবে সরসী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, রাজকুমারের চোখে মানে আবিষ্কার করিতে চায়।

ফটোর কথা মিছে। কি যেন মতলব আছে তোমার। আমায় বলো রাজু।

ওদের সকলকে একত্র করে দেখতে চাই।

কেন?

একটা ব্যাপার বুঝতে চাই। তুমি বুঝবে না, সরসী।

বুঝব না? তোমায় আমি সকলের চেয়ে ভাল বুঝি, তা জানো?

রাজকুমার একটু হাসিল। হাসিটা সরসীর পছন্দ হইতেছে না টের পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার গম্ভীর হইয়া গেল।

জানতাম না, কিন্তু মেনে নিচ্ছি। তবে এটা ঠিক আমার বোঝার কথা নয়। এ অন্য ব্যাপার। রাজেনবাবুকে ভাল বুঝলেও তার নতুন মেটিরিয়াল স্পিরিচুয়ালিজমের থিয়োরী কি বুঝতে পারবে ভরসা কর?

থিয়োরী না বুঝতে পারি, থিয়োরীটা কোন বিষয়ে সেটুকু বুঝতে পারব বৈকি।

তবে শোন। মেয়েদের দেহের গড়নের সঙ্গে মনের গড়নের সম্পর্কটা বুঝবার চেষ্টা করছি।

ও, তাই বলো!

অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে সরসী যেন হঠাৎ আলো দেখিতে পাইয়াছে। চোখে তার উত্তেজনা দেখা দেয়, মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

রাজকুমার বলিতে থাকে, আমার মতে দেহের গড়নের সঙ্গে মেয়েদের মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সরসী। সুস্থ স্বাভাবিক দেহের কথাই বলছি। যে আবেষ্টনীতেই একটি মেয়ে বড় হোক, তার দেহের গড়নের জন্য মনের কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকবেই। তোমার মানসিক ধর্ম্মের কয়েকটা বিশেষ রূপ আছে, তুমি যদি জন্মের পরদিন থেকে অন্য একটি পরিবারে মানুষ হতে তবু এই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকত। যেমন ধরো, তোমার সাহস। তোমার দেহের গড়ন না বদলিয়ে কোন প্রভাব তোমার সাহস নষ্ট করতে পারত না। প্রকাশটা হয়তো অন্যরকমের হত। অন্য বাড়ীতে অন্য অবস্থায় মানুষ হলে তুমি হয়তো পথকে ভয় করতে, পুরুষকে ভয় করতে, বেলগাছকে ভয় করতে, মার খেয়ে কাঁদতে ভয় করতে, তবু কতগুলি দিকে সাহস তোমার থাকতই। অসুখ বিসুখ বিপদ আপদে বাড়ীর মধ্যে হয়তো একা তোমার মাথা ঠিক থাকতো, হাতে শুধু শাঁখা পরে তুমিই হয়তো হাসিমুখে বড়বাবুর দশহাজার টাকার গয়না পরা বৌয়ের সঙ্গে গল্প করতে, তুমিই হয়তো—

বুঝেছি, বুঝেছি। আর শুনতে চাই না রাজু, থামো। তুমি সত্যি বাঁচালে আমায়। তোমার থিয়োরী না পাগলামি সে তুমিই জানো, ক'দিন থেকে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি এটুকু যে বুঝতে পারছি তাই আমার ঢের। এইজন্য তুমি অমন করে তাকাচ্ছিলে আমাদের দিকে, ট্রামে বাসে আদ্দির পাঞ্জাবী-পরা ছোঁড়াগুলোও যেমনভাবে তাকাতে পারে না? কি আশ্চর্য্য মানুষ তুমি রাজু!

রাজকুমারকে সরসী চা করিয়া দিল, তিনরকম খাবার দিল। কথা বলিতে লাগিল অনর্গল। তার হাসি কথা চলাফেরা সব যেন হঠাৎ হাল্কা হইয়া গিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে সরসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তোমার ও থিয়োরী কি শুধু মেয়েদের সম্বন্ধে খাটে? ছেলেদের বেলা খাটে না? শুধু মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা করার তোমার অত আগ্রহ কেন শুনি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া রাজকুমার বলিল, ছেলেদের বেলাও খাটে। নিয়ম একই। তবে পুরুষের দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অতটা ঘনিষ্ঠ নয়। দেহের গড়ন অনুসারে মনের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেটা একেবারে চাপা পড়ে যেতে পারে, থেকেও না থাকার সামিল হয়ে যায়। মেয়েদের ব্যাপার অন্যরকম।

তারা দেহসর্ব্বস্ব বলে?

না, তাদের দেহ অন্যরকম বলে। দেহের অনুভূতি অন্য রকম বলে। দেহের উপযোগিতা অন্যরকম বলে। আরও অনেক কিছু আছে।

বিদায় দেওয়ার সময় সরসী বলিল, কাল তোমার লিষ্টের সকলকে আসতে বলব, তুমি কিন্তু ওদের জানিও না সখটা তোমার। গ্রুপ ফটো তোলার সখ আমার, তোমায় দিয়ে আমি ফটো তোলাচ্ছি। বুঝতে পারছ?

পরদিন কালীকে সঙ্গে করিয়া রাজকুমার সরসীর বাড়ী গেল। তিনটি মেয়ে আসিতে পারে নাই। তবু চোদ্দটি মেয়ে আসিয়াছে, কালী আর সরসীকে ধরিলে ষোল জন। এতগুলি মেয়েকে একসঙ্গে পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়াও রাজকুমার খুসী হইতে পারিল না। এতগুলি দেহ আর মনের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া দেখা রাজকুমারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। শুধু কথা বলিয়াই সময় কাটিয়া গেল।

জীবনে রাজকুমারের অনেকবার অনেকরকম ঝোঁক আসিয়াছে। এটা অবশ্য রাজকুমারের একচেটিয়া নয়, নেহাৎ গোবেচারী শ্লথ মানুষেরও ঝোঁক আসে। কোন কোন মানুষ ঝোঁকের মাথায় কখনো কোন কাজ করে না, ভাল কাজও নয়। দুঃখ আর অশান্তি দূর করিয়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সুখী করার ঝোঁকও যদি এ সমস্ত মানুষের চাপে, যতক্ষণ ঝোঁক থাকিবে কিছুই তারা করিবে না। ঝিমাইয়া পড়া পর্য্যন্ত মনে মনে শুধু বিবেচনা করিয়া চলিবে কাজটা উচিত

কি না আর লাভ লোকসানের খতিয়ানটা কি এবং নিজের সংযমের বাহুল্যে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবে। সংযম যেন নিছক ধীরতা ও শৈথিল্য।

হঠাৎ-জাগা সমস্ত ইচ্ছাকে রাজকুমার অবশ্য আমল দেয় না, পাগল ছাড়া সেটা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়। তবে ঝোঁকের মাথায় কাজ করার স্বভাব তার আছে। অনেক পুরস্কার ও শাস্তি, আনন্দ ও বিষণ্ণতা এমনিভাবে সে অর্জ্জন করিয়াছে।

এবার যে সৃষ্টিছাড়া খেয়ালটি তাকে আশ্রয় করিল, আবির্ভাবটা তার আকস্মিক নয়। তবু এ খেয়ালটি ঝোঁকের মতই প্রবল হইয়া উঠিল। প্রথমে মনের কোণে কথাটা একবার শুধু উঁকি দিয়া গেল, ভাঙ্গা মেঘের মত মনের আকাশের এক টুকরা অসঙ্গত আলগা চিন্তা। নিজের কাছেই যেন রাজকুমার লজ্জা বোধ করিল। এসব চিন্তা কোথা হইতে ভাসিয়া আসে, আবার কোথায় চলিয়া যায়। এ চিন্তাটিরও ধীরে ধীরে মনের দিগন্তে মিলাইয়া যাওয়া উচিত ছিল, তার বদলে দিন দিন যেন স্পষ্টতর ও অবাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

শীতের আমেজে দেহের সঙ্কোচন প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়, কালীর হাতে সেলাই করা পাড়ের কাঁথা গায়ে টানিয়া শেষ রাত্রে ব ই আরাম বোধ হয়। আধ ঘুম আধ জাগরণের সেই যুক্তিহীন নীতিহীন নিষ্পাপ জগতের অবাস্তব অবলম্বনে একটি অপরূপ নিরাবরণ দেহ আলগোছে ভাসিতে থাকে। বেশী দূরে নয়, হাত বাড়াইলে বোধ হয় স্পর্শ করা যায়, তবু অস্পষ্ট। কোন জীবনের উপযোগী এ দেহ, ভিতরের প্রকৃতির কোন পরিচয় আঁকা আছে এই দেহের বাহিরে, কিছুই টের পাওয়া যায় না। ঘুম ভাঙ্গিবার পর ছায়া মিলাইয়া যায়, ওই রকম কয়েকটি দেহ পরীক্ষা করিবার ঔৎসুক্য শুধু জাগিয়া থাকে রাজকুমারের।

মোটা মোটা ডাক্তারি বই আর নোটবুকগুলির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এই কথাটা সে মনে মনে নাড়াচাড়া করে। পরীক্ষার জন্য দেহ ভাড়া করা যায়, কিন্তু সে সব নরনারীর দেহ পরীক্ষা করিয়া তার বিশেষ কোন লাভ হইবে না। যাদের সে জানে, যাদের সুখ-দুঃখ-আশা আকাঙ্ক্ষার সংবাদের সঙ্গে জীবন যাপনের রীতিনীতির পরিচয় সে রাখে, নিরাবরণ তাদের কয়েক জনকে সে যদি দেখিতে পাইত!

কিন্তু এদের কারো কাছে ইচ্ছাটা জানানো পর্য্যন্ত চলে না।

শোনামাত্র যুগ-যুগান্তরের সংস্কারে ঘা লাগিবে, তাকে মনে করিবে পাগল, অসভ্য, বর্ব্বর। বুঝাইয়া বলিলে যে কেউ বুঝিবে সে ভরসাও রাজকুমারের নাই।

সে যে শুধু একটা সত্যের, একটা নিয়মের সন্ধান চায়, কেউ তা বিশ্বাস করিবে না। যতই ভীরু আর লাজুক মনে হোক, উদ্ধত অত্যাচারী সৈনিক বা যন্ত্রীর জীবন ছাড়া শ্যামলের সুখী হওয়ার উপায় কেন নাই; কঙ্কির মত যতই অবাধ্য ও স্বাধীন মনে হোক রিণিকে, শাসন-পিপাসু শক্তিমান পুরুষের উপর কলা-বৌ-এর মত নির্ভর করিতে না পারিলে রিণির জীবনে সার্থকতা কেন নাই; দেশে দেশে নগরে নগরে যাযাবর জীবন কেন স্যর কে, এল-এর প্রয়োজন ছিল; ইতিমধ্যেই চার পাঁচটি সন্তানের মা হইতে না পারায় সরসী কেন সভাসমিতি করিয়া বেড়ায়; এসব প্রশ্নের জবাব জানিবার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না, কৌতূহলও কারো নাই। এগুলি প্রশ্ন বলিয়াই তারা স্বীকার করিতে চায় কিনা সন্দেহ। মানুষের দেহে এই সব রহস্যের নির্দেশ সন্ধান করা ওদের কাছে অর্থহীন উদ্ভট ব্যাপার, ছি ছি করার ব্যাপার।

কিন্তু যেটুকু সে জানিয়াছে কেবল সেইটুকু জানিয়া থামিয়া থাকার কথা ভাবিলেও এদিকে জীবনটাই যেন অসঙ্গত মনে হয়। ঝোঁকের এই অভিশাপ চিরকালের—যখন যেদিকে গতি, সেদিক ছাড়া অন্য কোনদিকে জগতের সার্থক অস্তিত্ব আছে ভাবা যায় না।

একদিন আলোচনা ও পরামর্শের জন্য রাজকুমার বিকাল-বেলা হাজির হয় বন্ধু পরেশের কাছে।

পরেশ বলে, এ্যানাটমি শিখতে চাও? সেটা তো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ওর আর কি, পয়সা দিয়ে মড়া কিনবে, ছুরি দিয়ে কাটবে—

মড়া! জীবনের সঙ্গে সে খুঁজিতেছে জীবন্ত মানুষের সংযোগ ও সামঞ্জস্যের রীতি, মড়া কাটিয়া তার হইবে কি?

উৎসাহের সঙ্গে রাজকুমার পরেশকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতে আরম্ভ করে।

পরেশ ডাক্তার মানুষ, রাজকুমারের কথা শুনিতে শুনিতে সে হাসিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

হাত দেখার ব্যাপারটা জানি, শরীর দেখাটা নতুন ঠেকছে।

তুমি হাত দেখায় বিশ্বাস কর না?

না। ওসব বুজরুকি।

তুমি যা জান না তাই যদি বুজরুকি হয়—

আমি জানি না বলে নয়। একটা কিছু সম্ভবপর কি না সাধারণ বুদ্ধিতেই মোটামুটি বোঝা যায়। ভবিষ্যৎ কখনো মানুষের হাতে লেখা থাকতে পারে! হাত দেখে কখনো বলা যেতে পারে একদিন মানুষের জীবনে কি ঘটবে না ঘটবে?

নগেনবাবু যে এক বছরের মধ্যে অন্ধ হয়ে যাবেন, তুমি কি করে জানলে?

সেটা ভিন্ন কথা। নগেনবাবুর চোখে অসুখ হয়েছে, চোখের এই অসুখে বছরখানেকের মধ্যে মানুষ অন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েকটা চেনা লক্ষণ দেখে তুমি জানতে পেরেছ, নগেনবাবুর চোখে অসুখ হয়েছে, কেমন? আগে আরও

অনেকের চোখে এই রকম অসুখ হয়েছে, অল্পদিনের মধ্যে তারা অন্ধ হয়ে গেছে, তুমি তাই বলতে পারছ নগেনবাবুও অন্ধ হয়ে যাবেন। মানুষের হাতেও তো চেনা লক্ষণ থাকতে পারে, যা দেখে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে? যেমন ধরো—পরেশের হাত টানিয়া আঙুলগুলির ঠিক নীচে হাতের তালুতে চারটি চিহ্ন দেখাইয়া দেয়, এগুলো দেখে আমি বুঝতে পারছি ডাক্তারিতে তোমার কোনদিন পশার হবে না।

হাত দেখার বুজরুকির পরেশের হঠাৎ গভীর কৌতূহল দেখা যায়। আগ্রহের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করে, কি করে জানলে?

আরও অনেকের হাতে এরকম চিহ্ন ছিল, দেখা গেছে তারা খুব ঢিলে অলস প্রকৃতির মানুষ। কোন বিষয়ে চেষ্টাও থাকে না, পরিশ্রমও করতে পারে না। বছর পাঁচেকের মধ্যে তোমার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

পাঁচ বছর পরে সম্ভব?

তা বলা যায় না। তবে উন্নতি না হওয়ার লিমিট যে পাঁচবছর সেটা জোর করে বলতে পারি। বাপের পয়সাতেই এ ক'টা বছর তোমায় চালাতে হবে। অবস্থার ফেরে যদি স্বভাব বদলায়, হাতের এই চিহ্নগুলিও বদলে যাবে, তখন হয়তো তোমার কিছু হতে পারে। বছর পাঁচেক সময় তাতে লাগবেই।

পরেশ মনে মনে চটিয়াছিল, ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, তুমি এত বড় গণৎকার হয়ে উঠেছ তাতো জানতাম না। ডাক্তারি করার আগে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তো ভুল করেছি!

শুধু ডাক্তারি তো নয়, তা বলিনি আমি। ডাক্তারিতে পশার হবে না, একথা তোমার হাতে লেখা নেই। থাকলেও সে লেখা পড়ার পড়বার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার হাতে লক্ষণ আছে উন্নতি করার অক্ষমতার। নিজে উপার্জ্জন করে বড়লোক হওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই বলে তোমার যে টাকা হবে না তাও বলা চলে না। অন্য কেউ তোমার টাকা খাটিয়ে তোমাকে আরও বড়লোক করে দিতে পারে, কোন আত্মীয় মারা গিয়ে সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারে, লটারীর টিকিট কিনে টাকা পেতে পার। তোমার হাত দেখে যদি বলি টাকা তোমার হবে না, শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর, সেটা হবে বুজরুকি। কিন্তু যদি বলি নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রমে টাকা তোমার হবে না, সেটা হবে বিজ্ঞান। হাত দেখারও খানিকটা বিজ্ঞান, বাকীটা বুজরুকি। আর এই বুজরুকির জন্যই খাঁটি জিনিষটুকুর ওপর লোকের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। বেশী ফাঁকির সুযোগ থাকলে বিজ্ঞান ভেস্তে যায়। ফুটপাতের তিলক-আঁটা উড়ে গণৎকারের মত ডাক্তার পসাতে পায় না বলে তোমাদের লোকে বিশ্বাস করে, নিমুনিয়া হলে তোমরা অনেকে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা কর, তবু।

তাই নাকি?

তাই। বিজ্ঞানের এত উন্নতি কেন সম্ভব হয়েছে জান? জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কথাও কেউ বিশ্বাস করতে পাবে না, এই নিয়ম মেনে চলা হয়েছে বলে। সামান্য একটি আবিষ্কার পর্য্যন্ত তাকে প্রমাণ করতে হবে,—আগে শ' খানেক আবিষ্কারে মানুষকে চমকে দিয়েছে বলেই যে তাঁর একশ' এক নম্বর আবিষ্কারটি মেনে নেওয়া হবে, তা চলবে না। অনুমান করার অধিকার আছে কিন্তু সেটা অনুমান বলেই ঘোষণা করতে হবে। 'আমি বলছি' বলে কোন কথা বিজ্ঞানে নেই।

সত্যি, ভারি আশ্চর্য্য তো!

রাজকুমার মনে মনে হাসে। ঠিক এই প্রতিক্রিয়াই পরেশের কাছে প্রত্যাশা করা চলে। অকর্ম্মণ্য অলস মানুষের স্থিতিশীল অকর্ম্মণ্যতার এও একটা প্রমাণ। যা ভাবে না, যা জানে না, অন্যের কাছে তার ব্যাখ্যা শুনিতে এরা জ্বালা বোধ করে। মনে করে তারই যেন সমালোচনা করিতেছে, উপদেশ দিয়া প্রমাণ করিতেছে তারই মূর্খতা।

আশ্চর্য্য বৈকি, গাম্ভীর্য্যের ভাণ বজায় রাখিয়াই রাজকুমার বলিয়া যায়, আমি যে দেহ দেখে মানুষকে জানার কথা বলছিলাম তাও কতকটা হাত দেখার মত। মানুষকে দেখে অনেক সময় তার স্বভাব-চরিত্র টের পাওয়া যায় মানো তো?

কে জানে, জানি না।

যেমন ধরো সুরেশ। দেখলেই টের পাওয়া যায় ছেলেটা বিগড়ে গেছে। অনায়াসে বলা যায় ছেলেটা লেখাপড়াও শিখবে না, মানুষও হবে না। যেখানে ওকে তুমি রাখো, যে কাজেই লাগিয়ে দাও, ও কখনো ভালভাবে চলতে পারবে না।

সুরেশ পরেশের ছোট ভাই—কদিন আগে অতি কুৎসিত একটা অপরাধে ছ'মাসের জন্য জেলে গিয়াছে। সুরেশের পাংশু শীর্ণ মুখে সদা চঞ্চল কুটিল দুটি চোখ দেখিলে অপরিচিত মানুষও সত্যসত্যই টের পাইয়া যাইত তার ভিতরটা কি রকম বিকারে ভরা।

পরেশ মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

একটা রোগী দেখতে যাব!

বলিয়া সে চলিয়া যায় বাড়ীর ভিতরে।

তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে রাজকুমারের মনে হয় পরেশকে না চটাইলেই হইত। এরকম সস্তা অভিমান দেখিলেই কেন যে তার আঘাত দিতে ইচ্ছা হয়! ছেলেবেলা ফাঁপানো খেলনা বেলুন দেখিলেই যেমন ফুটা না করিয়া থাকিতে পারিত না, এখন ফাঁকা মানুষের সংস্পর্শে আসিলেই ফাঁকিতে খোঁচা দেওয়ার সাধটা তেমনি সে দমন করিতে পারে না। মানুষের সঙ্গে এই জন্য তার বনে না। আবেগ আর অভিমানে সায় দেওয়ার তোষামোদ জানে না বলিয়া আত্মীয় বন্ধু অনেকের কাছেই সে পছন্দসই

লোক নয়। দশজনের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলার প্রধান মন্ত্রটিই সে বাতিল করিয়া রাখে।

ভাবিতে ভাবিতে গভীর একাকীত্বের অনুভূতি তাকে বিষণ্ণ করিয়া দেয়। মানুষের সঙ্গ লাভের এমন একটা জোরালো কামনা সে অনুভব করে যেন বহুদিন জনহীন অরণ্যে বা প্রান্তরে বাস করিতেছে। ক্লাবের কথা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি সে সেখানে গিয়া হাজির হয়। টেনিস খেলার সখ জাগায় একদিন সে ক্লাবে যোগ দিয়াছিল, তারপর নিয়মিত চাঁদা দিয়া আসিতেছে কিন্তু ক্লাবে যাতায়াত করে কদাচিৎ। এই ব্যাপারটাও আজ যেন তার খেয়াল হইল প্রথম। ক্লাবের সে মেম্বার, ক্লাবে সুযোগ আছে খেলা-ধূলা ও দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করার, কিন্তু ক্লাবের জন্য কোন আকর্ষণ সে অনুভব করে না। মানুষের সঙ্গ সে কি ভালবাসে না? মানুষটা সে কি কুনো? অথবা দশজনের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে না বলিয়া দশজনকে এড়াইয়া চলে?

স্যার কে, এল প্রায়ই ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলিতে আসেন। তিনজন অর্দ্ধপরিচিতের সঙ্গে ব্রিজ খেলিতে বসিয়া রাত ন'টার সময় বিরক্তিতে রাজকুমারের চোখে যখন প্রায় জল আসিয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছে, স্যার কে, এল-ই তাকে উদ্ধার করিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ তুমি আজ এদিকে? রাজকুমার বলিল, আড্ডা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আড্ডা আমার একেবারে সয় না।

আমারও সয় না। তবু আড্ডা দিই।

পথে স্যার কে, এল-এর এক বন্ধুর বাড়ী হইতে রিণিকে তুলিয়া নেওয়ার কথা ছিল। রিণি এখানে প্রায়ই রাত্রে টেনিস খেলিতে আসে। বিকালে সে খেলে না। খেলার পর যে শ্রান্তি বোধ হয় তাতে নাকি বিকালটা তার মাটি হইয়া যায়। রিণির দেখাদেখি আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নাকি বিকালের বদলে রাত্রে টেনিস খেলার সুবিধা বুঝিতে পারিয়াছে।

তখনও খেলা চলিতেছে। সর্ট আর সার্ট পরা রিণিকে যে সে দেখিতে পাইবে রাজকুমার তা কল্পনাও করে নাই। জোরালো কৃত্রিম আলোয় রিণির দ্রুত সঞ্চরণশীল হাল্কা শরীরটি তার চোখে যেন নতুন একটা বিস্ময়ের মত ঠেকিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ দলের মেয়েটি শাড়ী পরিয়াই খেলিতে নামিয়াছে, মাঝে মাঝে রিণির দিকে চাহিয়া তার ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিতেছে মৃদু হাসি।

খেলা দেখার জন্য দাঁড়াইয়া রাজকুমার শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া গেল শুধু রিণিকে।

খেলার শেষে রিণি বলিল, আরেকটু শীত না পড়লে খেলে আরাম নেই। যত শীত পড়ে তত তাড়াতাড়ি ঘাম শুকিয়ে যায়।

রাজকুমার বলিল, না খেললে ঘাম হয় না।

ফ্যাট হয়। আর রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। বাড়ী গিয়ে স্নান করলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসবে।

শরীর সম্বন্ধে রিণির যে এতখানি যত্ন আছে রাজকুমারের জানা ছিল না। স্যার কে, এল-এর জন্য আজ গাড়ীতে রিণির পাশে বসিতে না পারায় তার কেমন যেন ক্ষতি বোধ হইতে থাকে। রিণির গলা পর্য্যন্ত এখন ঢাকা, মুখ ফিরাইয়া কথা বলিতে গিয়া সে আবরণ সে যেন দেখিতে পায় না, টেনিস কোর্টের রিণিই যেন এত কাছে পিছনের সিটে বসিয়াছে মনে হয়। এই দেহাশ্রয়ী জীবটি আহ্লাদী মেয়ের মত আদরের তাপে গলিতে চায়, শান্ত সুরক্ষিত সংস্কারময় অন্তঃপুরে স্বামী নামে প্রভুর তত্ত্বাবধানে বাস করিবার শুধু সে উপযোগী,—এই সিদ্ধান্ত কি সে করিয়াছে এই রিণির সম্বন্ধে?

রাজকুমারের যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

রিণির সাহস আছে, একগুঁয়েমি আছে, তেজ আছে। এইগুলি সে অর্জ্জন করিয়াছে তার আত্মবিরোধী জীবন যাপনের প্রক্রিয়ায়। রিণিকে সে যদি তার নূতন চিন্তাধারার সন্ধান দেয়? রিণির কাছে সে যদি তার অসঙ্গত দাবী জানায়?

স্যার কে, এল-এর একটা কথাও রাজকুমারের কানে যায় না, নিজে সে কি বলিতেছে আর রিণি কি জবাব দিতেছে তাও ভাল খেয়াল থাকে না।

কথা বন্ধ করিয়া হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া যায়।

শান্ত মনে কথাটা বিবেচনা করা দরকার। রিণিকে কিছু বলা না বলার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে, ঝোঁকের মাথায় কিছু করিয়া বসিলে চলিবে না। রিণি রাগ করিতে পারে, চিরদিনের জন্য তার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলিয়া দিতে পারে, মনে মনে তাকে ঘৃণা করিতে পারে, দুঃখ পাইতে পারে, হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। অনেক রকম সম্ভাবনাই আছে। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার।

কিন্তু অনুরোধটা জানাইলে রিণির কাছে কি রকম প্রতিক্রিয়া আশা করা উচিত সে বিষয়ে তাকে ভাবিতে হইতেছে কেন? ঠিক কি রকম প্রতিক্রিয়া হইবে এতদিন রিণিকে জানিয়া এটুকুও সে কি অনুমান করিতে পারে না?

রিণি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছিল, রাজকুমার তাড়াতাড়ি গিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে রিণি। খুব দরকারী কথা।

রিণি আশ্চর্য্য হয় না। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ খাপছাড়া উত্তেজনার সঙ্গে খুব দরকারী একটা কথা বলিতে চাওয়া, রিণি তার মানে জানে। ঠিক এমনিভাবে ওরা চিরদিন কথাটা জানায়। বলার সুযোগ যখন থাকে তখন কিছু বলে না, আজকালের মধ্যে আবার সুযোগ আসিবে জানিয়াও অপেক্ষা করিতে পারে না, অসময়ে ব্যস্ত হইয়া উঠে।

কি কথা?

ঘরে চলো, বলছি।

দু'চার মিনিটে বলা হবে না বোধ হয়?

না। একটু সময় লাগবে। অনেক কথা বুঝিয়ে বলতে হবে তোমাকে।

আমারও বুঝতে সময় লাগবে নিশ্চয়। মালতীর মত বুদ্ধি তো নেই।

রিণির এই ঈর্ষার খোঁচাটা রাজকুমারকে তিরস্কারের মত আঘাত করিল। মালতীর কথা তার মনেই ছিল না। নূতন চিন্তাটাই কিছুদিন হইতে তার মন জুড়িয়া আছে। মালতী নামে যে একটি মেয়ে আছে জগতে, গত বর্ষার এক সন্ধ্যায় ওই মেয়েটিকে যে জগতের অন্য সব মেয়ের চেয়ে সে কাছে আসিতে দিয়াছে, এসব সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল।

মালতীকে সে আর পড়ায় না। এবার মালতীর পরীক্ষা, ভালভাবে পাশ করার আগ্রহ তার চিরদিন খুব প্রবল। রাজকুমারের কাছে পড়িলে তার আর পাশ করার ভরসা নাই। রাজকুমার তাই নিজেই পড়ানো বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মালতীও আপত্তি করে নাই। তার আসা-যাওয়া যে একেবারে কমিয়া গিয়াছে, বাদ পড়িয়াছে অতি প্রয়োজনীয় অনাবশ্যক কথা বলা, সেজন্যও মালতীর কাছ হইতে কোন নালিশ আসে নাই। হয়তো মালতী ভাবিয়াছে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটানোর ভয়ে সে যায় না, পরীক্ষার আগে আবেগ ও উত্তেজনায় তাকে একটি দিনের জন্যও অশান্ত করিতে চায় না। ভাবিয়া মালতী হয়তো কৃতজ্ঞতাই বোধ করিতেছে।

তার ব্যবহারে মালতী দুঃখ পায় নাই—এই যুক্তি কিন্তু রাজকুমারের নিজের মানসিক শান্তি বজায় রাখিতে কাজে লাগে না। শ্যামলের কথাটা তার মনে পড়িয়া যায়। শ্যামল বলিয়াছিল, মালতীকে ভালবাসিবার উপযুক্ত সে নয়। অসঙ্গত বলিয়া জানিলেও কথাটা এখন তাকে পীড়ন করিতে থাকে। রিণির কাছে যে প্রস্তাব করিতে সে চাহিতেছে, জানিতে পারিলে মালতী ব্যথা পাইবে। সে ব্যথার স্বাদ কত কটু, কত তীব্র তার জ্বালা, রাজকুমার অনুমান করিতে পারে। মালতী তার উদ্দেশ্য বুঝিবে না। রিণির রূপ যে সে দেখিতে চায় না, রিণিকে অনুরোধটা জানানোর আগে তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া আর গলা শুকাইয়া যাওয়ার কারণ যে মনের কোন দুর্বলতা নয়, মালতী তা ধারণাও করিতে পারিবে না, বিশ্বাসও করিবে না! মালতীর কাছে সে উদারতা প্রত্যাশাও করা চলে না। আহত-বিস্ময়ে কত কি যে মালতী ভাবিবে! ক্ষোভ, দুঃখ, ঈর্ষা ও ক্রোধে আরও কত আঘাত যে নিজের জন্য নিজেই সে চয়ন করিবে!

তবে, হয়তো মালতী জানিবে না। না জানার সম্ভাবনাই বেশী। রিণি যদি রাগ করে, চিরদিনের জন্য যদি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দেয়, কারো কাছে সে কোনদিন বলিতে পারিবে না, ছদ্মবেশী এক বুনো জানোয়ারের কোন্ দাবী একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল।

মালতী জানিবে না। তবু রাজকুমার অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। স্তরে স্তরে সঞ্চিত সংস্কারের অবাধ্য প্রতিবাদ একটানা চাপের মত মনে অশান্তি জাগাইয়া রাখে। মালতীর না জানা তো বড় কথা নয়! মালতীর জানার ফলাফলটা সে যতখানি কল্পনা করিতে পারে তারই গুরুত্ব যেন সকলের আগে বিবেচ্য। জানুক, বা না জানুক, আঘাত পাক বা পাক, যে কাজ করিলে একটি মেয়ের সুখ-শান্তি ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে কাজ করা তার উচিত নয়। মনে তার পাপ নাই?—না থাক। পুণ্যের জন্যও অনেক কাজ সংসারে করা যায় না।

রিণির সঙ্গে গুরুতর বুঝাপড়ার লড়াই সুরু করিবার ঠিক আগে এসব চিন্তা রাজকুমারকে একটু কাবু করিয়াছিল বৈ কি। কালও যা করা চলিবে আজ তা না করিয়া পালানোর কথাটাও একবার তাবু মনে আসিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার জন্য আরেকটু সময় নিলে কি আসিয়া যায়? হঠাৎ যেন একটু ভয় করিতে লাগিল রাজকুমারের। ভাবনা তার ছিল অনেক, এতক্ষণ ভয় এতটু ছিল না।

সময় যদি লাগে, তাহলে তুমি বোসো। খেয়ে এসে তোমার দরকারী কথা শুনব।

না, আগেই শুনে যাও।

বেশীক্ষণ লাগবে না নাইতে। মিনিট কুড়ি। কথাটা ততক্ষণ মনে মনে গুছিয়ে নাও বরং, বলতে সুবিধে হবে।

রিণি একটু হাসিল। এমন মধুর হাসি রাজকুমার কোনদিন তার মুখে ছাখে নাই। রিণি যেন হঠাৎ আজ কেমন হইয়া গিয়াছে।

তবে আজ থাক, রিণি।

থাকবে কেন? তোমার আজ কি হয়েছে বলতো? খেলে এসে না নাওয়া পর্য্যন্ত আমার কি বিশ্রী লাগে তুমি বুঝবে না। বলতে চাও বলো, শুনতে কিন্তু আমার ভাল লাগবে না বলে রাখছি।

কথাটা শোন আগে, বুঝতে পারবে নাইতে যাওয়ার আগে কেন বলতে চাই। আমি বাথরুমে থাকব, রিণি।

বাথরুমে থাকবে?

তোমার নাওয়া দেখব। তুমি নাইবে, আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকব চুপ করে।

রিণি কথা বলিতে পারে না। জোরে তার দাঁতে দাঁত আটকাইয়া গিয়াছে, মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। রাজকুমার সোজা তার চোখের দিকে তাকায়। দ্বিধা সঙ্কোচ ভয় সব তার এতক্ষণে কাটিয়া গিয়াছে।

কথাটা তোমার খুব অন্যায় মনে হচ্ছে? এখানে বোসো, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলছি।

বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। কোথায় গিয়েছিলে বাবার সঙ্গে? কটা পেগ গিলেছ?

পেগ? ওসব আমার নেই তুমি জান না?

এতদিন তাই তো জানতাম।

আজ আমার কথা শুনে ধারণাটা বদলে গেছে, না? আমার সব কথা কিন্তু শোনোনি রিণি।

হাত ধরিয়া রিণিকে একরকম সে জোর করিয়া একটা সোফায় বসাইয়া দিল। বড় রাগ হইতেছিল রাজকুমারের। এত কথা ভাবিবার থাকিতে রিণি কিনা ভাবিয়া বসিল মদ গিলিয়া সে তার সঙ্গে ফাজলামি করিতে আসিয়াছে!

আগ্রহের সঙ্গে সে রিণিকে সব বুঝাইয়া দিতে থাকে। বিশেষ করিয়া জোর দেয় তার নিষ্পাপ নির্ব্বিকার মনোভাবের উপর, তার উদ্দেশ্যের আসল মানের উপর। কি আবেগের সঙ্গেই সে যে বার বার ঘোষণা করে, বাথরুমে রিণিকে দেখিতে যাওয়ার মত অভদ্র ছোটলোক সে নয়, ওরকম ইচ্ছা জাগার মত হীন নয় তার মন।

ব্যাখ্যা করিতে রাজকুমার চিরদিনই ওস্তাদ। বুঝিতে রিণির আর কিছুই বাকী থাকে না। মুখের ভাবে তার পরিবর্ত্তন কিন্তু হয় আশ্চর্য্য রকম, রাজকুমারের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। মনে হয়, রাজকুমারের প্রস্তাব শুনিয়া তার যেন শুধু চমক লাগিয়াছিল, রাজকুমার মদ খাইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া তার যেন শুধু দুঃখ হইয়াছিল। এতক্ষণে তার রাগ হইয়াছে, ব্যাখ্যা শুনিবার পর, সব বুঝিবার পর।

বুঝতে পেরেছ রিণি?

পেরেছি বৈ কি।

গলার আওয়াজেই রাজকুমার সচেতন হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ সুরকে চাপিয়া এভাবে দাঁতে কাটিয়া রিণিকে সে আর একদিন কথা বলিতে শুনিয়াছিল। গানের আবেশে বিহ্বলা রিণির বাড়ানো মুখের আমন্ত্রণ যেদিন সে গ্রহণ করে নাই। সেদিনও রিণির নাক এমনি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল রাগের মাথায় হঠাৎ বুঝি কামড়াইয়া দিবে—দুরন্ত ছোট মেয়েরা যেমন দেয়।

ম্লান মুখে রাজকুমার একটু হাসিল।

জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, তুমি রাজী নও বুঝতে পারছি।

বুঝবে বৈ কি। তুমি তো বোকা নও।

কিছু মনে কোরো না রিণি।

না। মনে আবার কি করব।

আমি তবে যাই।

যাও। আর এসো না।

আচ্ছা।

রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কথাটা তুমি আর একটু উদারভাবে নেবে ভেবেছিলাম, রিণি।

রিণিও উঠিয়া দাঁড়াইল।

তোমায় বোকা ভাবতে পারলে তাই নিতাম। তুমি তো বোকা নও।

রাজকুমার চলিয়া যায়, রিণি পিছন হইতে তাকে ডাকিল।

একটা উপদেশ নিয়ে যাও। আরেকটি মেয়েকে যখন কথাটা বলবে, মালতীকেই বলবে বোধ হয়, কিছু বুঝিয়ে বলতে যেও না। শুধু বোলো যে তোমার এ সাধটা না মেটালে তুমি পাগল হয়ে যাবে, সায়নাইড খাবে। হয়তো রাজী হতে পারে।

রিণি কিছুই অস্পষ্ট রাখে নাই। কয়েকটি কথাতেই সব পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছে। যতই অসঙ্গত হোক, শুধু তার ইচ্ছার কথা হইলে নিজের নিরাবরণ দেহটি তাকে দেখাইতে রিণি রাজী হইলেও হইতে পারিত। সত্য সত্যই রাজী সে হয়তো হইত না, কিন্তু একটু দোমনা তো অন্ততঃ হইত। একবারের জন্যও মনে তো হইত কি আসিয়া যায় মানুষটার ব্যাকুল প্রার্থনা মিটাইলে? বিমুখ করিয়া একটু আপশোষও হয়তো জাগিত। নিজের জন্য আবেদন জানানো ছাড়া রিণির মন একটু নরম করারও আর কোন উপায় নাই। কেবল রিণির নয়, সব মেয়ের সম্বন্ধেই এই এক কথা। রিণি তাই বলিয়াছে।

রাজকুমার কি কথাটা জানে না? যুক্তির দাম মেয়েদের কাছে নাই, একটুখানি আবেগের বন্যায় বিশ্বের সমস্ত যুক্তি তর্ক উচিত অনুচিত ভাল মন্দ ভাসিয়া যাইতে পারে, এটুকু জ্ঞান কি সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই এত দিনে? রাজকুমার লজ্জা বোধ করে। রিণি তাকে বোকা মনে করিতে অস্বীকার করিয়াছে, বোকামি কিন্তু সে করিয়াছে সত্যই। সায়নাইড খাওয়ার কথা বলিলে রিণি গর্ব্ব বোধ করিবে আর নিছক একটা থিওরি যাচাই করিতে তার সাহায্য চাহিলে সে বোধ করিবে অপমান, এটুকু তার খেয়াল রাখা উচিত ছিল।

তাছাড়া, রিণি প্রত্যাশা করিয়াছিল অন্য কথা। রাজকুমার বিশ্বাস করে না রিণি তাকে ভালবাসে। তাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভাল না বাসিলেও ভালবাসার ঘোষণা শুনিতে কে না ভালবাসে? এদিকটাও তার খেয়াল করা উচিত ছিল।

নিজের চারকোণা ঘরে চারকোণা খাটে রাজকুমার চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে আর উত্তেজিত চিন্তা ছুটাছুটি করে তার মনে। সিলিং-এর হাত তিনেক নীচে একটা মাকড়শা শূন্যে ঝুলিয়া আছে, সূক্ষ্ম অবলম্বনটি চোখে পড়ে না। কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়া মাকড়শাটি আরও হাত খানেক নীচে পড়িয়া যায়। রাজকুমারের ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া ওঠে। না, দ্বিতীয় বার চেষ্টা করার চেয়ে তার ব্যর্থতাই ভাল।

জীবনে আর কোন মেয়ের কাছে এ দাবী সে করিবে না।

এক কাপ চা আনিয়া কালী বলে, এখন চা খেলে ভাত খাবেন কখন? খিদে নষ্ট হয়ে যাবে।

খিদে থাকলে তো নষ্ট হবে।

খিদে নেই কেন?

ধরো খেয়ে এসেছি?

ধরো খেয়ে এসেছি মানে? খেয়ে এলে খেয়ে এসেছেন, নয়তো খেয়ে আসেননি। কোথায় খেলেন? কি খেলেন?

রাজকুমার মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, একটা মেয়ে খাইয়ে দিয়েছে কালী। এত খাইয়েছে কি বলব। পেট ভরে বুক ভরে মাথা পর্য্যন্ত ভরে গেছে।

মাথা ধরেছে? শঙ্কিতভাবে কালী প্রশ্ন করে।

ধরে নি, ভরেছে।

রাজকুমারের হাসির জবাবে কালী কিন্তু হাসে না। মুখ ভার করিয়া বলে, আপনার শুধু মেয়ে বন্ধু, গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে বন্ধু। বেটাছেলের মেয়ে বন্ধু থাকতে নেই।

তাহলে তো তোমার সঙ্গে আড়ি করতে হয়।

আমি তো বন্ধু নই। আমি অনেক ছোট।

ওরাও বন্ধু নয় কালী। ওরাও আমার চেয়ে অনেক ছোট,—ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ! কালী অদ্ভুত অবজ্ঞার হাসি হাসে, ধেড়ে ধেড়ে সব মেয়ে, বিয়ে হলে এ্যাদ্দিন—

সাত ছেলের মা হত, না?

কালী সায় দিয়া বলে, বিয়ে হয়নি কেন ওদের? পাত্র জোটেনি?

নাঃ, কই আর জুটল? আমি একবার বলেছিলাম ওদের, এসো তোমাদের সবাইকে আমি বিয়ে করছি। ওরা রাজী হয়ে গেল। কিন্তু ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে তো সব, ভারি চালাক। প্রত্যেকে বলতে লাগল, আমায় আগে বিয়ে করো, তারপর আর সবাইকে বিয়ে করবে। তার মানে বুঝতে পারছ?

খুব পারছি। একবার বিয়েটা হয়ে গেলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে দেবে না, একা বৌ হয়ে থাকবে। আমি তো মেয়ে, মেয়েদের ব্যাপার আমি সব জানি।

রাজকুমারও ক্রমে ক্রমে সেটা জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল। আজকাল কালীর মুখ ফুটিয়াছে। রাজকুমারের সঙ্গে হাল্কা অথবা ভারি চালে সে অনর্গল আলাপ করিয়া যায়। অভিজ্ঞতার অভাব আছে কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞানের তার অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবু তার যে সরলতা মুগ্ধ করে, সেটা ভাণ নয়, মুগ্ধ করার ক্ষমতাই তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। । রিণি-মালতী-সরসীর চেয়ে কালী বোকা নয়! কালীও সব বিষয়ে ওদেরি মত। ওদের সঙ্গে কালীর তফাৎ দুপুরের রোদের সঙ্গে সকালের রোদের তফাতের মত।

সহজভাবে নিশ্চিন্ত মনে কালীর সঙ্গে কথা বলা যায়। এভাবে কারো সঙ্গে কথা বলিবার সুখটা রাজকুমারের এতদিন জানা ছিল না। কথা বলার আগে কিছু ভাবিতে হয় না, ভাবিবার সময় কথা বলিয়া যাইতে হয় না। যতক্ষণ খুসী কথা বলো, এক মিনিট অথবা এক ঘণ্টা। কথা বলিতে চাও বলো, কথা শুনিতে চাও শোনো, নয়তো খুসীমত চুপ করিয়া থাক, বধির হইয়া যাও। সবই স্বাভাবিক, কেউ রাগ করিবে না। বলার কথাও খুঁজিতে হয় না। রিণি-মালতী-সরসীর সঙ্গে কথা বলার সময় কতবার বলার কথা না থাকায় অস্বস্তি বোধ করিতে হইয়াছে, টানিয়া আনিতে হইয়াছে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি অথবা চেনা মানুষের সমালোচনা। ছেলেমানুষী আবোল-তাবোল কথা শুধু কালীর সঙ্গে বলা যায়।

মনোরমা হেঁসেল আগলাইয়া বসিয়া থাকে, ঘরে দু'জনের গল্প চলে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেলে কালী কোণের টুলটা কাছে আনিয়া বসে। কালীর প্রসাধনের গন্ধটি তেজী ও স্পষ্ট। রিণি-মালতী-সরসীর মত কেবল সুবাসের মৃদু ইঙ্গিত নয়।

হঠাৎ এক সময় মনোরমার এদিকে ভয় হয়। এত দেরী? রাজকুমারের সম্বন্ধে ভাবনার কিছু নাই বটে, তবু এত দেরী? বিবাহের আগে শুধু একদিন একজনের সঙ্গে মনোরমা আধ ঘণ্টা নির্জ্জনে গল্প করিয়াছিল। কেউ বাধা দিয়া গল্পের সমাপ্তি ঘটায় নাই, বাধা সে দিয়াছিল নিজেই, নিজেকে বাঁচানোর জন্য। ভাবিয়াছিল, তাই উচিত। দু'দিন পরে যার সঙ্গে বিবাহ হইবে, এখন তার কাছে ধরা না দেওয়াটাই নিয়ম। আজ অসময়। কিন্তু আর তো আসিল না সে মানুষটি। মনোরমা জানে, সেদিন ধরা দিলে সে আসিত। দু'দিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য। সে তো বুঝিতে পারে নাই মনোরমার মনের কথা, হাত ধরা মাত্র তার রক্তেও কি আগুন লাগিয়াছিল।—আজও তার তাপে মনোরমার মন জ্বলিয়া যায়। সে ভাবিয়াছিল, মনোরমা বুঝি ঠাণ্ডা, মন তার বরফের দেশ। কল্পনার শীতল মনোরমা তার ভালবাসাকে জুড়াইয়া দিয়াছিল। তা'ছাড়া আর কি কারণ থাকিতে পারে তার না আসার, মনোরমাকে বিবাহ না করার?

সাড়ে ন'টার সময় কালী চা দিতে গিয়াছে, সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। মনোরমার বুক ঢিপ ঢিপ করে। এত দেরী। খাইতে আসার তাগিদ দিতে রাজকুমারকে ডাকিতে গিয়া কালীকে বাঁচানোর জন্য মনটা ছটফট করে মনোরমার। কিন্তু সে উঠিতে পারে না। শুধু আজের জন্য বাঁচাইতে গিয়া সে যদি কালীর চিরদিনের মরার ব্যবস্থা করিয়া বসে?

তারপর কালীর তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ কাণে আসে। মনোরমা জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। সর্ব্বাঙ্গে তার কয়েকবার শিহরণ বহিয়া যায়। পিঁড়িটা ঠেলিয়া দেয়ালের কাছে গিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া সে চোখ বোজে। হাসি! আর ভয় নাই। যেখানে হাসি আছে সেখানে কোন ভয় নাই।

রাজকুমার একদিন সন্ধ্যার পর মালতীর খোঁজ করিতে গেল। এইটুকু পথ যাইতেই চোখে পড়িল আলো আর দেবদারু পাতায় সাজানো তিনটি বাড়ী। ছাতে সামিয়ানা, শানাই বাজিতেছে। অগ্রহায়ণ মাস, চারিদিকে বিয়ের ছড়াছড়ি। রাজকুমারের মনে পড়ে, একটি বন্ধুর বিবাহে তার নিমন্ত্রণ ছিল। দু'টি বছর খুঁজিয়া বাছিয়া একটি মেয়ে পাওয়া গিয়াছে পছন্দমত। এ পছন্দের মানে রাজকুমার জানে। মেয়েটি সুন্দরী নয়, রঙ খুব ফর্সা। তার আরেকটি বন্ধু এ রকম বাছাই করা এক মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। অমন রূপ নাকি খুব কম দেখা যায়। বৌ দেখিয়া তাকে নিজের বৌ হিসাবে কল্পনা করিতে গিয়া রাজকুমার শিহরিয়া উঠিয়াছিল, এমন কুৎসিত ছিল সেই অত্যন্ত ফর্সা রঙের মেয়েটি।

মালতীর বাড়ী গিয়া দেখা গেল, সরসী আর রুক্মিণী আসিয়াছে। দু'জনেই বিশেষভাবে সাজিয়াছে, মালতীও দামী কাপড় পরিয়া নামিয়া আসিল। তিনজনে বিবাহের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে শ্যামলের সঙ্গে।

নিমন্ত্রণে যাওয়ার আগ্রহ তিনজনেরই প্রবল, শ্যামলের দেরীর জন্য কারো কিন্তু বিরক্তি দেখা গেল না।

বোন আর বৌদিকে নিয়ে আসবে। —মালতী বলিল।

দেরী করার অপরাধ তাই শ্যামলের নয়। দু'টি মেয়েকে সঙ্গে আনিতে হওয়ায় দেরী যে তার হইবে, এটা সকলে ধরিয়াই রাখিয়াছে।

রাজকুমার বলিল, আমি তবে বিদায় হলাম।

সরসী বলিল, তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে?

অনাহূত?

অনাহূত মানে? ধীরেনবাবু তোমায় বলেন নি?

তোমরা ধীরেনের বিয়েতে যাচ্ছ নাকি? এতো ভারি আশ্চর্য্য যোগাযোগ হল!

আশ্চর্য্য যোগাযোগ আবার হল কোন্‌খানটায়? তুমি ধীরেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে, আমি চেষ্টা করে একটা চেনা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা যাচ্ছি কন্যা পক্ষে, তুমি যাবে বরযাত্রী হয়ে। এতো সোজা কথা।

আগে জানিলে কথাটা সোজাই মনে হইত। একটা বিবাহ ঘটানোর গর্ব্বে এখন বিশ্বের, সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরসীর আয়ত্তে আসিয়াছে, আশ্চর্য্য কিছু ঘটিবার উপায় নাই। রাজকুমার যে ঠিক আজ সন্ধ্যাতেই অনেকদিন পরে মালতীর খোঁজ করিতে আসিয়াছে, তাও সরসীরই বাহাদুরী। ধীরেনের দু'বছর খোঁজার পর পছন্দমত মেয়ে পাওয়ার ব্যাপারটা রাজকুমার এবার বুঝিতে পারে। সরসীই তার মনে পড়াইয়া দেয় তার বাড়ীতে মেয়েটিকে রাজকুমার একদিন দেখিয়াছিল। না, দু'বছর খুঁজিয়া পছন্দ করার মত মেয়ে সে নয়। তবে মাঝখানে সরসী ছিল। সেই পছন্দ করাইয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। সরসী সব পারে।

সকলকে আড়াল করিয়া সরসী একাই তার সঙ্গে কথা বলে। চিরদিন তার এই রীতি। দেখা হওয়া মাত্র রাজকুমারকে সে দখল করে। মনে হয়, রাজকুমারের জন্যই সে যেন ওৎ পাতিয়া ছিল। তার সভাসমিতি করিয়া বেড়ানোর মানে আর কিছুই নয়, রাজকুমারের অদর্শনের ক'টা দিন বাজে কাজে কোন রকমে সে সময় কাটায়।

মালতী বলে, তোমায় কেমন আনমনা ঠেকছে আজ?

সরসী সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের হইয়া জবাব দেয়, কবিত্ব করিস নে মালতী, থাম্। একটা মানুষ ভাল করে চুল না আঁচড়ালেই তোর কাছে আনমনা ঠেকে। চিরুণীটা দেখি তোর।

সরসী নিজেই মালতীর চিরুণী দিয়া রাজকুমারের চুল ঠিক করিয়া দেয়। তার পিছনে দাঁড়াইয়া মালতী একটু হাসে।

রুক্মিণী বলে, চুল আঁচড়ালে কি হবে, রাজকুমারবাবুর চেহারাটাই কবির মত।

সরসী মুখে এ কথার প্রতিবাদ করে না, শুধু ভৎসনার দৃষ্টিতে রুক্মিণীর মুখের দিকে তাকায়। রুক্মিণী একেবারে বিব্রত হইয়া পড়ে। কারো চেহারা কবির মত, একথা বলা কি অসঙ্গত? প্রশংসার বদলে তাতে কি নিন্দা বুঝায়? কে জানে! অথচ সদ্য পরিচিত একজনকে ঠিক এই কথা বলায় পরদিন সকালে সে বাড়ী আসিয়া রুক্মিণীর সঙ্গে আলাপ করিয়া গিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি সে আবার বলিতে যায়, কবির মত চেহারা মানে—

সরসী বলে, মানে, ওকে তোমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে!

এবার রুক্মিণী নির্ভয়ে সহজ ভাবে জবাব দেয়, তা হয়েছে। তবে একপক্ষের পছন্দে আর লাভ কি!

রাজকুমার মনে মনে তার নিজস্ব অপদেবতার কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়। কিন্তু উপায় তো নাই, কথার পিঠে কথা চাপাইতেই হইবে। কোন রকমে একটু হাসিয়া সে বলে, এ অনুমানটা আপনার ভুল।

ভুল নয় রাজকুমারবাবু, প্রমাণ আছে। পছন্দ দূরে থাক, আমায় আপনি অপছন্দ করেন।

আগে আপনার প্রমাণ দাখিল করুন, আসামী জবাবদিহি করবে।

রুক্মিণী মৃদু মৃদু হাসে। এ ধরণের আলাপের সময় সকলেই হাসে, তবে ঠিক এ ভাবে নয়! কেমন যেন বাঁকা বাঁকা রুক্মিণীর হাসি। বুঝা যায়, সরসী অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া আছে।

রুক্মিণী বলে, যেমন ধরুন, যাকে পছন্দ করে তার বাড়ী

লোকে না ডাকতেই যায়। যাকে পছন্দ করে না যাওয়ার কথা থাকলে তার বাড়ীতেও ভদ্রতার খাতিরে যায়। যাকে অপছন্দ করে তার বাড়ীতে যাওয়ার সব ঠিক থাকলেও যায় না।

তাই বটে। রুক্মিণী একদিন তাকে বাড়ীতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সেও যাইবে বলিয়াছিল। কবে ক'টার সময় যাইবে তাও ঠিক ছিল। তারপর রুক্মিণীর অস্তিত্বই সে ভুলিয়া গিয়াছিল। না যাওয়ার অজুহাত দিয়া ক্ষমা চাহিয়া একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখে নাই। রুক্মিণী আহত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে। রাগ করার কথাই।

রাজকুমারের বিপদের টের পাইয়া সরসী মুখ খোলে।

কেন, রাজকুমারের চিঠি পাওনি তুমি?

রুক্মিণী বলে, চিঠি? কিসের চিঠি?

রাজকুমার ভাবে, চিঠি? কিসের চিঠি?

সরসী বলে, আমার সামনে ও যে তোমায় চিঠি লিখল? হঠাৎ শিলং যেতে হল ওকে, নিজেই বলতে যাচ্ছিল তোমাকে, আমি বললাম চিঠি লিখে দিলে চলবে। চিঠি পোষ্ট করেছিলে তো রাজকুমার?

রাজকুমার বলে, নিশ্চয়।

সরসী বলে, চিঠির কোন গোলমাল হয়েছিল বোধ হয়। পোষ্টাপিসের ব্যাপার তো।

পোষ্টাপিসের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া সরসী ব্যাপারটা শেষ করিয়া দেয়। রুক্মিণী নরম হইলেও এত সহজে রাজকুমারকে রেহাই দিতে পারে না।

শিলং থেকে ফিরে একদিন আসতে পারতেন তো?

এবার আত্মরক্ষার দায়িত্ব রাজকুমারের, সে দুঃখের ভাণ করিয়া বলে, এমন ব্যস্ত ছিলাম, কি বলব আপনাকে। তা ছাড়া, হঠাৎ গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতেও ভরসা পাইনে।

আচ্ছা, এবার হঠাৎ গিয়ে আমায় বিরক্ত করার নেমন্তন্ন করে রাখলাম। ভুলবেন না যেন। বলিয়া রুক্মিণী এতক্ষণ পরে ক্ষমার সহজ হাসি হাসিল। অর্থহীন দীর্ঘ ভূমিকার পর।

রাজকুমার ভাবিতে লাগিল, সভ্যতার নামে এরা কি অসভ্যতাই শিখিয়াছে। প্রথমে দেখা হওয়া মাত্র এই হাসি হাসিলে কত সহজ হইয়া যাইত মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করার ইচ্ছা জাগানো।

খানিক পরেই শ্যামল আসিল। ব্যস্তসমস্ত, উদ্বিগ্ন শ্যামল। এক ঘণ্টার বেশী দেরী করিয়া ফেলার অপরাধে সে যেন নিজের মরণ কামনা করিতেছে। সঙ্গে তার বোন সুধা ও বৌদিদি ইন্দিরা। দু'জনের সাজ-সজ্জা একেবারে চমকপ্রদ। শ্যামলের যে মোটে ঘণ্টাখানেক দেরী হইয়াছে এটাই আশ্চর্য্য।

রাজকুমারকে দেখিয়া শ্যামলের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। রাজকুমার মালতীকে পড়ানো ছাড়িয়া দিয়াছে জানিয়া সে স্বস্তি পাইয়াছিল।

রাজকুমার মাঝে মাঝে আসে তা সে জানিত কিন্তু সেদিন বর্ষা-সন্ধ্যার ব্যাপারটির পর রাজকুমারকে সে এ বাড়ীতে ছাখে নাই।

রাজকুমার বলিল, কেমন আছ শ্যামল?

শ্যামল জবাব দিল না।

প্রশ্নের জবাব না দিবার সাধারণ কারণ থাকা সম্ভব মানুষের। হয়তো শ্যামল শুনিতে পায় নাই। মেয়েদের বিয়েবাড়ীতে পৌছিয়া দিবার হাঙ্গামায় যে রকম ব্যতিব্যস্তই সে হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু সেদিন মিটিং-এর কথাটা সকলের মনে ছিল। সকলেরই তাই মনে হইল, সেদিনের অপমানের জন্যই বুঝি শ্যামল রাগ করিয়া রাজকুমারের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মালতীই যেন বিব্রত হইয়া পড়িল সকলের চেয়ে বেশী। শ্যামলকে সে একপাশে ডাকিয়া নিয়া গেল।

রাজুদার সঙ্গে কথা বল না?

না।

কেন?

ইচ্ছে হয় না।

ছি ছি, কবে সেই মিটিং-এ কি হয়েছিল, আজও তা মনে করে রেখেছ? দোষ তো ছিল তোমার। তুমি কেন গায়ে পড়ে—

সেজন্য নয়। ও একটা রাস্কেল মালতী।

উত্তেজিত অবস্থায় না থাকিলে কথাটা শ্যামল বলিয়া ফেলিত না। অত বোকা সে নয়। মালতীর মুখের সঙ্গে নিজের মুখখানাও তার বিবর্ণ হইয়া গেল।—তোমার বড্ড মাথা গরম। কাকে কি বলো ঠিক নেই। রাজুদা তোমাকে দশ বছর পড়াতে পারে, তা জানো?

পেটে বিদ্যে থাকলেই লোকের মনুষ্যত্ব থাকে না।

রাজুদা'র মনুষ্যত্ব নেই, মনুষ্যত্ব আছে তোমার! লোকের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা বলতে পারো না তুমি! ওর তুলনায় তুমি তো কেঁচো।

মালতী ছিটকাইয়া রাজকুমারের কাছে সরিয়া গেল।

চলো! চল, আমরা যাই।

শ্যামল কোথা হইতে কার একটি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। একটা গাড়ীতে এতগুলি মানুষের যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্ততঃ দু'জনের ট্রামে বা বাসে যাইতেই হইত। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা উঠার আগেই মালতী চুপি চুপি রাজকুমারকে বলিল, শ্যামলের গাড়ীতে আমি যাব না। চল, আমরা ট্রামে যাই।

গাড়ীতে যে যায়গা কম পড়িবে, এতক্ষণে সকলের সেটা খেয়াল হইয়াছিল। সরসী বলিল, গাড়ীতে তো কুলোবে নাসকলের। আমি বরং রাজকুমারের সঙ্গে—

মালতী তখন পথ ধরিয়া কয়েক পা আগাইয়া গিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, তোমরা গাড়ীতে যাও। আমরা দু'জন ট্রামে যাচ্ছি। এসো।

সরসীর চোখের সামনে রাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া মালতী বড় রাস্তার দিকে চলিয়া গেল।

একটা ট্রাম সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

মালতী বলিল, না। পরের ট্রামে।—এখনও থাকিয়া থাকিয়া মালতী কাঁপি া উঠিতেছিল।

কি হয়েছে মালতী ?

শ্যামলের সঙ্গে কোনদিন আমি যদি কথা বলি—

এতক্ষণে গলা ধরিয়া মালতীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

কি করেছে শ্যামল ?

আমায় অপমান করেছে !

অপমান করেছে ? কি অপমান ?

তোমায় রাস্কেল বলেছে।

আমায় রাস্কেল বলেছে তাতে তোমার অপমান হল কেন ?

চুপ কর। তামাসা ভাল লাগে না। যা হচ্ছে আমার ! শ্যামল কিনা বলে তোমার মনুষ্যত্ব নেই। নিজে থেকে ভিখিরীর মত আসে, দয়া করে হেসে কথা কই, তাইতে ভেবেছে, কি না জানি মহাপুরুষ হয়ে গেছি আমি। এবার বাড়ীতে এলে দূর করে তাড়িয়ে দেব।

অত রাগ কোরো না, মালতী। বেচারী তোমায় ভালবাসে, সেদিন জানালা দিয়ে আমাদের দেখে ওর মাথা বিগড়ে গেছে। আমাকে গাল তো দেবেই।

মালতী সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল, ভালবাসে না ছাই। অত ছোট মন নিয়ে কেউ ভালবাসতে পারে ?

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, ভালবাসে বলেই তো মন ছোট হয়েছে। তা'ছাড়া, আমার ওপর ওর রাগের আরেকটা কারণ আছে।

জানি, কাদের বাড়ীর মেয়ের হাত ধরেছিলে তো ?

রাজকুমার আশ্চর্য্য হইল না।

শ্যামল বলেছে ?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, এমনি শুনেছি। সবাই জানে। ওসব লোকের বাড়ীতে যাওয়ার কি দরকার ছিল তোমার ?

দরকারের কথা পরে বলছি। জেনেও তুমি চুপ করে ছিলে যে ?

তুমিও তো চুপ করে ছিলে ?

রাজকুমার কিছুক্ষণ কথা বলিল না। আরেকটি ট্রাম সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাপারটা প্রথমে আমার কাছে এত তুচ্ছ ছিল মালতী, বলার কোন দরকার বোধ করিনি। পরে যখন দেখলাম আমার কাছে তুচ্ছ হলেও অন্যের কাছে তুচ্ছ নয়, তখন বলব ভেবেছিলাম। সময়মত নিজেই বলতাম

আমিও জানতাম তুমি সময় মত নিজেই বলবে। তাই চুপ করে ছিলাম। কিন্তু শ্যামলের কি স্পর্দ্ধা! তোমার সমালোচনা করতে যায়।

আরেকটি ট্রাম আসিতে দেখিয়া মালতী বলিল, যাবে ? আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না।

রাজকুমার বলিল, না, চলো। সকলের সামনে বিয়ে বাড়ী যাব বলে বেরিয়েছি, না গেলে ওরা কি ভাববে ?

মালতী হাসিল, লোকে কি ভাববে, তুমি আবার তা ভাবো নাকি ? পরের বাড়ীর মেয়ের হাত ধরতে যাও কেন তবে ?

এই জন্যে।—বলিয়া রাজকুমার মালতীর হাত মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিয়ে বাড়ীতে সময়টা কাটিল ভালই। বন্ধু ও পরিচিত অনেকে উপস্থিত ছিল। রাত দশটার মধ্যে লগ্ন, বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ রাজকুমার বিবাহ দেখিল। কনেকে সত্যই আশ্চর্য্য রকম সুন্দরী দেখাইতেছে। রঙ তার অত্যন্ত ফর্সা, সাধারণ অবস্থায় দিনের বেলা লাবণ্যের অভাবে চোখে ভাল লাগে না, এখন ক্রীম, পাউডার, স্নো, চন্দন আর ঘামে স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়াছে মুখখানা। খুঁতগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে সাজানোর কায়দায় এবং খুঁতও মেয়েটির কম নয়। রাজকুমার অনাবশ্যক সহানুভূতি বোধ করে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এভাবে সাজিয়া থাকিবার সুযোগ মেয়েটি পাইবে না। দু'পাশে চাপা কপাল, নিভাঁজ চোখের কোণ, নাকের নীচে ভিতর দিকে মুখের অসমতল খাদ, চোয়ালের অসামঞ্জস্য, এ সব লোকের চোখে পড়িতে থাকিবে। তবে, ধীরেনের চোখে হয়তো পড়িবে না। ফর্সা রঙে তার চোখে যে ধাঁধাঁ লাগিয়াছে, সেটা আর কাটিবার নয়। বাড়ীর বৌ-এর রঙের গর্ব্বে বাড়ীর অন্য মানুষেরাও হয়তো তার রূপের অন্য সব ত্রুটির কথা তেমন ভাবে মনে রাখিবে না।

মেয়েটি একটু বোকা এবং অহঙ্কারী। মুখ দেখিয়া এটুকু বুঝা যায়। কাপড়ে পুটুলী করা দেহটি দেখিয়া অনুমান করা যায়, ভোঁতা, অনাড়ম্বর, নিষ্ক্রিয় প্রেমের সে উপযোগী। নীরবে অনেকটা নির্জ্জীব পুতুলের মত নিজেকে দান করার জন্য সে চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে ; ধীরেনের যখন খুসী গ্রহণ করিবে যখন খুসী করিবে না, তার দিক হইতে কখনো কোন দাবী আসিবে না, কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না। স্বামীর সঙ্গে অন্তরালের জীবনটিও প্রথম হইতেই তার কাছে হইয়া থাকিবে প্রকাশ্য উঠা-বসা-চলা-ফেরার জীবনের মতই বাঁচিয়া থাকার নিছক একটা অঙ্গ মাত্র, আবেগ ও

রোমাঞ্চের বাড়াবাড়ি যাতে বিকারের সামিল। দাবী সে করিবে সুখ, সুবিধা ও অধিকার, কর্তৃত্ব সে করিবে অনেক বিষয়ে, সংসারে নিজের স্থানটি দখল করিতে কারো সাহায্যের তার দরকার হইবে না, তার হুকুমেই ধীরেন উঠিবে বসিবে। নিস্তেজ প্রাণহীন শুধু সে হইয়া থাকিবে স্বামীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কে।

মেয়েটির সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু হয়তো স্পষ্টভাবে জানা যাইত, যদি—

মনের চোখে সেভাবেই দেখিয়াছে। একটু বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে না, বিবাহের আসরে বন্ধুর কনেকে পর্য্যন্ত এরকম অভদ্রভাবে কল্পনা করা? এদিকটা রাজকুমারের একবার খেয়ালও হয় নাই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আবেষ্টনীতে মেয়েটির জীবনে কি বৈশিষ্ট থাকিবে সেই অনুমানেই মশগুল হইয়া গিয়াছিল। কাপড় ঢাকা দেহ দেখিয়া কতটুকুই বা বুঝিতে পারা যায়? দশমিনিটের জন্য যদি ভগবান যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন ঠিক তেমনি অবস্থায় মেয়েটিকে সে দেখিতে পাইত! বন্ধুর দাম্পত্য জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ইতিহাস তার জানা হইয়া যাইত।

এগারটার সময় সরসী কোথা হইতে আসিয়া বলিল, আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে চল।

ওরা?

ওরা পরে যাবে—শ্যামলের সঙ্গে।

ওরা দেরী করছে কেন?

আড্ডা দিচ্ছে। এখনো খেতেও বসে নি।

তুমি খেয়েছ?

সন্দেশ মিষ্টি খেয়েছি, আমি নেমন্তন্ন খাই না।

এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে। আমি অবশ্য ঘরোয়া নেমন্তন্ন খাই, তুমি বললে তোমার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসব। ভোজ কখনো খাই না।

কিছু খেয়েছো তো?

কই আর খেলাম? দু'বার ডাকতে এল, আমি বললাম, সকলের সঙ্গে বসব না। বাস্, কেউ আর টুঁ শব্দটি করল না।

তুমি বড় ছেলেমানুষ রাজু। বিয়ে বাড়ী, পাঁচ সাতশো লোক খাবে, প্রত্যেকের বিষয়ে অমন করে খোঁজ খবর রাখতে পারে? বললে না কেন তোমার কিছু এনে দিতে? আমি বসব না মশায়, আমায় একটা প্লেটে সামান্য কিছু এনে দিন, এ কথাটা আর মুখ ফুটে বলতে পারলে না!

কথাটা ওদের বলাই উচিত ছিল না?

তোমরাই আবার মেয়েদের সেন্টিমেন্টাল বলো। সরসী হাসিয়া ফেলিল, আমি বলে দিচ্ছি, কিছু খেয়ে নাও। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

নিশ্চয়।

রাজকুমারকে খাবার দেওয়ার কথা বলিতে সরসী কিন্তু যায় না, খোঁপা ঠিক করার অবসরে কত কি যেন ভাবিয়া নেয়।

তার চেয়ে আমার বাড়ী গিয়ে খাবে চলো।

বাঁচালে সরসী। লক্ষ্মী মেয়ে। হাটে বসে খাবার গিলতে সত্যি আমার কষ্ট হয়, সেন্টিমেন্টাল বলো আর যাই বলো।

আমি কিন্তু এ সব হাটে বসে দশজনের সঙ্গেই খেতে ভালবাসি, রাজু। তোমায় মিছে বলেছিলাম, আমি খুব নেমন্তন্ন খাই। তোমায় বাড়ী নিয়ে যাব বলে না খেয়ে ওদের আগে চলে এসেছি।

বলো কি সরসী? আমায় তো সাবধান হতে হবে।

তুমি আবার অসাবধান কবে? বাস তো কর দুর্গে, সাবধান আবার হবে কি?

কিসের দুর্গ সরসী? কার দুর্গ?

তোমার নিজের দুর্গ। কিসের তা জানি না।

কথার কথা? কে জানে! বুঝিতে না পারিয়া রাজকুমার একটু বিরক্তি বোধ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া কথাটা স্পষ্ট করিতেও বাধ' বাধ' ঠেকিতে লাগিল। সরসীর ইঙ্গিত তার জিজ্ঞাসা করিয়াই বুঝা উচিত।

সরসীদের বাড়ীর সকলেই বিয়েবাড়ীতে গিয়াছিল, কেবল কেদার সকাল সকাল ফিরিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। রাত তিনটায় কাসিতে কাসিতে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিবে, তার আগে ভদ্রলোকের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

চাকর দরজা খুলিয়া দিয়া হুকুমের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। সরসী বলিল, তুই শো গে যা লছমন।

একটু পুরানো ধাঁচের বড় চারকোণা বাড়ী, ঘরগুলি প্রকাণ্ড। নীচের হলটিতে রীতিমত সভা বসানো চলে। এই হলে রাজকুমারকে বসাইয়া সরসী খুঁজিয়া পাতিয়া নানারকম খাবার আনিয়া হাজির করিল।

পেট ভরেই খাও। এখন একবার খেয়ে বাড়ী গিয়ে আর খাবার দরকার নেই।

পেট ভরে না খেলেও বাড়ী গিয়ে আর খেতাম না সরসী।

এখনো তোমার হজমের গোলমাল হয়?

সাবধান থাকলে হয় না।

খুব গুণের কথা হল, না? এই বয়সে বুড়োদের মত খাওয়ার বিষয়ে সাবধান হয়ে চলতে হবে? তুমি একেবারে একসারসাইজ কর না। সারা দিন শুয়ে বসে ঘরের কোণে কাটালে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে?

সেজন্য খুব বেশী আসত যেন না সরসী। আসল কারণ হল, এক কালে খুব একসারসাইজ করতাম, হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছি। চিরকালের আলসে লোকের শুয়ে বসে থাকাটা দিব্যি সয়ে যায়, হঠাৎ একদিন আলসে হলেই বিপদ।

ছাড়লে কেন? আবার তো ধরতে পার?

ধরব। শীগ্‌গির ধরব। দু'চার দিনের মধ্যে।

অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে রাজকুমারের কথা বলার ধরণে সরসী একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। সে যেন সরসীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছে, দেহকে আর অবহেলা করিবে না, অবিলম্বে ব্যায়াম আরম্ভ করিবে। অপরাধের বিলম্বিত প্রায়শ্চিত্ত করার মত। রাজকুমারের খাওয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সরসী আর কথা বলে না, নীরবে তাকে দেখিয়া যায়। সেটা বিস্ময়কর ঠেকে রাজকুমারের কাছে।

এবার বিদায় নেওয়া যাক।

বোসো।

সেটা কি উচিত হবে? রাত কম হয়নি।

তুমি আমাকে উচিত অনুচিত শেখাতে এসো না।

নিজেও সরসী বসে। বসার পর একসঙ্গে বেশীক্ষণ রাজকুমারের মুখখানা দেখিতে না পারায় এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে বার বার তার মুখের দিকে তাকায়। রাজকুমার নীরবে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। সরসীর কিছু বলিবার আছে অনেক আগেই সে তা অনুমান করিয়াছিল। তার কাছে কিছু আশা করিয়া সরসী সুযোগ পাইয়া এত রাত্রে তাকে খালি বাড়ীতে ডাকিয়া আনে নাই, সরসীর কাছে এসব হঠাৎ পাওয়া সুযোগ সুবিধার কোন মানে নাই। সেরকম ইচ্ছা থাকিলে কবে সকলে বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলে বাড়ী ফাঁকা হইবে সে ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া রাজকুমারকে দিয়াই হয়তো সে খালি একটা বাড়ী ভাড়া করার ব্যবস্থা করিত। কোন কারণে তাকে আজ সরসীর দরকার হইয়াছে। খুব সম্ভব তাকে কিছু বলিবে সরসী এবং যতক্ষণ মুখ ফুটিয়া না বলিবে, কি যে সে বলিতে চায় কেউ কল্পনাও করিতে পারিবে না।

সরসীর প্রকৃতি আসলে খুব সহজ ও সরল। দরকারী নির্দ্দোষ মিথ্যা সে অনর্গল বলিতে পারে, আজ সন্ধ্যায়ও অনায়াসে লাগসই কৈফিয়ৎ রচনা করিয়া নিজেকে সাক্ষী দাঁড় করাইয়া রুক্মিণীর কাছে তার লজ্জা বাঁচাইয়াছিল। বুদ্ধি তার ধারালো, মানুষের কাছে কাজ আদায় করার কোন কৌশল বোধ হয় তার অজানা নাই, সস্তা আবেগ তার কাছে এতটুকু প্রশ্রয় পায় না।

কাল থেকে তোমার কথাই ভাবছি রাজুদা।

কেন?

তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন।

কেমন হয়ে যাচ্ছি?

কি রকম অস্থির দিশেহারা হয়ে পড়ছ। বেঁচে থাকতেই তোমার যেন ভাল লাগছে না, সব সময় একটা কষ্ট ভোগ করছ। অনেকদিন থেকেই তোমার এ ভাবটা লক্ষ্য করছি। কি হয়েছে তোমার?

রাজকুমার নীরবে মাথা নাড়িল।

সরসী ভ্রূ কুঁচকাইয়া একটু ভাবিল।—কি হয়েছে বুঝতে পারা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু কিছু যে তোমার হয়েছে তাও কি বুঝতে পার না? অসুখ হলে তো সব সময় জানা যায় না কি অসুখ হয়েছে, শরীরটা শুধু খারাপ লাগে। নিজের ভেতরে সেই রকম কিছু বোধ কর না? অসুখের কথা বলছি না। মনে তোমার কোন রকম অস্বস্তি আছে, টের পাও না?

এসব কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন সরসী?

বললাম না তোমার জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে? রিণির কাছে সব শুনে—

তাই বল।

তুমি যা ভাবছ, তা নয়। রিণির কাছে সব শুনে আমার ভাবনা হয় নি, তার অনেক আগে থেকে তোমার সাধারণ চালচলন কথাবার্ত্তার ধরণ দেখেই ভাবনা হয়েছে। তবে রিণির ব্যাপারটা না জানলে আমি হয়তো চুপ করে থাকতাম। মানুষের কত কি হয়, বিশেষ করে তোমার মত যারা নিজের মনের মধ্যেই বেশী করে বাঁচে। তোমার ভেতরে কোন একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটছে, আস্তে আস্তে আবার সামঞ্জস্য হয়ে যাবে মনে করেছিলাম। একবার ভেবেছিলাম, লভে পড়েছ বুঝি, ছেলেখেলা নয়, আসল লভ। তারপর দেখলাম, সে সব কিছু নয়।

কি করে জানলে সে সব কিছু নয়?

সে রোগের সিমটম আলাদা, আমরা চিনতে পারি। একটা মেয়েকে ভালবাসার মানে জানো? সকলকে ভালবাসা, জীবনকে ভালবাসা, বেঁচে থাকতেই মজা লাগা। তুমি কাউকে ভালবাসো না, নিজেকে পর্য্যন্ত নয়। সব সময় তুমি ছটফট করছ, কি করলে একটু স্বস্তি পাবে। সর্ব্বস্ব হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন পাগলের মত খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, তুমিও ঠিক তেমনি ভাবে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছ। থিসোরী? তুমি পাগল রাজুদা। দেহের গড়নের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতির সম্পর্ক কি তাই টেষ্ট করার জন্য কেউ এভাবে ব্যাকুল হয়? তোমার আরও সিরিয়াস কিছু হয়েছে, এ শুধু তার একটা লক্ষণ। আমার কান্না পাচ্ছে বুঝতে পারছ?

সেটা সহজেই বুঝা যাইতেছিল। গলা ভারি হইয়া চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছে। রাজকুমার তাড়াতাড়ি বলিল, কেঁদো না সরসী। কান্না আমি সইতে পারি না।

কান্না পেলেই আমি কাঁদি না কি?

তাই তো তোমায় ভালবাসি।

ভালবাসো না, ছাই। পছন্দ কর। ভালবাসলে তো বেঁচে যেত।

রাজকুমার করুণভাবে একটু হাসিল। সরসীকে সে পছন্দ করে, স্নেহ করে, একটু ভয়ও করে। নিজের সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও সহজ কথাগুলি সরসী ছাড়া কারও কাছে সে শুনিতে পাইত না। অনেক দিন হইতেই সরসী জানে তার ভিতরে কিছু একটা গোলমাল চলিতেছে।

নিজের সম্বন্ধে নিজে সে কখনো এভাবে চিন্তা করে নাই। যখন এ বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছে, স্থূল বাস্তব জগতের আপেক্ষিকতার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছে, ব্যাপারখানা কি। নিজের সম্বন্ধে যত কেন জাগিয়াছে, তার সবগুলির জবাব খুঁজিয়াছে যে অভিধানে শুধু সাধারণ চল্‌তি মানে পাওয়া যায়। মুদীর হিসাবে যেন সুখ-দুঃখের হিসাব কষিয়াছে। ভূমিকম্পের কারণ খুঁজিয়াছে মাটির উপরে। আরও যে অনেক উষ্ণ গহন স্তর আছে মাটির নীচে এ যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সরসী মনে পড়াইয়া দিয়াছে। গভীর কৃতজ্ঞতায় অনেকদিন পরে রাজকুমারের হৃদয়গ্রন্থিতে স্রাব হয় চোখের জলের মত নোনতা সুস্বাদু রসের, শুকনো মন একটু ভিজিয়া ওঠে।

সরসী বলিল, এত বড় হলে বসতে ভাল লাগছে না। ওপরে যাবে? চলো।

উপরে দু'টি পাশাপাশি ঘর সরসীর, একটিতে সে বসে, অপরটিতে শোয়। মাঝখানে একটি দরজা আছে, ঘর দু'টির ব্যবধান বজায় রাখিতে দরজাটি সে অধিকাংশ সময় বন্ধ করিয়া রাখে, সামনের বারান্দা ঘুরিয়া যাতায়াত করে এঘর হইতে ওঘরে।

বসিবার ঘরে রাজকুমারকে বসাইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একপাশে একটি চারকোণা টেবিলে সরসী লেখাপড়া করে, তার সভাসমিতির কাগজপত্রেই টেবিলের অর্দ্ধেকটা ভরিয়া আছে। ছোট একটি শেল্‌ফে বাছা বাছা বই, প্রত্যেকটি বই রাজকুমারের পড়া। নির্ব্বিচারে ভালমন্দ সব বই পড়ার সময় সরসীর হয় না। রাজকুমারের সঙ্গে তাই তার বন্দোবস্ত আছে, রাজকুমার নিজে পড়িয়া সে সব বই তাকে পড়িতে বলে শুধু সেই বইগুলিই সে পড়ে—তার জ্ঞানবুদ্ধির আয়ত্তের বাহিরের বইগুলি ছাড়া। এঘরে প্রায়ই অনেক মেয়ে জড়ো হয়, সোফা চেয়ারে ঘরটি একটু ঠাসিয়া ফেলিতে হইয়াছে। জানালার কাছে গেরুয়া আস্তরণ ঢাকা একটি ঈজিচেয়ার, সরসী ওখানে বিশ্রাম করে। আস্তরণে মাথার চুলের দাগ পড়িয়াছে টের পাওয়া যায়। সারাদিন ছুটাছুটির পর ওখানে চিৎ হইয়া শ্রান্ত সরসী না জানি কি ভাবে। দশজনের সঙ্গে সরসীর কারবার, সর্ব্বদা সে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, দু'চারজন সঙ্গিনী সারাদিন তার আছেই। সরসীকে এই ঘরে একা কল্পনা করিতে গিয়া রাজকুমারের মনে হয় সে যেন নিজেরই এক রহস্যময় ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতেছে।

সরসীর ফিরিতে দেরী হইতেছিল। এত রাত্রে তাকে একা বসাইয়া কি করিতেছে সরসী? আত্মসম্বরণ করিতেছে? রাজকুমার নিজের কাছেই মাথা নাড়ে। যতই বিচলিত হোক সামলাইয়া উঠিতে সরসীর সময় লাগে না, নির্জ্জনতার প্রয়োজন হয় না। নীচে তার যখন কান্না আসিয়াছিল তখনও এক মিনিটের জন্য উঠিয়া গিয়া কাঁদিয়া অথবা কান্না থামাইয়া আসিতে হয় নাই।

রাজকুমার মৃদুস্বরে ডাকে, সরসী?

পাশের ঘর হইতে সরসী সাড়া দেয় আসছি।

কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয় সরসীর গলা। নীচে অত সহজে যে-কান্না সে আটকাইয়াছিল, ও ঘরে গিয়া সত্যই সত্যই তবে কি সেই কান্নাই সে কাঁদিতেছে? রাজকুমার কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে। রিণির কাছে তার খাপছাড়া প্রস্তাবের বিবরণ শুনিয়া এমন আঘাত লাগিয়াছে সরসীর মনে? রিণিকে কথাটা বলার আগে সে শুধু ভাবিয়াছিল, এসব কাণে গেলে মালতী কত কষ্ট পাইবে। সরসীর কথা তার মনেও আসে নাই। শেষ পর্য্যন্ত আঘাতটা তবে পাইল সরসী?

রাজকুমার ভাবিয়াছিল, সরসী বাহির হইতে ঘরে আসিবে। শোয়ার ঘরের দরজা খোলায় শব্দে সেদিকে চাহিয়া তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল।

সরসী আগাইয়া আসিল আরও কয়েক পা।

রিণির মত রঙ নেই, আমি কালো। তবু ভাবলাম, তুমি তো রঙ দেখতে চাও না—

তুমি কাঁপছ সরসী।

মনের জোরে কুলোচ্ছে না। কি মনে হচ্ছে জানো? ছুটে গিয়ে খাটে তোষক গদির নীচে ঢুকে পড়ি। কিছু ভাবা আর করার মধ্যে কত তফাৎ! তখন থেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি না ডাকলে দরজা খুলতেই পারতাম না।

তুমি বড় সুন্দর সরসী।

চুপ। ওসব বলো না। দম আটকে মরে যাব।

মরবে না, শোন। তোমার শরীর এমন সুন্দর বলে তোমার মনটাও সুন্দর। তোমায় এখন আমি প্রণাম করতে পারি, জানো?

অনির্ব্বচনীয় আনন্দে রাজকুমারের চিত্ত ভরিয়া যায়, নিরবসন্ন সক্রিয় শান্তির মত এক অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগে। শক্তি ও সহিষ্ণুতার যেন সীমা নাই। শ্রদ্ধা, মমতা, কৃতজ্ঞতা আর সহানুভূতি মেশানো যে মনোভাব সরসীর প্রতি জাগে, প্রেমের চেয়ে তা বোধ হয় কম জোরালো নয়। সরসী তাকে বোঝে, বিশ্বাস করে। ব্যাখ্যা করিয়া সরসীকে তার কিছু বুঝাইতে হয় নাই, রিণির কাছে তার বক্তব্যের ভাঙাচোরা বিকৃত বিবরণ শুনিয়া সে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছে তাই মনে করিয়াছে যথেষ্ট। আর জেরা করে নাই, তর্ক তোলে নাই, নিজের হইয়া ওকালতি করার যন্ত্রণা তাকে দেয় নাই, বিনা ভূমিকায় নিজের দেহটি তাকে দেখিতে দিয়াছে। সরসী ছাড়া আর কেউ তা পারিত না।

সরসীর মুখ বিবর্ণ হইয়াই ছিল, ধীরে ধীরে কখন আপনা হইতে তার চোখ বুজিয়া যায়, আর খোলে না।

এবার যাও সরসী।

তোমা'র কাজ হয়েছে? এসেছি যখন, মাঝখানে পালিয়ে গিয়ে লাভ হবে ন'। আর দু'তিন মিনিট কোন রকমে সইতে পারব।

আর দরকার নেই।

সরসী শোয়ার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না কিন্তু বুঝা যায় দরজার কাছেই সে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় দম নিতেছে।

এবার তুমি যাও রাজুদা। আজ আর তোমায় মুখ দেখাতে পারব না।

আচ্ছা।

লছমনকে ডেকে দিয়ে যেও।

আচ্ছা। সরসী?

না-না না। বলো না রাজুদা রাস্তায় নেমে গেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে তোমার ভয় হল সরসী? সামনে থেকে সরে গিয়ে? আমি অন্য কথা বলছিলাম।

কি কথা?

আমি কাউকে ভালবাসি না।

সে তো আমিই তোমাকে বলেছি একটু আগে।

তুমি বললে কি হবে, আমি তো জানতাম না। আজ জানতে পেরেছি। তোমায় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যাই। তোমার শরীর আর মন শুধু সুন্দর নয়, তুমি ভাল, তোমার বেঁচে থাকা সার্থক। তুমি আমাকে উঁচুতে তুলে দিয়েছ। তোমার সাহায্য না পেলে কোনদিন হয়তো সেখানে উঠতে পারতাম না সরসী। তুমি আমার আরেকটা উপকার করেছ সরসী। গিরির ব্যাপারটা জানো?

জানি।

ব্যাপারটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু শকটা কোন মতে কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। একটা জ্বালা বরাবর থেকে গিয়েছিল। তুমি আজ জ্বালাটা দূর করে দিলে। মনে মনে কতখানি কষ্ট পাচ্ছিলাম এতদিন ভাল বুঝতে পারিনি, এখন মন শান্ত হয়েছে, এখন বুঝতে পারছি। কোন মেয়ের সংস্পর্শে এলেই আপনা থেকে মনে হত, এও গিরির জাতের জীব, এর মধ্যেও নিশ্চয় খানিকটা গিরির উপাদান আছে। তোমার সম্বন্ধে পর্য্যন্ত তাই মনে হ'ত। যুক্তি দিয়ে বুঝতাম অন্য রকম, কিন্তু কিছুতে চিন্তাটা ঠেকাতে পারতাম না। তুমি আজ আমার বিকারটা কাটিয়ে দিয়েছ সরসী।

একটু দাঁড়াও রাজুদা, যেও না।

কয়েক মিনিট পরে সাধারণ একটি শাড়ী পরিয়া ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে দিয়া সরসী এ ঘরে আসিল।

জোরে জোরে মাইল খানেক হেঁটে আসি চলো। আজ রাতে নইলে ঘুম আসবে না।

রাজকুমার ভাবে, কারো কাছে সে কি কোনদিন কোন অপরাধ করে নাই, পৃথিবী অথবা স্বর্গ অথবা নরকবাসী কারো কাছে?—যে অপরাধের অনুভূতি তাকে যন্ত্রণা দিতে পারে, যার প্রতিক্রিয়ায় জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে কারও উপরে একটু বিদ্বেষের জ্বালা অনুভব করিতে পারে?

রাগ নাই, অভিমান নাই। একটি মানুষের উপরেও নয়। জড় বস্তুকেও মানুষ কখনো হিংসা করে, হোঁচট লাগিলে অন্ধ ক্রোধে ইঁটের উপর পদাঘাত করে, কারাগারের লোহার শিক ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু মানুষ নিষ্ক্রিয় নির্জ্জীব পুতুল হইলে একটি পুতুলের মুখ তার পছন্দমত নয় বলিয়া যতটুকু বিরক্তি বোধ করা চলিত, তাও সে বোধ করে না। মানুষের মনের অন্ধকার ও দেহের শ্রীহীনতার অপরাধ সে ক্ষমা করিয়াছে। মানুষ যে কৃপণ তাতে তার কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ, মানুষের কাছে সে কিছু চায় না।

এই নির্ব্বিকার ঔদার্য্য যেন জীবনের সেরা সম্পদ, কুড়াইয়া পাইয়াছে। দূর হইতে দিনের পর দিন শুধু চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন ধনীর দুলালের খেলনাটি বস্তি-বাসী শিশুর হাতে আসিলে সে যেমন আনন্দে পাগল হইয়া ভাবে, জীবনে তার পাওয়ার আর কিছুই বাকি নাই, আর্ষ শাস্তি আহরণের সৌভাগ্যে বিপরীত আনন্দের উন্মাদনায় রাজকুমারেরও তেমনি মনে হইতে থাকে, এবার সে তৃপ্তি পাইয়াছে, সম্মুখে তার পরিতৃপ্ত জীবন।

সকলে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে রাজু? ডার্বি জিতেছ?

একে জিতেছি।—রাজকুমার দেখাইয়া দেয় নিজেকে, কখনো বুকের ডাইনে কখনো বাঁয়ে আঙুল ঠেকাইয়া।

যে কাছে আসে সেই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে, নদীতে জোয়ার আসার মত এত স্পষ্টভাবে সে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনোরমা বিস্মিত হয়, আশা করিবে কি হতাশ হইবে ভাবিয়া পায় না। আশাভঙ্গের ভয়টাই হয় বেশী। কালীর জন্য যদি বদলাইয়া গিয়া থাকে রাজকুমার, তাকে কিছু না বলিয়াই কি বদলাইত? এখন শুধু এইটুকু আশা করা চলে যে তাকে কিছু না বলিলেও কালীর সঙ্গে হয়তো তার কোন কথা হইয়াছে, হয়তো অন্য কিছু ঘটিয়াছে। অন্য কিছু কি আর ঘটিবে, হয়তো কালীকে একটু আদর করিয়াছে রাজকুমার এবং কি করিবে না করিবে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়া সুখী হইয়াছে। এবার সময়মত একদিন তার কাছে কথাটা পাড়িবে।

মনে মনে মনোরমা কিন্তু মাথা নাড়ে। রাজকুমারের খুসী হওয়া যেন সে রকম নয়। সে শান্তই ছিল চিরদিন, আরও শান্ত হইয়াছে, শুধু চোখেমুখে ফুটিয়াছে জ্যোতি, কথা ও ব্যবহার হইয়াছে নির্ভর নিশ্চিন্ত সুখী মানুষের আনন্দময় সহজ আত্মপ্রকাশ। একটু তো উত্তেজনা থাকা উচিত ছিল আনন্দে, কালীকে চায় কি চায় না এ সমস্যার মীমাংসা যদি তার হইয়া গিয়া থাকে, সুরু যদি হইয়া থাকে কালীকে পাওয়ার দিন গোণা? কালীকে সে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে কালী, কি হয়েছে রে?

জিজ্ঞাসা করে অনেক বুদ্ধি খাটানো খানিকটা ভূমিকার পর। সে আর কালী ছাড়া রান্নাঘরে কেউ নাই, তবু হাত ধুইতে ধুইতে কালীকে সে শোয়ার ঘরে যাইতে বলে,—একটা কথা আছে। একটু দেরী করিয়া নিজে ঘরে যায়, দরজা সযত্নে ভেজাইয়া দেয়। তারপর সামনে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে সুখবর প্রত্যাশা করার মত ব্যগ্রভাবে প্রশ্নটা করে। যদি কিছু ঘটিয়া থাকে কালীর মত বোকা মেয়েরও বুঝিতে বাকী থাকিবে না কোন্ বিষয়ে তার জানিবার আগ্রহ। মুখে কিছু না বলুক, কালীর মুখ দেখিয়াই সে সব বুঝিতে পারিবে।

কিন্তু হায়, কালীর মুখে বিস্ময় ছাড়া আর কোন ভাব ফোটে না।

কিসের দিদি?

হতাশ ক্রোধে মনোরমা বলে, কচি খুকী তুমি, কিছু জান না। রাজু তোকে কিছু বলেনি? কিছু করে নি?

না তো?

না তো? বড় গর্ব্বের কথা তোর, না? যা চেহারা, যা স্বভাব, কে তোকে পছন্দ করবে।

রাজকুমার আজকাল সকলের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। চেষ্টা না করিয়া কেউ আজকাল রাজকুমারকে কাছে পায় না। কাছে মানে পাশে বা সামনে নয়। সেভাবে কারো কাছ হইতে রাজকুমার নিজেকে দূরে সরাইয়া নেয় নাই। দেখা সাক্ষাৎ সকলের সঙ্গে যেমন চলিতেছিল প্রায় সেই রকমই বজায় আছে। যাদের সঙ্গে শুধু বাহিরের পরিচয় তারা বরং এমন কথাও ভাবে যে আরেকবারের আলাপে মানুষটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই বুঝি খানিকটা বাড়িয়া গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে তার পরিচয় ভূমিকা পার হইয়া জীবনের আনুষঙ্গিক দৃশ্যপট জানাজানিতে অন্ততঃ পৌঁছিয়াছে, যারা উচ্চারণ করার আগেই তার দু'চারটি মনের কথা এতকাল টের পাইয়া আসিয়াছে, চেষ্টা না করিলে তারাও আর মনের তার নাগাল পায় না, ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি তুচ্ছ একটি কথারও পুনরাবৃত্তি যেন হয় না কারও সঙ্গে তার দু'চার ঘণ্টার আলাপে।

তিন দিন তার সঙ্গে মালতীর দেখা হইয়াছে, দশ জনের মধ্যে এবং নির্জ্জনে। তিনদিন নিজের মধ্যে নিজেকে নিয়া মসগুল মানুষটাকে মালতী দেখিয়াছে, কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারে নাই।

প্রথমেই এই চিন্তা তার মনে আসিয়াছিল, একি শ্যামলের জন্য? শ্যামল আর তার সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া কি রাজকুমার হঠাৎ এভাবে বদলাইয়া গিয়াছে? রাজকুমারের পরিবর্ত্তনের কত সম্ভবপর কারণের কথাই সে ভাবিতে পারিত, কত রাগ আর অভিমান জাগিতে পারিত উপেক্ষার মত রাজকুমারের নির্ব্বিকার খাপছাড়া ব্যবহারে, তার বদলে শ্যামলকে কারণ হিসাবে মনে টানিয়া আনিয়া বুকটা তার ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সত্যই যেন শ্যামলের সঙ্গে তার কিছু হইয়াছে. শ্যামল যেন নিছক তার বন্ধু নয়। শ্যামলের দিক হইতে ধরিলে হয়তো সে তা নয়। হয়তো কেন, মালতী ভালভাবেই জানে শ্যামলের মনকে বন্ধুর মন বলিয়া গণ্য করা শুধু ভুল নয়, নিষ্ঠুর অন্যায়। মাঝে মাঝে শ্যামলের জন্য আজকাল জ্বালা করিয়া চোখে তার জল আসে। আজ অপমান করিলেও কাল সে বই ফেরত নেওয়ার ছলে গম্ভীর মুখে বাড়ীতে আসে, বই হাতে পাওয়া মাত্র চোখ, তার ক্রুদ্ধ করুণ ছলছল আশ্চর্য্য চোখ, আড়াল করিতে অভিমানী শিশুর মত মুখ ফিরাইয়া মাথা উঁচু করিয়া গটগট করিয়া চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করে, কিন্তু ডাকিবামাত্র ফিরিয়া আসিয়া বলে, কি বলছ শীগগির বলো, আমার কাজ আছে। তবে এটা শুধু শ্যামলের দিক। সে তো কোনদিন তাকে প্রশ্রয় দেয় নাই,—কাছে আসিতে আর কথা বলিতে দেওয়া যদি প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। রাজকুমারের ভাবান্তর তার আর শ্যামলের সম্পর্কেরই কোন জটিল দুর্ব্বোধ্য প্রতিক্রিয়া, প্রথমেই এ কল্পনা কেন তাকে চমকাইয়া দেয়? তারপর সারাদিন উতলা করিয়া রাখে, নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করায়? ক'দিন মালতী যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে দারুণ কিন্তু সে যেন কেমন এক ধরণের যন্ত্রণা, উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনা আর আত্মহারা অবসাদের বেদনাহীন পীড়ন, গা পোড়ানো জ্বরে হাড় কাঁপানো শীতের মত।

আজ শ্যামল আসিবে। কাল মালতী নিজে তাকে আসিতে বলিয়াছে। শ্যামলের সঙ্গে তার সিনেমায় যাওয়ার কথা আছে। বাহিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হওয়ার কথা সে ভাবিতেছে, হঠাৎ তার মনে হইল, এভাবে চলিতে পারে না, এভাবে রাজকুমারকে দূরে সরিয়া যাইতে দেওয়া অন্যায়,—তারও অন্যায়, রাজকুমারেরও অন্যায়। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া শুধু উতলা হইলে তার চলিবে না। আজ রাজকুমারকে তার কাছে পাওয়া চাই। শ্যামল যখন আসিল, রাজকুমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়া মালতী সবে রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়াছে।

উৎসাহে শ্যামল অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও মালতী, দেরী হয়ে গেছে।

আমি যাব না।

কেন ? লক্ষ্মী চলো। প্লিজ।

কি আশ্চর্য্য, বলছি তোমার সঙ্গে যাব না, রাজুদার সঙ্গে আমার দরকার আছে, জোর করে নিয়ে যাবে তুমি আমায় ?

জোর করে—?

যাব না—তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না কোনদিন। কেন তুমি আমায় জ্বালাতন কর ?

আমি তো কিছুই করিনি মালতী ?

করনি ? দিন রাত পেছনে লেগে আছ তুমি আমার, কিছু করনি ? এই যে তাকিয়ে আছ অমন করে, এটা কিছু করা নয়. এই যে তর্ক করছ, এটাও কিছু করা নয়—তুমি কিছুই কর না, বড় ভাল ছেলে তুমি। যেতে বলছি, চলে যাও না ? তোমার কি মান অপমান জ্ঞান নেই ? এত অপমান করি, কিছুতেই তোমার অপমান হয় না ?

তুমি আমায় কখনো অপমান করনি !

করিনি ? হাজারবার করেছি। অন্য কেউ হলে—

রাগের মাথায় কখনো দু'চারটে কথা বলেছ, তাকে অপমান বলে না। আসতে বারণ করে নিজেই আবার আসতে বলেছ।

আমি আসতে বলেছি ? ছুতো করে তুমি নিজে এসেছো।

ছুতোগুলি তুমি মেনে নাওনি কেন ? বই নিতে এসেছি, বই নিয়ে চলে যেতে দিলেই চুকে যেত। দু'চার দিনের বেশী তো আর ছুতো করে আসতে পারতাম না, আপনা থেকে আমার আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত।—মালতীর সঙ্গে কলহ বাধিলে চিরদিন শ্যামলের কথা জড়াইয়া গিয়াছে, আজ তাকে চাপা গলায় ধীরে ধীরে অপরিচিত ভঙ্গিতে কথা বলিতে শুনিয়া মালতীর হঠাৎ কেমন ভয় করিতে লাগিল। শ্যামল ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। রাগে সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তবু সে এত আস্তে এত স্পষ্টভাবে কথা বলিতেছে কি করিয়া ?

থাকগে। ওসব কথা থাক শ্যামল।

না, থাকবে না।

মালতী ভীরু চোখ তুলিয়া শ্যামলের মুখের দিকে তাকায়। শ্যামলের চোখে কি হইয়াছে—অমন করিয়া তার দিকে সে তাকায় কেন ?

রাজকুমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর শ্যামলের সম্পর্কে মালতীর মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। নিজে সে যাচিয়া রাজকুমারকে জানাইয়া দিয়াছিল, শ্যামলের সঙ্গে তার সিনেমায় যাওয়ার কথা আছে, শ্যামল এখনই তাকে নিতে আসিবে, কিন্তু রাজকুমারের সঙ্গে সে আজ সন্ধ্যাটা কাটাইতে চায়। ভাবিয়াছিল, শ্যামলকে বাতিল করিয়া তার সঙ্গ চায় শুনিয়া রাজকুমার নিশ্চয় খুসী হইবে। খুসী সে হইয়াছিল কিনা ভগবান জানেন, শ্যামলের সঙ্গেই সিনেমায় যাওয়ার জন্য তাকে রাজী করাইতে কত চেষ্টাই যে রাজকুমার করিয়াছিল! শ্যামলের মনে নাকি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, শ্যামল তাকে ভালবাসে। শেষে রাজকুমার বলিয়াছিল, ওকে অন্ততঃ মিষ্টি কথা বলে ফিরিয়ে দাও মালতী, মনে যেন দুঃখ না পায়। আমার কাছে আসছ ওকে জানিয়ে দরকার নেই। ওর সম্বন্ধে আমার ভয় আছে মালতী, মাথাপাগলা ছেলে তো, কখন কি করে বসে। তার সঙ্গে সন্ধ্যা যাপনের জন্য রাজকুমারকে রাজী করাইতে রীতিমত চেষ্টা করিতে হওয়ায় মালতীর গা জ্বালা করিতেছিল, এসব কথা শুনিতে শুনিতে তার মনে হইয়াছিল শ্যামলের চেয়ে বড় শত্রু বুঝি তার নাই। হয়তো ঈর্ষাতে নয়, শ্যামলের মনে কষ্ট দেওয়ার ভয়েই রাজকুমার তাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাকে উপেক্ষা করিতেছে। শ্যামল রাজকুমারের পরিবর্ত্তনের কারণ। তাকে ভালবাসিয়া শ্যামল তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িবে।

মিষ্টি কথার বদলে অতি কড়া ভাষাতেই শ্যামলের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া সে তাই বাতিল করিয়া দিয়াছে। রাজকুমারের সঙ্গে তার দরকার আছে একথাটা জানাইয়া দিতেও কসুর করে নাই। এখন শ্যামলের রকম দেখিয়া তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। এতক্ষণ বিশ্বাস করে নাই, এবার মনে হইতে লাগিল রাজকুমার হয়তো ঠিক বলিয়াছে, শ্যামল ভয়ানক কিছু করিয়া বসিতে পারে।

শ্যামল বলিতে থাকে,—তুমি হয়তো সত্যি আমায় অপমান করেছ, বাঁদর নাচিয়েছ, আজ তাড়িয়ে দিয়ে কাল আবার ডেকে পাঠিয়ে পোষা কুকুরের মত খেলা করেছ আমার সঙ্গে। করে থাকলে বেশ করেছ। আমি বোকা, বোকাই থাকতে চাই, আমার যা ইচ্ছা তাই আমি বিশ্বাস করব। তবে তোমাকে আর জ্বালাতন করব না মালতী, প্রতিজ্ঞা করছি। তুমি আর টেরও পাবে না শ্যামল বলে কেউ এ জগতে আছে। সত্যি বলছি মালতী, কাল থেকে তুমি ধরে নিতে পারবে, আমি বেঁচে নেই।

তার মানে ? এসব কি বলছ ? কি করবে তুমি ? শক্ত করিয়া শ্যামলের কব্জি চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত চোখে তার পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মালতী শিহরিয়া উঠিল, এই সব উদ্ভট মতলব জাগছে তোমার মাথায়। আমি আগেই জানতাম তুমি একটা ভীষণ কাণ্ড না করে থামবে না। তোমার মত যারা ছেলেমানুষ হয়, চিরকাল তারাই লেকে ডুবে, সায়ানাইড খেয়ে জগতের ওপর শোধ নেয়—তোমার মত যারা ভীরু আর কাপুরুষ !

আরও জোরে মালতী শ্যামলের হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, ছাড়িয়া দিলেই সে যেন সঙ্গে সঙ্গে লেকে গিয়া ডুব দিবে অথবা কলেজের লেবরেটারীতে গিয়া সায়ানাইড গিলিবে,—তোমায় একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। এই যে মতলব তুমি করেছ—আগে শুনে নাও আমার কথা—এর মানে তো এই যে আমি অন্যের হয়ে যাব, তুমি তা সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারবে না ? আমার জন্যই মরবে তো তুমি ?

কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখছ, আমাকেও তুমি কি ভাবে মেরে রেখে যাবে, এক মুহূর্তের জন্য আমি শান্তি পাব না? আমি কি করে বাঁচব বলতো? আমায় ভালবাস বলে তোমায় মরতে হবে—আমাকে শাস্তি দিয়ে! একে ভালবাসা বলে নাকি? আমায় পেলে না বলে মরতে পারবে, আমার সুখের জন্য বেঁচে থাকার কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না!

শ্যামল মৃদুস্বরে বলিয়াছিল, তা বলি নি মালতী। সায়ানাইড খাওয়ার কথা বলিনি। আমি বলছিলাম, আর তোমায় জ্বালাতন করব না, দূরে সরে যাব।

শুধু দূরে সরে যাবে?

হ্যাঁ, তোমায় আর বিরক্ত করব না।

ও!

মালতী নিশ্চিন্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মুখ দেখিয়া কিন্তু মনে হইয়াছিল সে যেন আহত হইয়াছে, অপমানও বোধ করিয়াছে। যাকে ছেলেমানুষ মনে করিয়া রাখা যায় তার কাছে ছেলেমানুষি করিয়া ফেলার লজ্জায় রাগও কি কম হয় মানুষের।

আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না মালতী!

মালতী চুপ করিয়া ছিল। শ্যামল তাকে বুঝিতে পারে না, রাজকুমার তাকে বুঝিতে পারে না, সে নারী, সে রহস্যময়ী। শ্যামল তাকে পূজা করে, রাজকুমার তাকে অবজ্ঞা করে, কারণ সে নারী, সে রহস্যময়ী, তাকে কেউ বুঝিতে পারে না!

আমার একটা কথা রাখবে মালতী?

অত ভূমিকা কোরো না। কি কথা?

একমাস বাইরে কোথাও ঘুরে আসবে?

তোমার সঙ্গে?

না। তুমি একা। কোন আত্মীয়স্বজনের কাছে চলে যাও। পুণায় তোমার মাসীমার কাছে অনায়াসে যেতে পার। যাবে?

তখন মালতীর মনে হইয়াছিল, শ্যামল যেন আর ছেলেমানুষ নাই, ছোট ছোট আবেগে নিজেকে সে খরচ করিয়া ফেলে না, কখন সে যেন পরিণত পুরুষ হইয়া গিয়াছে, ধীর সংযত আত্মপ্রতিষ্ঠ তেজী পুরুষ, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পুরুষ, হাসি কান্না আনন্দ বিষাদের রসজ্ঞ পাকা অভিনেতা। ঠিক কি অনুভূতি তখন তার জাগিয়াছিল আর আনুষঙ্গিক আরও কি সব কথা মনে হইয়াছিল পরে মালতী কোনদিন স্মরণ করিতে পারে নাই। ওই কয়েক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা শুধু তার মনে ছিল, নূতন চিন্তা আর অনুভূতির যেটা ফলাফল, পরবর্তী প্রক্রিয়া। সে অভিজ্ঞতা বড় অদ্ভুত। শ্যামল নিষ্ঠুর, রাজকুমারের চেয়ে নিষ্ঠুর। রাজকুমার কি নিষ্ঠুর? যাকে আপন করিতে চাই সে ব্যথা দিবেই, প্রিয় নিষ্ঠুর হইবেই—কারণ জগতে কেউ আপন হয় না, কেউ প্রিয় থাকে না চব্বিশ ঘণ্টা। একদিন রাজকুমার যখন শুধু তার চোখে চোখে চাহিয়াছিল, পলক না ফেলিয়া যতক্ষণ চাহিয়া থাকিবার ক্ষমতা মানুষের আছে ঠিক ততক্ষণ, মালতীর আর্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল। এ সহজ সুবোধ্য কথা। কোলের শিশুকেও তো মার মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর মনে হয়। কিন্তু গুরুজনের মত তাকে সহর ছাড়িয়া দূরে কোথাও গিয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়ার সময় শ্যামলকে দেখিবার কয়েকটি মুহূর্তে এ কি অভিজ্ঞতা তার জন্মিয়া গেল যে রাজকুমারের চেয়ে শ্যামলের নিষ্ঠুরতা গভীর ও মর্মান্তিক? তার আঙুলে গোলাপের কাঁটা ফুটিলে যে শ্যামলের মনে হয় তো লক্ষ কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা হয়?

আমার ভালর জন্য বলছ, তোমার কোন স্বার্থ নেই কেমন?

এবার শ্যামল চুপ করিয়া ছিল।

তুমি যাও শ্যামল। আমি বেরুবো।

আমার সঙ্গেই চলো?

তোমার সঙ্গে যাব না।

কখন ফিরবে?

তুমি আমায় পাগল করে দেবে। যেতে বলছি, যাও না?

যাচ্ছি মালতী!

যাচ্ছি বলিয়াও শ্যামল মিনিট দুই দাঁড়াইয়াছিল।

আর আসব না তো?

তার মানে?

তুমি যদি সত্যি বারণ কর, তা হলে আর আসব না।

মালতী হতাশ ভাবে এতক্ষণ পরে বসিয়া পড়িয়াছিল।

তোমার সঙ্গে সত্যি পারলাম না শ্যামল। কি যে করি তোমাকে নিয়ে আমি! আমি জানি তুমি একটা ছুতো খুঁজছ, নাটক করাব মত খুব উচ্ছসিত ভাবে আমি সত্যি সত্যি তোমাকে আসতে বারণ করব, তুমিও আমার হৃদয়হীনতায় আহত হয়ে চলে যাবে, আর আসবে না। প্রথমদিন ভাববে আমি রক্তমাংসের মানুষ নই, পরদিন ভাববে আমি মাটি, পরদিন পাথর, পরদিন লোহা, পরদিন ইস্পাত—বেশ মজা হবে, না? সব ব্যাপারকে একেবারে চরমে না তুললে কি তোমার চলে না? তুমি জানো, ওভাবে তোমাকে আমি যেতে বলতে পারি না। তুমি বোধ হয় ভাব যে মেয়েরা যার সঙ্গে লভে পড়ে তাকে ছাড়া সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সুখ পায়?

আর কিছু বলতে হবে না মালতী। আমি যাচ্ছি।

শোন। তোমাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। আজ আমার সময় নেই, ক্ষমতাও নেই। কাল সন্ধ্যার পর একবার এসো।

আমাকে আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না, মালতী।

হবে। সব কথায় কথা বাড়াও কেন? কাল এসো।

না এলে তুমি দুঃখিত হবো?

শ্যামল। ফের যদি তুমি আমার সঙ্গে এমনি কর কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

তারপর শ্যামল চলিয়া গেলে এমন শ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত আর অসহায় মনে হইয়াছিল নিজেকে, আধ ঘণ্টা মালতী চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। এখন আবার রাজকুমারের সঙ্গে বুঝাপড়া বাকী আছে। শেষ বুঝাপড়ার কি আছে, কিছুই সে জানে না। কিন্তু আর তার সহ্য হয় না। এই অনির্দিষ্ট অসহ্য-হওয়ার প্রতিকার চাই। এ ভাবে আর চলে না, চলিতে পারে না। হয় রাজকুমার তাকে লইয়া যাক সমুদ্রতীরের কোন বন্দরে, পাহাড়ের মাথায় কোন সহরে, মাঠের ধারের কোন গ্রামে, সেখানে সন্ধ্যা হইতে তাকে বুকে তুলিয়া এত জোরে পিষিতে থাক যেন শেষ রাত্রে তার দম আটকাইয়া যায়, নয়তো তাকেই অনুরোধ করুক জোরে তার গলা জড়াইয়া ধরিতে যাতে আর রাজকুমার নিঃশ্বাস নিতে না পারে। তার দুর্বোধ্য অর্থহীন যন্ত্রণার মত এইরকম খাপছাড়া ভয়ানক কিছু ঘটুক।

রাজকুমার প্রতীক্ষা করিয়া আছে, সে যাচিয়া দেখা করিতে চাহিয়াছে বলিয়া রাজকুমার তার জন্য রাস্তার ধারে একটা বিলাতী দোকানের লাল বাড়ীর সামনে গাড়ী-বারান্দার নীচে ফুটপাতে দাঁড়াইয়া তার প্রতীক্ষা করিতেছে, ক্রমাগত এই কথাটা মনে পড়িতে পড়িতে মালতীর মস্তিষ্কে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার পাক-খাওয়া কমিয়া আসিল। জীবনে মালতী এক-বার নাগরদোলায় চড়িয়াছিল, দশ এগার বছর বয়সে। তার দুর্দশা পৌঁছিয়াছিল সেই সীমায় যার পরেই মূর্চ্ছা গিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। উঠিয়া জামা কাপড় বদলানোর সময় আজ তার মনে হইতে লাগিল, এই মাত্র সে যেন নাগরদোলা হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সে জানিত না, সম্প্রতি রাজ-কুমারেরও একদিন এই রকম মনে হইয়াছিল।

রাজকুমার বলিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখছিলাম মালতী, দেখতে দেখতে একটা অন্যায় করে ফেলেছি।

সে কি ?

এদিক থেকে একজন মহিলা আসছিলেন, সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবেন। যখন কাছাকাছি এলেন, আমি বুঝতে পারলাম তিনি আশা করছেন আমি একটু পিছু হটে তাকে পাশ কাটাবার আরেকটু যায়গা দেব। ভদ্রতা করে একপা পিছু হটতে গিয়ে আরেকজনের পা মাড়িয়ে দিলাম, ছোটখাট একটু ধাক্কাও লাগল। যার পা মাড়িয়ে দিলাম তিনি ঠিক মহিলা নন, কমবয়সী একটি বিদেশী মেয়ে।

তারপর ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে বুঝলাম অন্ততঃ গালে একটা চড় সে মারবেই। আমি অ্যাপলজি পর্য্যন্ত চাইলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কুড়ি কি বাইশ সেকেণ্ড। তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে চলতে আরম্ভ করল। কি বলে গেল জান ?—সরি।

তারপর ?

তারপর আবার কি ?

তোমার চোখের দিকে কুড়ি-বাইশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকেই মেয়েটার রাগ জল হয়ে গেল কেন বুঝিয়ে বলবে না ? ওটাই তো আসল কথা,—গল্পের মরাল। আচ্ছা আমিই বলছি শোন। ভুল হলে করেক্ট করবে। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল, মানুষ ভাল, মানুষ কখনো অন্যায় করে না, সমস্ত অন্যায় আপনি ঘটে যায়—ওগুলি জীবনের অ্যাক্‌সিডেণ্ট। ঠিক হয় নি ?

মালতী আজ রাজকুমারকে খোঁচা দিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে। মালতীর পক্ষে এটা একেবারে অসম্ভব বলিয়া জানিত কিনা রাজকুমার, তাই অনেকদিন পরে আজ ভাল করিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—মুখের ভাব না দেখিয়া কোনো কথার মানে বুঝা যায় না অনেক সময়। সহরের সৌখীন প্রান্তর ডিঙ্গাইয়া শেষ বেলার রোদ তাদের গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তাপের চেয়ে সে রোদের রঙ বেশী। মালতীর বিবর্ণ মুখে সত্যই তার কথার ব্যাখ্যা ছিল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ করেছে ?

না। অসুখ করেনি।

বাড়ীতে না ডেকে এখানে আমাকে অপেক্ষা করতে বললে কেন মালতী ?

বাড়ীর বাইরে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল তাই। হয় নিজের বাড়ীতে নয় অন্য কারো বাড়ীতে তোমার সঙ্গে এতদিন কথা বলেছি। আমায় একদিন সিনেমায় পর্য্যন্ত তুমি নিয়ে যাওনি আজ পর্য্যন্ত।

রাজকুমার একটু ভাবিল।

সাড়ে ছ'টার সময় স্যর কে, এল-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। পিওন দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এমন করে লিখেছেন দেখা করার জন্য, একটা কিছু গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে। স্যর কে, এল-কে ফোন করে দি', সাড়ে ন'টার সময় বাড়ী গিয়ে দেখা করব। তারপর সিনেমায় যাবে তো চলো।

না। আগে দেখা করে হাঙ্গামা চুকিয়ে এসো।

তুমি এতক্ষণ কি করবে ?

আমি ? এক কাজ করা যাক, হোটেলে একটা রুম নাও। তুমি স্যর কে, এল-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবে, আমি বিশ্রাম করব—শুয়ে থাকব একটু।

তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, মালতী।

ছেলেমানুষ নই ?

আগে ছিলে, এখন কি আর তোমায় ছেলেমানুষ বলা যায় ? তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ মালতী। আজ থেকে তুমি সুখী হবে।

শুনিয়া মালতীর ভয় করিতে থাকে। সুখ-দুঃখের কথা সে কখনো ভাবে নাই। সুখে অথবা দুঃখে কোনদিন তার

সচেতন হইতে খেয়াল থাকে নাই আমি সুখী অথবা আমি দুঃখী। নিজের সম্বন্ধে নিজের বিচারে এই হিসাবটা তার চিরদিন বাদ পড়িয়াছে। একটা অজানা মধ্যবিত্ত ফিরিঙ্গি হোটেলের একটি ঘরে তাকে রাখিয়া রাজকুমার স্যার কে, এল-এর সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলে নিজেকে মালতীর বড় অসহায় মনে হইতে থাকে। অপরিচিত আবেষ্টনীতে নিজেকে একা মনে করিয়া নয়, বাঁচিয়া থাকার মত সহজ স্বাভাবিক ব্যাপারটা হঠাৎ অতি বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া। তার নিজের একটা জীবন আছে, জীবন যাপনের কঠিন আর জটিল কর্ত্তব্য তাকে পালন করিতে হইবে, কিন্তু সে কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। তার বুদ্ধি নাই, সাহস নাই, অভিজ্ঞতা নাই। রাজকুমার যাই বলুক, সে সত্যই ছেলেমানুষ, এতকাল শুধু ছেলেখেলা করিয়াছে, ছেলেখেলা করা ছাড়া আর কোন যোগ্যতা তার নাই। জীবন তো ছেলেখেলার ব্যাপার নয়!

হোটেলটি বড় রাস্তা হইতে খানিকটা তফাতে, পথের শব্দ কানে আসে না। হোটেলটিও ছোট এবং প্রায় নিঃশব্দ। হোটেলের লোক খাটে দু'জনের বিছানায় ফর্সা চাদর পাতিয়া, পাশাপাশি দু'টি করিয়া বালিশ রাখিয়া গিয়াছে। ছোট গোল চায়ের টেবিলটির দু'দিকে দু'খানা চেয়ার। চারটি বড় বড় জানালায় এমন কৌশলে পর্দা দেওয়া যে ঘরের মধ্যে আলো আসে কিন্তু মানুষের দৃষ্টি আসে না। দেয়াল যেন সবুজ রঙে গম্ভীর হইয়া আছে। ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধনের আয়োজনের অভাব মালতীর অসম্পূর্ণতার অনুভূতিকে জোরালো করিয়া তোলে। আয়নায় যে মালতীকে দেখা যায় তাকে মালতীর মনে হয় অন্য একটি মেয়ে।

শেষ মুহূর্ত্তে রাজকুমার মালতীকে একা রাখিয়া স্যার কে, এল-এর সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, মালতী রাজী নাই।

না, সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে এসো। আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর মনে মনে ভাববে রিণির বাবা কি জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমার তা সইবে না।

তা ভাবব না মালতী! ওটুকু মনের জোর আমার আছে।

মনের জোরের কথা নয়।

রাজকুমার চলিয়া যাওয়ার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে মালতী অস্থির হইয়া উঠিল। সময় যে এত শ্লথ, শুইয়া বসিয়া ঘরের মধ্যে পাক দিয়া আর ক্রমাগত কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটির দিকে চাহিয়া সময়কে যে কিছুতেই তাড়াতাড়ি পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া যায় না, আজ যেন সে তা জানিতে পারিল প্রথম। অথচ মনে মনে সে কামনা করিতে লাগিল, রাজকুমারের ফিরিতে যেন দেরী হয়। অনেক দেরী হয়।

ফিরিয়া আসিতে রাজকুমারের সত্যই দেরী হইয়া গেল।

স্যার কে-এল-এর আফিস বেশী দূরে নয়, ট্যাক্সিতে পৌঁছিতে রাজকুমারের পাঁচ সাত মিনিটের বেশী সময় লাগিল না। আপিসের লোকজন অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে, কেবল তিনজন কেরাণী তখনো ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিতেছে। নিজের ঘরে স্যার কে-এল পাইপ কামড়াইয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন আর ঘরের কোণে টাইপরাইটের সামনে চুপচাপ বসিয়াছিল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে। বয়স তার রিণির চেয়ে হয় তো বেশী নয় কিন্তু মুখে অনেক বেশী বয়সের ছাপ।

বসো রাজু।

স্যার কে, এল নিজেই বসিলেন।

তুমি এখনো যাও নি যে মিস রেডল?

স্যার কে, এল নিজেই তাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, মনে ছিল না। মিস রেডল চলিয়া গেলে রাজকুমারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন, একটা চিঠি টাইপ করাব বলে ওয়েট করতে বলেছি, এক ঘণ্টার বেশী চুপচাপ ওয়েট করছে! একবার যে মনে করিয়ে দেবে সেটুকু সাহস নেই। খাঁটি ইংরেজ মেয়ে হলে, ইংরেজ কেন, বাঙ্গালী মেয়ে হলে, কখন খেয়াল করিয়ে দিত, চিঠি ও টাইপ করানো হত আমার। যাকগে।

মুখে যাকগে বলিলেও বাজে চিন্তাগুলিকে যাইতে দিয়া সহজে কাজের কথা কিন্তু তিনি আরম্ভ করিতে পারেন না। একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করেন তার এক দুঃসাহসী টাইপিষ্টের কথা, মাসের শেষে যে ওভারটাইম চার্জ্জ করিয়া তার কাছে বিল পাঠাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবশ্য বিদায় দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সেটা তার দুঃসাহসের জন্য নয়।

নিজের পাওনা বুঝে নেবার সাহস সকলের থাকবে, আমি তাই পছন্দ করি রাজু। তুমি তো জানো আমাকে, জানো না? আমার প্রিন্সিপল হল, কারো ওপর অন্যায় না করা। তাই বলে অভদ্রতাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আমি তাকে অপিস টাইমের পর থাকতে হুকুম দিই নি, অনুরোধ করেছিলাম। একেবারে বিল না পাঠিয়ে সেও যদি আমাকে—যাকগে।

রাজকুমার বুঝিতে পারে যে ব্যাপার সহজ নয়। এতক্ষণ স্যার কে, এল শুধু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, দরকারী চিঠি টাইপ করানোর জন্য টাইপিষ্ট বসাইয়া রাখিয়া তার উপস্থিতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাকে দেখিয়া এখন ভয়ানক বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রাণপণে সেটা দমন করার চেষ্টা করিতেছেন। নিজেকে একটু আয়ত্তে না আনিয়া আলোচনা আরম্ভ করিবার সাহস তাঁর হইতেছে না। তাকে এমন কি বলার থাকিতে পারে

রিণির বাবার যা বলা তাঁর পক্ষে এত কঠিন? রিণির মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে স্যর কে, এল-এর পরিচয়, ইদানীং কেবল সে পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, বয়স হইতে সুরু করিয়া অর্থ সম্মান শিক্ষাদীক্ষা চালচলনের পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সহানুভূতির একটা যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, এই মাত্র। স্যর কে, এল-এর জীবনে কোন অঘটন ঘটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?

হঠাৎ রাজকুমারের মনে হয়, যা ঘটিয়াছে সেটা স্যর কে, এল এর ব্যক্তিগত কিছু নয়, কেন্দ্র নিশ্চয় রিণি। নিজের জীবনে স্যর কে, এল-এর এমন কিছু ঘটিতে পারে না তাকে যা না বলিলে তাঁর চলে না এবং বলিতে গিয়া এমন নার্ভাস হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু রিণি? কি হইয়াছে রিণির?

রিণি কেমন আছে? অনেকদিন দেখা হয় নি রিণির সঙ্গে।

রিণিও তাই বলছিল। তুমি আর যাও না?

রাজকুমার একটু অস্বস্তির সঙ্গে স্যর কে, এল-এর মুখের দিকে তাকায়। রিণির কথা তোলা মাত্র তার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, অতি ধীরে ধীরে তিনি কাগজ-কাটা ছুরির ডগা দিয়া রেখা আঁকিয়া চলিয়াছেন ব্লটিং প্যাডের একপ্রান্ত হইতে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত। তাঁর কথা, ভঙ্গি ও মুখের ভাবের কোন মানেই রাজকুমার বুঝিতে পারে না। রিণি কি স্যর কে, এল-এর কাছে তার সেই অভদ্র অনুরোধের কথা বলিয়া দিয়াছে? স্যর কে, এল কি সেইজন্য তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? কিন্তু সে যখন আর রিণিকে বিরক্ত করিতে যায় না, পায়ে পড়িয়া তাকে অপিসে ডাকিয়া পাঠাইয়া সে কথা তুলিবার তো কোন অর্থ হয় না।

পরশু রিণি আমাকে সব বলেছে রাজু।

রাজকুমার চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রিণি সব বলিয়াছে। ভাল কথা। স্যর কে, এল তাকে কি বলিবেন? উপদেশ দিবেন? গালাগালি? লজ্জা, ভয়, আপশোষ কিছুই রাজকুমার বোধ করে না, রিণির উপর রাগও হয় না। রিণির মন তার অজানা নয়। সে মনে কত খেয়াল, কত ঝোঁক, কত জিদ, আর কত আত্মপীড়নের পিপাসা আছে সে তার পরিচয় রাখে। এরকম মন যাদের হয়, জীবনকে জটিল করাই তাদের ধর্ম্ম। কোনদিন যদি অসাধারণ কিছু ঘটে জীবনে, সেই ঘটনার জের টানিয়া চলিতে চায় সারা জীবন, প্রেমে অথবা বিদ্বেষে সমাপ্তিতে অস্বীকার করিতে চায়, কারণ, আগেই অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ফেলায় শেষ হইতে দিলেই এখন তাদের লোকসান।

বন্ধু একদিন তার অনাবৃত দেহ দেখিতে চাহিয়াছিল, একি রিণি ভুলিতে পারে অথবা বন্ধুর সঙ্গে শুধু সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াই এমন একটা ব্যাপারকে শেষ হইতে দিতে পারে! স্যর কে, এল রাজকুমারকে পছন্দ করেন? রাজকুমার যে কি ভয়ানক মানুষ তার প্রমাণ দিয়া বাপের ধারণার নাটকীয় পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়া রিণি থাকিতে পারিবে কেন? রাজকুমারের প্রতি স্যর কে, এল-এর ক্রোধ ও বিদ্বেষ জাগিবে, অতীতে বিলীন হইয়া যাওয়ার বদলে জের টানা চলিতে থাকিবে রাজকুমারের অসভ্যতার, রিণির হৃদয় মনে নূতন করিয়া ছোঁয়াচ লাগিবে উত্তেজনার। আগে হয় তো রাজকুমারের জ্বালা বোধ হইত, গিরির হাত টানার ব্যাপারে যেমন হইয়াছিল। এখন সে রিণির জন্য মমতাই বোধ করে। নিজের জন্য অকারণে যন্ত্রণা সৃষ্টি করার এই নেশা চিরদিন মেয়েটার জীবনে অভিশাপ হইয়া থাকিবে।

তোমার সম্বন্ধে আমার অন্য ধারণা ছিল, রাজু। আমার একটা অহঙ্কার আছে, আমি মানুষ চিনতে পারি। এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলাম, তুমি এত বড় রাস্কেল। সোজাসুজি কয়েকটা কথা আলোচনা করার জন্য তোমাকে তাই ডেকে পাঠিয়েছি।

আলোচনা করে লাভ কি হবে?

রিণি আমার মেয়ে রাজু। আমার আর ছেলে-মেয়ে নেই।

এ কথাটা কেন বললেন বুঝতে পারছি না।

স্যর কে, এল পাইপটা মুখে তুলিয়া কামড়াইয়া ধরিলেন, তারপর আবার নামাইয়া রাখিলেন।

তুমি সব অস্বীকার করতে চাও?

না, অস্বীকার করতে চাই না। রিণির সঙ্গে অভদ্রতা করেছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। আমার কি উদ্দেশ্য ছিল বলে লাভ নেই। আপনি বুঝতেও পারবেন না, বিশ্বাসও করবেন না।

অভদ্রতা! কি বলছ তুমি?

রাজকুমার কিছুই বলিল না। রিণির সঙ্গে তার ব্যবহারের সংজ্ঞা লইয়া কি স্যর কে, এল তর্ক করিতে চান? বলিতে চান ওটা অভদ্রতার চেয়ে আরও খারাপ কিছু?

ফাঁসির ভয় না থাকলে তোমায় আমি খুন করতাম রাজু। তুমি রিণির যা ক্ষতি করেছ সে জন্য নয়, তোমার এই মনোভাবের জন্য। রিণির কাছে সব শুনেও তোমায় আমি একা দোষী করিনি। রিণি ছেলেমানুষ নয়, তারও উচিত ছিল নিজেকে বাঁচিয়ে চলা। দু'দিন ধরে আমি ক্রমাগত নিজেকে কি বুঝিয়েছি জানো? কেবল তুমি আর রিণি নও, আরও অনেক ছেলে-মেয়ে এ রকম ভুল করেছে, রিণি আমার মেয়ে বলেই আমার মাথা খারাপ করলে চলবে না, ভুল করলে চলবে না। রিণিকে তুমি বিয়ে করবে কি না, না করলে কেন করবে না, খোলাখুলি ভাবে এই কথা জিজ্ঞেস করব বলে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এক বছর একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করা যখন তোমার কাছে শুধু অভদ্রতা,

তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। তোমাকে বলা বৃথা, তবু বলছি, যদি পার স্যুইসাইড কোরো। তোমার মত মন নিয়ে কারো বেঁচে থাকা উচিত নয়। আচ্ছা, এবার তুমি যাও রাজু।

কথা বলিতে রাজকুমারের সাহস হইতেছিল না। রিণি সব বলিয়াছে যা ঘটে নাই, যা ঘটিতে পারিত না। কিছুই বলিতে বাকী রাখে নাই। কেন বলিয়াছে? কি চায় রিণি? তার উদ্দেশ্য কি? যতই বিকার থাক মনে, রিণি তো পাগল নয়। তাকে জড়াইয়া বাপের কাছে এই অদ্ভুত অকথ্য কাহিনী সে বলিতে গেল কেন? তাকে সে পাইতে চায়, বিবাহের মধ্যে, চিরদিনের জন্য? কিন্তু তাকে পাওয়ার জন্য এই উদ্ভট উপায় সে অবলম্বন করিবে কেন? রিণি তো কোনদিন জানিতেও দেয় নাই, তাকে তার চাই।

যদি ধরা যায় তখন রিণিও নিজেকে জানিত না, সেদিনকার রাগারাগির পর এতদিনের অদর্শনে তার খেয়াল হইয়াছে, নিজেই তাকে ক্ষমা করিয়া তাকে তো সে কাছে ডাকিতে পারিত, চেষ্টা করিতে পারিত তাকে জয় করার। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, তাকে পাওয়ার আর কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইলে রিণি যদি এই পাগলামি করিত, তার একটা মানে বুঝা যাইত।

তোমায় যেতে বলেছি রাজু!

কাল আমি একবার রিণির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

স্যর কে, এল সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, কেন?

রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।—আপনার সঙ্গে কথা বলার আগে রিণির সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। এমন তো হতে পারে, আপনি সব কথা জানেন না, রিণি আপনাকে সব বলতে পারেনি? আপনি ধরে নিন, রিণি আর আমার মধ্যে কয়েকটা ভুল বোঝা আছে, ধরে নিয়ে কাল তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিন।

ব্লটিং প্যাডের দিকে চাহিয়া স্যর কে-এল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটু অপেক্ষা করিয়া রাজকুমারও নীরবে বাহির হইয়া গেল।

পথে নামিয়া মালতীর কাছে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাওয়ার জন্য রাজকুমার ট্যাক্সি ডাকিল না, ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিতে লাগিল। দেহে মনে সুন্দর সরসীকে আশ্রয় করিয়া সে যে আনন্দের জগতে উঠিয়া গিয়াছিল, সেখান হইতে আবার মাটিতে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। চলিতে চলিতে রাজকুমারের মনে হয় সে কি সত্যই কিছু পাইয়াছিল, আনন্দ অথবা শান্তি? এখন তো তার মনে হইতেছে, কয়েকটা দিন সে শুধু অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

চলিতে চলিতে মালতীর কথা ভাবিয়া রাজকুমার শ্রান্তি বোধ করে। কি মধুর ছিল মালতী-সম্পর্কে তার গুরুতর কর্তব্যের কল্পনা কয়েক মুহূর্ত আগে। মালতীকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে মালতী কি চায়। জীবনের স্রোতে ভাসিয়া চলিতে চলিতে একটি বিচ্ছিন্ন ফুল অস্থায়ী বাধায় আটকাইয়া গিয়াছে, ভাবিতেছে এইখানে বুঝি তার ভাসিয়া চলার শেষ, আবার তাকে ভাসিয়া যাওয়ার সুযোগ দিতে হইবে তার নিজস্ব পরিণতি, স্থায়ী সার্থকতার দিকে। এই কাজটুকু করিবে ভাবিয়াই নিজেকে রাজকুমারের দেবতা মনে হইতেছিল। ভীরু দুর্বল মানুষের মত এখন তার মনে হইতে থাকে, মালতীর মুখোমুখি হওয়া একটা বিপদ' মালতীকে কিছু বুঝানোর চেষ্টা বিপজ্জনক সম্ভাবনায় ভরা।

অবিশ্বাস্য, তবু সত্য। মালতী যে ঘরে তার প্রতীক্ষা করিতেছিল তার রুদ্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার সময় রাজকুমার পূর্ণমাত্রার সচেতন হইয়া উঠিল যে, দরজার ওপাশে মালতীর স্পর্শ ছাড়া আর সমস্তই অর্থহীন। কথা অবশ্য সে বলিতে পারে যত খুসী, কিন্তু কথার কোন মানে থাকিবে না। স্যার কে, এল-এর শ্যাম্পেনের বোতল খোলার আওয়াজের মত কথা হইবে শুধু তৃষ্ণার সঙ্কেত, পানীয়ের আহ্বান।

আজ হঠাৎ নয়, চিরদিন এমনি ছিল, মনের অনেক দরজার ওপাশে অনেক মালতীর স্পর্শ। এইমাত্র শুধু সেটা জানা গেল। আকাশের মেঘে সে বাসা বাঁধিয়াছিল, সেখান হইতে নামাইয়া আনিয়া রিণি তাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাই জানা গেল। সন্দেহ করার ভরসাও তার নাই। অভিজ্ঞতার মত এভাবে যা জানা যায় তাতে কি আর ভুলের সুযোগ থাকে? একটি রহস্য শুধু এখন বিস্ময়ের মত জাগিয়া আছে যে, মালতী কেন,? যার জন্য নিজের স্নেহকে একদিন ভালবাসা মনে হইয়াছিল, সে কেন? রিণি আর সরসী থাকিতে মালতী কেন এ অভাবনীয় রূপকে পরিণত হইয়া গেল?

চুলোয় যাক। মালতীকে দুয়ার খুলিবার সঙ্কেত জানাই-বার পর মালতী দুয়ার খুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত কয়েক মুহূর্ত রাজকুমার ভাবিয়াছিল—চুলোয় যাক। কি আসে যায় মালতী যদি শ্যামলকে ভালবাসে আর সেই ভালবাসাই তাকে ঠেলিয়া দেয় তার পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজকুমারের দিকে, রাজকুমারকে সে শুধু ভালবাসিতে চায় বলিয়া, রাজকুমারকেই তার ভালবাসা উচিত এই ধারণা পোষণ করে বলিয়া? এ তো সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। ভালবাসিবার দুরন্ত ইচ্ছা যে ভালবাসা নয় এ জ্ঞান অনেকের যেভাবে আসিয়াছে মালতীরও সেভাবে আসুক—আজ রাত্রি শেষে, অথবা আগামী কাল। সে নিজে অবশ্য সব জানে। কিন্তু জানা কথা না জানার

ভাণ করা নিজের কাছে এমন কি কঠিন? তার ফরমুলা তো বাঁধাই আছে—আজিকার রাত্রি স্মরণীয় হোক, কাল চুলোয় যাক।

ঘরের ভিতরে গিয়া এ ভাবটা অবশ্য তার কাটিয়া গেল। কিন্তু জড়ের গতিবেগের মতই আবেগের গতি, বেগ থামিবার পরেও গতি হঠাৎ থামে না। আপনা হইতেই খানিকটা আগাইয়া চলে।

খাটে বসিয়া রাজকুমার বলে, দেরী হয়ে গেছে, না?

মালতী অস্ফুট স্বরে বলে, হ্যাঁ।

একলা কষ্ট হচ্ছিল?

আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

রাজকুমার এতক্ষণে মালতীর দিকে তাকায়। দেয়ালে নীচু ব্র্যাকেটে আলো জ্বলিতেছে, মেঝে আর ওপাশের দেয়ালে মালতীর ছায়া পড়িয়াছে, ছায়ার তার শাড়ীর বিন্যাস ও অবিন্যাস স্পষ্টতর। পিছনের দেয়ালের পট-ভূমিকায় মালতীকে দেখাইতেছে মনের ক্যামেরায় তোলা পুরাণো ফটোর মত অস্পষ্টতার রহস্যে রহস্যময়ী—আধ-ভোলা স্মৃতি যেন ঘিরিয়া আছে তাকে। তাড়াতাড়ি কয়েকবার চোখের পলক ফেলিয়া রাজকুমার নিজের চোখের জলীয় ভ্রান্তিকেই যেন মুছিয়া দিতে চায়, তারপর হারাণো গোধূলির নিষ্প্রভ দিগন্তে সোণার থালার মত নতুন চাঁদকে উঠিতে দেখিয়া শিশু যেভাবে চাহিয়া থাকে তেমনি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিতে থাকে মালতীকে। সরসীকে তার মনে পড়িতেছে, হৃদয়-সাগর মন্থনে উত্থিতা উর্ব্বশী সরসীকে। সে যেন কতদিনের কথা, রাজকুমার যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। তেমনি অনবদ্য নগ্নতার প্রতিমূর্ত্তির মত মালতীকে ওইখানে, যেখানে সে দাঁড়াইয়া আছে কৃত্রিম আলোয় সাজানো পুতুলের মত, দাঁড় করাইয়া দু'চোখ ভরিয়া তাকে দেখিবার জন্য রাজকুমারের হৃদয় উতলা হইয়া উঠে। দেহে মনে আবার সে যেন সেদিনের মত নবজীবনের, মহৎ আনন্দের সঞ্চার অনুভব করে। তার আশা হয়, সরসীর মত মালতীও আজ তাকে সমস্ত শ্রান্তি ও ক্ষোভ ভুলাইয়া দিতে পারিবে, আবার নিরুদ্বেগ মুক্তি জুটিবে তার, আবার সে উঠিতে পারিবে তার আকাশের আবাসে, যে কুলায় ছাড়িয়া নিজের ইচ্ছায় সে নামিয়া আসে নাই।

নিজের অজ্ঞাতসারে রাজকুমার উচ্চারণ করিতে থাকে, মালতী! মালতী! পথহারা শ্রান্ত মুমূর্ষু শিশু যেভাবে তার মাকে ডাকিয়া কাতরায়।

কিন্তু মালতী শুধু মাথা নাড়ে। রাজকুমার বুঝিতে পারে না, আবার আবেদন জানায়। মালতী মাথা নাড়ে আর আঁচলের প্রান্ত দিয়া নিজেকে আরেকটু ঢাকিতে চেষ্টা করে। কথা যখন সে বলে তার কণ্ঠস্বর শোনায় কর্কশ।

মালতী বলে, শোন। আমার কেমন যেন লাগছে।

কেমন লাগছে মালতী?

গা গুলিয়ে বমি আসছে।

ক্রোধ, বিরক্তি আর বিষাদে রাজকুমারের অনুভূতির আধারে ফেনিল আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। তীব্র সঙ্কীর্ণ বেদনার পুনরাবৃত্তিময় সংক্ষিপ্ত আবেদন ক্ষণিকের নির্ব্বিকার শান্তিতে লয় পায় আর আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে। সে অনুভব করে, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাবে অনুভব করে, ভয় ও শ্রদ্ধার বশ্যতা, কাব্য ও স্বপ্নের মোহ, আবেগ ও উত্তেজনার তাগিদ, কিছুই মালতীকে ভুল করিতে দিবে না। তার দিকে মালতীর গতি বন্ধ করিয়া কোনদিকে তাকে চলিতে হইবে দেখাইয়া দিবার কথা সে যা ভাবিয়াছিল, তার কোন প্রয়োজন ছিল না। মালতী আর আগাইবে না। সে ডাকিলেও নয়, হাত ধরিয়া টানিলেও নয়। শুধু আজ নয়, চিরদিন এই পর্য্যন্তই ছিল মালতীর ভুলের সীমা। ভুল কি ভুল নয় তাও হয়তো মালতী জানে না, এখনো হয়তো সে ধরিয়া রাখিয়াছে আজ রাত্রিই তার প্রিয় মিলনের রাত্রি, কিন্তু রাজকুমার দু'বাহু বাড়াইয়া দিলে সে আসিয়া ধরা দিবে না।

মালতীর সম্বন্ধে এ যে তার কল্পনা নয় সে বিষয়ে রাজকুমারের এতটুকু সন্দেহ থাকে না, অশোকতরুমূলে ক্লেশপাণ্ডুরবর্ণা অধোমুখী সীতার দিকে চাহিয়া দেবতা ব্রহ্মা আর রাক্ষসী নিকষার পুত্র রাবণ যে যন্ত্রণায় অমরত্বের প্রতিকার চাহিত, রাজকুমারও তেমনি যন্ত্রণা ভোগ করে। রাবণের তবু মন্দোদরী ছিল, জীবনে রাবণ তবু ভালবাসিয়াছিল সেই একটি-মাত্র নারীকে, একটু যে ভালবাসিবে রাজকুমার এমন তার কেউ নাই। তা ছাড়া, তার সীতাকে সে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রায় গায়ের জোরের মতই ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে ছল বল কৌশল করিয়া রাখিয়া এতদিন সে মালতীকে হরণ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ ভাবিয়াছিল তার মনটি পর্য্যন্ত মুক্ত করিয়া শ্যামলকে ফিরাইয়া দিবে। এই উদারতার কল্পনাটুকু পর্য্যন্ত তার মিথ্যা, অকারণ অহঙ্কার বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল!

নিছক অহঙ্কার, অতি সস্তা আত্ম-তৃপ্তি, নিজেকে কেন্দ্র করিয়া শিশুর মত রূপকথা রচনা করা। মালতী কবে তার বশে ছিল যে আজ তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা সে ভাবিতেছিল? কোন দিন কিছু দাবী করে নাই বলিয়াই তার সম্বন্ধে মালতীর মোহ এতদিন টিঁকিয়া ছিল, দাবী জানানো মাত্র মালতী ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া যাইত, হয়তো ঘৃণা পর্য্যন্ত করিতে আরম্ভ করিত তাকে।

বাড়ী যাবে মালতী?

একটু শুয়ে থাকি। বড় অস্থির অস্থির করছে।

রাজকুমার বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে মালতী গিয়া শুইয়া পড়িল।

দরজা বন্ধ করে' এতক্ষণ ঘরে বসে ছিলাম বলে বোধ হয়।

তা হবে।

মিছিমিছি রুমটা নেওয়া হল।

তাতে কি।

সাতটা টাকাই নষ্ট। কি চার্জ্জ! এক রাত্রির জন্ত একটা রুম, তার ভাড়া সাত টাকা। কে জানত হঠাৎ এমন বিশ্রী লাগবে শরীরটা?

ও রকম হয় মালতী।

এক হিসাবে ভালই হয়েছে। তুমি বেঁচে গেলে।

মালতীর ঠোঁটে এলোমেলো নড়াচড়া চলে, চোখের পাতা ঘন ঘন ওঠে নামে। চুলগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। তার শোয়ার ভঙ্গিতেই গভীর অবসন্নতা। মহাকাব্যের শৃঙ্গারশ্রান্তা রমণীর বর্ণনা রাজকুমারের মনে পড়িয়া যায়।

রাজুদা—একটা কথা বলি শোনো। তুমি কি ভাববে জানি না। আমি একটা বিশ্রী উদ্দেশ্য নিয়ে আজ এসেছিলাম। মানে, আমার উদ্দেশ্য ভারি খারাপ ছিল।

বল কি, ভারি আশ্চর্য্য কথা তো!

মালতীর বিবর্ণ মুখে রঙের প্লাবন আসিয়া আটকাইয়া রহিয়া গেল।

তা নয়। ঠিক তা নয়। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে তা হলে তুমি বাধ্য হয়ে বিয়ে করবে।

কেন? নাও তো করতে পারতাম।

তামাসা করছ? এই কি তোমার তামাসার সময় হল? আমার এদিকে মাথা ঘুরছে, কি ভাবছি কি বলছি বুঝতে পারছি না—রাগ করেছ নাকি? তুমি নিশ্চয় রাগ করেছ। তাই এমনি ভাবে ছাড়া ছাড়া কথা বলছ—রাগ হয়েছে তোমার।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তার রাগের চিহ্ন খুঁজিতে খুঁজিতে মালতী একেবারে উঠিয়া বসে।

রাগ করেছ কেন? তুমি তো জানো তুমি যা চাইবে তাই হবে, আমি কথাটি বলব না। সত্যি বলছি, বিয়ের কথা আর মনেও আনব না। এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম একলাটি ঘরে বসে। তুমি যখন ওসব অনুষ্ঠান পছন্দ কর না, আমার কাজ নেই বাবা বিয়ে ফিয়েতে। কিন্তু, মালতীর গলায় করুণ মিনতির সুর ফুটিয়া উঠিল, আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে। বলো রাখবে?

কি কথা মালতী?

এক রাত্রির জন্ত রুম নিয়ে নয়, চলো আমরা কোথাও চলে যাই দু'জনে, মাস তিনেকের জন্তে। অন্ততঃ দু'মাস। কিছুদিন এক সঙ্গে এক বাড়াতেই যদি না রইলাম—

আজ রাত্রিকে বাতিল করার সমর্থনে এই জোরালো যুক্তি মালতী আবিষ্কার করিয়াছে। আরম্ভ হওয়ার আগেই কাব্য প্রেম স্বপ্ন আর কল্পনা শুধু মনের উদ্বেগ আর দেহের অস্থিরতায় যে পরিণত হইয়া গেল তার তো একটা কারণ থাকা চাই? সে কারণটি এই। একটি বিচ্ছিন্ন রাত্রির অসম্পূর্ণ ভাঙ্গা প্রেম তার ভাল লাগিবে না। কাল সকালে ছেদ পড়িবে ভাবিয়া রাত্রিকে সে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, শুধু এই কারণে দেহমন তার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারকে সে ভালবাসে বৈ কি?

রাজকুমার নীরবে একটু হাসিল। ভাবিল, মালতী তার অর্থহীন হাসির যা খুসী মানে করুক, কিছু আসিয়া যায় না। মালতীর সঙ্গে বুঝাপড়ারও কোন প্রয়োজন নাই। মালতী একদিন নিজেই বুঝিতে পারিবে। মালতীর পক্ষে সেভাবে সব বুঝিতে পারাই ভাল।

পরদিন ছুটি ছিল, সকালে কয়েকটি বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিল। রাজকুমার বেকার, তার ছুটিও নাই। একটু সে ঈর্ষা বোধ করিল, বন্ধুদের জীবনে কাজের দিনগুলির মধ্যে ছুটির দিন সত্যসত্যই অনেকখান পৃথক্‌ হইয়া আসে বলিয়া। অনেক বেলায় সরসীও আসিয়া হাজির। যত বড় বড় ঘটনাই ঘটুক সরসীর জীবনে, কোনদিন তার মনে কিছু ঘটে না, কোনদিন সে বদলায় না, চিরদিন সে একরকম থাকিয়া গেল। আজও তার প্রকাণ্ড একটা মিটিং আছে। রাজকুমার যেন নিশ্চয় যায়। একটু প্রস্তুত হইয়াই যেন যায়, কিছু বলিতে হইবে।

সেদিনের মত কেলেঙ্কারি কোরো না।

কেলেঙ্কারি করেছিলাম নাকি সেদিন?

প্রায়। শেষটা সামলে গেলে তাই রক্ষা। ঘরোয়া মিটিং ছিল বলে সামলে নেবার সুযোগ পেলে, পাবলিক মিটিং হলে আগেই লোকে হাসতে আরম্ভ করত।

তা হইবে। সেদিন মস্ত একটা বাহাদুরী করিয়াছে এ ধারণাটা এতদিন বজায় রাখিতে না দিয়া আগে সরসী এ খবরটা দিলে ভাল হইত।

রিণির কি হয়েছে জানো? সরসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল।

কি হয়েছে?

আমি তো তাই জিজ্ঞেস করছি। বাড়ী থেকে নাকি বার হয় না, কারো সঙ্গে দেখা করে না। পরশু গিয়েছিলাম, দরজা বন্ধ করে ঘরে কি যেন করছিল, দরজা খুলল না, ভেতর থেকেই আমায় বসতে বলল। বসে আছি তো বসেই আছি, দরজা আর খোলে না। দু'বার ডাকলাম, সাড়াও দিলে না। শেষে আমি যখন ডেকে বললাম, আমার কাজ আছে আমি চললাম, একটা যাচ্ছেতাই জবাব দিলে।

কি বললে?

সে আমি উচ্চারণ করতে পারব না।

আমার সম্বন্ধে কোন কথা?

না। তোমার সম্বন্ধে কি কথা বলবে? একটা বিশ্রী ফাজলামি করলে, একেবারে ইতরামি যাকে বলে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া, কালীর সঙ্গে একটু ভাব জমানোর চেষ্টা করিয়া সরসী চলিয়া গেল। সরসীকে কালী পছন্দ করে না, রাজকুমারের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে দেখিলেই তার মুখ কালো হইয়া যায়। এক মিনিটের বেশী কাছে

থাকিতে পারে না কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার কাছে আসে। সরসী আর রাজকুমারের মুখের দিকে তাকায়, ঠোঁট কামড়ায়, হঠাৎ একটা খাপছাড়া কথা বলে, দুপদাপ পা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

সেদিন মনোরমার তিরস্কারের পর কালী কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। মনোরমা যতটুকু সাজাইয়া দেয় তার উপর সে নিজে নিজে আরেকটু বেশী করিয়া সাজ করে। গায়ে একটু বেশী সাবান ঘষে, মুখে একটু বেশী ক্রীম মাখে, একটু বেশী দামের কাপড় পরে।

সরসী চলিয়া যাওয়ামাত্র সে বলিল, এই মেয়েটা এলে আপনি পৃথিবী ভুলে যান।

এই মেয়েটা আবার কে কালী?

যার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করলেন—আপনার সরসী?

ওকে তুমি সরসীদি বলবে।

আমার বয়ে গেছে ওকে দিদি বলতে।

মুখ উঁচু করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া সিধা হইয়া কালী মূর্তিমতী বিদ্রোহের মত দাঁড়াইয়া থাকে, তার চোখ দুটি কেবল জলে বোঝাই হইয়া যায়। রাজকুমার অন্যমনে রিণির কথা ভাবিতেছিল, অবাক হইয়া সে কালীর দিকে চাহিয়া থাকে। এতটুকু মেয়ের মধ্যে ভাবাবেগের এই তীব্রতা সে হঠাৎ ঠিকমত ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না।

কি উদ্দেশ্যে এবং কেন কিছু না ভাবিয়াই, সম্ভবতঃ আহত সকাতর শিশুকে আদর করার স্বাভাবিক প্রেরণার বশে, কালীর দিকে সে হাত বাড়াইয়া দেয়। কালীর নাগাল কিন্তু সে পায় না, দু'হাতে তাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া কালী ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

সমস্ত দুপুর রাজকুমার বিষণ্ণ হইয়া থাকে। বাহিরে কড়া রোদ, ঘরে উজ্জ্বল আলো, রাজকুমারের মনে যেন সন্ধ্যার ছায়া, আমাবস্যা রাত্রির ছদ্মবেশী আগামী অন্ধকার। একটা কষ্ট বোধও যেন সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রাত্রি জাগরণের পর যেমন হয়। রাত্রে সে তো কাল ঘুমাইয়াছিল, সমস্ত রাত ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে?

বিকালে রাজকুমার রিণিদের বাড়ী গেল।

দারোয়ানের কাছে খবর পাওয়া গেল স্যর কে, এল, বাড়ীতেই আছেন, সারাদিন একবারও তিনি বাহিরে যান নাই। রিণির অসুখ, দু'বার ডাক্তার আসিয়াছিল।

অসুখ? নীচের হলে গিয়া দাঁড়াইতে রিণির ভাঙা ভাঙা গানের সুর রাজকুমারের কাণে ভাসিয়া আসে। তারপর হঠাৎ এত জোরে সে বাড়ীর দাসীকে ডাক দেয় যে তার সেই শেষ পর্দায় তোলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন ঘরের দেয়ালে, ঘরের বাতাসে, রাজকুমারের গায়ে আঁচড় কাটিয়া যায়। ডাক্তারকে দু'বার আসিতে হইয়াছিল রিণির এমন অসুখ! আগাগোড়া সবটাই কি রিণির তামাসা? কেবল তার সঙ্গে নয়, বাড়ীর লোকের সঙ্গেও সে কি খেলা করিতেছে—তার বিকারগ্রস্ত মনের কোন এক আকস্মিক ও দুর্বোধ্য প্রেরণার বশে?

ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া রিণিকে দেখিবামাত্র এ সন্দেহ তার মিটিয়া গেল। রিণির সত্যই অসুখ করিয়াছে। তার চুল এলোমেলো, আঁচল লুটাইতেছে মেঝেতে, মুখে ও চোখে একশ' পাঁচ ডিগ্রী জ্বরের লক্ষণ। অথচ শুইয়া থাকার বদলে সে অস্থির ভাবে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে। এক পাশে চেয়ারে মরার মত হেলান দিয়া বসিয়া স্যর কে, এল হতাশভাবে তার দিকে চাহিয়া আছেন।

রাজকুমারকে দেখিয়াও রিণি যেন দেখিতে পাইল না। কেবল স্যর কে, এল হঠাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া রাজকুমারের সামনে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইলেন, রাজকুমারকে কিছু যেন বলিবেন। তারপর একটি কথাও না বলিয়া নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন।

ছোট বুকসেল্‌ফটির কাছে গিয়া একটি একটি করিয়া বই বাছিয়া মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে রিণি গুনগুনানো সুর ভাঁজিতে লাগিল।

রিণি!

কে? অ! রিণি একটু হাসিল, বোসো না? বইগুলো একটু বেছে রাখছি—যত বাজে বই গাদা হয়েছে।

তোমার কি হয়েছে? জর?

কিছু হয় নি তো।

রাজকুমার বসিল। বই থাক রিণি। এখানে এসে বোস।

রিণি চোখের পলকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—ভাখো, হুকুম কোরো না বলছি। একশোবার বলিনি তোমায়, আমার সঙ্গে নরম সুরে কথা কইবে? তোমরা সবাই আমায় নিয়ে মজা করো জানি, তা করো গিয়ে যা খুসী, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ভদ্রভাবে করবে—রেসপেক্টফুলি।—উঁ? তাই বটে, ভুলে গিয়েছিলাম। কি যেন বললে তুমি?

রাজকুমার অত্যন্ত নরম সুরে বলিল, বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রিণি আসিয়া পাশে বসিবার পরেও রাজকুমার তার দিকে চাহিয়া থাকে, কোন্ অনুভূতি হৃদয়ে আলোড়ন তুলিয়াছে বুঝিতে পারে না। কাছে আসিবার পর এখন রিণির চোখ দেখিয়া সে যেন বুঝিতে পারে তার কি হইয়াছে। রিণির চাহনি স্পষ্ট ভাবেই তার কাছে সব ঘোষণা করিয়া দেয়, কিন্তু মনে মনে রাজকুমার প্রাণপণে সে সংবাদকে অস্বীকার করে। তার মনে হয়, রিণির সম্বন্ধে এই ভয়ঙ্কর সত্যকে স্বীকার করিলে তার নিজের মাথাও যেন খারাপ হইয়া যাইবে।

রিণি ব্লাউজের বোতাম লাগায় নাই, লুটানো কাপড় তুলিয়া রাজকুমার তার গায়ে জড়াইয়া দিল। রিণির সঙ্গে এখন কথা বলা না বলা সমান, কোন বিষয়েই তার সঙ্গে আলোচনা করার আর অর্থ হয় না। তবু তাকে বলিতে

হইবে। রিণি সুস্থ আর স্বাভাবিক অবস্থাতে আছে ধরিয়া লইয়াই তার সঙ্গে তাকে আলাপ করিতে লইবে। নতুবা নিজে সে অসুস্থ হইয়া পড়িবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

তোমার বাবাকে ওসব বলতে গেলে কেন রিণি?

রিণির মুখের বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।—বাবাকে? কি বলেছি বাবাকে?

আমার সম্বন্ধে?

তোমার সম্বন্ধে? কই না, কিছুই তো বলিনি বাবাকে তোমার সম্বন্ধে? বাবার সঙ্গে আমি কথাই বলি না যে!

পলকহীন দৃষ্টিতে রিণি রাজকুমারের চোখের দিকে সোজা তাকাইয়া থাকে, তার মুখের ভাবের সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটে না। তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠে ক্রোধের অভিব্যক্তি।

দাঁড়াও ডাকছি বাবাকে।

রাজকুমার ব্যস্ত হইয়া বলে, থাক্, রিণি, থাক্। বারণ কাণে না তুলিয়া সিঁড়ির মাথা পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া রিণি স্যর কে, এলকে ডাকিতে থাকে, বাবা? বাবা? ড্যাডি? ড্যাডি?

স্যর কে, এল উপরে আসিতেই হাত ধরিয়া তাকে সে টানিয়া আনে রাজকুমারের সামনে, কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে, রাজুদার নামে তোমায় আমি কি বলেছি বাবা?

স্যর কে, এল শান্ত কণ্ঠে বলেন, কই না, কিছুই তো বলনি তুমি?

বলেছি। রাজুদা আমার বেষ্ট ফ্রেণ্ড, তাই বলেছি। নিন্দে করে কিছু বলিনি। বলেছি বাবা?

না। বল নি।

নিশ্চিত হইয়া রাজকুমারের পাশে বসিয়া রিণি গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া। বিড় বিড় করিয়া আরও কত কি সে বলিতে লাগিল বুঝা গেল না। একটু অপেক্ষা করিয়া স্যর কে, এল চলিয়া গেলেন।

রাজকুমার বলিল, একটু শুয়ে থাকবে রিণি?

রিণি উদাস ভাবে বলিল, তুমি বললে শুতে পারি।

তোমার শরীর ভাল নেই, শুয়েই থাক। আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

তুমি আর আসবে না।

আসব, নিশ্চয় আসব।

বিনা দ্বিধায় রাজকুমার তাকে শিশুর মত দু'হাতে বুকে তুলিয়া বিছানায় লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল। তার অনেক দিনের লিপষ্টিক ঘষা ঠোঁটে আজ শুকনো রক্ত মাখা হইয়া আছে। সন্তর্পণে সেখানে চুম্বন করিয়া সে নীরবে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে স্যর কে, এল টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিয়াছিলেন, টেবিলে তার মাথার একদিকে একটি আধ খালি মদের বোতল অন্যদিকে শূন্য একটি গেলাস। রাজকুমারের সাড়া পাইয়া মুখ তুলিলেন।

নার্ভাস ব্রেক ডাউন? রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

স্যর কে, এল মাথা নাড়িলেন।—ইনস্যানিটি।

ডাক্তার কি বললেন?

এখন আর ওর বেশী কি বলবেন? সারতেও পারে, নাও সারতে পারে। ভাল রকম এগজামিনের পরে হয়তো জানা যাবে।

পরস্পরের মাথার পাশ দিয়া পিছনের দেয়ালে চোখ পাতিয়া দুজনে অনেকক্ষণ নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

তারপর স্যর কে, এল ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার আলমারি খুলে বোতল নিয়ে কদিন নাকি খুব ড্রিঙ্ক করছিল। কিছু টের পাইনি। ডাক্তার সন্দেহ করছেন খুব ধীরে ধীরে ইনস্যানিটি আসছিল, অতিরিক্ত ড্রিঙ্ক করার ফলে দু'চার দিনের মধ্যে এটা হয়েছে। রিণি ড্রিঙ্ক করত নাকি জানো?

কদাচিৎ কখনো একটু চুমুক দিয়ে থাকতে পারে, সে কিছু নয়।

স্যর কে, এল-এর মাথা নীচে নামিতে নামিতে প্রায় গেলাসে ঠেকিয়া গিয়াছিল তেমনি ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নামে রিণি যা বলেছিল রাজু?

সব কল্পনা।

তোমায় নিয়ে কেন?

তা জানি না।

আবার দুজনে নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

রিণির জন্য সকলের গভীর সহানুভূতি জাগিয়াছে। খবর শুনিয়া মালতী তো একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিল। রিণিকে কে পছন্দ করিত না এখন আর জানিবার উপায় নাই। একেবারে পাগল হইয়া রিণি শত্রু মিত্র সকলের জীবনে বিষাদের ছায়াপাত করিয়া ছাড়িয়াছে। দুঃখবোধ অনেকের আরও আন্তরিক হইয়াছে এইজন্য যে তাদের কেবলই মনে হইয়াছে,সকলের মন টানিবার জন্য রিণি যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে পাগল করিয়াছে। অহঙ্কারী আত্ম-সচেতন রিণিকে আর কেউ মনে রাখে না, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন শুধু মনে পড়ে কি তীব্র অভিমান ছিল মেয়েটার, আঘাত গ্রহণের অনুভূতি তার চড়া সুরে বাঁধা সরু তারের মত মৃদু একটু ছোঁয়াচেও কি ভাবে সাড়া দিত।

সরসী অত্যন্ত বিচলিতভাবে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করে, ও কেন পাগল হয়ে গেল রাজু?

রাজকুমার নির্ব্বোধের মত পুনরাবৃত্তি করে, কেন পাগল হয়ে গেল?

সরসী তখন নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, না, তুমিই বা জানবে কি করে।

রাজকুমার নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসে।

—কিছুদিন আগে হলে তোমার প্রশ্নের জবাবে কি বলতাম জান সরসী? বলতাম, রিণি কেন পাগল হয়েছে জানি, আমার জন্য!

তোমার জন্য?

আগে হলে তাই ভাবতাম। ওরকম ভাবার যুক্তি কি কম আছে আমার! তুমি সব জান না, জানলে তোমারও তাই বিশ্বাস হত।

সরসী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রাজকুমার অপেক্ষা করে, অনেকক্ষণ। সরসী কিন্তু মুখ খোলে না।

কি সব জান না, জানতে চাইলে না সরসী?

না।

বললে শুনবে না?

শুনব।

মালতীকে আমি পছন্দ করি ভেবে মালতীকে রিণি ইতিপূর্ব্বে দু'চোখে দেখতে পারত না। একদিন নিজে থেকে যেচে আমার দিকে প্রত্যাশা করে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাথা খারাপ হবার গোড়াতে স্যার কে, এল, এর কাছে আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব কথা বলেছিল যে, পরদিন তিনি আমায় ডেকে কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন, কেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করব না। এখন রিণি পাগল হয়ে গেছে, কারো কথা শোনে না, আমি যা বলি তাই মেনে নেয়। শুধু তাই নয়, অন্য সময় পাগলামি করে, আমি যতক্ষণ কাছে থাকি শান্ত হয়ে থাকে। আমার জন্যে যে ও পাগল হয়েছে তার আর কত প্রমাণ চাও?

তোমার জন্য পাগল হওয়ার প্রমাণ ওগুলি নয় রাজু। শ্রদ্ধা ভয় বিশ্বাসের প্রমাণ, হয়তো ভালবাসারও প্রমাণ।

হয়তো কেন?

ভালবাসার কোন ধরা-বাঁধা লক্ষণ নেই রাজু।

রাজকুমার কৃতজ্ঞতা জানানোর মত ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য্য মেয়ে সরসী। আমার বিবরণ শুনে অন্য কোন মেয়ের এতটুকু সন্দেহ থাকত না রিণি আমায় ভালবাসত আর মাথাটা ওর খারাপ হওয়ার কারণও তাই।

রিণি তোমায় ভালবাসত কিনা জানি না রাজু, তবে সেজন্য ও যে পাগল হয়নি তা জানি। একপক্ষের ভালবাসা কাউকে পাগল করে দিতে পারে না, যতই ভালবাসুক। রিণির পাগল হওয়ার অন্য কারণ ছিল। তোমায় যদি রিণি ভালবেসে থাকে, মনে জোরালো ঘা খেয়ে থাকে, অন্য কারণগুলিকে সেটা একটু সাহায্য করে থাকতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। তোমার মত সাইকলজির জ্ঞান নেই, তবে এটা আমি জোর করে বলতে পারি। ডাক্তারও তো বলেছেন, ধীরে ধীরে ইনস্যানিটি আসছিল। তোমার দায়িত্ব কিসের? তুমি কেন নিজেকে দোষী ভেবে মন খারাপ করছ? তার কোন মানে হয় না।

ধীরে ধীরে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সরসী শেষের দিকে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। আবেগ ও উত্তেজনা চিরদিন সরসীর চোখে মুখে অভিনব রূপান্তর আনিয়া দেয় এবং এই রূপান্তর তার ঘটে এত কদাচিৎ যে, আগে কয়েকবার চোখে পড়িয়া থাকিলেও রাজকুমারের মনে হয় হঠাৎ সরসীকে ঘিরিয়া যেন অপরিচয়ের রহস্য নামিয়া আসিয়াছে।

আমি তো বললাম তোমায়, আমি জানি রিণি আমার জন্য পাগল হয় নি।

তবে তুমি এমন করছ কেন?

সরসীর প্রশ্নে রাজকুমার আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কেমন করছি?

একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়েছ তুমি। মুখ দেখে টের পাওয়া যায় ভয়ানক একটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছ। সবাই বলাবলি করছে এই নিয়ে। তোমার কাছে এ দুর্ব্বলতা আশা করিনি রাজু।

সত্যি কথা শুনবে সরসী? আমার মন ভেঙ্গে গেছে।

কেন?

কেন তোমায় কি করে বুঝিয়ে বলব। আমি নিজেই ভাল করে বুঝতে পারি না। কেবল মনে হয় আমার জীবনের কোন সম্ভাবনা নেই, সার্থকতা নেই, আমি একটা ফাঁকি দাঁড়িয়ে গেছি। চিরদিন যেন ভাঙ্গা-চোরা মানুষ ছিলাম মনে হয়, এখানে ওখানে সিমেণ্ট করে বেঁধে ছেঁদে আস্ত মানুষের অভিনয় করছিলাম, এতদিনে ভেঙ্গে পড়েছি। চব্বিশ ঘণ্টা নিজের কাছে লজ্জা বোধ করছি সরসী।

সরসী অস্ফুটস্বরে কাতরভাবে বলে, আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে পার না রাজু? আমি যে কিছুই বুঝতে পারলাম না। অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলো।

রাজকুমার অনেকক্ষণ ভাবে। তার চোখ দেখিয়া সরসীর মনে হয়, মনের অন্ধকারে সে নিজের পরিচয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। চোখে তার আলোর এত অভাব সরসী কোনদিন দেখে নাই, এ যেন মুমূর্ষুর চোখ। সরসী শিহরিয়া উঠে। হাতের মুঠি সে সজোরে চাপিয়া ধরে ঠোঁটে, চোখ তার জলে ভরিয়া যায়। রাজকুমার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে প্রথম দিকের কথাগুলি সে শুনিতে পায় না।

রাজকুমার বলে, ঘুরিয়ে বলেও বোঝাতে পারব না সরসী। যদি বলি, ভেতর থেকে জুড়িয়ে যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি, ঠিক বলা হবে না। যদি বলি, বহুকাল থেকে আমি যেন ধীরে ধীরে স্যুইসাইড করে আসছি, তাও ঠিক বলা হবে না। আমার এই কথাগুলি কি ভাবে নিতে হবে জানো? গন্ধ বোঝাবার জন্য তোমায় যেন ফুল দেখাচ্ছি।

কি ভাব তুমি? মোটা কথায় তাই আমাকে বলো।

কি ভাবি? ভাবি যে আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কেন।

কারো সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সঙ্কীর্ণ জীবন, তারও কয়েকজনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার, বন্ধুত্বের, ঘৃণা বিদ্বেষের সম্পর্ক। কারো সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কি যেন বিকার আমার মধ্যে আছে সরসী, আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে আমি সেখানে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারি না। আমার যেন সব খাপছাড়া, উদ্ভট। নারী দেখব বলে আমি গিরির সঙ্গে কেলেঙ্কারি করি, শুধু খেয়ালের বশে রিণি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমার কাছে সেটা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সৌন্দর্য্যর বদলে মেয়েদের দেহে আমি খুঁজি আমার থিয়োরীর সমর্থন। আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল। বুঝতে পার না সরসী তোমাদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগটা কিরকম ? তুমি কখনো আমার বিচার কর না, শুধু আমায় বুঝবার চেষ্টা কর, তোমার সঙ্গে তাই প্রাণ খুলে কথা বলি। শুধু ওইটুকু সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার। আমার সঙ্গে শুধু আমার কথা তুমি বলবে, তোমার যেন আর কাজ নেই। তোমার সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহল কোনদিন দেখেছ আমার ? তোমার সুখ দুঃখের ভাগ নেবার আগ্রহ দেখেছ কখনো ? আমার প্রয়োজনে আমার জন্য তুমি একদিন আশ্চর্য্য সাহস আর উদারতা দেখালে তাই জানতে পারলাম তোমার দেহ মন কত সুন্দর। কিন্তু কৃতজ্ঞতা কই আমার ?

কৃতজ্ঞতা চাইনি রাজু।

তুমি না চাও, আমার তো স্বাভাবিক নিয়মে কৃতজ্ঞতা বোধ করা উচিত ছিল ? ওটা যেন আমার প্রাপ্য বলে ধরে নিয়েছি। তাহলেই ছাখো, তুমি যে আমার কাছে এসেছ, সেটা শুধু বিনা বিচারে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে আমাকে তোমার গ্রহণ করার চেষ্টার পথে, অন্তরঙ্গতার পথে নয়। অন্য কেউ হলে আপনা থেকে তোমাকে বুঝবার চেষ্টা করত, পরস্পরের জানাবোঝার চেষ্টায় সৃষ্টি হত সুন্দর স্বাভাবিক বন্ধুত্ব। আমার সেটা কোনদিন খেয়াল পর্য্যন্ত হয় নি।

তুমি আমায় কখনো উপেক্ষা করনি রাজু।

কেন করব ? আয়নাকে কেউ উপেক্ষা করে না।

সরসী নতমুখে নিজের আঙুলের খেলা দেখিতে থাকে। আঁচলের প্রান্ত নয়, কোলের কাছে জড়ো করা কাপড়ের খানিকটা পাকাইয়া কখন সে যেন আঙুলে জড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাগ করলে সরসী ? স্পষ্ট করে বললাম বলে ?

সরসী মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। রাগ করেছিলাম। তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে আর রাগ নেই। রাগ করি আর নাই করি তুমি স্পষ্ট করেই বলো—যত স্পষ্ট করে পার। রাজকুমার বলে, তোমার কথা আর বলব না। এবার মালতীর কথা বলি। মালতীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে জানো ? শ্রদ্ধাকে ভালবাসা মনে করার সম্পর্ক। সোজাসুজি ভালবাসলে হয়তো ওকে কাছে আসতে দিতাম না, ভুলেই থাকতাম মালতী বলে একটা মেয়ে এ জগতে আছে। কিন্তু ভিত্তিটা যখন ভুলের, দু'দিন পরে ভুল ভেঙে যাবে যখন জানি, জটিল একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হতে দিতে আমার বাঁকা মনের আপত্তি হবে কেন ? তারপর ধর রিণি—

সরসী চেয়ারে পিছনে হেলান দিয়াছিল, সোজা হইয়া বসে। বুঝা যায় মালতীর চেয়ে রিণির কথা শুনতেই তার আগ্রহ বেশী।

রিণি যতদিন সুস্থ ছিল, আমার সঙ্গে বনত না। আমি কাছে গেলেই যেন কঠিন হয়ে যেত ! পাগল হয়ে এখন রিণি সকলকে ত্যাগ করে আমায় আশ্রয় করেছে, আমি ছাড়া ওর যেন কেউ নেই। আগে ওকে আমার পছন্দ হত না, এখন ওর জন্য আমার মন কাঁদে। বিশ্বাস করতে পার সরসী ? এমন সৃষ্টিছাড়া কথা শুনেছ কোনদিন ? সাধারণ রিণির সঙ্গে নয়, পাগল রিণির সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

সরসী বলে, সৃষ্টিছাড়া কথা বলছ কেন ? পাগল হয়েছে বলেই তো রিণির জন্য তোমার মমতা জাগা স্বাভাবিক।

রাজকুমার বলে, আমার নয় মমতা জাগল। কিন্তু রিণি ? আমি এমন খাপছাড়া মানুষ যে পাগল হয়ে তবে রিণি আমায় সইতে পারল ! চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর কথা বলে না ? রিণি আমায় তাই দেখিয়েছে সরসী। সুস্থ মনে আমায় বন্ধু বলেও গ্রহণ করতে পারে নি, বিকারে শুধু আমায় চিনেছে।

সরসী কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলে, তাও যদি হয়, কথাটা তুমি ওভাবে নিচ্ছ কেন ? খাপছাড়া হওয়াটা সব সময় নিন্দনীয় হয় না রাজু। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চিন্তাশীল প্রতিভাবান মানুষের খাপ না খাওয়াটাই বেশী স্বাভাবিক। সুস্থ অবস্থায় রিণি হয়তো তোমার নাগাল পেত না, তোমার ব্যক্তিত্ব ওকে পীড়ন করত, তাই ও তোমায় সহ্য করতে পারত না। পাগল হয়ে এখন আর ওসব অনুভূতি নেই, তোমায় তাই ওর ভাল লাগে, বিনা বাধায় তোমায় শ্রদ্ধা করতে পারে।

রাজকুমার ম্লানভাবে একটু হাসে। বলে, চিন্তাহীন প্রতিভাবান মানুষ। চিন্তাগ্রস্ত নিউরোটিক মানুষ বললে লাগসই হত সরসী ! যত চেষ্টাই কর, আমার ট্র্যাজেডিকে আমার মহাপুরুষত্বের প্রমাণ বলে দাঁড় করাতে পারবে না, সরসী। নিজেকে আমি কিছু কিছু চিনতে পারছি।

সরসীর মধ্যে হঠাৎ উত্তেজনা দেখা দেয়, রাজকুমারের বাহুমূল চাপিয়া ধরিয়া সে বলে, পারছ ? তাই হবে রাজু। তাই হওয়া সম্ভব। নিজেকে জানবার বুঝবার চেষ্টা আরম্ভ করে তুমি দিশেহারা হয়ে গেছ। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তোমার কি হয়েছে !

সমুদ্রের সঙ্কেতে প্রতিবছর রাজকুমারের সালতামামী হয় ! দূরের সমুদ্র সহরে তার কাছে আসে। জীবনের কয়েকটা

দিন ভরিয়া থাকে ভিজা স্পর্শ, আঁসটে গন্ধ আর বালিয়াড়ির স্বপ্ন। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হয়, দীর্ঘকায়া চম্পকবর্ণা এক নারী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মাঠ বন নদী গ্রাম নগর পার হইয়া আগাইয়া আসিতেছে, শ্রোণীভারে থম থম করিতেছে তার গগনচুম্বী রসটম্বুর দেহে স্তম্ভিত ছন্দের ঢেউ, কটিতটে সৃষ্টি হইয়াছে নূতন দিগন্তের বঙ্কিম রেখা, মুখ ফিরিয়া খেলা করিতেছে নিশ্বাসে আলোড়িত মেঘ। মনে হয়, আসিতেছে।

পাড়ার একটি ছেলে প্রায় প্রতি রাত্রে বাঁশী বাজায়, রাজকুমার শুধু শুনিতে পায় এই কয়েকটা দিন। একতলার রোয়াকে আর দোতলার বারান্দায় আস্ত ভাঙা কয়েকটি টবের ফুলগুলি চোখে পড়ে, খেয়াল হয় যে পাতার রঙ সত্যই সবুজ। তবু সে বিশ্বাস করে না, মানিতে চায় না যে প্রত্যেক জীবনে আশীর্ব্বাদ থাকিবেই, আশীর্ব্বাদ কখনো ধ্বংস হয় না। নিজেকে সে ধমক দিয়া বলে, আমি অভিশপ্ত। বলে আর তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেয় সালতামামীর সঙ্কেত ও নববর্ষের প্রেরণা।

ভাবিয়া রাখে, ঘনিষ্ঠভাবে কারো সংস্পর্শে সে আর আসিবে না, কারো জীবনে তার অভিশাপের ছায়া পড়িতে দিবে না। ভগবান জানেন তাকে কেন ওরা শ্রদ্ধা করে, তার প্রভাব ওদের জীবনে কাজ করে কেন। কিন্তু আর নয়। তার সঙ্গে মেলামেশা সহজ ও সহনীয় করিতে ওদের যখন বিকার আনিতে হয় নিজেদের মধ্যে, তার কাজ নাই মেলামেশায়। অন্য কারো সঙ্গে নয়, কালী মালতী আর সরসীর সঙ্গেও নয়।

মনোরমাকে সে বলে, কালীকে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দাও দিদি।

খোকা পাশে ঘুমাইয়া আছে, মনোরমার কোন অবলম্বন নাই। মাথা নীচু করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদুকণ্ঠে সে বলে, গোড়াতেই কেন বললে না রাজুভাই? একটা কাঁচা মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে মজা লাগছিল? বিয়ের যুগ্যি কনের জন্য একটা বর গাঁথতে তার মতলববাজ দিদি কেমন করে ফাঁদ পাতে সেই রগড় দেখছিলে?

না, দিদি। গোড়া থেকে কালীকে আমার ভাল লেগেছিল।

মুখ তুলিয়া সাগ্রহে মনোরমা বলে, তবে?

রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আগ্রহ তার আপনা হইতে ঝিমাইয়া যায়। আবার মুখ নীচু করিয়া খোকার বালিশ হইতে একটি পিঁপড়ে ঝাড়িয়া ফেলে, ধীরে ধীরে মেঝেতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলে, তোমার দোষ নেই রাজুভাই, আমারি বোকামি হয়েছে। নিজের ইচ্ছেটাই আমি বড় করে দেখছিলাম। যদি বলি কালীর বিয়ের ভাবনা আমাদের ছিল না, বিশ্বাস করবে রাজু ভাই? তুমি তো দেখে এসেছো, ওর বাবার অবস্থা খারাপ নয়। মেয়েটাকে সস্তায় তোমার ঘাড়ে চাপানো যাবে বলে চেষ্টা করিনি ভাই।

তা জানি দিদি। ওকথা আমার মনেও আসেনি।

ওর বয়সে আমিও ওর মত হাবাগোবা মেয়ে ছিলাম রাজুভাই।

কালী হাবাগোবা মেয়ে নয় দিদি। বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, পাকামি নেই বলে হাবাগোবা মনে হয়।

মনোরমা যেন শুনিয়াও শোনোনা আপন মনে বলিতে থাকে, এমন ঝোঁক আমার কেন চাপল কে জানে! দিনরাত কেবল মনে হত, তোমার সঙ্গে ভাব হবে, বিয়ে হবে, কালীর জীবন সার্থক হবে, আমারও সুখের সীমা থাকবে না। মস্ত একটা ভার যেন নেমে যাবে মনে হত।

মনোরমাকে দেখিলে চমক লাগিয়া যায়। বিষাদ ও হতাশার যন্ত্রণায় মুখ যেন তার কালো হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। কালীর বদলে তাকেই যেন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে রাজকুমার, বুক তার ভাঙিয়া গিয়াছে, হাড়-পাঁজর সমেত। মমতা বোধ করার বদলে তাকে রাজকুমারের আঘাত করিতে ইচ্ছা হয়। তার সংস্পর্শে আসিয়া তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে কালীর কিশোর মনে বিকার আসিতেছে ভাবিয়া সে দুঃখ পাইতেছিল, কালীর মধ্যস্থতায় নিজের মনের আবছায়া গোপনতার অন্তরালবর্ত্তিনী মনোরমা তার সঙ্গে কি অদ্ভুত যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়াছে ছাখো।

কালীর আবির্ভাবের আগের ও পরের মনোরমার অনেক তুচ্ছ কথা, ভঙ্গি, ভাব ও চাহনি, অনেক ছোট বড় পরিবর্ত্তন, রাজকুমারের মনে পড়িতে থাকে। মনে পড়িতে থাকে, শেষের দিকে তার সমাদর ও অবহেলায় কালীর মুখে যে আনন্দ ও বিষাদের আবির্ভাব ঘটিত, কতবার মনোরমার মুখে তার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছে। কালীর চেয়েও মনোরমার প্রত্যাশা ও উৎকণ্ঠা মনে হইয়াছে গভীর।

মনোরমা মরার মত বলে, আমি ভাবছি ও ছুঁড়ি না সারাটা জীবন জ্বলে পুড়ে মরে। আমি কি করলাম রাজুভাই?

মনোরমা পর্য্যন্ত বিকারের অর্ঘ্য দিয়া নিজের জীবনে তাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে, এ জ্বালা রাজকুমার ভুলিতে পারিতেছিল না। অশ্রুজলের ইতিহাস হয়তো আছে, নিপীড়িত বন্দী-মনের স্বপ্ন-পিপাসা হয়তো প্রেরণা দিয়াছে, তবু রাজকুমার মনোরমাকে ক্ষমা করিতে পারে না, নিষ্ঠুরভাবে ধমক দিয়া বলে, কি বকছ পাগলের মত? কালী তোমার মত কাব্য জানে না দিদি। দিব্যি হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দেবে, তোমার ভয় নেই।

মনোরমা বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া থাকে। রাজকুমার আঘাত করিলেও সে বুঝি এতখানি আহত হইত না। দুদিন পরে নিজেই সে কালীকে তার মার কাছে রাখিয়া আসিতে যায়। আর ফিরিয়া আসে না। মাসকাবারে তার স্বামী

বাসা তুলিয়া দিয়া সাময়িকভাবে আশ্রয় নেয় বোর্ডিং-এ।

রাজকুমার বুঝিতে পারে যে সোজাসুজি তার বাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে উঠিয়া যাইতে মনোরমা সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে। বোর্ডিং-এর ভাত খাইয়া স্বামী তার রোগা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া দু'এক মাস পরেই মনোরমা সহরে অন্য বাড়ীতে নীড় বাঁধিবে। হয়তো কালীর শুভবিবাহের পর। ইতিমধ্যে যদি কালীর বিবাহ না-ও হয়, কয়েক মাসের মধ্যে হইবে সন্দেহ নাই। মনোরমা তখন একদিন এবাড়ীতে আসিবে, কালীর বিবাহে তাকে নিমন্ত্রণ করিতে।

আঘাত করিতে আসিয়া মনোরমার চোখ যদি সেদিন হঠাৎ ছল ছল করিয়া ওঠে? বিষাদ ও হতাশায় আবার যদি মুখখানা তার কালো আর বাঁকা হইয়া যায়? রোমাঞ্চকর বিষাদের অনুভূতিতে রাজকুমারের সর্বাঙ্গে শিহরণ বহিয়া যায়।

মালতীর সঙ্গে তার প্রায় দেখাই হয় না। মালতীও সাড়া শব্দ দেয় না। সরসীর কাছে রাজকুমার তার খবর পায়। আপনা হইতে সব ঠিক হইয়া যাইবে জানিলেও মালতীর সম্বন্ধে রাজকুমারের ভাবনা ছিল। আপনা হইতে সব ঠিক হইয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটি তো সহজ বা সংক্ষিপ্ত হইবে না মালতীর পক্ষে, কষ্টকর দীর্ঘ মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে তাকে কতদিন কাটাইতে হইবে কে জানে? তার সাহায্য পাইলে এই দুঃখের দিনগুলি হয়তো মালতীর আরেকটু সহনীয় হইত কিন্তু সে সাহস আর রাজকুমারের নাই। নিজের সম্বন্ধে তার একটা আতঙ্ক জন্মিয়া গিয়াছে। কয়েকটা দিন অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়া একদিন সে সরসীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিল। অকপটে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া প্রায় করুণ সুরে প্রশ্ন করিয়াছিল, কি করি বল তো সরসী?

সরসী বলিয়াছিল, তোমার কিছু করতে হবে না। আমি সব ঠিক করে নেব।

রাজকুমার চিন্তিতভাবে বলিয়াছিল, সেটা কি ঠিক হবে সরসী? যা বলার আমার বলাই উচিত, আমার হয়ে তুমি কিছু বলতে গেলে হয়তো ক্ষেপে যাবে। এমনিই কি হয়েছে কে জানে, একদিন ফোন পর্য্যন্ত করল না। যখন তখন ফোনে কথা বলতে পারবে বলে জোর করে আমাকে বাড়ীতে ফোন নিইয়েছে। কিছু বুঝতে পারছি না, সরসী।

এমন অসহায় নম্রতার সঙ্গে রাজকুমারকে সরসী কোনদিন কথা বলিতে শোনে নাই। ধরা গলার আওয়াজ রাজকুমারকে শোনাইতে না চাওয়ায় কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারে নাই।

তুমি কিছু ভেবো না রাজু। তোমার হয়ে মালতীকে বলতে যাব কেন? যা বলার আমি নিজে বলব, যা করার আমি নিজেই করব। এসব মেয়েদের কাজ, মেয়েরাই ভাল পারে। আমায় বিশ্বাস কর, আমি বলছি, মালতীর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। মালতী চুপ করে গেছে কেন বুঝতে পার না? ওর ভয় হয়েছে।

কিসের ভয়?

তুমি যদি সত্যি সত্যি ওকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে চাও—এই ভয়। সেদিন নিজে থেকে তোমায় বলেছিল বটে, এখন কিন্তু ওর ভেতর থেকে উল্টো চাপ আসছে। যেতে বললে যাবে কিন্তু ওর উৎসাহ নিবে গেছে। সেদিন হোটেলের রুমে যেমন বুঝতে পারে নি হঠাৎ কেন অসুস্থ হয়ে পড়ল, এখনও বেচরী সেইরকম বুঝতে পারছে না কি হয়েছে, অথচ তোমায় একবার ফোন করার সাহসও হচ্ছে না।

সরসী মালতীর ভার নেওয়ায় রাজকুমার নিশ্চিন্ত হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সরসীর উপর সে নির্ভর করিতে শিখিতেছিল, সব বিষয়ে সরসীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা ও পরামর্শ করার প্রেরণাও তার এই মনোভাব হইতে আসিতেছে। তাকে রিণির প্রয়োজন, তাই শুধু উন্মাদিনী রিণির সাহচর্য্য স্বীকার করিয়া সকলের জীবন হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে, বাদ পড়িয়াছে সরসী। সরসীকেও সে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিল, মুক্তি পাইতে সরসী অস্বীকার করিয়াছে। রাজকুমার তাকে ডাকে না, সরসী নিজেই তার কাছে আসে, বাড়ীতে না পাইলে স্যর কে. এল-এর বাড়ী গিয়া তার খোঁজ করে। রিণি তাকে সহ্য করিতে পারে না, নীচে বসিয়া রাজকুমারের সঙ্গে সে কথা বলে। বার বার রিণি তাদের আলাপে বাধা দেয়, রাজকুমারকে উপরে ডাকিয়া অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখে, সরসী ধৈর্য্য হারায় না, বিরক্ত হয় না, অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে রাজকুমারের মনে হয়, সে যেন সকলকে রেহাই দেয় নাই, তাকেই সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, একমাত্র সরসী তাকে ছাঁটিয়া ফেলে নাই, আরও তার কাছে সরিয়া আসিয়াছে।

স্যর কে, এল-এর বাড়ীতেই রাজকুমারের বেশীর ভাগ সময় কাটে—রিণির কাছে। রাজকুমার না থাকিলে রিণি অস্থির হইয়া ওঠে, কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের চুল ছেঁড়ে, রাগ করিয়া আলমারীর কাচ, চীনা মাটির বাসন ভাঙ্গে, বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, ধরিতে গেলে মানুষকে কামড়াইয়া দেয়, জামা কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া নগ্ন দেহে রাজকুমারের খোঁজে বাহির হইয়া যাইতে চায় পথে। রাজকুমারকে দেখিলেই সে শান্ত হইয়া যায়, আশ্চর্য্যরকম শান্ত হইয়া যায়। প্রায় স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মত কথা বলে ও শোনে, চলাফেরা করে, খাবার খায়, ঘুমায়। একটু তফাৎ হইতে লক্ষ্য করিলে অজানা মানুষের তখন বুঝিবার উপায় থাকে না তার কিছু হইয়াছে। কোন কোন মুহূর্তে রাজকুমারের পর্য্যন্ত মনে হয় যে রিণি বুঝি সারিয়া উঠিয়াছে, একটা চমক দেওয়া

উল্লাস জাগিতে না জাগিতে লয় পাইয়া যায়। রিণির চোখ। রাজকুমার যত কাছেই থাক, যতই সুস্থ ও শান্ত মনে হোক রিণিকে, দুটি চোখের চাহনি রিণির ক্ষণিকের জন্যও স্বাভাবিক হয় না।

প্রথম দিকে রাত্রে রিণিকে ঘুম পাড়াইয়া রাজকুমার নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু দেখা গেল এ ব্যবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া রিণি হৈ চৈ সৃষ্টি করিয়া দেয়, কেউ তাকে সামলাইতে পারে না, শেষ পর্য্যন্ত রাজকুমারকে ডাকিয়া আনিতে হয়। রাত্রেও রাজকুমারকে তাই এ বাড়ীতে শোয়ার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

স্যর কে, এল কিছু বলেন নাই। রাজকুমার নিজেই তার কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল।

আপনার আপত্তি নেই তো?

না।

লোকে নানা কথা বলবে।

বলুক।

রাত্রে মাথার কাছে বিছানায় বসিয়া শিশুর মত গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া রিণিকে সে ঘুম পাড়াইল, তারপর নিজের ঘরে যাওয়ার আগে কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া নেওয়ার জন্য আরেকবার গেল স্যর কে, এল-এর ঘরে।

আপনি যদি ভাল মনে করেন, রিণিকে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি।

কেন

আপনি তো বুঝতে পারছেন, প্রায় স্বামি-স্ত্রীর মতই আমাদের দিনরাত একত্র থাকতে হবে—কতকাল ঠিক নেই।

রাজু, স্ত্রী পাগল হলে স্বামী তাকে ত্যাগ করে।

তবু আপনার মনে যদি—

আমার মনে কিছু হবে না রাজু। শুধু মনে হবে তুমি রিণিকে সুস্থ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছ। সেদিন বলি নি তোমাকে, রিণিকে আমি তোমায় দিয়ে দিয়েছি? তোমাকে ছাড়া ওর এক মুহূর্ত্ত চলবে না, আমার পাগল মেয়ের জন্য তুমি সব ত্যাগ করবে আর আমি নীতির হিসাব করতে বসব? তোমাকে আমি বাঁধতে চাই না রাজু। আমি চাই যখন খুসী তোমার চলে যাবার পথ খোলা থাকবে। তুমি ভিন্ন ঘরে বিছানা করেছ, দরকার হলে রিণির ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন নেই। আমার মেয়েকে তুমি ভাল করে দাও, আমি আর কিছু চাই না, রাজু।

সরসীও এই কথাই বলিল রাজকুমারকে। বলিল যে রিণির সঙ্গে রাজকুমারের এই ঘনিষ্ঠতা তার কাছেও যখন এতটুকু দোষের মনে হইতেছে না, রাজকুমারেরও সঙ্কোচ বোধ করার কারণ নাই। জীবন তো খেলার জিনিষ নয় মানুষের।

চতুষ্কোণ সমাপ্ত

আজ কাল পরশুর গল্প

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পগুলি একটা বিশেষ ভাবে পব পর সাজিয়ে দিবার ইচ্ছে ছিল, যাতে 'আজ কাল পরশুর গল্প' নামটির সঙ্গতি হয় তো আরেকটু পরিস্ফুট হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু সাজানোটা এলোমেলো হয়ে গেছে। 'সামঞ্জস্য' গল্পটি শেষে যাওয়া একেবারে উচিত হয়নি। অন্য গল্পগুলিও এরকম আগে পরে চলে গেছে।

গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখ, ১৩৫৩

আজ কাল পরশুর গল্প

মানমুক্তিয়ার আকাশ বেয়ে সূর্য্য উঠেছে মাঝামাঝি। নিজের রাঁধা ভাত আর শোল মাছের ঝাল খেতে বসেছে রামপদ ভাঙা ঘরের দাওয়ায়। চালার খড় পুরোনো পচাটে আর দেয়াল শুধু মাটির। চালা আর দেয়াল তাই টিঁকে আছে, ছ'মাসের সুযোগেও কেউ হাত দেয়নি। আর সব গেছে, বেড়া খুঁটি মাচা তক্তা—মাটির হাঁড়িকলসিগুলি পর্য্যন্ত। খুঁটির অভাবে দাওয়ার চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে। চালাটা কেশব আর তোলেনি। কার জন্য তুলবে? দাওয়ার দু'পাশ দিয়ে মাথা নীচু করে ভেতরে আসা-যাওয়া চলে। অন্ধকার হয়েছে, হোক।

হুমড়ি খেয়ে কাত-হয়ে-পড়া চালার নীচে আঁধার দাওয়ায় নিজের রাঁধা শোলের ঝাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছে রামপদ, ওদিকে খালের ঘাটে নৌকা থেকে নেমেছে তিনটি মেয়েছেলে আর আর একটি ছেলে।

এদের মধ্যে একজন রামপদ'র বৌ মুক্তা। তার মাথায় রীতিমতো কপাল-ঢাকা ঘোমটা। সুরমার ঘোমটা সঁীথির সিঁদুরের রেখাটুকুও ঢাকেনি ভালো করে। এতে আর শাড়ী-পরার ভঙ্গিতে আর চলনফিরন-বলনের তফাতে টের পাওয়া যায় মুক্তা চাষাভুষো গেরস্থঘরের বৌ, অন্য দু'জন সহুরে ভদ্রঘরের মেয়ে বৌ, যারা বাইরে বেরোয়, কাজ করে, অকাজ কি সুকাজ তা নিয়ে দেশ জুড়ে মতভেদ। নইলে, শাড়ীখানা বুঝি দামীই হবে আর মিহিই হবে মুক্তার, সাধনা আর সুরমার কাপড়ের চেয়ে। এর চেয়ে কমদামী ময়লা শাড়ী মুক্তার নেই। নইলে তাই পরে সে গাঁয়ে ফিরত।

তার বুক কাঁপছে, গা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। মোটা চট মুড়ি দিয়ে বস্তা হয়ে আসতে পারলে বাঁচত, মানুষ যাতে চিনতে না পারে।

চিনতে পারা হয়তো কিছু কঠিন হত। কিন্তু মানমুক্তিয়ার কে না জানে মুক্তা আজ গাঁয়ে ফিরছে। বাবুরা আর মা-ঠাকরুণরা রামপদ'র বৌকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে রামপদ'র ঘরে।

চারটি বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার একটু ছাউনি—গগনের পানবিড়ির দোকান। পিছনের বড় গাছটার ডালপালার ছায়া এখন চওড়া করেছে হোগলার ছায়া। গাছের গুঁড়িটা প্রায় নালার মধ্যে ও পাশের ধার ঘেঁষে, নইলে গুঁড়ি ঘেঁষে বসতে পারলে হোগলার ছাউনিটুকুও গগনের তুলতে হত না।

ক'জন ঝিমুচ্ছিল বাঁচবার চেষ্টার কষ্টে, খানিকটা তারা সজীব হয়ে ওঠে। বুড়ো সুদাসের চোয়ালের হাড় প্রকাণ্ড, এমন ভাবে ঠেলে বেরিয়েছে যে পাঁজরের হাড় না গুণে ওখানে নজর আটকে যায়।

'রামের বৌটা তবে এল?

'তাই তো দেখি!' নিকুঞ্জ বলে, তার আধ-পোড়া বিড়িটা এই বিশেষ উপলক্ষে ধরিয়ে ফেলবে কিনা ভাবতে ভাবতে। এক পয়সার চারটে বিড়ি কিনেছিল কাল। আধখানা আছে।

ঘনশ্যামের টিনের চালার আড়ত থেকে গোকুল চার জনের ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোবার ছলে ঘনিষ্ঠ দর্শনের পুলক লাভ করে এদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

গদার বৌ মারা গেছে ও-বছর। ওরা খানিকটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলে সে মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'রাম নেবে ওকে?'

'না নেবে তো না নেবে। ওর বয়ে গেল।' যোয়ান গোকুল বলে, ঘনশ্যামের আড়তে কাজ করে মোটামুটি পেট ভরে খেতে পাওয়ার তেজে।

সুদাস কেমন হতাশার সুরে বলে, 'উচিত তো না ঘরে নেয়া।'

গোকুলকে সে ধমক দেয় না, 'তুই থাম ছোঁড়া বলে।' তীব্র কুৎসিত মন্তব্য করে না মুক্তাকে ফিরিয়ে নেবার কল্পনারও বিরুদ্ধে! গোকুলের কথাতেই যেন প্রকারান্তরে সায় দিয়ে যোগ দেয়, ফিরবার কি দরকার ছিল ছুঁড়ির?

গোকুল ইয়ার্কি দিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ইয়ার্কিতেও বাস্তব যুক্তি টোল খায় না, হাল্কা হয় না।

ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো কঙ্কাল ছিল মুক্তা। সকলের মতো সুদাসেরও চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়ীখানা। সকলের মতো সে-ও টের পেয়েছে মুক্তার দেহটি আজ বেশ পরিপুষ্ট।

আঁকা বাঁকা রাস্তা, এপাড়া ওপাড়া হয়ে, পুকুর ডোবা বাঁশবন আমবাগান গাছপালা জঙ্গলে শান্ত। মুক্তা চেনে সংক্ষেপ পথ। যতটা পারা যায় বসতি এড়িয়ে চলতে আরও সে পথ সংক্ষেপ করে প্রায় অগম্য জঙ্গল মাঠ বাগানে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তবু গাঁ তো অরণ্য হয়নি, পাড়া পেরোতে হয়, ঘন বসতি কোনটা, কোনটা ছড়ানো। ভদ্রমানুষেরা তাকায় একটু উদাসীন ভাবে, যারা গুজব শুনেছে তারাও, শুধু ভুরুগুলি তাদের একটু কুঁচকে যায় সকৌতুক কৌতূহলে। চাষা-ভুষোদের কমবয়সী মেয়ে-বৌরা বেড়ার

আড়াল থেকে উঁকি দেয়, উত্তেজিত ফিসফিসানি কথার আওয়াজ বেশ খানিকটা দূর পর্য্যন্তই পৌছয়। বয়স্কারা প্রকাশ্যে এগিয়ে যায় পথের ধারে, কেউ কেউ মুক্তাকে কথা শোনায় খোঁচা-দেওয়া ছ্যাঁকা-লাগানো কথা। কেউ চুপ করে থাকে, কেমন একটা দরদ বোধ করে, বাছার কচি ছেলেটা মরেছে, কোথায় না জানি বাছা কত লাঞ্ছনা কত উৎপীড়ন সয়েছে ভেবে।

মধু কামারের বৌ গিরির মা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকায় তার মস্ত ফোলা-ফাঁপা শরীর নিয়ে। মধু কামার নিরুদ্দেশ হয়েছে বছরখানেক, কিছুদিন আগে গিরিও উধাও হয়ে গেছে।

'ক্যান লা মাগি ?' গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দিয়ে, 'ক্যান ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কি পাটা নিয়ে ? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দূর-অ দূর-অ ! যা।'

হাঁপাতে হাঁপাতে সে কথা বলে, যেন হল্‌কায় হলকায় আগুন বেরিয়ে আসে হিংসার বিদ্বেষের। সুরমা স্মিতমুখে মিষ্টি কথায় তাকে থামাতে গিয়ে তার গালের ঝাঁঝে একপা পিছিয়ে আসে। মনে হয় গিরির মা শেষ পর্য্যন্ত আঁচড়ে কামড়েই দিবে মুক্তাকে। মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

মানুষ জমেছে কয়েকজন। একজন, কোমরে তার গামছা পরা আর মাথায় কাপড়খানা পাগড়ীর মতো জড়ানো, হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে। একজন বলে, 'বাঃ বাঃ বেশ।' একজন উরুতে থাপড় মেরে গেঁয়ো ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

একটু তফাতে নালা পেরোবার জন্য পাতা তাল গাছের কাণ্ডটায় এ মাথায় বসেছিল গদাধর, বহু দূরের মানুষকে হাঁক দেবার মতো জোর গলায় এমনি সময়ে সে ডাকে, 'গিরির মা। বলি ওগো গিরির মা।"

গিরির মা মুখ ফিরিয়ে তাকাতে সে আবার বলে তেমনি জোর গলায়, 'গিরি যে তোমায় ডাকছে গো গিরির মা কখন থেকে। শুনতে পাও না ?'

গিরির মা থমকে যায়, দুঃস্বপ্ন-ভাঙা মানুষের মতো ক্ষণিক সম্বিৎ খোঁজে বিমূঢ়ের মতো, তারপর যেন চোখের পলকে এগিয়ে যায়।

'ডাকছে ? অ্যাঁ, ডাকছে নাকি গিরি ? যাইলো গিরি, যাই।'

এতগুলি মানুষ দেখে লজ্জায় সে জিভ কাটে। কোমরে এক-পাক জড়ানো ছেঁড়া কাঁথাখানা চট করে খুলে নিয়ে মাথায় ঘোমটার মতো চাপিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে পুরোনো কাঁটাল গাছের ছায়া বসে রামপদ সবে হুঁকোয় টান দিয়েছিল। তামাক সেজে একটুখানি, ডুমুর ফলের মতো। তামাক পাওয়া বড় কষ্ট। মুক্তাকে সাথে নিয়ে ওদের আসতে দেখে সে হুঁকোটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। এমনিই পুড়ে যেতে থাকে তার অত কষ্টে যোগাড় করা তামাক।

'আসেন।' রামপদ বলে ক্লিষ্ট স্বরে, দ্বিধা-সংশয়-পীড়িত ভীরু অসহায়ের মতো। তিন জন কাছে এগিয়ে এসেছে, ওদের দিকে না তাকিয়েই সে অনিশ্চিত অভ্যর্থনা জানায়, চোখ সে পেতে রাখে মুক্তার উপর। খানিক তফাতে থাকতেই মুক্তা থেমে গিয়ে হয়ে আছে কাঠের পুতুল।

'তোমার বৌকে দিয়ে গেলাম ভাই। যা বলার সব তোমায় বলেছি। ওর মন ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে গিয়ে আবার তোমরা ঘর-সংসার পাতো। আর এক দিন এসে আমরা দেখে যাব।'

'দিয়ে তো গেলেন।' বলে উৎসাহহীন বিমর্ষ রামপদ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একবার সে ঢোক গেলে, চোখের পাতা পিট-পিট করে তার। শীর্ণ মুখখানা বসন্তের দাগে ভরা, চুপসানো বাঁ গালটাতে লম্বা ক্ষতের দাগ। তবু এই মুখেও তার হৃদয়ের জোরালো আলোড়নের কিছু কিছু নির্দ্দেশ ফুটেছে তার শিথিল নিস্তেজ সর্ব্বাঙ্গজোড়া ঘোষণার সুস্পষ্ট মানে ভেদ করে।

'যাবে বলেছিলে, গেলে না কেন রামপদ ?'

'তাই তো মুস্কিল হয়েছে দিদিমণি।'

সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না। মিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস, কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী এরা ক'জন। ঘনশ্যাম এক রকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষা-ভুষোদের, অর্থাৎ চাষী গয়লা কামার কুমোর তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সে-ই ডেকে কাল ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে রামপদকে। অন্য ক'জন উপস্থিত ছিল সেখানে। একটু ভয় হয়েছে তাই রামপদ'র। একটু ভাবনা হয়েছে।

একটু !

নৌকোতে পাতবার সতরঞ্চিটা কাঁটাল তলায় বিছিয়ে তিন জন বসে। রামপদকেও বসায়। মুক্তা এতক্ষণ পরে সরে এসে সুরমার পিছনে গা ঘেঁষে মাটিতেই বসে। ঘোমটা তার ছোট হয়ে গেছে। ছোট ঘোমটার মিথ্যে আড়াল থেকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রামপদ'র মুখের দিকে। বৌয়ের চোখে এমন চাউনি রামপদ কোন দিন ছাখেনি।

এ সমস্যা তুচ্ছ করার মতো নয়। এক জন বড় মাতব্বর আর তার ধামাধরা ক'জন তুচ্ছ লোক রামপদ'র পারিবারিক ব্যাপারে নিয়ে কর্ত্তালি না করতে এলে এ হাঙ্গামা ঘটত না। দু'চার জন হয়তো ঠাট্টা বিদ্রূপ করত কিছু দিন, দু'-চার জন হয়তো বর্জ্জনও করত রামপদকে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মাথা ঘামাত না; চারিদিকে যা ঘটেছে আর ঘটছে তার কাছে এ আর এমন কি কাণ্ড ? না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল, কত মানুষ কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোন বাড়ীর দশ জন কোথায় গিয়ে ফিরে এল মোটে দু'জন

ধুঁকতে ধুকতে, কত মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেল কোথায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বৌ কোথায় ক'মাস নষ্টামী করে ফিরে এসেছে, এ কি আবার একটা গণ্য করার মতো ঘটনা? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু ঘনশ্যামেরা ক'জন যখন গায়ে পড়ে উস্কে দিতে চাইছে সবাইকে, কি জানি কি ঘটবে।

সুরমা জিজ্ঞেস করে, 'যাই হোক, বৌয়ের জন্য ভাত তো রেখেছ রামপদ?'

'আজ্ঞে আপনারা?'

'আমাদের ব্যবস্থা আছে। বৌকে দু'টি খেতে দাওতো তুমি। চালাটা তোলেনি কেন?'

'তুলব। তুলব।'

সুরমাই বলে কয়ে নিয়ে দু'টি খাওয়ার ছলে মুক্তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় রামপদ'র সঙ্গে। বাইরে যা ঘটুক, ওদের মধ্যে আগে একটু কথা আর বোঝা-পড়া হওয়া দরকার। গ্রামের এক জন কর্ম্মী শঙ্করের বাড়ীতে তাদের এবেলা নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল। গ্রামের অবস্থা সে ভালো জানে। তার সঙ্গে পরামর্শ করবারও দরকার হবে।

ঝাঁপটা উঁচু করে তুলে দিতে আরেকটু আলো হয় ঘরে।

'নাইবে?' রামপদ শুধোয়।

'মোর জন্যে রেঁধে রেখোছো!' বলে মুক্তা।

'শোলের ঝাল আর ভাত। আলুনি হৈছে কিন্তু?'

এগার মাস আর অঘটনের ব্যবধান আর কিছুতে নেই, শুধু যেন আরো অতি-বেশী রয়ে' রয়ে, অল্প দু'টি কথা বলায়, নিজের নিজের অনেক রকম ভাবনার গাদা নিয়ে নিজে নিজে ফাঁপরে পড়লে যেমন হয়। চুপ করে থাকার বড় যন্ত্রণা। ভাবনাগুলি নড়তে নড়তে মুক্তার মনে আসে: ছেলেটা তার ছিল সাত মাসের রামপদ যখন বিদেশ যায়। এটা বলার কথা। মুক্তা বাঁচে।

'খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বালি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরলে কি দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কি! তাতেই শেষ হল।'

না কেঁদে ধীর কথায় বিবরণটা দেবে ভেবেছিল মুক্তা, কিন্তু তা কি হয়। আগে পারত, না খেয়ে যখন ভোঁতা নির্জ্জীব হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি। আজ পুষ্ট শরীরে শুধু ক'মাসের অকথ্য অভিজ্ঞতা কেন বোধকে ঠেকাতে পারবে? গলা ধরে চোখে জল আসে মুক্তা'র।

'শেষ দু'টো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতো বেঁকে—'

মুক্তা এবার কাঁদে।

'কেউ কিছু করলে না?'

'দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল।'

চোখ মুছে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মুক্তা। এবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কেঁদে ককিয়ে দরদ সে চায় না, সুবিচার চায় না। সব জেনে যা ভালো বুঝবে করবে রামপদ, যেমন তার বিবেচনা হয়।

'খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দু'টো মন্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।'

'দাসমশায় তো খুব করেছেন মোদের জন্যে!' রামপদ বলে চাপা ঝাঁঝাঁলো সুরে।—'যা তুই, নেয়ে আয় গা।'

শোলের ঝাল দিয়ে মুক্তা বসেছে ভাত খেতে, বাইরে থেকে ঘনশ্যাম দাসের হাঁক আসে: রামপদ!

'তুই খা।'

বলে রামপদ বাইরে যায়। জন পাঁচেক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘনশ্যাম এসে দাঁড়িয়েছে সরকারী সমনজারীর পেয়াদার মতো গরম গাম্ভীর্য্য নিয়ে। শঙ্কর এসেছিল একটু আগে, ঘনশ্যামদের আবির্ভাবে সুরমাদের যাওয়া হয়নি।

'বৌ এসেছে রামপদ?'

'আজ্ঞে।'

'ঘরে নিয়েছিস্?'

'আজ্ঞে।'

'বার করে দে এই দণ্ডে। যারা এনেছে তাদের সঙ্গে ফিরে যাক।'

'ভাত খাচ্ছে।'

রামপদ'র ভাবসাব জবাব-ভঙ্গি কিছুই ভালো লাগে না ঘনশ্যামদের। টেকো নন্দী শুধোয়, 'তোর মতলব কী?'

রামপদ ঘাড় কাত করে।—'আজ্ঞে।'

'বৌকে রাখবি ঘরে?'

'বিয়ে করা ইস্তিরি আজ্ঞে। ফেলি কী করে?'

এই নিয়ে একটা গোলামালের সৃষ্টি হয় মানসুকিয়ার চাষাভুষোর সমাজে। ঘনশ্যামরাই জোর করে জাগিয়ে রাখে আন্দোলনটাকে। নইলে হয়তো আপনা থেকেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে থেমে যেত মুক্তার ঘরে ফেরার চাঞ্চল্য। সামাজিক শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ঘনশ্যামদের নেই, জমিদার দেশে থাকলেও হয়তো তাকে দিয়ে কিছু করানো যেত। তাবে সামাজিক শাস্তিই যথেষ্ট। সবাই যদি সব রকমের বর্জ্জন করে রামপদকে, কথা পর্য্যন্ত বন্ধ করে, তাতেই পরম শিক্ষা হবে রামপদ'র। সমাজের নির্দ্দেশ অমান্য করলে শুধু এক-ঘরে হয়েই যে সে রেহাই পাবে না

তাও জানা কথা। টিটকারী, গঞ্জনা, মারধোর, ঘরে আগুন লাগা সব কিছুই ঘটবে তখন। সবাই এসব করে না, তার দরকারও হয় না। সবাই যাকে ত্যাগ করেছে, যার পক্ষে কেউ নেই, হয় বিপক্ষে নয় উদাসীন, যার উপর যা খুশী অত্যাচার করলেও কেউ ফিরে তাকাবে না, মিলেমিশে সেই পরিত্যক্ত অসহায় মানুষটাকে পীড়ন করতে বড় ভালোবাসে এমন যারা আছে ক'জন, তাদের দিয়েই কাজ হয়।

তবে সময়টা পড়েছে বড় খারাপ। প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায়েরই মতো। মনগুলি ভাঙা, দেহগুলিও। আজ কী করে বাঁচা যায় আর কাল কী হবে এই চেষ্টা আর ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রত সবাই যে জোট বেঁধে ঘোট পাকাবার অবসর আর তাগিদ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে এই সত্যতা বেরিয়ে আসে। রামপদ'র কাণ্ডের কথাটা হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিয়ে সবাই আলোচনা করতে চায় ধান চাল নুণ কাপড়ের কথা, যুদ্ধের কথা। পেতে চায় বিশেষ অনুগ্রহ, সামান্য সুবিধা ও সুব্যবস্থা। একটু আশা-ভরসার ইঙ্গিত পেলে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যার চিহ্নটুকু দেখা যায় না, রামপদ'র বিচার থেকে রোমাঞ্চ লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায়।

কয়েকজন তো স্পষ্টই বলে বসল, 'ছেড়ে দ্যান্ না, যাক্ গে। অমন কত ঘটছে, ক'দিন সামলাবেন? যা দিনকাল পড়েছে।'

আপন জনকে যারা হারিয়েছে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঁচবার জন্য সহরে পালিয়ে, আপন্জন যাদের হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ, বিদেশ থেকে ফিরে যারা ঘর দেখেছে খালি, এ ব্যাপারে চুপ করে থাকার আর ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছা তাদেরই বেশী জোরালো। এ রকম কিছুই ঘটেনি এমন পরিবারও ক'টাই বা আছে!

ঘনশ্যাম একটু দমে যায়। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপায় গোকুল।

'বাড়াবাড়ি করলেন খানিক।'

'বটে?'

'সাধু হিদে নখাদের দিয়ে মেরে লাল করে দিতেন এক দিন, চুকে যেত, বিচার-সভা ডেকে বসলেন। দশ জনে যদি দশটা কথা কয়, যাবেন কোথা? দুগ্'গার কথা যদি তোলে কেউ?'

'তুই চুপ থাক হারামজাদা।' ঘনশ্যাম বলে ধমক দিয়ে, কিন্তু হাত তার উঠে গিয়ে ঘাঁটতে থাকে বুকের ঘন লোম। জালাও করে মনটা রামপ'দর স্পর্দ্ধায়। সে নাকি দাওয়ায় চালা তুলেছে, বেড়া দিয়েছে, গুছিয়ে নিচ্ছে সংসার। বলে নাকি বেড়াচ্ছে, গাঁয়ে না টিকতে দিলে বৌকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও। আগের চেয়ে কত বেশী খাতির করছে ঘনশ্যামকে লোকে আজ, তুচ্ছ একটা রামপদ'র কাছে সে হার মানবে! মনটা জালাও করে ঘনশ্যামের।

পরদিন বসবে বিচার-সভা। সদরে জরুরী কাজ সারতে বেরোবার সময় ঘনশ্যাম ঠিক করে যায় সকাল সকাল রওনা দিয়ে বিকাল বিকাল গাঁয়ে ফিরবে, গিরির কাছে আজ আর যাবে না। কাজ শেষ হয় বেলা দু'টোর মধ্যেই, কিন্তু মনের মত হয় না, যেমন সে ভেবেছিল সে-রকম। মনটা তার আরেকটু দমে যায়। সাধ হয় একটু বিলাতী খাবার। গিরির সাথে রাত কাটাবার। সময়ের হিসাবেও আটক পায় না। সভা হবে অপরাহ্নে, সকালে রওনা দিলেও গাঁয়ে সে পৌছবে ঠিক সময়ে।

গোকুলকে সবচেয়ে কমদামী বিলাতী বোতল কিনতে দিয়ে সে যায় গিরির ওখানে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের চোখ উঠে যায় কপালে, হাত বুকে উঠে লোম খোঁজে জামার কাপড়ের নীচে। মাদুর পেতে ভদ্রঘরের চারটি মেয়ে গিরিকে ঘিরে বসেছে, দু'জন তার চেনা। মুক্তাকে নিয়ে যারা রামপদ'র কাছে পৌছে দিয়েছিল।

নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টা করারও সুযোগ মেলে না, 'এই! শোন, শোন।' বলে গিরি লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধরে গলাবন্ধ কোটের প্রান্ত।

'ভাগছো যে? দাঁড়াও, কথা আছে অনেক।'

'ওনারা কারা?'

'তা দিয়ে কাজ কি তোমার?' গিরি ফুঁসে ওঠে। জামা সে ছাড়ে না ঘনশ্যামের, পিছন ছেড়ে সামনেটা ধরে রাখে। কটমটিয়ে তাকায় বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। ঢোঁক গিলে দাঁতে দাঁত ঘষে।

'মা না কি ভালো আছে, বেশ আছে, মোর মা?'

'আছে না?'

'আছে? মাথা বিগড়েছে কার তবে, মোর? ক্ষেপেছে কে, মুই! তা ক্ষেপিছি, মাথা মোর ঘুরতে নেগেছে। ওরে নক্ষীছাড়া, ঠক, মিথ্যুক—'

'ও গিরিবালা!' সুরমা ভিতর থেকে বলে মৃদু স্বরে।

গাল বন্ধ করে নিজেকে গিরি সামলায়, গলা নামিয়ে বলে, 'মোর বাপকে টাকা দিয়ে ঝিভুঁয়ে মরতে পেঠিয়েছিল কে?'

'ওনারা বলেছে বুঝি?'

'মিছে বলেছে?' গিরি ডুকরে কেঁদে ওঠে বাপের শোকে, 'ও বাবা! মোর নেগে তুমি খুন হলে গো বাবা। এ নচ্ছার মেয়ার ধরে প্রাণ কেন আছে গো বাবা।' ভেতর থেকে আবার সুরমা ডাকে: 'ও গিরিবালা! তোমার বাবা মরেছে কে বললে? খবর তো পাওয়া যায়নি কিছু! বেঁচেই হয়তো আছে, মরবে কেন?'

'নিখোঁজ তো হয়েছে আজ দশ মাস।' গিরি বলে নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে।

অন্য ঘরের মেয়েরা জানালা-দরজায় উঁকি দেয়, কেউ

কাজের ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক চলাচল করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। অঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার, নালা ছিটাল থেকে উঠে আসছে অশ্লীল গন্ধ। এঁঠো বাসনগুলির অথাদ্যের গন্ধটাও কেমন বদ। সুরমায়া চার জনে বেরিয়ে আসে। তাদের দিকে না তাকিয়েই সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে যায়, 'সকালে আমরা আসব গিরিবালা, তৈরী থেকো।'

'সকালে আসবে কেন?'

'মোকে গাঁয়ে পৌঁছে দিতে, মার কাছে। ঘরে এস, বসবে।'

গিরি তাকে টেনেই নিয়ে যায় ঘরে। ধনশ্যামের দিশেহারা অবস্থা. শত উপায় শত মতলবের এলোমেলো টুকরো পাক খেতে থাকে তার মাথার মধ্যে, কি করা যায় কি করা যায় এই অন্ধ আতঙ্কের চাপে।

মাদুরে বসে বিড়ি ধরিয়ে কেসে বলে, 'গাঁয়ে গিয়ে কী করবি গিরি? আমি বরং—'

'বরং টরং রাখ তোমার। মার চিকিচ্ছে করাব। সব খরচা দেবে তুমি, যত টাকা নাগে। নয়তো কি কেলেঙ্কারি করি দেখো।' ধনশ্যামের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে গিরি ফস করে একটা সিগারেট ধরায়। ধপাস করে বসে পা ছড়িয়ে পিছনে একটা হাত রেখে পিছু হেলে। কয়েক মাসেই মুখের স্নিগ্ধ লাবণ্য উপে গেছে অনেকখানি, মাজা রঙের সে আভাও নেই তেমন, কিন্তু গড়নশ্রী হয়েছে আরও অপরূপ, মারাত্মক। সাধে কি ওকে পাবার জন্ম অত করেছে ঘনশ্যাম, ছেড়ে দেবে দেবে করেও ছাড়তে পারছে না। কায়স্থের মেয়ে না হলে ওকে সে বিয়েই করে ফেলত এখানে টেনে না এনে।

ছেড়ে দেবে ভাবছিল কিছু দিন থেকে, যদি ছেড়ে দিত! আজ তাহলে এ হাঙ্গামায় তাকে পড়তে হত না ভদ্রঘরের ও এই ধিঙ্গি মাগিগুলোর কল্যাণে।

'এত পয়সা করেছ, বিড়ি টানে।' গিরিবালা বলে, মুখ বাঁকিয়ে। বলে সোজা হয়ে বসে, রামপদ'র পেছনে নাকি নেগে তুমি? একঘরে করবে? সাধুপুরুষ আমার! মোর ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না? ওর বৌকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি? মোকে একঘরে করবে না সবাই?'

গোকুল মদের বোতল নিয়ে এলে গিরি একদৃষ্টে বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভ দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট ভেজায়। মুখের ভাব পলকে পলকে বদলে গিয়ে ঘনিয়ে আসে রুগ্নের যাতনাভরা লোলুপতা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি বিকারগ্রস্তের তীব্র কাতরতা।

'বিলাতী?'

গোকুল সায় দেয়।

গিরি যেন শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে যায়। অতি কষ্টে বলে, 'যাক, এনেছ যখন, খাও শেষ দিনটা। ভোর ভোর উঠে চলে যাবে কিন্তু।'

মদের গ্লাসে দু'-চার বার চুমুক দিয়ে একটু স্থির হয়ে ঘনশ্যাম ভাবে, না, কোন উপায় নেই। ভয় দেখানো, জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, লোভ দেখানো, বানানো কথায় ভোলানো কিছুই খাটবে না। সে গিরি আর নেই, সেই ভীরু লাজুক বোকা হাবা সরল গেঁয়ো মেয়ে। পেকে ঝানু হয়ে গেছে।

কিছু পেসাদ পেয়ে গোকুল বিদায় হয়। খুব ভোরে এসে সে ঘনশ্যামকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

রাত বাড়লে গিরি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'কি করি বল? কাল একবার যেতে হবেই। মার জন্য আঁকুপাকু করছে মনটা। তা ভেবো না তুমি। মার একটা ব্যবস্থা করে ফিরে আসব ক'দিন পরে। মাঝে মাঝে গাঁয়ে যেতে দিও মোকে, এ্যাঁ? ভেবো না, ফিরে আসব।'

গেলাস থেকে উছলে পড়ে শাড়ী ভিজে যায় গিরির। খিল-খিল করে হাসতে হাসতে রাগের চোটে গিরি গেলাসটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের কোণে।

বিচার-সভায় লোক খুব বেশী হল না, মানসুকিম্নার ঘেঁষাঘেঁসি পাঁচ-ছ'টা গাঁ ধরলে। লোক কমেই গেছে দেশে। রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছে বহু লোক। অনেকে আসতে পারেনি আসবে ঠিক করেও, কাঁপতে কাঁপতে জ্বরে পড়ায়। অনেকে ইচ্ছা করে আসেনি। সমাবেশটাও কেমন ঝিম-ধরা, নিরুত্তেজ, প্রাণহীন। ক্ষীণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি, চোখে উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা চাউনি। সভার বাক্‌গুঞ্জনও স্তিমিত। কথা কইতে ভাল লাগার দিন যেন নেই। বছর দুই আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের ফাঁকা জমিতে শেষ সামাজিক বিচার-সভা বসেছিল এই চাষাভুষো শ্রেণীর, পদ্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কি চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ছিল সে জমায়েতে, মানুষের কলরবে গমগম্ করছিল। কি ঔৎসুক্য ফুটেছিল সকলের মুখে এক বিবাহিতা নারীর কলঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষায়। তার তুলনায় এ যেন সরকারী জমায়েত ডাকা হয়েছে বর্তমান অবস্থায় গ্রামবাসীদের কি করা উচিত বুঝিয়ে দিতে।

দাওয়ায় বসেছে মাথারা, মাঝ-বয়সী আর বুড়ো মানুষ। ঘনশ্যাম বসেছে মাঝখানে, একেবারে চুপ হয়ে, অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে। তার ভাব দেখে মাথাদের অস্বস্তি জেগেছে— উপস্থিত মানুষগুলির ভাব দেখেও। দাওয়ার এক প্রান্তে মোড়ায় বসেছে শঙ্কর, সে এসেছে অযাচিত ভাবে। কেউ কেউ অনুমান করেছে তার উপস্থিতির কারণ, অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনি। অঙ্গনের দক্ষিণ কোণে জন-সাতেকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রামপদ, এদের আগে থেকে তার ভাব ছিল, বিশেষ করে করালী ও বুনোর সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে বসেছে মুক্তা, গিরির গায়ে লেগে। সে

অবশ্য গিরিকে খুঁজে তার গা ঘেঁষে বসেনি, গিরিই তাকে ডেকে বসিয়েছে। পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড় কম হয়নি সভায়।

ঘনশ্যামের দৃষ্টি বার বার গিরির ওপরে গিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ সরিয়ে নেয়।

বিচারের কাজে গোল বাধে গোড়া থেকেই। পূর্ব্ব-পরামর্শ মতো বুড় টেকো নন্দী গৌরচন্দ্রিকা সুরু করলে জমায়েতের মাঝখান থেকে রুক্ষ চুলে, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে আর একটা হাতাছেঁড়া ময়লা খাকি সার্ট গায়ে পাগলাটে চেহারার বনমালী উঠে চেঁচিয়ে বলে, 'কিসের বিচার ? কার বিচার ? রামপদ'র বৌ কোন দোষ করেনি।'

সবাই জানে, বনমালীর বৌকে সদরের দত্ত-বাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। প্রথমে সদরে রেখেছিল বৌ-টাকে, বনমালী হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল তখন আবার তাড়াতাড়ি কোথায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালী আর হদিস পায়নি। এখনো সে মাঝে মাঝে সদরে গিয়ে সন্ধান করে।

টেকো নন্দী বলে, 'আহা, দোষ করেছে কি করেনি তাই তো মোরা বিচার করব।'

বনমালী রুখে বলে, 'বটে ? কোন দোষ করেনি, তবু বিচার হবে দোষ করেছে কি করেনি ? এ তো খুড়ো ঠিক কথা নয়। গাঁয়ের কোন ছেলেমেয়ে গাঁ ছেড়ে ক'দিন বাইরে গেলে যদি তার বিচার লাগে, তবে তো বিপদ।'

করালী বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বলে, 'ঠিক কথা, গাঁয়ে খেতে পায়নি, সোয়ামী কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কিসের ?'

কে একজন মাথাটা নামিয়ে আড়াল করে বলে, 'সে-বেলা তো কেউ আসেনি, দু'টি খেতে-পরতে দিতে ?'

কানাই বিদেশে তিন ছেলে আর দুই মেয়ে হারিয়ে শুধু নিজের বৌ আর বড় ছেলের বৌকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। সে বলে, তাদের তিন জনের কইমাছের প্রাণ, সহজে যাবার নয়, যায়ওনি তাই। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখা যায়, সে থর থর করে কাঁপছে, মুখে এক অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার ভাব। কথা তার এলোমেলো হয়ে যায়, 'প্রাণে বেঁচে ফিরেছে মেয়েটা, ভগবান ছিল না তো কি ? ভগবান বাঁচত কি, মেয়েটা ফিরেছে তো মরে এসে। তা ভগবান আছেন।'

কেউ হাসে না। সভায় ভগবান এসে পাড়ায় শঙ্করের মতো অযাচিত আবির্ভাবের কৌতূহলমূলক একটা অনুভূতি জাগে অনেকের মনে।

জমায়েত স্তব্ধ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শুধু মেয়েদের মধ্যে গুজ-গাজ ফিস-ফাস চলতে থাকে অবিরাম। মুক্তার মত মেয়েরা আবার গাঁয়ে ফিরুক এটা যারা ঠিক পছন্দ করে না তারাও চুপ করে থাকে।

শেষে দাওয়া থেকে ভুবন বলতে যায়, 'কথা হল কি, ও যদি সদরে সত্যি খেটে খেতে যেত, খেটেই খেত—'

গিরি তড়াক করে ঘাড় উঁচু করে গলা চিরে ফেলে, 'খেটে খায়নি তো কি ? মোরা এক সাথে খেটে খেয়েছি। এ পাড়ায় দু'বাড়ী ঝি-গিরি করেছি, এক দোকানে মুড়ি ভেজেছি। কোন্ মুখপোড়া বলে খেটে খাইনি মোরা, শুনি তো একবার ?

প্রায় সকলেই জানে একথা সত্য নয় গিরির। কয়েকজন স্বচক্ষে মুক্তাকে দেখেছে সদরে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। কিছুকাল আগে গাঁয়ে লজ্জাবতী লতার মতো কাঁচা মেয়ে গিরির পরিবর্ত্তনটা সকলকে আশ্চর্য্য করে দেয়—খুব বেশী নয়। যে দিন কাল পড়েছে। দাওয়ার নাছোড়বান্দা মাথা টেকো নন্দীই শুধু বলে, 'কিন্তু বহু লোকে যে চোখে দেখেছে। ফণি বলছে সে নিজের চোখে—'

মাঝবয়সী বেঁটে ফণি চট করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়, 'না না, আমি তা বলিনি। আমি কেন ও-কথা বলতে যাব ?'

এতক্ষণ পরে ঘনশ্যাম মুখ খোলে। জমায়েতে টুঁ শব্দ নেই কারো মুখে মেয়েদের ফিসফিসানি ছাড়া, তবু নেতাদের সভার কলরব থামাবার ভঙ্গিতে দু'হাত খানিকক্ষণ তুলে রেখে সে বলে, 'যাক্, যাক্। ভাই সব, আজকালকার দিনে অত সব ধরলে মোদের চলে না। আমি বলি কি, কথাটা যখন উঠেছে, রামপদ'র ইস্তিরি নামমাত্র একটা প্রাচিত্তির করুক, চাপা পড়ে যাক ব্যাপারটা।'

বনমালী ফুঁসে ওঠে, 'কিসের প্রাচিত্তির ? দোষ করেনি তো প্রাচিত্তির কিসের ?'

গিরি গলা চেরে, 'মোকেও প্রাচিত্তির করতে হবে নাকি ? তবে ?'

তারপর বিশৃঙ্খলার মধ্যে জমায়েত শেষ হয়। বনমালীর বৌ চোখ-ভরা জল নিয়ে মুক্তার ঝাপসা মুখখানি দেখে তার চিবুক ধ'রে চুমো খেতে গিয়ে গালটা টিপে দেয়। কয়েকটি স্ত্রীলোক মুখ বাঁকিয়ে আড়-চোখে মুক্তার দিকে চাইতে চাইতে চলে যায়। শঙ্কর নিঃশব্দে মোড়া থেকে উঠে যেমন অযাচিত ভাবে এসেছিল তেমনি অযাচিত ভাবে বিদায় না নিয়ে বনমালীর সঙ্গ ধরে।

বলে, 'যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই ?'

বনমালী আশ্চর্য্য হয়ে যায়।—'ফিরে নেবে না তো খুঁজে মরছি কেন ?'

একটা কথা বলতে গিয়ে শঙ্কর থেমে যায়। ফিরিয়ে আনার মতো অবস্থা যে সকলের থাকে না, মন এমন বিগড়ে যায় যে ঘরসংসার আর যোগ্য না তার, সেও যোগ্য থাকে না ঘরসংসারের। কিন্তু কি হবে ও-কথা বলে বনমালীকে ? মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি তার বৌয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে, ওকে সে

সম্ভাবনার কথা জানিয়ে লাভ নেই। বৌ হিসাবে ওর বৌয়ের মরণ হয়েছে, মনের এমন রোগ হয়েছে বা চিকিৎসার বাইরে অথবা চিকিৎসা করে সুস্থ করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব মানুষের জগতে, সেটা আগে জানা দরকার।

'চেষ্টা করে দেখি কি হয়।' বলে সহানুভূতির আবেগে বনমালীর হাতটা শক্ত চেপে ধরে হাতের মধ্যে, কলেজের বন্ধুর হাত যেমন ভাবে চেপে ধরত।

সিকিখানা চাঁদের আলো ছাড়া মানমুকিয়া অন্ধকার সন্ধ্যা থেকে। বেলতলার ভূতের ভয়—বছরখানেক বছর-দুই আগেও খুব প্রবল ছিল। আজ-কাল বেলতলার ভূতের ভয়ের প্রসঙ্গই যেন লোপ পেতে বসেছে মানমুকিয়ায়। এই বেলতলায় দাঁড়িয়ে গিরি বলে ঘনশ্যামকে, 'তুমি যদি না বলতে ব্যাপারটা, চাপা দিতে—'

ঘনশ্যাম বলে, 'চোখ-কান নেই? ছাখোনি, আমি কি বলি না বলি তাতে কী আসতে যেত? আমি শুধু নিজের অবস্থাটা সামলে নিলাম লোকের মন বুঝে।'

গিরির বাড়ী বেলতলার কাছেই। বেলতলায় সে ভয় পায়নি, বাড়ী যেতে পথের পাশে নালার ওপর তালের পুলটার মাথায় একটা মানুষকে বসে থাকতে দেখে তার বুক কেঁপে যায়।

'কে গা?'

'আমি গা গিরি, আমি।'

'অ:! এত রাতে এখানে বসে আছ?'

'এই দেখছিলাম, গাঁয়ে তো এলো, গাঁয়ে গিরির মন টিঁকবে কি টিঁকবে না।'

'কী দেখলে?'

'টিঁকবে না। গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না। মোর সাথে যদি তোর বিয়েটা হয়ে যেত, মুক্তার মতো একটা ছেলেপিলে যদি হ'ত তোর, ক'বছর ঘর-সংসার যদি করতিস, তবে হয় তো—না, গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না।'

কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে কথা বলতে বলতে, কখন সে তালের পুল ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কথা শেষ না করে আর গিরির ছু'টো ভারি কথা না শুনেই, তাল-মতো টের পায় না গিরি। মুখ বাঁকিয়ে সিকি চাঁদের আলোর আবছাতে অজানাকে সে অবজ্ঞা জানায়। পরক্ষণে মনে হয় বুকের কাছে কিসে যেন টান পড়ে টন-টন করে উঠেছে বুকের শিরা-টিরা কিছু, তাই ব্যথায় গিরি আরেক বার মুখ বাঁকায়।

গিরির মা শুয়েছিল কাঁথা-মুড়ি দিয়ে।

গিরি ডাকে, 'মা? ওমা?'

গিরির মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। গিরির মুখের দিকে চেয়ে বিরক্তির সুরে বলে, 'কে গো বাছা তুমি? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে?'

দুঃশাসনীয়

আগে, কিছুকাল আগে, বেশীদিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এসে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ, ক্ষেত ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক, হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু, বটপুকুরের পুবোত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবদেরে শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম—এসবই যোগাত ভরসা, রাত দুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সহজ লাগসই পরিবেশ ও পরিচয়। গ্রাম তো এই রকমই বাংলার, রাত্রে সব গ্রাম। গা ছম-ছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।

আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে, সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা যাক। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অভিজ্ঞ এইরকম কোন ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্চ্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কার-বশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিরুদ্ধার, এ জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্ত্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্ম্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্ত্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

গাছপালার আড়ালে একটা ছনের বাড়ী। বাড়ীর সামনে ভাঙ্গা বেড়া কাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ও পাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ়

অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসী কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসী, খুড়ী বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদৃষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, 'কে? কে গো ওখানে?'

কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।

সারাটা দিন, সূর্য্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ীর ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোন কোন ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোক-সুলভ লজ্জায়। কোন বাড়ীতে কয়েকটি ছায়া থাকে এক সঙ্গে, মা, মাসী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন, শাশুড়ী, বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্কে সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয় কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।

ভোলা নন্দী কোমরের ঘুন্সীর সঙ্গে দু' আঙুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচহাতী ধুতিখানা বাড়ীর মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে কোন সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে—কাঁধে সর্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয় হাত দিয়ে, নইলে বিপদ। ভোলার বৌ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজ ছেলে পটলের বৌ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।

'কতকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা?'

পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে।

'আর সয় না।'

বলে' শাল কাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাস্ করে ঠুকে দেয়। 'আর সয় না, আর সয় না গো।' বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে খুঁটিতে, গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর-লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধুলায় ধূসর হয়ে যায় তার অপুষ্ট দেহ ও পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনকে পোড়া দেহের লজ্জা!

বৈকুণ্ঠ মালিক মাঠে মাঠে ভীষণ খাটে, নিজকে আর বৌটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। সন্ন্যাসীবাবুর দালানের পর আমবাগান, তার এপাশে রাস্তা এবং ওপাশে ঘুপচিমারা পথের ইয়ার্কি, তার কাছে দু'বিঘে বিচ্ছিন্ন ধান জমির লাগাও বৈকুণ্ঠের মোট আড়াইখানা কুঁড়ে নিয়ে তিন পুরুষের বসতবাটি। আড়াইখানা কুঁড়ের মধ্যে ঘর বলা যায় একটাকে, তার ঝাঁপের দরজা, বাঁশের দেয়াল, বাঁশের দুয়ার, বাঁশের খিল। ঝাঁপে থপ থপ থাপড় মেরে বৈকুণ্ঠ প্রায় পিত্তি-ফাটা তেতো গলায় বলে, 'বাড়াবাড়ি করছিস ছোট বৌ, বাড়াবাড়ি করছিস বড়। মোর কাছে তোর লজ্জাডা কি?'

তার বৌ মানদা ভেতর থেকে বলে, 'মুখপোড়া বজ্জাত! বোনকে কাপড় দিয়ে বোয়ের সাথে মস্করা? যমের অরুচি, লক্ষ্মীছাড়া।'

সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা—কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা তক্ ঝাঁপের দু'পাশে এমনি গালাগালি চলে দু'জনের মধ্যে। বাড়ীর তিনদিকে মাঠ ভরে শন উঁচু হয়ে আছে আড়াই থেকে তিন হাত। ছুটে গিয়ে ডুব দিলে লজ্জাসরম সব ঢাকা পড়ে যায়—আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণভরে কাঁদা যায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। এই শনের বনের মাঝখানের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বেনারসী শাড়ী পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ'হুনের ছাউনীর দিকে চলতে থাকে গর্ব্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে ছাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রি তক্, সারা দিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপি চুপি ঘাটে আসত দুটোচারটে বাসন আর কলসী নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগী?

শনক্ষেতের রঘরঘকে রঘু একটু মস্করা করে বেনারসী পরা মালতীর সঙ্গে, তা দেখে যেন যাত্রাদলের মেয়ে সাজা ছেলে সখীর মতো ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রাণুর হাপুস-কাঁদা যোল বছরের কাঁচা মেয়ে। এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে হনহনিয়ে, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালান চলে। ইস্! কি সাদা ওর পরনের ধুতিটা।

'অ বিন্দু! দাঁড়া।' রঘু ডাকে।

বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয় আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, 'কাল—কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে আজ।'

বেনারসী পরা মালতী বলে, 'ইহিঃ, খুকী মোর ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড় খুলে। খোল্ কাপড়। যাবি তো চ', নয় কাপড় খুলে দিয়ে ঘরে যা।'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'ঝাঁপ ভাঙবো ছোট বৌ।'

মানদা বলে, 'ভাঙো—মাথা ভাঙব তোমার আমি।'

সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামীর কাছে মেয়েমানুষের কাছে লজ্জা কি?

ভূতির ছেলে কানুর বয়স বছর বার। ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগার দিন। খিদেয় কাতর হয়ে কানু ভূতির কয়েদখানার বাইরে থেকে কেঁদে বলে, 'মা, ওমা! খিদে পায় যে?'

ভূতি বলে ভেতর থেকে, শিকেয় হাঁড়িতে পান্তো আছে, খে-গে যা নিয়ে।

'পাড়তে পারি না যে। তুই দে।'

ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, 'যাবো? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কি আসে যায়? মা কালীও তো ন্যাংটো। ওমা কালী, তুই-ই বল মা, যাবো? বল্ মা, মোর হিদয়ে থেকে একটা কিছু বল।'

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি হি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না। জল শুকিয়ে গেছে চোখের। চোখ শুষ্ক, জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।

হঠাৎ ছেঁড়া মাদুরটা চোখে পড়ে।

'দাঁড়া একটু।'

মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়। একহাতে শক্ত করে ধরে থাকে গায়ে জড়ানো মাদুরটা, আর এক হাতে দুয়ার খুলে রসুই ঘরে গিয়ে শিকে থেকে নামাতে যায় পান্তার হাঁড়িটা। পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা, পান্তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তখন মাদুরটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে ভূতি এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ করে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে সুরু করে কান্না। আর এমনি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এবার তার শুকনো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে মেঝের ভাত ভেজানো জলে।

রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, 'আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরের ডুবব, খোদার কসম।'

রাবেয়া ক'দিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষীর ঘরের বৌ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলেনি, শাক পাতা কুড়িয়ে এনে খুদ কুঁড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করছে মরণ! খেতে দিতে না পারার দোষ ও গ্রাহ্য করেনি, পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ, দিনভর ফুঁসে ফুঁসে গঞ্জনা দিচ্ছে। বিবিকে যে পরনের কাপড় দিতে পারে না সে কেমন মরদ, তার আবার সাদি করা কেন?

অনুনয় করে আনোয়ার বলে, 'আজিজ সাব্ খপর আনতে গেছেন। হাতিপুরের কাপড়ের ভাগ মিলবে আজকালের মধ্যে। একটা দিন সবুর কর আর।'

'সবুর! আর কত সবুর করব? কবরে যেয়ে সবুর করব এবার।'

সেমিজ না পরলে দু'ফেরতা শাড়ী পরা রাবেয়ার অভ্যাস। এক-ফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয়নি কোন দিন। পায়খানার চটের পর্দ্দাটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষ বাবুর বাড়ীর মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙীন শাড়ী বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ীর মেয়েরা চুমকি বসানো হাল্‌কা শাড়ীর তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী! আল্লা, এ কোন্ মরদের হাতে সে পড়েছিল।

রাত্রের ছায়ামূর্ত্তি হয়ে রাবেয়া গিয়ে দেখে আমিনা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে, তার গায়ে দুটো বস্তা চাপানো, চুণের বস্তা! বস্তার নিচেই আমিনার গায়ের চামড়া জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে, 'গা জ্বলছে—পুড়ে যাচ্ছে! আজ ঠিক মরব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।'

আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ শ' চাষী ও কামার কুমার জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াইশ' ভদ্র স্ত্রীপুরুষের কাপড় যোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহাকুমা হাকিম গোবর্দ্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উস্কানি যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সতের জন সাঙ্গপাঙ্গ। সতের মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশ' তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেক শ' গাঁট ধুতি শাড়ী জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা না করে থাকলে অবশ্য বিচারে খালাস পাবে, মিথ্যা হায়রাণির জন্য ক্ষতিপূরণের পাল্টা নালিশও রুজু করতে পারবে আইন অনুসারে কিন্তু গুরুতর নালিশ যখন হয়েছে ওদের নামে, হাজতে ওদের থাকতে হবে। জামিন দেওয়ার অনেক বাধা। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জামিনের কথা।

ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' তারা যা আদায় করেছে, এবার কাপড়ের ভাবনা কারো ভাবতে হবে না। মনোহর শা'র প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে,

দেখা যাক। আশা ছেড়ে দিয়েও হাতিপুরের নরনারী ভেবেছে, উপায় কি।

দু'জনে আজ সদরে গিয়েছিল, কবে হাতিপুরে এসে পৌঁছবে হাতিপুরের জন্য নির্দিষ্ট-করা কাপড়ের ভাগ, তারই খবর জানতে। গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে তাদের। ছায়ারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও আগ্রহ ও উত্তেজনার শেষ নেই।

বিকালে ছোটখাট একটি জনতা জমে উঠল গ্রামের পুব প্রান্তে কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে।

ঘোষকে একা বাস থেকে নামতে দেখে জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল। ভিড় দেখে ঘোষও গেল একটু ভড়কে।

'কী হল ঘোষমশায়, কাপড়ের কী হ'ল ?'

'গোলমাল হয়েছে একটু।'

'গোলমাল ? কিসের গোলমাল ?'

'কলকাতা থেকে মাল আসে নি। ভাই সব, আমরা জীবনপাত করে—'

বঙ্কু'র সাঙ্গপাঙ্গদের একজন, সরকারদের অবিনাশ, সে সময়টা কলেরায় মরমর হয়ে থাকায় মারপিটের নালিশে হাজতে যেতে পারেনি। সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে, সাত ওয়াগন। আমি দেখেছি, পুলিস দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুণে গুণে চালান দিল।'

'ও সদরের জন্যে। হাতিপুরের 'কোটা' আসে নি।'

'কবে আসবে ?'

'আসবে। আসবে। ছুটোছুটি করে মরছি দেখতে পাচ্ছ তো ভাই তোমাদের জন্যে ?'

হতাশ ম্রিয়মাণ জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝাই প্রকাণ্ড এক লরী রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদের সামনে রাস্তার সেই মোড়ে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে আজিজ, তার পাশে সুরেন ঘোষের ভাই নরেন ঘোষ। সুরেন ঘোষ মরিয়া হয়ে পাগলের মতো হাত নেড়ে ইসারা করে, আজিজ জনতার দিকে তাকিয়ে তার ইসারা ত্যাখে, ড্রাইভারকে কি যেন বলে, থামতে থামতে আবার গর্জ্জন করে লরীটা জোরে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্প দূরে পথের বাঁকের আড়ালে। লাল ধুলায় সৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।

জনতা ঘুরে দাঁড়ায়, একপা দু'পা এগিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাস তখনো ছাড়েনি। বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পোষাক-পরা সুদেব, কে মরে চামড়ার চওড়া বেল্টটা তার কী চকচকে। লালপাগড়ী আঁটা একজন চা আনতে যায় সুবলের দোকান থেকে—চা এবং একটা কিসের যেন চ্যাপ্টা শিশি আর সোডার বোতল। ঘোষের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সুদেব ধরায়, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে, যেন ভেতরে কাঁচা কয়লায় আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।

'কিসের ভিড় ?'

'কাপড় চায়।'

'হাঃ হাঃ। পরশু পচেটপুরে সার্চ্চে গেছলাম নন্দ জানার বাড়ী। বাড়ীর সামনে যেতেই হাত জোড় করে বলল, কী করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুই ঘরে যাক, সারা বাড়ী তল্লাস করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে! রসুই ঘরে ফেরারী ছোঁড়াটাকে সরিয়ে সারা বাড়ী সার্চ্চ করাবে। আমি বললাম, বেশ। তারপর সোজা রসুই ঘরের দরজা ভেঙে একদম ভেতরে। আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিকের কিচিরমিচির সুরু হয়ে গেল মশায়। সব কটাই প্রায় বুড়ী, কিন্তু একটা যা ছিল মিঃ ঘোষ, কি বলব আপনাকে। পাতলা একটা উড়নি পরেছে, একদম জালের মতো, গায়ের রঙ দেখে তো আমি মিষ্টার—'

হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে ফিরে যায় ধীরে ধীরে। এদিকের আশা ফুরিয়ে যাওয়ায় হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশী। এভাবে যখন হল না তখন এবার কী করা যায়। কেউ যদি উপায় বাৎলে দিত।

'জান্ নয় দিলাম রে আব্বাস,' আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, 'কী জন্যি জানটা দিব তা বল্ ?'

ভোলা বলে, 'লুঠ করে তো আনতে পারি দু'এক জোড়', কিন্তু তারপর ?'

তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে ছোট চাঁদটি উঠেই আছে, দিন দিন একটু একটু বড় হবে। ক'দিন পরে জ্যোৎস্নার তেজ বাড়লে বন্দিনী ছায়াগুলির কী উপায় হবে কে জানে। চাঁদ ডুবলে তবে যদি বাড়ীর বাইরে যাওয়া চলে, রোজ পিছিয়ে যেতে থাকবে শেষরাত্রির দিকে চাঁদ ডুববার সময়। বিলের ধারের বাঁধানো সড়কে নানারঙা শাড়ী পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা ক'জন হাওয়া খাচ্ছেন। কাপড় তৈরীর কলেই যে হাতিপুরের লোক কাজ করে ওই তার প্রমাণ। কিন্তু আরও কত লোকেও তো কাজ করে সতের মাইল দূরে কাপড় তৈরীর কলে, তবে কেন ও অবস্থা তাদের ? সবাই ভাববার চেষ্টা করে।

হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।

'তবে যে ঢেঁটরা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে ?' সকলে প্রশ্ন করল সন্ত্রস্ত হয়ে।

রসুল মিয়ার দালানের সামনের রোয়াকে এক ঘণ্টা ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে আনোয়ার বাড়ী গেল সন্ধ্যার পরে। শাড়ী না পাক, কথা সে আদায় করেছে। বাড়তি শাড়ী ঘরে ছিল কিন্তু রসুল মিয়াও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। অবস্থাটা একটু ভাল করে বুঝতে চান আগে। কদিন পরে তিনি একখানা শাড়ী অন্ততঃ আনোয়ারকে দেবেন, আজ হবে না। তাই হোক, তাও মন্দের ভাল। রসুল মিয়ার কথার খেলাপ হবে

না আশা করা যায়। রাবেয়াকে এই কথাটা অন্ততঃ বলা যাবে।

রাবেয়া খানিক পরে ঘাট থেকে ফিরে আসে। অদ্ভুত রকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে। আনোয়ার গোড়ায় তাকে দুঃসংবাদটা দেয়।

রাবেয়া বলে, 'জানি।' তারপর আনোয়ার রসুল মিয়ার কাছে দু'চারদিনের মধ্যে শাড়ী পাবার ভরসার খবরটা জানায়।

এবারও রাবেয়া বলে, 'জানি।'

দাওয়ায় এসে রাবেয়া তার কাছেই বসে। তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ী। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পর্দা জড়িয়ে নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়। তাই বোধ হয় সে শান্ত হয়ে বসে কথা বলে আনোয়ারের সঙ্গে, ফুঁসে না, শাসায় না, খোঁচায় না। মনে মনে গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনোয়ার কয়েকদিন পরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, 'খাবেনি? চল।'

'চল।'

দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠানের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে ছুঁড়ে দেয় উঠানের কোণে।

'ঘিন্না লাগে বড়। গা কুটকুট করছে।'

আনোয়ারের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।

'ফের নেয়ে নি।'

ঘরে থেকে ভরা কলসী এনে রাবেয়া মাথায় উপুড় করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুঠিটা খুলে চিপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।

'পানি ঢেলে দিলি সব?'

'ফের আনব।'

আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।

নমুনা

কেবল কেশবের নয়, এরকম অবস্থা আরও অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু'তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।

বছরখানেক আগের কেশব ভাল ছেলে খুঁজেছে, নগদ গহনা জামা কাপড় আর তৈজসপত্র সমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম্ম, যথারীতি দান করতে সে সর্ব্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্ব্বস্ব খুব বেশী না হওয়ায় যেমন তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটেনি। শৈলর রূপও আবার এদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বাড়ন্ত মেয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলে-মেয়ের এবং ঐ শৈলর পেটের অন্ন—এক পেটা, আধ পেটা, সিকি পেটা অন্ন—যোগাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, ভাল করে বুঝবার অবকাশও কেশব পায়নি। বড় ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটা চাকরি করত স্কুলে তেতাল্লিশ টাকার মাষ্টারি। ছেলেটা মরেছে এক বিশেষ ধরণের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যে একশো ছয় ডিগ্রিতে ওঠে আর ভরিখানেক সোনার দামে যতটুকু গা-ফোঁড়া ওষুধ মেলে তা যথেষ্ট না হওয়ায় পাঁচ দিনের মধ্যে জোয়ান একটা ছেলে মরে যায় এমন ম্যালেরিয়ার গুণটাই শুধু কেশবের শোনা ছিল।

আরেকটা মেয়েও কেশবের মরেছে, সাধারণ ম্যালেরিয়ায়। এ ম্যালেরিয়া কেশবের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া শত্রু। এর অস্ত্র কুইনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেক দিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি কুইনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গুলে কুইনিন দিতে গিয়ে ময়দার আঠা তৈরী হয়ে গেল!

সদয় ডাক্তার বলল, পাগল, ও খুব ভাল কুইনিন। নতুন ধরণের কুইনিন—খুবই এফেক্টিভ। নইলে দাম বেশী নিই কখনো আপনার কাছে?'

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর সদয় ডাক্তার রাগ করেছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মতো শাসনভরা নিন্দার সুরে বলেছিল, 'আপনারাই মারলেন ওকে। কুইনিন? শুধু কুইনিনে কখনো জ্বর সারে? পথ্য চাই না? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।'

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর

দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল শৈলর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সে জন্য কেশবের মনে কোন আফশোষ নেই। সে বরং ভাবে সে মেয়েটা মরে বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ!

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্টি। বড়ই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও ফ্যাকাসে। ছোট ছোট চোখে স্তিমিত নিস্তেজ নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্য্যন্ত ধার্ম্মিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলে না। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কি ভাবে যেন মারা যায়। দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে স্নেহ করা দূরে থাক, কালাচাঁদ তাকে জোর জবরদস্তি করে একটা বাড়ীর বাড়ীউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ী নয়। অনেক তফাতে ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ি। সে বাড়ীতে তখন দশ বারটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়ীটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দু'বাড়ীতে এখন মেয়ের সংখ্যা সতের আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ীর কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধপধপে আধহাতা সেমিজের উপর ধপধপে থান পরলে তাকে সম্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে সহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ এদিক ওদিক ঘুরেছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? তাছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভাল খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় রূপ-সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরী করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলান রূপ সৃষ্টির স্থূল রঙীন কুলেল কায়দা।

প্রায় কীর্ত্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আফশোষ করে কালাচাঁদ বলে, 'আহা চুক্ চুক্! আপনার অদৃষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়।'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু চোখ দু'টি একটু ছল ছল পর্য্যন্ত করল না! দেখে সে একটু আশ্চর্য্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কি যেন হয়েছে দেশ শুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্ত্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে কাঁপিয়ে তুলতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

সহরের আস্তানা হতে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসা-যাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখেনি, নিজে ঘা খায়নি। সে কেন কেশবের নির্ব্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল ডাল মাছ তরকারী এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দু'বেলা তিন বেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক। সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়, পাগল করে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়ীও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর সেমিজটি প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে একসময়।

'শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবসা সম্পর্কে কাণাঘুষা কেশবের কাণেও এসেছিল। সে চাপা আর্ত্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়ীতে রাখবে? শৈলিকে বাড়ীতে রাখবে তোমার?'

'বাড়ীতে নয় তো কোথা রাখবো চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব রাজী হয়ে বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি।' কালাচাঁদ খুসী হয়ে বলে, 'বুধবার আসব। একটু বেশী রাতেই আসব, গাড়ীতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কি আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ী গেছে।' কেশব চোখ বুজে বলে, 'কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারো অত জানবার গরজ আর নেই। যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।'

শৈলকে দেখা যাচ্ছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে; মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচড়া করে ওঠায় কালাচাঁদ একটু শিহরে ওঠে। সারা দেশটাতে বড় সস্তা আর সহজ হয়ে গিয়েছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই, তবু ভাবতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী

পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে। ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিমঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রী হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু'জন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্য্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশও তার পরিবারের ঝড়তি পড়তি মানুষ ক'টাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

তাছাড়া ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মতো ভদ্রও নয়। শূদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্থ মানুষ। ওরা যা পেরেছে কেশবের কি তা পারা উচিত? বুকটা ধড়ফড় করে কেশবের। তার মৃতদেহের নাড়ী সচল হয়। তালাধরা কাণে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ার স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুল চন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলোমেলো উল্টোপাল্টাভাবে ভেসে আসে ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী, চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে যেন পড়তে থাকে সে শৈলের বাপ।

কচুশাক দিয়ে ফ্যানভাত দু'টি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে কার বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। ঝিমায় আর গুণগুণানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায়: তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! তাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!

শৈলর রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখবেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নেই! কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। প্যাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ হয় না; রক্ত বার হলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেট মোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্য্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠে দুপুরে মেঘলা করে, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে কেশব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ শানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে নিয়ে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল শানাই বাজিয়ে এসেছে। তার অবর্তমানে সদয়কে শানাইওয়ালা আনতে হয়েছে সদর হতে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রেখে কোনমতে বাড়ী এসে কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলিয়ে পড়ল। পেট ভরে খেলে যে মানুষের এরকম দম আটকে মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পেল প্রথম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তারা এমনিভাবে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইল, যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাচ্ছে। পথে একবার এবং বাড়ীতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসে তার পেটে খালি হাত মালিশ করে দিতে লাগল। বাড়ীতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করছে। কালাচাঁদ এল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জ্জনে গাড়ী রেখে সে একজন লোক সঙ্গে করে এসেছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হচ্ছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়ীতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে শানাই বাজছে।

কেশব কেঁদে বলল, 'ও বাবা কালাচাঁদ।'

'আজ্ঞে?'

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব, আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না? বলুন তবে কী করব। মালপত্র গাড়ীতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করে থাকে। টর্চ্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখে নেয়। চোখ দেখে নেয়। চোখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মতো কেশবের জলভরা চোখ জলজল করতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করে কালাচাঁদ বলে, 'চটপট করাই ভাল। এই কাপড় জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয় না বারণ করে স্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলর মা আরেকটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়, 'মালগুলো সব আনগে যা বস্তি ওখেদ নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়ীতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ্য করে কালাচাঁদ টর্চ্চটা জেলে রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম করছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতায় থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হয়ে বসেছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙীন সাড়ী, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি কর বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলিকে তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও।'

'বিয়ে? আপনি পাগল নাকি?'

শৈলর হাতে জামা কাপড় দিয়ে কেশব গিয়ে কালাচাঁদের হাত ধরে। মিনতি করে বলে যে বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য।

'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুসী কোরো, সে তোমার ধর্ম্মো। আমার ধর্ম্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'

দুজন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য এসে পড়েছিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাক্, তবু বেশী লোক সঙ্গে না করে মাঝরাত্রে গায়ের একটা মেয়েকে নিতে আসবার মতো বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পেয়ে তাকে কেটে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ।

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে সে বলল, 'যা করবার করুন চটপট্।'

কালাচাঁদের কাছ হতেই দেশলাই চেয়ে নিয়ে কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালল। ঘরের বাইরে জ্যোৎস্নায় গিয়ে শৈল নতুন ও রঙীন সায়া ব্লাউজ শাড়ী পরে এল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বারবার মনে হতে লাগল, প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করলে বাপের পেট-ব্যথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমে যেত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পেত না পেটের ব্যাথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয়, 'শীগগির করুন।' ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানত না। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে এ সব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভাল লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুল-পাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জ্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফস্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়োর এ পাগলামিতে রাজী না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবে যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টেনে নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

কালাচাঁদের গা-ও ঘেমে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছে শক্ত করে শৈলর হাত ধরে টানতে টানতে সে বার হয়ে গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানীর কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোন পক্ষই বিদায় নেয় না বলে অবশ্য নয়; কালাচাঁদের ভাল লাগছিল না। শৈলও থ' বনে গিয়েছিল।

শিউলি জবা গাছের মাঝ দিয়ে বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ-ভাবটা শৈলর কেটে গেল। সেইখানে প্রথম হাত টেনে প্রথমবার সে বলল, 'আমি যাব না।'

আরও কয়েকবার হাতটানা ও যাব না বলার পর জোরে কেঁদে উঠবার উপক্রম করায় তারই শাড়ীর আঁচলটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে কালাচাঁদ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তখন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হাল্কা রোগী শরীরে জোর এল অদ্ভুত রকমের। পর পর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাত পা ছুঁড়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে লাগল। মুখে গোঁজা আঁচল খসে পড়লেও দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

সব শুনে কালাচাঁদের মন্দোদরী গোসা করে বলল, 'কী দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামার? আর কি মেয়ে নেই পিথিমীতে?'

'কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

'ঝোঁক চেপে গেল। মাইরি? ওই একটা বোঁচানাকী কালো হাড়গিলেকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল।'

'দুত্তোরি, সে ঝোঁক নাকি?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেক কাল নমস্কার করেছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিষ। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথাব্যথা, আদর-যত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হয়ে আসতে লাগল। সাদা থান ও সেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মতো যে মন্দোদরী, তার চোখে দেখা দিল কুটিল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেল।

শৈলর চেহারাটা তখন অনেকটা ফিরেছে।

'ওকে বাড়ী নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'কেন?'

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে করা বৌ। ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ী নিয়ে যাই, এক কোণে পড়ে থাকবে দাসী-চাকরাণীর মতো।'

দু'জনে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেল। বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত

কলহ। কালাচাঁদ রাগ করে একটা মদের বোতল হাতে করে শৈলর ঘরে গিয়ে ভিতর হতে খিল বন্ধ করে দিল।

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ী। স্ত্রীর সঙ্গে বাকী দিনটা বোঝাপড়া করে সন্ধ্যার পর গাড়ী নিয়ে শৈলকে আনতে গেল।

বাড়ীতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।

'লোক আছে! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুণতে আরম্ভ করল। গোণা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'লোকটা কে?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, 'খেয়াল চেপেছে, ও আবার বেশী টাকা কি? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।'

বুড়ী

বুড়ীর বড় পুতি আজ যাবে বিয়ে করতে। ছেলের ছেলে তার ছেলে, বড় সহজ কথা নয়। বুড়ীকে বাদ দিয়েই বাড়ীতে চলেছে আপনজনে ভরাট বাড়ীর ছেলে বিয়ে করতে গেলে যত কিছু কাণ্ড-কারখানা হয়—রাজ সংসারের সাধারণ হৈ-চৈও যেমন ওকে বাদ দিয়ে চলে। তবু যেন বুড়ী আজও হাজির আছে সব কিছুর মধ্যে প্রত্যক্ষে আর পরোক্ষে, বাড়ীর প্রতিদিনের সমবেত জীবনযাত্রাতেও যেমন থাকে। তিন কুড়ি বছরের জীবন্ত উপস্থিতির অভ্যস্ত ডালপালা আর শিকড় নিয়ে আছে—বড় ঘরের পশ্চিমের ওই মরা হাজা শুকনো গাছটার মতো, যার ডালে সারাদিন পাখী কিচির-মিচির করে আর নিশুতি রাতে ভাঙ্গাচোরা হাওয়া আওয়াজ তোলে মরমর মরমর।

ন্যাকড়া কাঁথার কাঁড়ি আর পুঁটুলি বালিশ নিয়ে বুড়ী দাওয়ায় বসে থাকে, দাওয়ার চালা নীচু করে নামানো। মরচে-ধরা কোমর, বাঁকা পিঠ, শনের নুড়ি চুল, লোল চামড়া, ফোকলা মুখ, তোবড়ান গাল, ছানিকাটা নিষ্প্রভ চোখ। লাঠি ধরে গুটি গুটি চলতে ফিরতে পারে, শক্তই আছে মনে হয় চামড়া-ঢাকা হাড় আর পাঁজর-ঢাকা ফুসফুস—বেশ জোরে চেঁচাতে পারে। শুয়ে বসেই থাকে বেশী, বিড় বিড় করে আপন মনেই বক বক করে কাটায় বেশীর ভাগ সময়। থেকে থেকে তারস্বরে সংসারের খুঁটিনাটি অব্যবস্থার সমালোচনা করে। পোড়া তামাকপাতার গুঁড়ো খায়। মাঝে মাঝে অকারণে অদ্ভুত আওয়াজে খলখলিয়ে হাসে।

'মরণ।' বলে বৌ আর নাতবৌয়েরা। কেউ জোরে, কেউ নীচু গলায়। নীচু গলায় বলে কচি বৌয়েরা। বুড়ীকে মান্য ক'রে নয়, বুড়ী শুনলেও কানে তোলে না, কানে তুললেও কিছু আসে যায় না। ছোট মুখে বড় কথা শুনে শাশুড়ী ননদরা পাছে চটে যায়, এই ভয়।

নন্দ বাহারে চুল ছেঁটেছে নিতাই পরামাণিককে দিয়ে। নগদ অটগণ্ডা পয়সা আদায় করেছে নিতাই, তার ছেলে বরের সঙ্গে যাবে, কত কিছু পাবে, তবু। বাড়ীর সাতজন এই নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিতাইকে মন্দ বলেছে। এরকম দিনে-ডাকাতি এদের সয় না।

বুড়ী ডাকে পুতিকে, বলে, 'অ নন্দ, অ ঘাড়-ছাঁটানি ছোঁড়া, শোন, শোন ইদিকে, একটা কথা বলি। বিয়া তো করবি ছোঁড়া, মেয়াটা কুমারী বটে তো?'

নন্দ'র মা শুনতে পেয়ে তাঁকে বলে, 'মরণ। কথা শোন বুড়ীর।' তারপর চিন্তিত হয়ে ভুরু কঁচকে বলে, 'নয় বা কেন। মেয়া নাকি বড় বাড়ন্ত-ধাড়ী মেয়া।'

'ঘর ভাল।'

'ভাল ঘরে মন্দ বেশী। নয় ধাড়ি করে রাখে মেয়াকে?'

বুড়ীর কাছে উবু হয়ে বসে নন্দ বলে, 'কুমারী না তো কি—তোর মতো বুড়ী?'

'পাবি মোর নাখান কুমারী পিথিমী ঢুঁড়ে? ফোকলা মুখে বুড়ি গাল-ভরা হাসি হাসে, 'একরাত্তির শুয়েছি তোর দাদুর সাথে? বিয়ের রাতে ভোঁস ভোঁসিয়ে পটল তুলল না তোর দাদু! সে এক কাণ্ড বটে! ভোঁসভোঁসানি শুনে আমি তো ডরিয়ে গিয়ে কান্না ধরেছি গলা ছেড়ে —হাউ-মাউ ক'রে দোর খুলে বাইরে গিয়ে। বাড়ী শুদ্ধ ছুটে এসে বলছে, কী কী, হয়েছে কী? আর হবে কী,

মোর কপাল! বুড়োর ততখণে হয়ে গেছে গা।' বুড়ী খলখলিয়ে হাসে।

পুতি কিন্তু তার হাসে না। পুতির মুখে তার দ্বিধা সংশয় সন্দেহ, অবিশ্বাসের পাতলা মেঘ। খানিক ঘাড় বাঁকিয়ে থেকে সে বলে, 'তাও হবে বা। মস্ত ধেড়ে মেয়ে, ওকি ঠিক আছে।

বুড়ী গালে হাত দেয়।—'মর তুই বাঁদর। নিজে না পছন্দ করলি তুই বড় মেয়ে দেখে?'

'তা তো করলাম—'

'বোকা, হাবা, বজ্জাত। কুমারী মেয়ে নষ্ট হয়? আমি নষ্ট হইছি? বিয়ার রেতে সোয়ামী মোলো, দিন দিন যেন বাড়লো সবার মোকে নষ্ট করার চেষ্টা, নষ্ট হইছি আমি? কুমারী না হই তো তোর বাপের কিরে। মেয়া বদ হয় সোয়াদ পেয়ে, কুমারী কি খারাপ হয় রে বেজম্মার পুত? মরণ তোর!—ষাট, ষাট,! দুগগা, দুগগা! তোর বালাই নিয়ে মরি আমি।'

'সত্যি বলছিস?' পুতি বলে তার মেঘকাটা মুখে আলো ফুটিয়ে।

'না তো কি?'

কাজ অকাজের ফাঁকে ফাঁকে সবাই ছাখে নন্দ উবু হয়ে বুড়ীর সামনে বসে আছে তো বসেই আছে। কথার যেন শেষ নেই দু'জনের। থেকে থেকে দু'জনে আবার হেসে উঠছে খলখলিয়ে, হি হি করে।

মেনকা হাপুস নয়নে কাঁদে আর বলে, 'আমি কোথায় যাব? কার কাছে যাব? মোর কে আছে?'

নন্দর বৌকে বাড়ীর কারো পছন্দ হয়নি। একে ধাড়ী মেয়ে, তাতে দূর সম্পর্কের মামাবাড়ীতে মানুষ, বিয়েতে পাওনা গণ্ডা জোটেনি ভালরকম, গয়না যা দেবে বলেছিল মেয়ের ধড়িবাজ মামা—তা পর্য্যন্ত সবগুলি মেনকা নিয়ে আসেনি। তার ওপর নন্দ নিজে পছন্দ করে' বাড়ীর লোকের অমতে তাকে বিয়ে করেছে—বিয়ে করে এনে বাড়ীর লোকের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে মাথায় করে রেখেছে বৌকে। বিয়ে সম্পর্কে ছেলের অবাধ্যতার জ্বালা মানুষের জুড়োয় না, মন বিষাক্ত হয়ে থাকে বৌয়ের ওপরেই। রোজগেরে ছেলের ওপর তো গায়ের ঝাল ঝাড়া যায় না।

তার ওপর বিয়ের এক বছরের মধ্যে নন্দ মারা গেল। বর্ষার শেষে পথঘাট উঠানের কাদা যখন শুকোতে আরম্ভ করেছে, বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে নন্দ তখন বৌ নিয়ে দু'মাসের জন্য পশ্চিমে বেড়াতে যাবার জন্য আয়োজন করছে। এ বাড়ীর কোন বৌ কোন কালে একা স্বামীর সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত কোথাও বেড়াতে যায়নি।

এমন অলুক্ষুণে বৌকে কে বাড়ীতে রাখবে?

মেনকার মামাকে লেখা হয়েছিল তাকে নিয়ে যাবার জন্য। সে জবাবও দেয়নি। রাখালের সঙ্গে তাই তাকে পাঠিয়ে দেবার আয়োজন হচ্ছে। মামাবাড়ীর দরজায় তাকে নামিয়ে দিয়ে রাখাল চলে আসবে, তারপর যা হবে তা বুঝবে মেনকা আর তার মামা।

মেনকা কিন্তু যেতে নারাজ। মামাবাড়ীতে শুধু মারধোর আর ছ্যাঁকা দেওয়ার ভয় থাকলে কথা ছিল না, মামাবাড়ীতে তাকে ঢুকতেই দেবে না সে জানে। দরজা থেকেই তাকে পথে নামতে হবে।

মেনকা তাই হাপুস নয়নে কাঁদে আর বলে, 'আমি কোথা যাব? কার কাছে যাব?'

রোয়াকে বসে বুড়ী ডাকে, 'এই ছুঁড়ি, শোন।'

মেনকা কাছে এসে দাঁড়ায়।

'কাঁদিস কেন হাপুস চোখে, যোয়ান মদ্দ মাগী?,

'আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে গো।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছে? কে তাড়িয়ে দিচ্ছে? তাড়িয়ে দিলেই তুই যাবি? তোর শ্বশুর ঘর, কে তাড়াবে তোকে?'

মেনকা চুপ করে থাকে।

'মোকে পেরেছিল তাড়াতে? একরাত ঘর করিনি সোয়ামীর, বিয়ের রাতে ছটফটিয়ে মোলো। সবাই বলে, দূর দূর, অলুক্ষুণে বৌ। বিয়ে হল, সোয়ামী খেয়ে কুমারী র'ল, একি মেয়ে গা? দূর! দূর! আমি গেলুম? মাটি কামড়ে রইলাম এখানকার। পারল কেউ তাড়াতে মোকে? অ্যাদ্দিন তুই সোয়ামীর সাথে শুলি, বাড়ীর বৌ হয়ে র'লি তোকে যেতে বললে তুই যাবি? মাটি কামড়ে থাক। খুঁটি আঁকড়ে থাক।'

মেনকার চোখে আশার আলো দেখা দেয়। সে সামনে উবু হয়ে বসে বুড়ীর।

বাড়ীর সবাই তাকিয়ে ছাখে মেনকা আর বুড়ীর মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস কথা চলেছে তো চলেইছে, কথার যেন শেষ নেই।

—গোপাল শাসমল—

সাতপাকিয়ার গগন শাসমলের ছেলে গোপাল গিয়েছিল জেলে। একদিন ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরল। জেলে যাওয়ার সময় তার বাড়ীতে ছিল মণ পঁচিশেক ধান, দুটো বলদ, একটা গরু, পুঁই-মাচা, লাউ-মাচা আর তিনটে সজনে গাছ। বাড়ী ফিরে দেখল, ধান মোটেই নেই, একটা বলদ নেই, গরুটা নেই, পুঁই মাচায় নেই, পুঁই, আর লাউ-মাচায় নেই লাউ। সজনে গাছ তিনটে আছে। সজনে গাছ তিনটির বয়স প্রায় গোপালের সমান। গাছগুলির অনেক ডাঁটা আর আঠা গোপাল খেয়েছে। জেলে যাওয়ার সময় পর্য্যন্ত ডাঁটার চচ্চড়ি এবং ছেলেমানুষ থাকার বয়সটা পার হওয়া পর্য্যন্ত আঠা। আধপেটা ভাত খেয়ে এই বিশ বছর সে জমাট-বাঁধা সজনে আঠা সংগ্রহ করে করে চিউইং গাম-এর মতো চিবোতে চিবোতে অনেকক্ষণ ধরে কেবল এই কথাটাই ভাবল যে, জেল-ফেরত ছেলেকে আধপেটা ভাত দিতে মা উপোস দিয়েছে আর বোনকে না খাইয়ে রেখেছে, এতো ভাল কথা নয়। এর চেয়ে জেলে থাকাই যে ভাল ছিল!

তারপর গাঁ ঘুরে আসতে বেরিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার সাধ হতে লাগল, পথের ধূলায় কিম্বা কাঁটা বনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

গাঁ প্রায় উজাড় হয়ে গিয়েছে তার অনুপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে। বেঁচে যারা আছে তারাও জীবন্ত নয়। খুব বেশী জীবন্ত কোনদিনই ছিল না, কিন্তু যে-টুকু ছিল তাতেই দলাদলি ঝগড়াঝাঁটি পুজাপার্ব্বণে উৎসব এমন কি সময় সময় মারামারি কাটাকাটিও করেছে গাঁয়ের লোক। আজ সকলে ধীর স্থির শান্ত সুবোধ মানুষ—চোখে হতাশার পর্দ্দা, চলনে হতাশার ভঙ্গি, কথায় হতাশার লম্বা টান, প্রতিটি মানুষ যেন—আর কেন, কি আর হবে, সব মায়া, মরা ভাল ইত্যাদির ক্ষীণ প্রাণবন্ত প্রতীক। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া আর প্যাঁচড়া। এমন ব্যাপক না হলেও অন্য রোগেরও ছড়াছড়ি। এমন প্যাঁচড়া গোপাল জীবনে কখনো ছাখেনি। যাঁকে ভাল করে ধরেছে তার হাড়ে লাগানো মাংসটুকু পর্য্যন্ত যেন খসে খসে পড়ছে। গফুর আর বনমালীকে দেখে প্রথমে সে ভেবেছিল এ বুঝি কুষ্ঠ বা ওই ধরণের কোন ব্যারাম। ভূষণের কাছে সে রোগের নামটা শুনল। ভূষণের হাতে ও পায়ে প্যাঁচড়া হয়েছে।

ভূষণ গোপালের মামা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু আরও বুড়ো দেখায়। একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, জোতদার কানায়ের কাছে বিশ বাইশ বছর কাজ করার অবসরে সব আবার ভুলে গেছে।

'কাজ? না, কাজ নেই। অসুখে ভুগলাম দু'মাস, তারপর হাতে পায়ে হল এই প্যাঁচড়া। ভাগিয়ে দিয়েছে।'

আজ শুধু বুড়ো নয়, ভূষণকে কেমন অদ্ভুত দেখায়। মাটির দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে দু'হাতের থাবা উঁচু ক'রে তার বসার ভঙ্গিটা পাছা-পেতে-বসা বুড়ো ভালুকের মত। থ্যাবড়া মুখটা এমন লম্বাটে হয়ে গেছে, দু'পাশ থেকে যেন পিষে দিয়েছে কোন জোরালো পোষণ যন্ত্র।

'নগা কিছু করছে না?'

'ঘানি টানছে। তুই যা অ্যাদ্দিন করে এলি। আমায় ছাড়িয়ে দেওয়ায় কানায়ের ওপর চটে ছিল। সীতু, রাখাল, বঙ্কি আর কটা ছোঁড়াকে নিয়ে কেনালে কানায়ের চালের নৌকো ধরিয়ে দিতে গেছল বাহাদুরী করে। ফাটা মাথা নিয়ে ডাকাতির চার্জ্জে জেলে গেছে। ব্যাটা কুপুত্র চণ্ডাল। দু'বেলা খেতে পাবার মতলব ছিল ব্যাটার।'

ভূষণের মেয়ে রতন এসেছিল একখানা তাঁতের কাপড় পরে।

'কি যা-তা বলছ বাবা। দাদা গেল তোমার জন্যে শোধ নিতে, তুমি বলছ তার মতলব ছিল। খেতে পাবার জন্যে কেউ জেলে যায়?'

বলে সে হাঁটু-বাঁকাবার যন্ত্রণায় মুখ বাঁকিয়ে গোপালের পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করল।

গোপাল এসে মামাকে প্রণাম করেনি। যাবার সময় ভূষণের পায়ের পাতার আধ হাত তফাতে মাটি ছুঁয়ে সে প্রণাম সারল।

পথে নেমে জোতদার কানায়ের বাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে গোপাল ভাবে, পৃথিবীতে যা সব ঘটছে তা তার বোধগম্য হবে না। বিশ বছরের বেশী যে কাজ করে এসেছে সে, দু'মাস অসুখে ভুগে অশক্ত হয়ে পড়ায় কানাই তাকে ভাগিয়ে দিল! কেবল তাও তো নয়। দু'এক যোজন দূরের হোক, কানায়ের সঙ্গে একটা সম্পর্কও যে আছে, তার ভূষণ মামার। যে সম্পর্কের জোরে তারও অধিকার আছে কানাইকে বড় মামা বলার।

জোতদার কানায়ের বাড়ীর কাছে এসে কান্নার আওয়াজ শুনে গোপাল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গাঁয়ে পা দেবার পর এই কান্নার শব্দে যেন তার নিজস্ব একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার আবেষ্টনী ভেঙে পড়ল এতক্ষণে, বেলা যখন খতম হয়ে এসেছে। এখন তার খেয়াল হল, গাঁয়ের এতগুলি নারীপুরুষের বুকভরা শোক কান্নায় রূপ পায়নি, কান্না সে শোনেনি গাঁয়ে এসে। মৃত্যুপুরীর নীরবতাকে এতক্ষণ সে অনুভব করেছে কিন্তু কতগুলি জীবন্ত কঙ্কাল চোখে পড়ায় সে অনুভূতিকে বুঝতে পারেনি। অথচ এ অনুভূতি

তার কত চেনা! কতবার জনহীন শ্মশানে তার হৃদয় মন এ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে।

দাওয়ায় বসে কানাই আকাশ বাতাসকে শুনিয়ে অদৃষ্টকে শাপ দিচ্ছিল। গোপাল প্রণাম না করায় চটে গেলেও শ্রোতা পাওয়ায় সে খুশী হল। তার ছেলের আজ ফিট হয়েছে। দু'বছরে তেরো হাজার টাকা উপায় করেছে এমন সোনার চাঁদ ছেলে। কোন বিশেষ অপদেবতা বা অপদেবী নজর দিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু কেন এই নজর দেওয়া, এত ধম্মো কম্মো পূজা অর্চ্চনা করার পর!

'দু'বচ্ছর চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ে ভাবনায় দিন কাটাবার জন্যে হবে বা? শশী একটু ভয়-কাতুরে বটে তো।'

'কিসের ভয় ভাবনা?' সবিস্ময়ে কানাই শুধোয়।

'এই ধরা পড়ে জেলে যাবার ভয়। চোরাই কারবারে ভয় তো আছে।'

'কচু আছে। হাজার হাজার লোক করেছে না ও কারবার? তুই বাঁদর, জেল খাটিস। ওর জেলের ভয়টা কিসের?' থেমে গিয়ে কানাই থুতনিটা ঘন ঘন এপাশ ওপাশ নাড়ে আর লোমবহুল বুকে বাঁ হাতের তালু ঘষে—অম্বলের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে বুকটা।

'সুধাময়ী এসেছে আজ।'

'বটে নাকি? বেশ।'

'এয়েছে মানে আমি আনাইনি—এয়েছে। এনে ফেলে দিয়ে গেছে আমার বাড়ী। বেয়াই বেটা, জানিস গোপাল, বজ্জাতের ধাড়ী।'

গোপাল খবরটা শুনেছিল। কানাইয়ের মেয়ে সুধার বিয়ে হয়েছিল গত বছর আশ্বিন মাসে। এবছর কার্ত্তিকের গোড়ায় সে প্রসব হতে এসেছে বাপের বাড়ী। জামাই এসে রেখে গেছে।

হুঁকো এসেছিল। কানাই হুঁকো টেনে কাসে আর বলে, 'পেটে তিনবার নাথি মেরেছে। নক্তে ভেসে যাচ্ছে পিণ্ডীমী। তাই ফেলে রেখে গেল হারামজাদার দল। এখন আমি ডাকব ডাকতার কবরেজ, টাকা খসাবো মুঠো মুঠো—মরবে জানি, তবুও সব করা চাই। কেন বাবা? তিলে তিলে দগ্ধে মারা কেন বাপকে? মরণ সংবাদ দিলেই হত একবারে!'

'ডাক্তার এনেছেন কাকে!'

'মধুকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করিয়েছি। ওর গাছগাছড়া অব্যর্থ। ভীমের মাকেও আনেয়েছি। ও বড় ভাল দাই। একাজ করে করে চুল পেকে গেছে।'

গোপাল শোনে আর ভাবে, কানায়ের বাড়ী কেন এসেছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে হঠাৎ উঠে সে বিদায় নেয়।

কানায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে জীবনে প্রথম নিজের বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে গোপাল নিজেকে ধিক্কার দেয়, ভূষণের বাড়ীর কাছে পৌছন পর্য্যন্ত। সুধার রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। ভীমের সত্তর বছরের বুড়ী মা, যে কানে কম শোনে, চোখে কম ত্যাখে, সে সুধাময়ীকে মারছে। এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য মনে তার কেটে কেটে বসে গিয়েছে অথচ দুঃখ-বেদনার বদলে সে অনুভব করছে সন্তোষ। যা হওয়া উচিত এ যেন তাই হয়েছে! নিয়ম রক্ষা—নীতির সম্মান বজায় থেকেছে। কানাই কষ্ট পাক, তাতে পরম তৃপ্তি বোধ হোক, ততখানি হিংসুটে ছোটলোক হতে জেলখাটা গোপালের আপত্তি নেই। কিন্তু কানাইকে শাস্তি দেবার জন্য সুধাময়ীর রক্তে পৃথিবী ভাসিয়ে দেওয়ার মতো অমানুষ হওয়া কি তার উচিত?

গাঁয়ের অনেকের বাড়ী ঘুরেও, কার' ক'জন আপনজন না খেয়ে মরেছে শুনেও, ভূষণমামার সঙ্গে আলাপ করে সুধাময়ীর জন্য ব্যথা বোধের অক্ষমতায় গোপাল কাবু হয়ে রইল। ভূষণের বাড়ীর কাছে যখন সে পৌছল, সন্ধ্যা উৎরে গেছে। চাঁদ বুঝি উঠবে মাঝ রাতের কাছাকাছি, আকাশের কুয়াশায় তারাগুলি ম্লান, অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। ভূষণের মেয়ে রতন সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে এসে গোপালের হাত ধরল।

'চাল এনেছো তো? আজ আগে চাল দেবে, তবে ছুঁতে দেব। মাইরি বলছি কানাইবাবু—'হুস করে একটা শ্বাস টানার শব্দ হল। 'কে? কে তুমি?' প্রশ্ন না করেই রতন তাকে ছেড়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তখন আবার গোপাল টের পেল পথ নির্জ্জন। সন্ধ্যার খানিক পরেই এত বড় গাঁয়ের মৃত জনহীনতায় একা সে জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দাম্ভিক হবে। সুধাময়ীর কথা সে ভুলে গেল। রতনকে সে বড় স্নেহ করত।

মঙ্গলা

শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মঙ্গলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ডোবা থেকে উঠে আসে। পুলিশ হঠাৎ গাঁয়ে হানা দিয়েছিল মাঝরাতে। সেই থেকে এই সকাল পর্য্যন্ত সে ডোবার জলকাদার আগাছার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়েছে।

হাঙ্গামা'র পর থেকে এই নিয়ে পুলিশ সাতবার হানা দিল গাঁয়ে। আবার যদি হানা দেয় কিছুকাল পরে, শীত যখন আরও বেড়ে যাবে, এতক্ষণ ডোবায় এভাবে লুকিয়ে থাকতে হলে ডোবার মধ্যে সে জমে কাঠ হয়ে যাবে নিশ্চয়, উঠে আর আসতে হবে না। অঘ্রাণের শেষেই হাত পা তার অসাড় হয়ে গেছে, পৌষ মাঘের বাঘ মারা শীত সইবে কতক্ষণ।

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে দিশেহারা হয়ে ছুটে ডোবায় নামবার সময় বাঁ পায়ের তলাটা কিসে যেন কেটে গিয়েছিল অনেকটা, ভাঙ্গা কাচে না শামুকগুগলিতে কে জানে। কত রক্ত যে বেরিয়ে গেছে দেহ থেকে, ঠিকানা নেই। আঁচল জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি বহুক্ষণ, চুইয়ে রক্ত পড়েছে, সে বেশ টের পেয়েছে। আঁচলটা কি লাল হয়েছে ত্যাখো!

সকাল বেলার রোদের মৃদু তেজে মঙ্গলার অসাড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ধীরে ধীরে সাড়া আসে, ঘন ঘন কেঁপে কেঁপে সে শিউরে ওঠে। হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে ফুঁপিয়ে। প্রায় জমে যাওয়া অনুভূতিগুলিও যেন তার সূর্য্যের তাপে এতক্ষণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি শীতের কাঁপুনি কমাতে কানাই এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়েছিল। দু'হাতে ছিলিমটা পাকিয়ে ধরে সাঁ সাঁ করে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আধবোজা গলায় সে বলে, 'কাঁদিস নি মঙ্গলা। পরের বার জাগব নি আর। ঘরে থাকব। যা করার করবে।'

পাছা টন টন করে ওঠে মঙ্গলার। পাছায় সে বেত খেয়েছিল দু'মাস আগে, সে ব্যথা আজও থাকার কথা নয়। তবে উলঙ্গ করে বেত মারা হয়েছিল বলে বোধ হয় ঘটনার সঙ্গে শারীরিক বেদনাটাও তাজা কটকটে হয়ে আছে স্মৃতিতে।

কানাই-এর ছোট ভাই বলাই ডোবায় না গিয়ে উঠেছিল বাড়ীর দক্ষিণে তেঁতুল গাছটায়। ওদের মতো জলকাদায় ভিজে শীতে কষ্ট না পেলেও সমস্ত শরীরটা তার ব্যথায় টনটন করছে। কলকেটা নিয়ে দাদার দিকে পিছন ফিরে বসে টান দিয়ে সে বলে, 'মোদের আর কিছু করবে না মন করে। ফেরার ক'জনার জন্যে তো হানা দিচ্ছে, মোদের মারধোর আর না করতে পারে।'

'বলেছে তোমার কানে কানে, পীরিতের সাঙ্গাৎ তুমি।'

মঙ্গলা গর্জ্জে ওঠে। সেই সঙ্গে তারস্বরে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগতে যেখানে যত পুলিশ আছে তাদের চোদ্দপুরুষকে।

বাড়ীর সামনে পথ দিয়ে যেতে যেতে কথাগুলি শুনতে পায় অধর ঘোষাল। হনহনিয়ে বাড়ীর মধ্যে এসে মুখে হাত চাপা দেওয়ার মতো ব্যস্ত বিহ্বল মানায় তাকে থামিয়ে দেয়।

'থাম ছুঁড়ি, থাম। কে গিয়ে খবর দেবে, মরবি যে তখন?'

'ঠিক। সবার হাঁড়ির খবর যাচ্ছে, অবাক কাণ্ড।'

'ভূষণ শালা একজন, ওবাড়ীর ভূষণ মাইতি।'

অধর ব্যাকুলভাবে ধমকে বলে, 'থাক্ না বাবা, থাক না। অত দিয়ে কাজ কি তোদের, চুপ মেরে থাক না?'

'চুপ মেরেই তো আছি গো বাবু। বোবা বনে গেলাম।' বলে মঙ্গলা এতক্ষণে পিঁড়ি এনে অধর ঘোষালকে বসতে দেয়।

'না, আর বসব না।' বলে অধর ঘোষাল উবু হয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসে।

অধর রোগা, ঢ্যাঙ্গা, চিকণ শ্যামবর্ণ। চুলে সবে পাক ধরেছে কিন্তু ভুরু একেবারে সাদা। শীর্ণতা, লম্বা গলাবন্ধ কোট আর পাকা ভুরুর জন্য তাকে ভারি হিসেবী, বিষয়ী ও বিবেচক মনে হয়।

'বলতে তো ভরসা হয় না তোদের, পেটে কথা রাখতে পারিস নে। বলে বেড়াবি দশজনকে।'

কিছু বলতে চায় বুড়ো। পেটে কথা চেপে রাখতে পারছে না। তাই এমন মুখের ভঙ্গি করেছে যেন তাদের অবিশ্বাস করেও অনুগ্রহ করার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বাস করছে। অধরের কথা আর ভঙ্গিতে গা জ্বলে যায় মঙ্গলার।

'সুদেব আর ভূদেব কাল রাতে এয়েছিল। মরমর মা'টাকে দেখতে।'

'বটে?' কানাই আর বলাই-এর মুখ হাঁ হয়ে যায়।

'সাহস কী, মাগো। গাঁয়ে এল?' মঙ্গলা বলে।

'খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল।'

'ধরেছে নাকি?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে তিনজনে।

অধর মাথা নাড়ে।—'না। পালিয়ে গেল। কী করে পালাল ভগবান জানে, চাদ্দিকে ঘিরে ফেলেছিল।' অধরের চোখ প্রায় বুজে আসে, মৃদু ক্ষোভ আর আপশোষের সুরে

বলে, 'পুলিশ এবার বলবে, গাঁয়ের লোক ওদের লুকিয়ে রাখছে, সাহায্য করছে। ফের তল্লাসী চলবে নতুন করে, জিজ্ঞাসাবাদ সুরু হবে, চষে ফেলবে গাঁটাকে। ভাখ দিকি বাপু, তোদের ক'জনার জন্যে গাঁ শুদ্ধু লোকের কি দুর্ভোগ? নিজের মা বোন বাপ ভায়ের কথাটাও ভাববিনে তোরা?'

মঙ্গলা থতমত খেয়ে যায়। কথাটা তো ঠিক বলেছে হাড়হাবাতে বজ্জাত বুড়ো!

বজ্জাত? আজ প্রথম মঙ্গলার খেয়াল হয় গাঁয়ের প্রায় সব লোক কতকাল অধরকে মনে মনে বজ্জাত বলে জেনে রেখেছে তার হিসেব হয় না, অথচ ওর কোন বজ্জাতির খবর তো তারা রাখে না! সে নিজেও মনে মনে লোকটাকে কত খারাপ বলে জেনে এসেছে চিরকাল, অথচ চিরদিন সাধু, ভদ্র, পরোপকারী বিবেচক মানুষ যেন সে, এমনি ব্যবহারই করে এসেছে তার সঙ্গে। ও কেন খারাপ, কোন বিষয়ে অসাধু, অভদ্র, অনিষ্টকারী বা অবিবেচক তাতো সে কিছুই জানে না।

কিছুদিন থেকে একটু বেশী যাতায়াত আর ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করায় মনে হয়েছিল, বুড়ো বুঝি মজেছে। বয়স কাঁচা না থাক, যৌবন যা আছে তাতেই বুড়োকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়তে পারবে ভেবেছিল সে। কিন্তু এক ঘাটের জল খেতে চাওয়ার সাধও তো শেষ পর্য্যন্ত বুড়োর দেখা যায় নি!

'কতকাল পালিয়ে বেড়াতে পারবি বল?' খানিক থেমে থেকে, একটু প্রায় ঝিমিয়ে নিয়ে, অধর বলে, 'ধরা পড়বি, দু'দিন আগে আর পরে। নিজেরাই ধরা দে, হাঙ্গামা চুকুক, আমরা বাঁচি। গাঁয়ে বা আসবার কী দরকার ছিল তোদের দু'জনের? পালিয়েছিস, দূরে পালা, পুলিশ জানুক গাঁয়ের ধারে কাছে তোরা নেই। মাকে দেখতে এয়েছে! কত দরদ মায়ের জন্তে! বুড়ো বাপ খেতুনি খাচ্ছে, মায়ের চিকিচ্ছে নেই, ধরা না দিয়ে দরদ করে দেখতে এলেন মাকে। খুব তো দেখলি, গাঁ শুদ্ধু লোককে হাঙ্গামায় ফেলে গেলি ফের!'

আরেকটু বেলা করে অধর উঠল। যাবার সময় বলে গেল, 'আমার গরুটা খুজে দিস, কানাই বলাই। কাল থেকে পাত্তা নেই। খোঁয়াড়ে যদি ফের দিয়ে থাকে যদু দত্ত, দেখে নেব এক চোট যদুকে আমি, এই বলে গেলাম তোদের।'

আরও বেলায় মঙ্গলা বড় পুকুরে নাইতে যায়। গা-গতর জমে থাক, ব্যথা হোক, ভেজে আসুক, নাইতে হবে, রাঁধতে হবে, পোড়া পেট শুনবে না। দত্তদের বড় পুকুরের ঘাটে মেয়ে পুরুষ নাইতে আর জল নিতে এসেছে, এ ঘাটে বাসন মাজা বারণ। ফিসফাস গুজগাজ চলে গত রাত্রের ব্যাপারের। অধর গোপন কথা কিছু ফাঁস করেনি, সবাই জানে সব কথা। বরং ঘটনা কিছু বেশীই জানে অধরের চেয়ে। কেবল সুদেব আর ভুদেব নয়, ফেরারীদের আরেকজনও নাকি গাঁয়ে এসেছিল কাল রাত্রে। কে সে ঠিকমত জানা যায় নি। কেউ বলে দীনু বসাকের ছেলে তিনকড়ি, কেউ বলে সতীশ সামন্তের ভাই যতীশ সামন্ত, কেউ বলে পদ্মলোচন সাউ নিজে। মঙ্গলার হঠাৎ খেয়াল হল অধরের কথার আসল মানেটা। না, তাদের পেটে কথা থাকে না বলে ব্যাপারটা তাদের শোনাতে ভাবনা হয়নি অধরের, ব্যাপারটার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আর পলাতকদের যে সমালোচনা সে শুনিয়েছে তাই ছিল তার গোপন কথা। কে জানে গাঁয়ের মানুষ দুর্ভোগ চায়, না, ফেরারীরা ধরা দিয়ে তাদের একটু স্বস্তি দিক, এটা চায়! সে দিনকাল আর নেই, ঘা খেয়ে খেয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে শান্তশিষ্ট অলস নির্জীব মানুষগুলি। ওদের মন বোঝা ভার!

তবে, কিছুই না করে, বাড়ী বাড়ী অন্তত খানাতল্লাস আর সকলকে জেরা পর্য্যন্ত না করে, ভোর ভোর পুলিশ গাঁ ছেড়ে চলে গেল কেন ভেবে সবাই অবাক হয়ে গেছে। মঙ্গলাও এই কথাটাই ভাবছিল।

কালু দাসের কচি বৌটা, স্বামী যার এখনো আটক আছে, জলে কলসী আর পা ডুবিয়ে বসে চুপ করে সকলের কথা শুনছিল, মাথাটা একটু হেঁট করে একদৃষ্টে কালচে জলের নীচে খেলায় রত দত্তদের পোষা বড় বড় লালচে রুই কটার দিকে চেয়ে। মঙ্গলা কলসী কাঁখে তুলে উঠছে, সে হঠাৎ বলে, 'যাবে নি? একবার ওনারা এয়েছেন, ফের তো আসতে পারেন, তাই চলে গেছে। ফের ওনারা এলে, তখন ধরবে।'

শুনে কেউ অবাক হয় না, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে না। পুলিশ কেন কী করে জানা যেন চাষীর ঘরের এতটুকু কচি বৌয়ের পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। বাড়ীর দিকে চলতে চলতে মঙ্গলা ভাবে, তা বটে, ওরা আসতে পারে আবার। সুদেব আর ভুদেবের আসবার সম্ভাবনাই বেশী, মায়ের ওদের আজ-মরে কাল-মরে অবস্থা, অন্তেরাও পারে, তাদেরও মা বোন ভাই আছে।

গোলোক যদি আসে? ওর অবশ্য তেমন আপন কেউ কেউ নেই এখানে। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা ধরলে আছে, না ধরলে নেই। তবু, কিছুদিন তো ছিল তার কাছে লোকটা, আর ছিল বলেই ওর জন্ত ভোগান্তিতার কম হয়নি এবং হচ্ছে না, খবর নিতে কি আসতে পারে না একবার?

যদি আসে, একচোট ওকে নেবে মঙ্গলা। পাছাটা টনটন করে ওঠে মঙ্গলার, কোমরটা একটু বেঁকে গিয়ে কলসীর জল খানিকটা উছলে পড়ে যায়। ইস, কী হয়ে গেছে দেহটা তার, এক কলসী জল বইতে এত কষ্ট! জেল হোক, দ্বীপান্তর হোক, ফাঁসি হোক, গোলোকের নাগাল পেলে মঙ্গলা তাকে ধরা দিতে বলবে। নিজে ধরা না দিলে, সেই তাকে ধরিয়ে দেবে। কেন, কিসের অত খাতির ওর।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে মঙ্গলার। পায়ের কাছে ঘাসে কলসীটা নামিয়ে রেখে চারিপাশের জগতকে প্রাণভরে গলা ফাটিয়ে একচোট গালাগালি দিতে মনটা তার ছটফট করে। মাঠ জঙ্গল নালা ডোবাকে, আস্ত আর পোড়া চালার ভস্মগুলিকে, ফসল-ভরা আর ফসল-পোড়া ক্ষেতগুলিকে, অঘ্রাণের সোনার সকালকে, চলমান মানুষ আর গরু বাছুরগুলিকে। মাটিতে পায়ের পাতায় কাটার ব্যথা ভুলে গিয়ে লাথি মারে মঙ্গলা মোটে একবার। গোলোকের বাছ সে সতীত্ব দিতে পারত খুসী মনে আর গোলোকের জন্য তার সতীত্ব গেল আস্তাকুঁড়ে, লাঞ্ছনা হল অকথ্য। পা দিয়ে আবার রক্ত বেরোল, ছ্যাখো! তার খবর নিতে কেন আসবে গোলোক!

খুঁ য়ে খুঁড়িয়ে অতি কষ্টে বাড়ী গিয়ে মঙ্গলা দুটি ভাত সিদ্ধ করে শুয়ে পড়ে। পা-টা তার একটু একটু করে ফুলতে থাকে সারাদিন, সন্ধ্যার সময় ফুলে ঢোল হয়ে যায়। রাত্রে আরও ফুলবে সন্দেহ থাকে না। পলাশ পাতা পায়ে জড়িয়ে বেঁধে দাওয়ার শুয়ে মঙ্গলা কাতরায়। জ্বরের ঘোরে তার কেমন নেশার মতো আচ্ছন্ন ভাব এসেছে, মনে তার দেহের জ্বালা যন্ত্রণার অনুভূতি একটু ভোঁতা হয়েছে। কানাই গেছে অধরের হারানো গরুটা ফিরিয়ে দিতে, বেগুণ ক্ষেতে ঢোকায় দত্তরা সতাই নাচালের খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল—আড়াই ক্রোশ পথ। বলাই গেছে বসন্ত কবিরাজের বাড়ী, মঙ্গলার জন্য ওষুধ আনতে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের একটা লোক সোজা উঠান পেরিয়ে দাওয়া ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেও মঙ্গলা ভয় পায় না।

ঝিমানো সুরে শুধোয়, 'কে? কে গো?

গোলোক বলে, 'আমি গো, তুমাদের দেখতে এলাম।'

'সাঁঝ সকালে জানান দিয়ে দেখতে এলে? ধরবে যে?

'ধরে ধরবে। ধরা দিতেই তো এইছি।'

'ধরা দিতে এয়েছো? অ!'

'সবাই এইছি ধরা দিতে। পরামর্শ করে এইছি। গাঁয়ের সবাই মোদের বেধে ধরিয়ে দেবে—মোরাই বলব ধরিয়ে দিতে, জরিমানাটাও যদি মাপ হয় গাঁয়ের। ইস, এ যে অনেক জ্বর গো!'

গোলোকের ঠাণ্ডা হাত গা থেকে সরিয়ে মঙ্গলা কপালে রাখে।

'গাঁয়ের লোক ধরিয়ে দেবে? দিচ্ছে—পায়ে ধরে সাধো গা। খানিক খানিক খপর কি পায়নি হেথা কেউ, তোমরা কোথায় আছ, কী করছ? মুখ খুলেছে কেউ? নাগসায়রে তুমি যেতে পারো, একথাটি বলতে পারতাম না আমি? বলেছি? দাঁতে দাঁত কামড়ে থেকেছি আগাগোড়া মঙ্গলা একটু ঝিমায়। 'ধরা দিতে এয়েছো। এ্যাঁ? নাই বা দিলে ধরা? যাক না কিছুকাল। দেখা যাক না কী হয়।'

'নাঃ। মোদের জন্যে গা শুদ্ধ লোক ভুগবে? আজ রাতটা যে যার বাড়া কাটাব, সকালে দত্তদের ওখানে সবাইকে ডাকিয়ে বলব, মোদের আটক করে খপর পাঠাও।'

মঙ্গলা জ্বরের ঘোরে হাসে। 'সবাইকে ডাকিয়ে বললে খপর যাবে না। সবাই মিলে বরং বলবে, পালাও শীগগির। খপর দেবার যে আছে দু' একজন, তারাই খপর পৌছে দেবে ঠিক।'

বলতে বলতে কানাই বলাই এসে গোলোককে দেখে স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

গোলোক বলে, 'ভয় নেই, খপর নিতে এইছি।,

বলাই ঢোক গিলে মঙ্গলাকে বলে, 'কবরেজ মশায় মালিশ দিলে একটা। আর বললে সেঁক দিতে।'

একথার জবাব না দিয়ে মঙ্গলা কানাইকে শুধোয়, বুড়ো ঘরে ছিল?'

'ছিল।'

তখন মঙ্গলা উঠে বসে। বলাই আর গোলককে বলে, 'তোমরা বসে থাকো, এখুনি আসছি।'

কষ্টে দাওয়া থেকে পা নামিয়ে বলাই-এর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, 'ধরে নিয়ে চল দিকি ভাই আমাকে একটু। চটপট চল। থামো বাবু তোমরা, ফপরদালালি কোরো না, যা বলছি শোন।'

বলাই-এর ঘাড়ে ভর দিয়ে ফোলা পা-টা টেনে টেনে মঙ্গলা বাইরের কুয়াশায় বেরিয়ে যায়।

কুয়াশা গোয়ালের খড়ের ধোঁয়ায় ভারি হয়েছে।

'কোথা যাবে?'

'চল্ না দাদা।' মঙ্গলা কাতরে ওঠে।

অধরের বাড়ী পৌছে মঙ্গলা ভেতরে যায় না, বাড়ীর সামনে কদম গাছটার তলে দাঁড়িয়ে থাকে। বলাই ডেকে আনে অধরকে।

'শোনেন। খপর আছে।'

লণ্ঠনের আলোয় তার মুখের চেহারা দেখে অধরের সাদা ভুরু কুঁচকে যায়। সেই লণ্ঠনের আলোতেই মঙ্গলা অধরের সদরের ঘরের জানালায় দেখতে পায় ভূষণ মাইতির মুখ।

'ওরা আজ গাঁয়ে আসছে, ধরা দিতে। সব ক'জনা আসছে।'

'ধরা দিতে আসছে?'

'হাঁ, সব ক'জনা। গোলোক এসেছিল, মোকে বলে গেল।'

'অ, তা গোলোক চলে গেছে নাকি?

'আসবে ফের। মোর কাছে থাকবে। বললে কি, আজ রাতটা যে যার ঘরে থাকবে আপনজনের সাথে,

কাল সকালে ধরা দেবে। রাতে যদি খবর পেয়ে পুলিশ আসে, তবে নাকি ফের পালাবে, আর আসবেনি ধরা দিতে কোনকালে। বলে কি জানেন, গাঁয়ের লোকের মুখ চেয়ে ধরা দেবো বলে আসছি, একটা রাত যদি না ঘরে থাকতে দেয় তারা, তবে কাজ কি মোদের ধরা দিয়ে। মোর ডর লাগছে গো বাবু। কালকের মতো যদি পুলিশ আসে তো সব্বোনাশ। ওরাও ধরা দেবেনি, মোদেরও মরণ।'

কথাটা বিবেচনা করতে করতে ধীর শান্তভাবে অধর বলে, 'পুলিশ কি খপর পাবে?'

মঙ্গলা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, 'যদি পায়? কী হবে তবে? একজনাও ধরা পড়বেনি জানেন তো, গাঁয়ের আধকোশের মধ্যে পুলিশ এলে গাঁয়ে জানা-জানি হয়ে যায়। কালের মতো পুলিশ আসবে, এসে দেখবে সবাই পালিয়েছে। কী উপায় হবে?'

অধর চোখ বুজে বলে, 'ভগবান যা করেন। আমরা কী করতে পারি বল? তবে কি জানিস, কাল এসেছিল, আজ আবার পুলিশ আসবে মনে হয় না।'

বাড়ী ফিরে মঙ্গলা শুয়ে পড়ে ধপাস করে।

বলে, 'আলোটা জ্বাল বলাই, যেটুক তেল আছে জেলেদে। দু'ভাই মিলে রাঁধাবাড়া কর কি আছে ঘরে, একটা লোক এয়েছে, থাকবে একটা রাত, খেতে দিতে হবে না তাকে? আর তুমি একটু মালিশ কর পায়ে।

নেশা

পুলকেশের সিনেমা দেখার নেশা একেবারে ছিল না। যতীনেরও তাই। স'ত্যিকারের কোন ভাল ছবির খবর পেলে, রুচি, রসবোধ আর বিচারশক্তি আছে বলে তারা বিশ্বাস করে এমন কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে খবর পেলে হয়তো কখনো নিজেরা শখ করে গিয়ে দেখে আসত ছবিটা। তাছাড়া ইচ্ছে করে কখনোই তারা সিনেমায় যেত না। মাঝে মাঝে তবু যে যেতে হত তার কারণ ছিল ভিন্ন। সিনেমা যাবার ভীষণ শখ আছে অথচ কেউ না নিয়ে গেলে যেতে পারে না এমন যার বা যাদের আব্দার এড়ানো চলে না, তাকে বা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হত।

ছায়াছবি যে একেবারে তারা দুবন্ধু উপভোগ করে না তা নয়। একটু উল্টোভাবে কিছু কিছু উপভোগ করে—দর্শকের যেরকম উপভোগের জন্য ছবিটা মোটেই তৈরী হয়নি। বাংলা আর হিন্দি ছবি হলেই পুলকেশ আর যতীনের অভিনব উপভোগটা জমে বেশী। উদ্ভট অবাস্তব সৃষ্টিছাড়া একঘেয়ে কাহিনী, চরিত্রগুলির অমানুষিক খাপছাড়া আর সঙ্গতিহীন কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গি, যেখানে সেখানে গান, উৎকট হাসি কান্না আর ভাঁড়ামি ইত্যাদি তাদের হাসির অনেক খোরাক জোটায়। অন্য সকলের ভদ্রতার মর্য্যাদা রাখার জন্য যেখানে সশব্দে হাসা সম্ভব হয় না সেখানে মুখে রুমাল গুঁজে হাসিটা চাপা দেয়। সময়টা তাই একরমক তাদের কেটে যায় হাই না তুলে, ঘুম না পেয়ে।

মৃন্ময়ী একদিন আশ্চর্য্য হয়ে পুলকেশকে বলেছিল, 'তুমি কেঁদে ফেল্লে! দৃশ্যটা খুব করুণ সত্যি, কিন্তু—'

'কোন্ দৃশ্যটা?'

'মেয়েটা যেখানে রাতদুপুরে বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে—'

'ও দৃশ্যটা করুণ নাকি? আমার তো ভারি কমিক লাগছিল। এত কাণ্ডের পর অচেনা বাপের সংগে রাতদুপুরে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন মানে হয়? আমরা নয় জানি ও লোকটা মেয়েটার বাপ। কিন্তু মেয়েটাও কি তা জানে? আমি তো ভাবছিলাম মেয়েটা যাতে বাড়ীতেই থাকে তার জন্য প্লট এত ঘোরালো করা হচ্ছে!'

মৃন্ময়ী আহত হয়ে বলে, 'ও, তুমি কাঁদো নি? হাসি চাপছিলে!'

দেহমনে স্বাস্থ্য, জীবনে আনন্দ, অসঙ্গতির হাস্যকর দিকটাই চোখে পড়ে আগে। তাই, জীবনের সংগে ছবিগুলির সংযোগের অভাব দেখে, কষ্টকল্পনা দেখে, সস্তা ও হাল্কা রোমান্সের গেঁজলা রস থই থই করতে দেখে, এমন কি মানুষের মনে ছবিগুলির প্রভাব যে কিছু কিছু ক্ষতিকর তা ভেবেও, পুলকেশরাও বিদ্বেষমূলক সমালোচনার ঝাঁঝ অনুভব করে না। এই সব ছবি দেখার জন্য যারা পাগল তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাবও পোষণ করে না। কেবল এই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে ছেলেভুলানো এ জিনিষ দিয়ে বয়স্ক মানুষ নিজেকে ভোলায় কী করে! নিজেদের ভোলাবার এত জিনিষ রয়েছে জগতে! এরকম আশ্চর্য্য হওয়ার মধ্যে নিজেদের বেশ বস্তুতান্ত্রিক

ভাবপ্রবণতাহীন মনে হয় বলে খুব তারা গর্ব্ব অনুভব করে!

তারপর জীবন আসে পরবর্ত্তী বাস্তব অধ্যায়ের নিয়ম, অনিয়ম, প্রয়োজন আর ঘাতপ্রতিঘাতের সূচনা নিয়ে। যে ভাবে আরম্ভ করবে ভেবেছিল, পুলকেশ বা যতীন কারো আরম্ভটাই সেরকম হয় না। হাসিমুখেই তারা সেই আরম্ভকে গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন হওয়ার বৈচিত্র্যময় প্রেমের লীলাখেলায় কত সময় যে তার কোথা দিয়ে কেটে যায়!

শেষের তিন বছর একবারও পুলকেশ কোন সিনেমায় যায়নি। এই নিয়েই একদিন মৃণ্ময়ীর সঙ্গে তার দারুণ কলহ হয়ে গেল। সিনেমায় মৃণ্ময়ী হরদম যায়, অন্যের সঙ্গে। কিন্তু কেন তা হবে? কেন তাকে পুলকেশ একদিন সিনেমায় নিয়ে যেতে পারবে না? কোন্ স্বামী এ রকম ব্যবহার করে স্ত্রীর সঙ্গে? তার নিজের যেতে ভাল না লাগুক; মৃণ্ময়ীর কি সখ থাকতে নেই।

'আরেকদিন নিয়ে যাব।'

'আরেকদিন কেন? আজ নিয়ে চল।'

তাই করতে হল শেষ পর্য্যন্ত। বহুদিন পরে পুলকেশ সেদিন এ টি বাংলা ছবি দেখল। খাপছাড়া অদ্ভুত মনে হল বটে ছবিটা, কিন্তু আজ আর হাস্যকর মনে হল না। এমন কি অজানা নতুন তরুণ ডাক্তার পাড়াগাঁয়ে পা দেওয়া মাত্র কম্পাউণ্ডারের বয়স্থা কুমারী মেয়েকে তার সঙ্গে মাঠে গিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে লাফাতে লাফাতে ডুয়েট গান করতে দেখেও তার হাসি পেল না, বরং বেশ মিষ্টি আর রসালই লাগলো ব্যাপারটা।

মশগুল হয়েই পুলকেশ শেষ পর্য্যন্ত ছবিটা দেখে ও শুনে গেল।

পরের শনিবার অফিসের এক সহকর্ম্মীর সঙ্গে সে আবার সিনেমায় গেল। পরের সপ্তাহে গেল তিনবার। কয়েক মাসের মধ্যে সে নিয়মিতভাবে সিনেমায় যেতে এবং ভালমন্দ নির্বিচারে ছবিগুলি তন্ময় হয়ে দেখতে আরম্ভ করল। বন্ধুদের সঙ্গে ছবি আর তাড়কাদের বিষয় আলোচনা ও তর্ক করে কেটে যেতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

একদিন ম্যাটিনিতে নাচে গানে প্রেমে বিচ্ছেদ আর শেষ মিনিটের মিলনে এক জমকালো ছবি দেখে পুলকেশ বাইরে এসেছে, দেখা হল যতীনের সঙ্গে। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, যতীন ছাতি মাথায় দিয়ে হাঁটছিল ফুটপাতে। যতীনকে হঠাৎ দেখে পুলকেশ চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। তার শরীর ভেঙে পড়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে আধময়লা জামা-কাপড়। যতীন নিজেই তাকে দেখে কাছে এগিয়ে এল।

এতদিন পরে দেখা, কিন্তু এমনি নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে দু'জন যে উল্লাসটা তেমন জোরালো হল না। কিছুটা আশ্চর্য্য আর কিছুটা খুশী হয়ে পুলকেশ বলল, 'যতীন! কলকাতা এলি কবে?'

যতীন বলল, 'মাসখানেক। তোর বাড়ী যাব যাব ভাবছিলাম, হয়ে ওঠেনি।'

যতীনের মুখে পুলকেশ মদের গন্ধ পায়। চোখে দেখতে পায় নেশার আবেশ। কথায় একটা অস্বাভাবিক টলোমলো প্রফুল্লতা। দুই বন্ধু কথা বলে ধীরে সুস্থে, খবর নেয় আর দেয় ছাড়া ছাড়া ভাবে। এতগুলি বছর ধরে অজস্র কথা জমেছে কিন্তু বলার বা শোনার তাড়া যেন তাদের নেই।

যতীন বলে, 'আয়, বসে কথাবার্ত্তা কই।'

'কোথায় বসবি?'

'আয় না। কাছেই।'

খানিক এগিয়ে বাঁয়ে গলির মধ্যে একটা দেশী মদের দোকানে যতীন তাকে নিয়ে যায়। শনিবারের বিকাল, ইতিমধ্যেই লোক জমে জায়গাটা গমগম করছে—ছেঁড়া কাপড় পরা খালিগায়ের লোক থেকে ফরসা জামাকাপড় পরা পর্য্যন্ত সব ধরণের বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী লোক। দোকান-ঘরের বেঞ্চিগুলি সব ভর্ত্তি, দাঁড়িয়ে এবং উবু হয়ে বসেও অনেকে মদ খাচ্ছে। পাশের ঘরে একটা বেঞ্চে জায়গা ছিল, পুলকেশকে বসিয়ে যতীন বলে, 'বোস, একটা পাঁট আনি। একটু সেলিব্রেট করা যাক।'

'আমি তো ওসব খাই না।'

'একদিন একটু খাবি, তাতে কী হয়েছে? এ্যাদ্দিন পরে দেখা, একটু ফূর্ত্তি না করলে হয়?'

এখানে ঢুকেই যতীনকে আগের চেয়ে বেশী তাজা, বেশী উৎসাহী মনে হচ্ছে। সেলিব্রেট করার একটা ভাল উপলক্ষ পেয়ে সে যে ভারি খুশী হয়েছে বেশ বোঝা যায়, বেশী মদ খাওয়ার জন্য নিজের মনটা আর তাকে কামড়াবে না। পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে যুক্তি পেয়েছে, কৈফিয়ৎ পেয়েছে সমর্থন পেয়েছে বেশী মদ খাবার। যতীন মদ আনতে যায়, পুলকেশ বসে বসে ভাবে। যতীনের অধঃপতনে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়।

যতীন এসে বসলে সে জিজ্ঞেস করে, 'কদিন খাচ্ছিস?'

'বছর দু'তিন?'

'এটা ধরলি কেন?'

প্রশ্ন শুনে যতীন হাসে।—'খেলে একটু ভাল লাগে আবার কেন!'

গেলাসে মদ ঢেলে ঢেলে খেতে যতীনের অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকে, কথা সে বলতে থাকে তাড়াতাড়ি, বেশী বেশী। একবার চুমুক দিয়েই পুলকেশের সর্ব্বাংগ শিউরে উঠেছিল, বমি ঠেলে উঠেছিল। আর খাবার চেষ্টা না করে সে যতীনের কথা শুনে যায়। অদৃষ্ট বড় খারাপ ব্যবহার করেছে যতীনের সঙ্গে, ঘা মেরে মেরে থেঁতলে দিয়েছে জীবনটা, কোনদিন বিশেষ সুবিধা করতে দেয়নি। চাকরীর

গোড়ায় বাপ মারা গেল। কিছু টাকা হাতে পেয়ে চাকরী ছেড়ে একটা ব্যবসা আরম্ভ করেছিল, সুবিধা হল না। বীমার দালালী করেছিল কিছুদিন, সুবিধা হল না। একটা এজেন্সির কারবার ধরেছিল, সেটাতে কিছু হল না। দুটো ছেলে হবার পর বৌটা পড়ল অসুখে, সেই থেকে একটানা ভুগছে। বোনের বিয়ে দিয়েছিল, বোনটাকে তার স্বামী নেয় না। বিরক্ত হয়ে সকলকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সে কলকাতায় নতুন একটা ব্যবসা ফেঁদেছে।

'সংসারের হাঙ্গামা নেই, খরচের টাকা পাঠাই, বাস। এবার ঠিক গুছিয়ে নেব। দু'বছরের মধ্যে যদি না মোটর কিনি তো—'

জমজমাট নেশা হয়েছে যতীনের। সগর্ব্বে বুক ঠুকে সে পুলকেশকে শোনায় ব্যবসাতে তার কেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অল্পদিনে কী ভাবে সে ফেঁপে উঠবে, অন্য লোকেরা কী ভুল করে আর সে কী ভুল করবে না, এমনি সব বড় বড় কথা। জীবনে অসামান্য সাফল্য লাভের অহঙ্কারেই সে যেন সিধে হয়ে বসে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

পুলকেশ তার দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে, ন'টার শো-এ প্রিয় ছবিটা তৃতীয়বার দেখতে যাবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, না একাই যাবে।

বেড়া

বাড়ীর ঠিক মাঝখানে উঁচু চাঁচের বেড়া। খুব লম্বা মানুষের মাথা ছাড়িয়েও হাতখানেক উঁচু হবে। বেড়া ডিঙিয়ে কারো নজর চলবে না, অবশ্য যদি উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে নজর চালানো না হয়। নজর দেবার অন্য উপায় আছে : ফুটোতে চোখ পাতা।

বাড়ীটাকে সমান দু'ভাগ করেছে বেড়াটা, পশ্চিমের ভিটার লম্বা দাওয়া ভাগ ক'রে, উঠান ভাগ ক'রে সদরের বেড়ার চার হাত ফাঁকের ঠিক মাঝখান দিয়ে খানিক এগিয়ে বাড়ীতে ঢুকবার এই ফাঁক আড়াল ক'রতে দাঁড় করানো সামনের পর্দ্দা-বেড়াটার ঠিক মাঝখানে গিয়ে ঠেকেছে।

আগে, প্রায় সাত বছর আগে, গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দনের বাপ অনন্ত হাতী যখন বেঁচে ছিল, তখন বাড়ীতে ঢুকবার পথ ছিল একটা দক্ষিণ-পূব কোণে। এই পথের সামনেও বসানো ছিল একটা আড়াল-করা পর্দ্দা-বেড়া। ভাগের সময় পথটা পড়েছিল জনার্দ্দনের ভাগে। সদরের বেড়ার আরেক প্রান্তে, অর্থাৎ উত্তর-পূব কোণে বেড়া কেটে নতুন একটা প্রবেশ-পথ করে নিতে অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় গোল বেধেছিল। ঢুকবার-বেরোবার পথই যদি না থাকল, বাড়ীর এমন ভাগ দিয়ে সে কী করবে—গোবর্দ্ধন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মালিকদের মানতে হ'য়েছিল যে তার আপত্তি সঙ্গত। অনেক মাথা ঘামিয়ে তারপর সালিশরা, যাদের প্রধান ছিলেন সদরের সেরেস্তাদারের বাবা প্রাণধন চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্যাভূষণ, ব্যবস্থা দিয়েছিলেন ভাগের বেড়ার দু'পাশে সদর বেড়া দু'হাত ক'রে কেটে দুই অংশের ঢুকবার-বেরোবার পথ করা হোক, আর পুরনো পর্দ্দা-বেড়া তুলে এনে স্থাপন করা হোক এই বিভক্ত পথের সামনে ; কারণ ও-বেড়াটাও দু'ভায়ের বাপের সম্পত্তি। অতএব দু'জনের ওতে সমান অধিকার।

জনার্দ্দন আপত্তি ক'রে বলেছিল আড়াল-করা বেড়া সরালে সদর বেড়ার কোণের পুরনো পথের ফাঁকে রাস্তার লোক যে তার বাড়ীর বৌ-ঝিদের দেখতে পাবে, তার কী হবে ? সে এমন কী অপরাধ ক'রেছে যে, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে তাকে বন্ধ ক'রতে হবে বেড়ার ফাঁক। রীতিমত সমস্যার কথা। সালিশরা যখন মীমাংসা খুঁজতে মাথা ঘামাচ্ছেন, গোবর্দ্ধন উদার ও উদাসভাবে বলেছিল, তিন হাত বেড়ার ফাঁক-বন্ধ করার পয়সা খরচ করতে যদি জনার্দ্দনের আপত্তি থাকে, সে এদিকের অংশ নিক। সদর বেড়ার ফাঁকের অসুবিধা ভোগ করতে গোবর্দ্ধন রাজী আছে।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সালিশরা হঠাৎ সমস্যাটির চমৎকার মীমাংসা আবিষ্কার করেন। কেন, দু'পাশে দু'হাত করে পথ করতে সদর বেড়ার মাঝখানে চার হাত অংশ তো কাটতেই হবে, তাই দিয়ে অনায়াসে বন্ধ করা যাবে জনার্দ্দনের অংশের সদর বেড়ার পুরনো ফাঁক।

এমনি দুর্য্যোধনী জেদি হিংসার চুলচেরা ভাগাভাগির প্রতীক হ'য়ে ভাগের বেড়াটি দাঁড়িয়ে আছে সাত বছর। অনন্ত হাতীর শ্রাদ্ধের দশ দিন পরে বেড়াটা উঠেছিল। আদালত কুরুক্ষেত্রে তারপর যত লড়াই হ'য়ে গেছে দু'ভায়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে, যত হাতাহাতি গালাগালি হ'য়ে গেছে বাগানের ফল, পুকুরের ঘাট, গাছের মরা ডালের ভাগ নিয়ে তাও যেন প্রতীক হ'য়ে আছে এই বেড়াটিই। জীর্ণ

হ'য়ে এসেছে বেড়াটা, এখানে ওখানে মেরামত হ'য়েছে, আর এখানে পড়েছে মাটির চাবড়া, ওখানে গোঁজা হ'য়েছে ন্যাকড়া, সেখানে সাঁটা হ'য়েছে কাগজ।

বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে উঁকি মারা চলত—দু'পাশ থেকেই। হঠাৎ গোবরগোলা জল বেড়া ডিঙিয়ে এসে পড়ত গায়ে। গোবর্দ্ধনের মেয়ে পরীবালা একদিন চোখ পেতে আছে বেড়ার ফুটোয়, জনার্দ্দনের মেয়ে তাকে তাকে থেকে একটা কঞ্চি সেই ফুটো দিয়ে চালান ক'রে দিল তার চোখের মধ্যে। চোখ যায় যায় হল পরীবালার, মাথা ফাটে ফাটে হল গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন দু'ভায়ের, ক'দিন পাড়ায় কাণ পাতা গেল না দু'বাড়ির মেয়েদের গলাবাজীতে। বেড়ায় কাঁথা-কাপড় শুকতে দিলে অদৃশ্য হ'য়ে যেত। এঁটো-কাঁটা, নোংরা, ছেলেমেয়ের মল বেড়া ডিঙিয়ে পড়ত একপাশ থেকে অন্যপাশে। এ পাশের পুঁই বেড়া বেয়ে উঠে ও-পাশের আয়ত্তে একটি ডগা একটু বাড়ালেই টেনে যতটা পারা যায় ছিঁড়ে নেওয়া হত। বেড়া ডিঙিয়ে অহরহ আসা-যাওয়া করত সমালোচনা, মন্তব্য, গালাগালি, অভিশাপ। চেরা বাঁশের বেড়াটাকে মাঝে রেখে এমন একটানা শত্রুতা চলত দু'পাশের দু'টি পরিবারের মধ্যে যে, সময় সময় মনে হত কবে বুঝি ওপাশের চালা পুড়িয়ে দেবার ঝোঁক সামলাতে না পেরে এপাশে নিজের চালাতেই আগুন ধরিয়ে দেয়!

গোলমাল এখনো চলে, বিদ্বেষ এখনো বজায় আছে পুরো মাত্রায়। তবে গোড়ার দিকের মতো খুটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অহরহ হাঙ্গামা চলে না, গায়ে পড়ে সহজে কেউ ঝগড়া বাধায় না। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হবে দু'পাশের মানুষগুলি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে সংযম অভ্যাস ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। আক্রমণাত্মক হিংসা কমে এসে এখন দাঁড়িয়েছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অবহেলাত্মক মনোভাবে। খোঁচাবার ও গায়ের ঝাল ঝাড়বার প্রক্রিয়াও ক্রমে ক্রমে বেশ কৌশলময় ও মার্জ্জিত হ'য়ে উঠেছে। এ পাশের ছেলেমানুষ কানাই মাঝের বেড়ার মাহাত্ম্য ভুলে ও-পাশে সমবয়সী বলাইয়ের সঙ্গে খেলতে গেলে, শত্রুপক্ষের ছেলেকে আয়ত্তে পেয়েও ও-পাশের কেউ তাকে ধরে পিটিয়ে দেয় না, আচ্ছা ক'রে মার দেওয়া হয় বলাইকে। এ-পাশ থেকে হাঁক ওঠে, কানাই! কানাই এলে তাকে চড়চাপড় মেরে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করা হয়, ও-বাড়ী মরতে গেছিলি কেনরে, বেহায়া পাজী বজ্জাত? ও-পাশ থেকে জবাব আসে বলাইএর প্রতি আরও জোর গলার শাসানোতে, ফের যদি ও-বাড়ীর কারো সাথে তুই খেলিস হারামজাদা নচ্ছার···

দু'পাশেই ছেলেমেয়ে আছে, হাজার বলে তাদের বোঝানও যায় না যে, বেড়ার ও-পাশ যেতে নেই। ছেলেমেয়েরা তাই নিরাপদ থাকে। তবে কুকুর বেড়ালের রেহাই নেই। এপাশের বেড়াল ও-পাশে হাঁড়ি খেতে গেলে তার রক্ষা থাকে না।

দু'পাশের হাঁড়িই যখন প্রায় শূন্য থাকছে দুর্ভিক্ষের দিনে, জনার্দ্দনের ছেলে চন্দ্রকুমারের বৌ রাণীবালার পোষা বিড়ালটা মেউ মেউ ক'রে বেড়াচ্ছে খিদেয় কাতর হ'য়ে, গোবর্দ্ধন একদিন কোথা থেকে যোগাড় ক'রে নিয়ে এল আধসেরি একটা রুইমাছ! মাছ দেখে খুসী হ'য়ে হাসি ফুটল সবার মুখে, দু'মুঠো চাল সেদিন বেশী নেওয়া হল এই উপলক্ষে। গোবর্দ্ধনের ছেলে সূর্য্যকান্তের বৌ লক্ষ্মীরাণী আঁশবঁটি পেতে কুটতে বসল মাছ।

মাছ কাটা শেষ হ'য়েছে, কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য্যকান্ত বৌয়ের দিকে গোড়ায় যেমন তাকাত প্রায় সেই রকম সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাছের দিকে, কোথা থেকে রাণীবালার আদুরে বিড়াল এসে এক টুকরো মাছ মুখে তুলে নিল। মাছকাটা বঁটিটা তুলেই সূর্য্যকান্ত বসিয়ে দিল এক কোপ। রাণীবালার আদুরে বিড়াল একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত না ক'রে মরে গেল। মাছের টুকরোটা মুখ থেকে খসে পড়ায় লক্ষ্মীরাণী সেটা তুলে রাখল চুপড়িতে।

পথের ধার থেকে মরা বিড়ালটা কুড়িয়ে নিয়ে গেল চণ্ডী বসাক। চাল ছিল না কিন্তু ঘরে তার একটু নুণ আর একটু হলুদ-লঙ্কা ছিল। ঘুরে ঘুরে হত্যা দিয়ে দুটি খুদকুঁড়ো চণ্ডী যোগাড় ক'রে নিয়ে এল। ঝাল ঝাল বিড়ালের মাংস দিয়ে সে-দিন সে দু'বেলা ভোজ খেল সপরিবারে।

হত্যাকাণ্ডের খবরটা রাণীবালা পেল পাঁচুর মার কাছে। ও-বাড়িতে পাঁচুর মা দু'টি চালের জন্য গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ধন্না দিয়ে থেকেও শেষ পর্য্যন্ত পায়নি। নিজের চোখে সে ঘটনাটা দেখেছে আগাগোড়া। এ কি কাণ্ড মা, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করিস, হিংসে করে মা-ষষ্ঠীর বাহনকে মারলি একাদশীর দিন, এত শত্রুতা?

'দু'টি চাল দিবি বৌ? দে মা, দু'টি চাল? বিড়াল ছানা দেব তোকে একটা, তোর পায়ে ধরি খুদকুড়ো যা'হোক দুটি দে।'

'কোথা পাব গো? চাল বাড়ন্ত। খুদকুঁড়ো শাউড়ী আগলে আছে।'

বলে বিড়ালের শোকে রাণীবালা কাঁদতে থাকে, বাড়ীর সকলের কাছে নালিশ জানায়। সামলাতে না পেরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, অভিশাপও দিয়ে বসে ও-পাশের খুনেদের। ছেলেবেলা থেকে রাণীবালা বিড়াল পুষতে ভালবাসে, কত পোষা বিড়াল তার মরে আর হারিয়ে গেছে। ও-বাড়ীর লোক হত্যা না ক'রলে হয়তো বিড়ালটার জন্য এত শোক তার হত না।

কিন্তু এমনি অবাক কাণ্ড, এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধানোর বদলে জনার্দ্দন তাকেই ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ চুপ কর বাছা। বাড়াবাড়ি কোরো না।'

চন্দ্রকান্তও প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'তোমার বিড়াল যায় কেন চুরি করে খেতে?'

রাণীবালা হকচকিয়ে যায়, ভেবে পায় না ব্যাপারখানা কি। রাগে অভিমানে তার গা জ্বালা করে, ভাবে না খেয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু ভরসা পায় না। কারো পেট কলমীশাক-সেদ্ধ দিয়ে দুটি ভাত খেয়ে ভরে না। কেউ যদি তাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি না করে সে না খেয়ে গোসা ক'রে শুয়ে থাকলেও!

চন্দ্রকান্ত তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়—পুলপারের জমিটা না বেচে আর উপায় নেই। গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন দু'জনে মিলে না বেচলে জমিটা বেচবারও উপায় নেই। কাল দু'জনে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রছে প্রাণধন চক্রবর্ত্তীকে জমিটা বেচে দেবে। এখন কোন কারণে গোবর্দ্ধন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে বসলে মুস্কিল হবে।

'ঝগড়াঝাটি কোরো না খবর্দ্দার, ক'দিন মুখ বুজে থাকো।'

বিড়াল মারার সময় গোবর্দ্ধন উপস্থিত ছিল না। ফিরে এসে ব্যাপার শুনে সে-ও অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্য্যকে বলে, 'একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের? এমনি করে ক্যাকড়া বাধাও, ব্যাস, জমি বেচাও খতম। খেঝো তখন কচুপোড়া সিদ্ধ ক'রে। খবর্দ্দার, কেউ ঝগড়া করবে না ওদের সাথে। মুখ বুজে থাকো ক'দিন।'

সাত বছরের শত্রুতা স্বার্থের খাতিরে একদিনে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল। দু'পারেই কটু কথা যদি বা কিছু বলা হল, হল চুপি চুপি, চাপা গলায়, নিজেদের মধ্যে। এপার কথা বলল না বটে ওপারের সঙ্গে সোজাসুজি কিন্তু ওপারকে শোনাবার জন্যই এপার চেঁচালো, 'ও কানাই, ওদের বেগুণ ক্ষেতে গরু ঢুকেছেরে!' ওপারও চেঁচালো এপারকে শুনিয়ে, 'ও বলাই, ওদের পুঁটু পুকুরপাড়ে একলা গেছে-রে!' আমতলায় কানাই-বলাইকে খেলতে দেখে কোন পার কিছু বলল না। এপারের ছেলে ওপারে যাওয়ায় ওপারের ছেলে চড় খেল না। লক্ষ্মীরাণীর বিড়াল প্রায় সারাটা দুপুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল ওপারের দাওয়ার কোণে জড়ো করা ছেঁড়া চটে। হাতটা মনটা বার বার নিসপিস করে উঠলেও রাণীবালা পর্য্যন্ত তাকে কিছু বললে না। ওপারের পুঁই গাছের সতেজ ডগাটি লক লক ক'রে বাতাসে দুলতে লাগলো এপারের এলাকায়।

কথা যা বলাবলি হল তিনদিনে দু'পারের মধ্যে, তা' শুধু গোবর্দ্ধন আর জনার্দ্দনের জমি বিক্রি নিয়ে গম্ভীর নৈর্ব্যক্তিক কথা, তবু এভাবেও তো সাতবছর তারা কথা বলেনি।

দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়ে টাকা পাবার দিন সকালে বেড়ার এপার থেকেই গোবর্দ্ধন বলে, 'কখন রওনা হবে, জনা?'

'এই খানিক বাদেই,' জবাব দিয়ে, একটু থেমে জনার্দ্দন যোগ দেয়, 'ফেলনার জরটা বেড়েছে।'

ফেলনা রাণীবালার ছেলে।

একসাথে বেরোয় দু'জনে, জনার্দ্দন ডাক দিয়ে নিয়ে যায় গোবর্দ্ধনকে। একসাথে বাড়ী থেকে বেরোবার কোন দরকার অবশ্য ছিল না। চক্রবর্ত্তীর বাড়ী হ'য়ে তারা সাব রেজেষ্ট্রারের অফিসে রওনা হবে, একে একে গিয়ে সেখানে জুটলেও চলতো। কিন্তু সাত বছর বিবাদ ক'রে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কাটাবার পর দু'ভাই যখন শান্ত ভাবে ক'দিন ধরে কথা বলে, তখন কি আর দরকার আছে অত হিসেব করে সব কাজ করার! দু'জনে চলতে থাকে একরকম নির্ব্বাক হ'য়েই। মাঝে মাঝে এ ওর মুখের দিকে তাকায় আড়চোখে। সাত বছরে দু'জনের বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে সংসারের চাপে, দুর্ভিক্ষের গত দু'বছরেই যেন বেশী বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও কি আছে ভগবান জানেন।

'দরটা সুবিধা হল না।'

'উপায় কি?'

'ডবল দরে এমন জমি মিলবে না।'

'ঠিক। লতিফের সেচা জমির চেয়ে ভাল ফসল দিয়েছে গতবার।' গোবর্দ্ধন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে।—'শোন বলি, জনা। না বেচলে হয় না জমিটা? এক কাজ করি আয়। না বেচে বাঁধা রাখি, পারি তো ছাড়িয়ে নেব দু'জনে মিলে।'

'চক্কোত্তি মশায় কি রাজী হবে?'

'রাজী না হয় তো মধু সা'র কাছে বাঁধা দেব। নয় তো রথতলার নিকুঞ্জকে। বেচে দিলে তো গেল জন্মের মত। যদি রাখা যায়!'

গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন—অনন্ত হাতীর দুই ছেলে, কথাটা বিচার ও বিবেচনা ক'রে দেখতে থাকে। দেখে লোকের মনে হয় যেন আলাপ ক'রছে দু'টি সাঙাৎ।

এদিকে জর বাড়তে বাড়তে ফেলনার যায় যায় অবস্থা হয় দুপুর বেলা। চাঁচের বেড়া থাকলেও ওপারে সব টের পায় সবাই। সূর্য্যের মা ইতস্তত করে অনেকক্ষণ, ফিস ফিস ক'রে সূর্য্য আর লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করে কয়েকবার, 'যাব নাকি?' তারপর বেলা পড়ে এলে সতীরাণীর বিনুনী কান্না শুনে হঠাৎ মনস্থির করে সাত বছর পরে সূর্য্যের মা বেড়ার ওপারে যায়, আস্তে আস্তে গিয়ে বসে ফেলনার শিয়রে চাঁদের মার পাশে। সন্ধ্যার আগে ফেলনা মারা গেলে মড়া কান্না শুনে এপারের বাকী সকলেও হাজির হয় ওপারে। সাত বছরে পাঁচবার মড়া কান্না উঠেছে জনার্দ্দনের অংশে, কিন্তু গোবর্দ্ধনের অংশ থেকে বেড়া পেরিয়ে কেউ কখনও আসেনি। সাত বছর পরে আজ বেড়ার দু'দিকের মেয়েরা বেড়ার

একদিকে হ'য়ে একসঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করে। চাঁদ শোকের নেশায় পাগলের মত কাণ্ড আরম্ভ করলে সূর্য্য তাকে ধরে রাখে। একটু রাত করে গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন যখন বাড়ী ফেরে তখনও দেখা যায় ওপারের প্রায় সকলেই রয়েছে এপারে, ওপারের ছেলেমেয়েগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে এপারের মাদুরে কাঁথায়, এপারের ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে।

তাই বলে যে খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি বন্ধ হ'য়ে গেল দু'পারের মধ্যে চিরদিনের জন্য, উঠানের মাঝখানে পুরানো চাঁচের বেড়াটা থেকেও রইল না, তা নয়। মানুষ তা'হলে দেবতা হ'য়ে যেত। তবে পরের আশ্বিনের ঝড়ে পচা বেড়া পড়ে গেলে সেটা আবার দাঁড় করবার তাগিদ কোন পারেরই দেখা গেল না। বেড়াটা ভেঙে জ্বালান হতে লাগলো দু'পারেরই উনানে। দু'পারের ঝাঁটার সঙ্গেও সাফ হ'য়ে যেতে লাগলো বেড়ার টুকরোর আবর্জ্জনা। শেষে একদিন দেখা গেল দাওয়ার বেড়াটি ছাড়া উঠানে বেড়ার চিহ্নও নেই, বাড়ীর মেয়েদের ঝাঁটায় দু'টির বদলে একটি উঠান তকতক ক'রছে।

তারপর?

কাণকালি গাঁয়ের খালে একবার একটা কুমীর এসেছিল। মানুষখেকো মস্ত কুমীর। পরপর তিনটি বৌকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গাঁয়ের। একজন মাঝবয়সী, দু'জন তরুণী। একজন রোগা ন্যাংলা, একজন বেশ মোটাসোটা, আরেকজন ছিপছিপে দোহারা গোছের লম্বাটে। মোটা বৌটি কুমীরের পেটে গিয়েছিল একাই। অন্য বৌ দু'টির একজনের গর্ভ ছিল সাত আট মাস, অন্যজনের কাঁখে ছিল ছোট একটি শিশু। তার পেটেও একটা কিছু ছিল ক'য়েক মাসের। তাকে যখন কুমীর ধরল, বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য তাকে সে যত জোরে যত দূরে পারে ছুঁড়ে দিয়েছিল। মায়ের প্রাণ তো!

কান্তি দাসের বিধবা বোন সনকা বাচ্চাকে তুলে আনে।

সেই শিশুর বয়স এখন পনের বছর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। টেরা বাঁকা আধ শুকনো বাঁ হাতটা একেবারেই অকেজো, আঙুল গুলি শক্ত হয়ে গে , বাঁকে না। ডান হাতে বেশ জোর আছে, বিশেষ কর্ম্মতৎপর নয় বটে, কারণ কোন কাজেই পটুতা অর্জ্জন করার ধৈর্য্য তার নেই, কিন্তু হাতটি যেন সব সময়েই কাজের জন্য অস্থির ও চঞ্চল হয়ে থাকে, অথবা অকাজের জন্য। তার বাবা গিরিশ আবার বিয়ে করেছিল এগার মাসের মধ্যেই, কিন্তু প্রথম পক্ষের একমাত্র খুঁতে ছেলেটাকে মানুষ করার চেষ্টার ত্রুটি সে করেনি—স্কুলে পর্য্যন্ত দিয়েছে। স্কুলে গড়েন ক্লাস সেভেন পর্য্যন্ত উঠেছিল। ফেল করে করেই সে ক্লাসে উঠেছিল বরাবর কিন্তু একবার, ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে উঠেছিল ফাষ্ট হয়ে। চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এই চমকপ্রদ ঘটনায়। কিন্তু শুধু ওই একবার। তার আগে বা পরে আর কখনো সে পরীক্ষায় পাস করেনি—একমাত্র ড্রয়িং-এর পরীক্ষা ছাড়া। ড্রয়িং-এ তার হাতটা ছিল পাকা। এক হাতে এত সহজে এত ভাল ড্রয়িং সে করতে পারত যে, অন্য ছেলেরা হাঁ করে চেয়ে থাকত। ড্রয়িং মাষ্টারের চেয়ে তার আঁকা পাখী ও গাছ জীবন্ত হত বেশী। তবে ছেলেবেলাতেই কেমন বখাটে হয়ে গেল ছেলেটা। ক্লাস সেভেনে একবার ফেল করার পর আর তাকে পড়ানোই গেল না। পরপর কয়েকটি কেলেঙ্কারীর পর গিরিশ তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়িয়ে দেবার পরেও সে অবশ্য গিরিশের বাড়ীতেই থাকে। তাড়ানো ছেলের মতো থাকে।

এই বয়সেই দড়ির মতো পাকিয়ে দেহের মাংসপেশীগুলি তার শক্ত হয়ে গেছে, রোগা শরীরটাতে শক্তি আর সহিষ্ণুতা আশ্চর্য্যরকম। মুখে স্থায়ী ছাপ পড়েছে একটা শ্রান্ত সকরুণ জিজ্ঞাসার, ভাঙা বাঁকা নাকটা যেন জিজ্ঞাসার ভারেই নুয়ে গেছে। আর কী ভীরু তার দুটি চোখ! সবাই যেন যখন তখন তাকে মারে, আপন পর ছোট বড় দেবতা মানুষ নারী পুরুষ যে যেখানে আছে। নিরুপায় সহনশীলতায় সে যেন চুপচাপ সয়ে যায়। অসহ্য হলে অন্তরালে কাঁদে।

মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্য সে গাঁ ছেড়ে উধাও হয়ে যেত। এবার প্রায় ছ'মাস কোথায় গিয়ে কাটিয়ে এল কেউ জানে না। সবাই যখন ভাবতে আরম্ভ করেছে যে আরও অনেকের মতো সেও দুর্ভিক্ষের কবলে গেছে চিরদিনের মতো, তখন সে একদিন ফিরে এল। সাজপোষাকের তার উন্নতি দেখা গেল অদ্ভুত রকমের—সিল্কের পাঞ্জাবী,

ফর্সা ধুতি, চকচকে বার্ণিশ করা জুতো। গাঁয়ে থাকবার তার ঝোঁক দেখা গেল না, যদিও গিরিশ আর বাড়ীর লোকের কাছে খাতিরের এবার আর সীমা রইল না তার। দু'একদিন থাকে, ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ জমায়, বড়ই তাকে মিশুক বলে মনে হয় এবার। ক্ষণে ক্ষণে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে উদ্ভট চেহারার একটা কেস বার করে তা থেকে খাঁটি মার্কিন মিলিটারী সিগারেট নিয়ে টানে—আগে সে তামাক আর বিড়ি খেত, মাঝে মাঝে পয়সায় দুটোওলা সিগারেট।

লালু আর মবুবকেও সিগারেট দেয়। ওদের সঙ্গে এবার তার বড় ভাব হয়েছে। লালুর বয়স এগার বছর, মবুবের বার। সমবয়সী বয়স্ক লোকের মতোই তারা তাদের মেয়ে সংক্রান্ত ব্যবসার কথা বলে, অশ্লীল হাসিতামাসাগুলি পর্য্যন্ত তাদের হয় বয়স্কদের মতো।

গজেন বলে, 'মদনের বোনটা পিছায় কেন রে?'

লালু বলে, 'ডরায়। লালমুখো গোরাদের যদি ধরিয়ে দি?'

'লালমুখো গোরা কিসের?' গজেন বলে বেজার হয়ে।—'মোদের বিবি'সাব কি কয়? মেহের খিবিসাব?'

মবুব বলে, 'কয় কি, তোরা পোলাপান, তোদের কথায় গিয়ে মরব?'

'পোলাপান ঠাউরেছে, না?'—একটা কুৎসিত ইঙ্গিতে তারা যে পাকাপোক্ত পুরুষের চেয়ে বেশী কিছু সেটা প্রমাণ করে তিনজনে হাসে। মানুষ বুড়ো হয়ে মরে গিয়ে যত বুড়ো হয় গজেন তার চেয়ে পাকা। হাসাহাসির পর সে বলে, 'তা কথা বেঠিক না। মাগী ছাড়া মাগীরা ভরসা পায় না। চপলার জন্যে এ মুশকিল।'

চপলার খারাপ রোগ হয়েছে, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত। দামী কাপড় পরে হাসিমুখে সে আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কটিবাজারে কাজ করতে যাবার জন্য মেয়েদের ভরসা দিতে পারে না।

কথাটা ভাববার মতো। ভাবতে ভাবতে গজেন বাড়ী যায়। বাড়ী পৌঁছেই ভাত বাড়বার হুকুম দেয়, এখুনি তাকে কটিবাজার রওনা হতে হবে। রোজগেরে ছেলেকে বাড়ীর মেয়েরাই সাগ্রহে ভাত বেড়ে দিত কিন্তু তারা কেউ নড়বার চড়বার আগেই ওবাড়ীর হাবো যেন উড়তে উড়তে পিঁড়ী পেতে তার ভাত বেড়ে এনে দেয়। গজেনের নতুন মা, মাসী আর পিসীরা অসন্তুষ্ট হয়ে আড়চোখে তাকায়। ছুঁড়ি যে গজেনেরি দেওয়া নতুন রঙীন শাড়ি পরে এ বাড়িতে এসে ফর ফর করে উড়ছে, এতে তাদের চোখ জ্বালা করে আরও বেশী।

'ফিরবে কবে?' সভয় ভক্তিতে হাবো জিজ্ঞেস করে। গলা তার প্রায় বুজে আসে আবেগে।

'পরশু তরশু ফিরব।'

হাবোকে মন্দ দেখাচ্ছে না রঙীন কাপড়ে, গজেন ভাবে। একটু আশ্চর্য্য হয়েই সে মেয়েটার সারা গায়ে একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নেয়—মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এদিক ওদিক আর তার একান্ত অনুগত এই যে একটা মেয়ে আছে, এর কথা তার খেয়ালও হয় নি একবার। একটু হাবাগোবা মেয়েটা, চোখ একটু ট্যারা, হাড়গিলের মতো রোগা শরীর। কিন্তু বয়েস তো কম! তাছাড়া, এরকম হাবা গোছের মেয়েই ভাল, সহজে বাগানো যায়, ভয় দেখিয়ে সহজে কাবু করা চলে।

'হাবো, সঙ্গে যাবি? কাজ করে খাবি? কাপড় গয়না পাবি?'

'যাবো।'

হাবোর চোখ জলজল করে ওঠে।

চিরদিন এই মেয়েটা কেন যে তার এত অনুগত গজেন জানে না—পৃথিবীতে এই একজন। কোনদিন ভাবেও না। হাবো তার কাছে অতি সস্তা, তাকে অন্ধ অবেগের সঙ্গে ভক্তি করে বলে। তার পঙ্গু, বিকারগ্রস্ত জীবনেরই একটা অঙ্গ হিসাবে মেয়েটা তারে জীবনে মিশে ছিল বরাবর। আছে তো আছে, এইভাবে। তার নতুন ব্যবসায়ের কাঁচা মাল হিসাবে আজ মনে মনে ওকে যাচাই করতে গিয়ে মেয়েটার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠে তার এলোমেলো ভাবনা জাগে। কেমন আকুপাঁকু করে মনটা নানা বিরুদ্ধ চিন্তায়। বিধবা ভাগ্নী রাসিকে হারাধনের আস্তানায় পৌঁছে দিতে পারলে কী রকম হয়। রাসি খুব রূপসী, ওকে দেখলে কথাটা সে না ভেবে থাকতে পারে না। ভাবতে গেলে আবার কেমন জ্বালাপোড়া আর অস্থির ভাব সুরু হয়। সে কি আর সত্যি নিজের ভাগ্নীকে হারাধনের কবলে দিয়ে আসবে। কিন্তু তবু ভাগ্নী তার জন্য সে জ্বালাতন হয়ে উঠেছে। তাকে দেখলেই মন তার দাম কষা সুরু করে!

হাবো তার সঙ্গেই বার হয়। অনেকক্ষণ হাঁ করে থাকায় লালা গড়িয়ে পড়েছিল, সসপ্ করে একবার লালা টেনে সে মুখটা বন্ধ করে দেয়। কয়েকটা বাড়ী পরেই হাবোর বাবা দয়ালের খড়ের ঘর। গজেনের সঙ্গে মেয়েকে আসতে দেখে দয়াল ভ্রূকুটি করে তাকায়, কিন্তু গজেন কাছাকাছি এলে তার মুখখানা বেশ অমায়িক মনে হয়।

'তেল একটিন দিলি না বাবা?'

'দেব দেব। পরশু কি তরশু নিয়ে আসব সাথে।'

কোটের বাঁ হাতটা ঝুলছিল লড়বড় করে, ডগাটা পকেটে গুঁজে সে খাল ধারে এগিয়ে যায়। মিলিটারী, সরকারী, আধা-সরকারী আর লাইসেন্সী নৌকা চলছিল খাল দিয়ে। একটা নৌকাকে সে হাঁক দেয়, জানায় তার পাশ আছে। নৌকা ধারে এসে তাকে তুলে নেয়।

কটিবাজারে সমারোহ ব্যাপার। চারদিকে অস্থায়ী চালাঘরের অরণ্য, মাছির মতো মানুষের ভিড়, নতুন রাস্তা

কাঁপিয়ে হরদম লরীর আনাগোনা। ফাঁকায় পাহাড় সমান স্তূপাকার চালের পচা গন্ধে চারিদিক মসগুল।

হারাধনকে গজেন জেস্তির ঘরে খুঁজে বার করে। হারাধন লোকটা বেঁটে ও বলিষ্ঠ, ঘাড়ে-গর্দ্দানে এক করা, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মাথার চুলে পাক ধরেছে। এই অবেলায় মদ খেয়ে চোখ লাল করে ফেলেছে।

'মাগী চাই একটা।'

গজেন তাকে খবরাখবর দেবার পর হারাধন বলে এক ঢোঁক মদ গিলে। ছোট ছেলে দিয়ে একদিকে যেমন সুবিধা আছে, অন্যদিকে তেমনি অসুবিধাও অনেক। ছোট ছেলে যে কোন বাড়ী গিয়ে যে কোন মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারে, কেউ কিছু সন্দেহ করে না। মেয়েলোক কেউ আনাগোনা করলে বরং খটকা লাগতে পারে লোকের মনে কিন্তু এগার বছরের ছেলে যে মেয়ে ভজানোর কাজে লেগেছে, লোকের এ ধারণা সহজে হয় না। কিন্তু অতটুকু ছেলের কথাতে আবার ভরসা করতে মেয়েরা সাহস পায় না, এই হল মুস্কিল। খাটি গেরস্ত ঘরের দু'তিনটি মেয়ে প্রায় তৈরী আছে, চপলার মতো চালাকচতুর হাসিখুসী নাদুসনুদুস একজন মাগীর এখন একবার গাঁয়ে ঘুরে আসা দরকার। শাড়ী গয়না রে গিয়ে চাক্ষুস প্রমাণ দেখিয়ে আসবে ওদের যে, ওদের জন্যও কেমন পেট-ভরা খাওয়া, ভাল ভাল কাপড় আর দামী দামী শাড়ী গয়না রয়েছে তৈরী হয়ে, কটিবাজারে এসে খেটে উপার্জ্জন করে নিলেই হয়।

'বেশী গয়না না কিন্তু।'

গজেন তা জানে। বেশী গয়না দেখলে খটকা লাগে মানুষের মনে। গরীব মানুষের মনে।

'না, বেশী গয়না না।'

দুদিন পরে ফুল, একটিন কেরোসিন এবং আরও নানারকম জিনিষপত্র নিয়ে গজেন নৌকায় কাণকালি আসে। ফুল দেখতে বিশেষ সুন্দরী নয় কিন্তু তার চেহারায় একটা আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য আছে ঘরোয়া ভাবের। মা শিশুকে আদর করতে করতে একেবারে গদগদ হয়ে পড়লে তখন তার যে রকম মুখের ভঙ্গি হয়, তারই স্থায়ী ছাঁচে ঢেলে যেন মুখখানা গড়া হয়েছে ফুলের। তার কথা মিষ্টি, হাসি মোলায়েম। তবু তাকে যারা চেনে তারা তাকে ভয় করে। এই শান্ত নম্র গেরস্ত বৌটির মতো চেহারার ভিতরে যে বুদ্ধি আছে তার ধারে অনেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

কাণকালি পৌছে একটা দুঃসংবাদ শোনা যায়। কোনো এক নারীসঙ্ঘ থেকে দু'জন মহিলা কর্ম্মী গাঁয়ে এসেছে আগের দিন সকালে। বৈরাগী দাসের সেই বৌটাকে তারা সঙ্গে এনেছে কটিবাজারের বাজার থেকে সংগ্রহ করে, ওদের কথায় জীর্ণ শীর্ণ জরগ্রস্ত বৌটাকে বৈরাগী ক্ষমা করেছে, গ্রহণ করেছে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে মেয়ে দু'জন সকলকে সাবধান করে দিচ্ছে, লোকের কথায় ভুলে মেয়েরা যেন কোথাও না যায়। লোভে পড়ে গিয়ে দু'দিনে মেয়েদের কি অবস্থা হয়, রোগে ব্যারামে শরীর একটু ভাঙলেই কি ভাবে পথে এসে দাঁড়াতে হয়, বাগে পেলে কি ভাবে দূরে দূরে চালান করে দেওয়া হয়, সব কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। বৈরাগী দাসের বৌটাকে সামনে ধরছে প্রমাণ হিসাবে।

সঙ্গে দু'জন বাবু আছে তাদের। লালু আর মধুবকে তারা কত উপদেশই যে দিয়েছে। স্কুলের ছেলে তারা, এই বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে খারাপ কাজে লাগা কি উচিত?—এমনি সব বড় বড় কত কথা।

'সিগারেট চাইতে ছোকরা বাবুটা রেগে টং।'

লালু আর মধুব খিলখিলিয়ে হাসে।

গজেন চিন্তিত হয়ে ফুলকে নৌকায় রেখে একাই নেমে যায়। অবস্থাটা ভাল করে না বুঝে মাগীটাকে সঙ্গে করে গাঁয়ের মধ্যে যেতে তার ভরসা হয় না। কেরোসিন-তেলের টিনটা সে সঙ্গে নিয়ে দয়ালের বাড়ী পৌছে দেয়।

তখন শেষ দুপুর। বাকী বেলাটা সারা গাঁয়ে ঘুরে গজেন ভড়কে যায়, চটেও যায়। যারা তাকে দেখতে পারত না কোনদিন তাদের কথা বাদ যাক, জিনিষপত্র দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে যে সব দুর্ব্বল অসহায় মানুষের কাছে তার বেশ খাতির জমেছিল, তারাও যেন অনেকে কেমন দূরে সরে গিয়েছে, তাকে ভাল করে আমল দিতে চায় না। ঘোষপাড়ায় ঢুকবার পথে পাড়ার পাঁচটা ছেলে তার পথ আটকাল, স্পষ্ট বলে দিল পাড়ায় ঢুকলে তার একটি মাত্র আস্ত হাতটা মুচড়ে ভেঙে দেবে। হাত কার ভাঙে আর কার আস্ত থাকে, গজেন তা দেখে নেবে, কিন্তু অবস্থা তো সুবিধাজনক নয়। মদন আমতা আমতা করে আবোল তাবোল কি যেন বকল। তার বোনটা কথাই বলল না তাদের সঙ্গে। মেহের দরজা খুলল না।

সন্ধ্যার সময় মন খারাপ করে গজেন নৌকায় ফিরে যায়। দুচোখে তার ঘনিয়ে আসে গভীর বিষাদ। নৌকার গলুই-এ বসে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে শুনতে এক অজানা দুর্ব্বোধ্য বেদনার রহস্যময় সঞ্চারে তার মন উদাস অবসন্ন হয়ে আসে। বিকৃত উত্তেজনার অবসান ঘটলেই চিরদিন তার এরকম মন কেমন করে।

ফুল বলে, 'কি গো ভাব লাগলো?'

'ভাবছি। আজ নামা হয় না, নায়ে থাকবো।'

'ও বাবা, ডর লাগবে।'

'আমি থাকবো।'

'তাতে বুঝি ডর কম?'

ফুলের পিপাসা পেয়েছিল। আজ আর নামতে হবে না স্থির হওয়ায় সে বোতল বার করে তৃষ্ণা মেটাবার আয়োজন করে। গজেনকে ডেকে নেয় ছই-এর মধ্যে। সেখানে কড়া মিলিটারী চোরাই মদ আর ফুলের সাহচর্য্যে ক্রমে

ক্রমে গজেনের উত্তেজনা ফিরে আসায় কাব্যিক বিষাদ কেটে যায়।

আরও কিছু পরে বেশ মেতেই ওঠে তারা দুজনে।

ছই-এর বাইরে হাবোকে প্রথম দেখতে পায় ফুল। গজেনকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বলে, 'তুমি কে গো?'

গজেন মুখ ফিরিয়ে বলে, 'কিরে হাবো? কি করছিস হেথা?'

হাবো পা গুটিয়ে হাতে ভর দিয়ে বসে হাঁ করে দেখছিল। মুখ দিয়ে তার লালা গড়িয়ে গড়িয়ে নৌকার পাটাতনে জমেছে। সসপ্ করে লালা টেনে মুখ বন্ধ করে সে উঠে দাঁড়ায়, এক লাফে ডাঙায় পড়ে, ছুট দেয় গাঁয়ের দিকে।

দূরে থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজবার খানিক পরে দয়ালের বাড়ীতে 'আগুন! আগুন!' চীৎকার ওঠে। পাড়ার লোক হৈ হৈ করে ছুটে যায়। পুরো এক টিন কেরোসিন গায়ে বিছানায় ঢেলে হাবো আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘরে পর্য্যন্ত আগুন ধরে গেছে দয়ালের।

খবর শুনে বৈরাগী দাসের বৌ চোখ বড় বড় করে বলে, 'এক টিন তেল! কুপি জ্বালার তেল মেলে না এক ফোঁটা, ছুঁড়ি এক টিন তেল ঢেলেছে!'

অনেকেই আপশোষ করে।

—স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই—

কৈলাস বসুকে সকলে স্বার্থপর আর সঙ্কীর্ণচেতা বলে জানে। মানুষটার চালচলন আচার ব্যবহার তো বটেই, চেহারাও সকলের এই ধারণাকে অনেকটা সমর্থন করে। বেঁটে, আঁটোসোটো ধরণের মোটা, প্রায় গোলাকার মাথায় বুরুশের মতো শক্ত ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, লম্বা নাকের দু'পাশে মোটা ভ্রূর নীচে খুদে খুদে দু'টি চোখ। চোখ দু'টিকে কটাই বলা চলে। ছোট এবং কটা, তবু সে চোখের দৃষ্টি বড় বড় নিকষ কালো চোখের অধিকারীদের কাছে বড় বেশী স্পষ্ট সমালোচনা আর তিরস্কারে ভরা মনে হয়। মুখের আটক নেই, এমন অভদ্র মানুষকে এড়ানোর মতো সকলের চোখ তাই কৈলাস বসুর চোখকে এড়িয়ে চলে।

কৈলাস কথা যে কম বলে তা নয়, মৃদু রসিকতা-ভরা হাসির সঙ্গে মিষ্টি কথাই সাধারণত বলে, তবু লোকের মনে হয় সে যেন বড় বেশী গম্ভীর, সব সময় মুখ বুজে কেবল নিজের কথা ভাবছে। কারণটা সম্ভবত এই যে, অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে প্রায়ই তার কথার কোন যোগ থাকে না। অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে হয়তো তার দেখা হয়ে গেল, তাকে চমকিয়ে দেবার জন্য অবিনাশ হয়তো সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'ঘোষালের কীর্ত্তিটা শুনেছেন, দাদা—ওপাড়ার কেদার ঘোষালের নতুন কীর্ত্তি? ছি, ছি! ভদ্দরলোকের এমন পিরবিত্তি হয়, এমন কাজ ভদ্দরলোকে করে!—'

কৈলাস হয়তো জিজ্ঞেস করে, 'ছেলের কোন খপর পেলেন চক্কোত্তি মশায়? চিঠিপত্র এল?'

অবিনাশ একটু দমে যায়। সহরবাসী রোজগেরে ছেলে তাকে ত্যাগ করেছে সত্য, চিঠিও লেখে না খবরও পাঠায় না, কিন্তু এই কি সে কথা তুলবার সময়! সহানুভূতি জানানোর তো সময় আছে? তবু ধৈর্য্য ধরে অবিনাশ হয়তো বলে, 'না, চিঠিপত্তর পাইনি। কি জানেন দাদা, এ যুগটাই এ রকম, কারও কাণ্ডজ্ঞান নেই। নইলে ঘোষাল এমন কাণ্ডটা করতে পারে? বামুন মানুষ তুই, গলায় তোর পৈতে আছে, সনদেবেলা তুই কিনা এক জেলেমাগীর ঘরে—'

কৈলাস হয়তো আবার বলে, 'সেই যে পাত্রটির সন্ধান পেয়েছিলেন খুকীর জন্যে, কতদূর এগোল প্রস্তাবটা?'

অবিনাশের হাতদাঁত সুড় সুড় করে, কৈলাসের গালে এক ঘা বসিয়ে দিতে, গায়ের কোথাও কামড়ে দিতে।

নবীন সরকারের দাওয়ায় বসে হয়তো পাঁচজনে নানা কথা আলাপ করছে। সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের সেক্রেটারী কিসে সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলল যে, সাত টাকা এগার আনা বিপিন মুদীর দোকানে ধার থেকে গেল, সকলে যখন এ সমস্যার কূলকিনারা পাচ্ছে না, কৈলাস হয়তো তখন আপন মনে বকে চলেছে, এ বছর বর্ষা কম হওয়ার ফলটা এ পর্য্যন্ত কি দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে। গ্রামান্তরে আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়ার সময় ভূষণের বিধবা শালীর গর্ভটা ঠিক ক'মাসের হয়েছিল, সকলে যখন এই তর্কে মসগুল হয়ে আছে, কৈলাস হয়তো তখন কেবলই সকলকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে যে, বিপিন মুদীর দোকানে দুর্গোৎসবের ধারটা সে এখন ঘরের পয়সা

দিয়ে মিটিয়ে দেবে বলেনি, কয়েকজনের কাছে তার যে টাকাটা পাওনা আছে, সেটা পেলে তখন মিটিয়ে দেবে।

এ কি কথা বলা? আলাপ করা? এভাবে কথা বলার চেয়ে মুখ বুজে থাকা কি ভাল নয়?

কৈলাস কখনো কোথাও চার আনার বেশী চাঁদা দেয় না, কোন উপলক্ষেই নয়। অন্তত পাঁচ টাকায় বিক্রী করা চলে এমন কিছু বাঁধা না দিলে পাঁচটা টাকা ধার পর্য্যন্ত দেয় না। পাড়ায় যে থাকে, যার ছেলে সহরে একশ' টাকা বেতনে চাকরী করে, তাকে পর্য্যন্ত নয়! হাসি মুখে আবার বলে যে, এভাবে টাকা ধার না দিলে শোধ করার কথাটা কারও মনে থাকে না, শোধ করার চেষ্টাও থাকে না। সকলের চোখের উপরে নিজের খুসীমত সে একটি ছোট পাকা বাড়ী তুলেছে—ক'খানা এবং কতবড় ঘর করা উচিত, দরজা জানালা কি রকম হলে ভাল হয়, এসব বিষয়ে কারও একটা পরামর্শও কাণে তোলেনি। পথ সংক্ষেপ করতে সকলে পায়ে পায়ে তার জমির উপর যে পথটি গড়ে তুলেছিল, বিনা দ্বিধায় তার উপর রান্নাঘর তুলে পথটা বন্ধ করে দিয়েছে। অনুযোগ অভিযোগের জবাবে হাসিমুখে বলেছে, কয়েক গজ বেশী হাঁটা মানুষের পক্ষে সমান কথা। পঞ্চাশ হাত তফাতের পথটাতেই যখন কাজ চলে, সে কেন অন্য যায়গায় রান্নাঘর তুলে অসুবিধা ভোগ করবে?

কেদার ঘোষাল সকলকে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু কেউ সাহস করেনি। অন্য লোকে হয়তো মামলার নামেই একটা মিটমাটের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত, তার জমির উপর দিয়ে পাড়ার লোকের হাঁটবার অধিকারের বদলে কমপক্ষে পাড়ার লোককে মস্ত একটা ভোজ দিয়ে দিত। কিন্তু কৈলাস হয়তো মামলার নামেই আগে কলকাতা থেকে উকিল ব্যারিষ্টার আনাবার ব্যবস্থা করে রাখবে।

কৈলাসের স্ত্রী অভয়ার একটু ঝগড়া করা স্বভাব। কিন্তু সাতটি ছেলেমেয়ে আর স্বার্থপর স্বামীর জন্য বেচারীর স্বভাবটা ভাল করে মিটতে না মিটতে প্রায় চাপাই পড়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সে অনুযোগ করে বলে, 'মানুষের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে পার না?'

কৈলাস আশ্চর্য্য ও আহত হওয়ার ভাণ করে বলে, 'কেন, তোমার সঙ্গে মানিয়ে চলি না?'

'মানিয়ে যা চল তা ভগবানই জানেন। আমার কপাল মন্দ তাই তোমার হাতে পড়েছিলাম। লোকের নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়াও কেন তুমি? তোমার কি দরকার নিন্দে করে? সকলকে চটিয়ে লাভ কি শুনি?'

কৈলাস জবাব দেয় না। এও তার এক ধরণের স্বার্থপরতা, নিজেকে সমর্থন করার জন্যও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করতে চায় না। অভয়ার অনুযোগটাও মিথ্যা নয়। কারও কুৎসা কৈলাস কাণে তুলতে চায় না, উৎসাহী প্রচারককে বাজে কথা বলে দমিয়ে দেয়, তবু যে কী করে কুৎসা-প্রচারক হিসাবে তারই নামে কুৎসা রটে যায়! তার কথায় লোকে বিশ্বাস করে বলে হয়তো প্রচারকামীরা ইচ্ছা করে তার নামটা ব্যবহার করে। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে সে এমনভাবে নিজের নিজের অন্যায়গুলি উপলব্ধি করায়, যে অন্যের অপবাদ কাণে এলে সকলের মনে হয়, সে ছাড়া আর কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে পরের অপবাদ দেখিয়ে দেবে?

কেদার ঘোষালের আধুনিকতম কলঙ্কের সঙ্গে তার নামটা বড়বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। অবিনাশ চক্রবর্ত্তী রাধারমণ ভট্টাচার্য্যকে বলেছিল, 'কৈলাস বোসের অহঙ্কার আর তো সয় না দাদা। নিজের চোখে যা না দেখবে তাই হেসে উড়িয়ে দেবে, সবাই যেন মিথ্যেবাদী। কেদার ঘোষালের ব্যাপারটা বললাম, শুনে আমার সঙ্গে তামাসা জুড়ে দিল। আমি যেন ওর তামাসার পাত্তর!'

আরও অনেক কথা অবিনাশ বলেছিল! পরদিন রটে গিয়েছিল, কৈলাস স্বীকার করেছে যে সে নিজের চোখে কেদার ঘোষালকে জেলেমাগীর ঘরে ঢুকতে দেখেছে। রটনাটি আরও খানিকটা বিকৃতভাবে স্বয়ং কেদার ঘোষালের কাণে গিয়ে পৌঁচেছে!

সুতরাং কেদার ঘোষাল ভয়ানক চটে গেছে! কৈলাস বদনাম রটিয়েছে বলে শুধু নয়, বদনামটা একেবারে মিথ্যা বলে। জেলে পাড়ায় কেদার গিয়েছিল কিন্তু কোন জেলেমাগীর ঘরে ঢোকেনি। কে না জানে যে, আজকাল সে কেবল জেলেপাড়া নয়, কুমোরপাড়া, তাঁতিপাড়া, বাগ্দীপাড়া সব পাড়াতেই যাতায়াত করছে? মিউনিসিপ্যালিটির সে সদস্য, এখানকার সর্ব্বপ্রধান নেতা, সে যদি ওসব পাড়ায় না যায়, কে যাবে? এতদিন প্রয়োজন ছিল না, যায়নি, এখন প্রয়োজন হয়েছে, যাচ্ছে। ওসব গরীব দুর্ভাগাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সে যে চেষ্টা আরম্ভ করেছে, সেটা তো সকলে জানে? অন্তত, জানা তো উচিত সকলের? তবু তার নামে এই মিথ্যা বদনাম।

আসলে বদনামটা কিন্তু খুব বেশী ছড়ায়নি। দু'চারদিন একটু ফিসফাস করে চুপ করে গিয়েছিল। কেদারের চরিত্রগত বেশ সুনাম আছে চারিদিকে। সকলে তাকে ভদ্র, সংযত, ভালমানুষ বলেই অনেকদিন হতে জানে। মানুষটা সে উদার, পরোপকারী। সর্ব্বত্র সে যে অনেকের চেয়ে বেশী টাকা চাঁদা দেয় তা নয়, মাঝে মাঝে নানা প্রতিষ্ঠানে মোটা টাকা দানও করে। তাকে ছাড়া সভা-সমিতি হয় না, নতুন পরিকল্পনা দাঁড়ায় না। স্থানীয় হাসপাতাল, স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতি সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তার যোগ আছে। বন্ধু ও পরিচিত সকলেই তাকে পছন্দ করে, অনেক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে তার পরামর্শও জিজ্ঞেস করতে আসে।

একটিমাত্র খাপছাড়া বানানো বদনামে এরকম জনপ্রিয় মানুষের সুনাম নষ্ট হয় না। তবু, একটু ভয় পেয়ে ছোট লোকদের পাড়ায় যাওয়া কেদার অনেক কমিয়ে দিল। এক মাসের মধ্যে জেলেপাড়ার ধারেকাছেও ভিড়ল না। কিন্তু একেবারে না গেলেও তো চলে না, নেতৃত্ব বজায় রাখা চাই। তাছাড়া ওদের অবস্থাও সত্যসত্যই বড় শোচনীয়, ওদের জন্য যতটুকু পারা যায় না করলেই বা চলবে কেন? তাই, সকালের দিকে মাঝে মাঝে কেদার ওসব পাড়ায় যায় এবং কমপক্ষে সাত আটজন অনুগত ও উৎসাহী কর্মীকে সব সময় বডিগার্ডের মতো সঙ্গে সঙ্গে রাখে।

আগেও অবশ্য এ-রকম বডিগার্ড দু'একজন কেদারের সঙ্গে থাকত। একা ওসব পাড়ায় যেতে তার চিরদিনই ভয় করে। এখন ছোটখাট একটি দল বেঁধে যায়, কেউ যাতে আর কোনমতেই ভুল করতে না পারে যে, তার ভাল ছাড়া মন্দ কোন উদ্দেশ্য আছে।

কৈলাসও মাঝে মাঝে ওসব অঞ্চলে যায়, তবে কেদারের মতো কখনও নেতা হিসাবে উপরে উঠবার প্রেরণায়, কখনও গরু ছাগলের মতো যারা জীবন কাটায় তাদের জন্য কিছু করবার সখে, কখনও বা নবযুগের নতুন মতাবলম্বী অল্পবয়সী অনুগত কর্মীদের সমর্থন হারানোর আশঙ্কা। অবশ্য ওদিকে যায় না, নিছক তার নিজের দরকারে। ওখানকার অনেকেই তার কাছে টাকা ধারে। টাকার পরিমাণটা অবশ্য খুবই কম, গরীবকে কৈলাস কখনো দু'পাঁচ টাকার বেশী ধার দেয় না এবং সুবিধামত হয় টাকায়, নয় মাঠের ধানে, বিলের মাছে, গোয়ালের দুধে, তাঁতের কাপড়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেয়। কৈলাসের নিজের কিছু জমি আছে, সেই জমিতে খেটে যদি কেউ দেনা শোধ করতে চায় তাতেও কৈলাস আপত্তি করে না। তবে সুদটা কৈলাসকে নগদ দিতে হয়—পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক এক পয়সা সুদ!

মফঃস্বলের ছোট সহর, কোথায় সহরের শেষ আর গ্রামের আরম্ভ, সরকারী কাগজপত্রের নির্দ্দেশ দেখেও সেটা ঠিক করা যায় কিনা সন্দেহ। একদিন তাই নকুড় পালের বাড়ীর সামনে কৈলাস আর কেদারের দেখা হয়ে গেল। এগারজন বডিগার্ড অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কেদারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, হাত তিনেক তফাতে নকুড়ের আশে-পাশে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার কুড়ি বাইশজন লোক। কমবয়সী ছেলেমেয়েও জুটেছে অনেক, কাছাকাছি প্রায় সমস্ত বাড়ীর বেড়ার ফাঁকে মেয়েদের মুখ উঁকি দিচ্ছে।

সকলকে জড়ো করে কেদার সবে বলতে আরম্ভ করেছিল, কৈলাস একপাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল। কৈলাসের উপর রাগ ছিল, সেইজন্য বোধ হয় তাকে দেখে কেদারের উৎসাহ গেল বেড়ে, অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী আবেগের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে রোগ আর দারিদ্র্যের পীড়ন সকলের কী শোচনীয় অবস্থা হয়েছে, সকলকে তাই ভাল করে বুঝিয়ে দিল। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সকলের যে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত, এই কথাটা বুঝিয়ে দিতেও তার সময় লাগল অনেকটা।

কেদারের বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র কৈলাস সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা, ঠিক বলেছেন।' তারপর মুখে একটা জোরালো আপশোষের আওয়াজ করে বলল, 'তবে কি জানেন, বেচারীরা করবে কি, করবার যে কিছু নেই!'

কেদার রাগ করে বলল, 'করবার কিছু নেই মানে?'

'কি আছে বলুন?'

'ওই যে বললাম, সকলে মিলে চেষ্টা করতে হবে?'

বেশ বুঝা যাচ্ছিল কেদারের বক্তৃতায় কৈলাসের মন রীতিমত নাড়া খেয়েছে, এ কথায় সেও যেন রেগে গেল, 'আপনি তো বলে খালাস চেষ্টা করতে হবে বলে। কী চেষ্টা, কিসের চেষ্টা তা বলুন?' তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, 'যাক যাক আমার ওসবে কথায় কাজ কি। আপনার ছেলের জ্বর কমেছে কেদারবাবু?—আমার সেই টাকাটা নকুড়?'

নকুড় কাছে এগিয়ে এল, নীচু গলায় বলল, 'আজ তো লাড়াব কত্তা।'

কৈলাস মাথা নেড়ে বলল, 'তাকি হয় হে, আজ না পারলে কবে পারবে? পরশু ধান বেচার টাকা পেয়েছ, তিন টাকা তিন পয়সা দিতে পারবে না?'

নকুড় বিড়বিড় করে কি বলতে লাগল, কারও কানে গেল না। হঠাৎ কেদার বলল, 'আপনিই বা এমন নাছোড়বন্দা কেন মশায়? গরীব মানুষ এত করে বলছে, তিনটে টাকার তো মামলা, কদিন পরেই না হয় আদায় করবেন?—আচ্ছা, এই নিন, আমি দিচ্ছি আপনার তিন টাকা শোধ করে। তুমি তোমার সুবিধে মতো আমায় টাকাটা দিও নকুড়, আর যদি নেহাৎ নাই দিতে পার—'

নকুড় প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কেদারকে মনিব্যাগ হতে টাকা বার করে কৈলাসের দিকে বাড়িয়ে দিতে দেখে তাড়াতাড়ি ঠিক ম্যাজিকওয়ালার মতো কোমরের ভাঁজ হতে ঠিক তিন টাকা তিন পয়সা বার করে ফেলল। টাকাটা কৈলাসের হাতে দিয়ে লজ্জার হাসি হেসে সবিনয়ে কেদারকে বলল, 'না, বাবুমশায়, না। মোর থেকে মিটমাট হয়ে যাকগা—হাঙ্গামায় কাজ কি?'

তারপর কৈলাস বলল, 'এবার ফিরবেন তো? চলুন এক সঙ্গেই যাই।'

কৈলাসের আরও কয়েকটি আদায় বাকী ছিল, কেদারও ঠিক করেছিল কিছু তফাতের আরেকটি পাড়া আজ ঘুরে যাবে। নিজের নিজের কাজ বাতিল করে দুজনে একসঙ্গে ফিরে চলল পাশাপাশি, নিঃশব্দে—অনেকটা বন্ধুর মতো।

কৈলাস নিজে হতে কথা পাড়বে না বুঝে কেদার শেষে বলল, 'আপনি বড় নিষ্ঠুর।'

কৈলাস বলল, 'কী করি বলুন, উপায় কি!'

'আপনার মন বড় ছোট।'

'তা বটে। একজনের তিনটে টাকা বলে উদারতা দেখালেন, ওরকম দু'শো চারশো হলে করতেন কি? এখনও প্রায় তিনশ লোক আমার কাছে টাকা ধারে।'

'আমি হলে চাইতে পারতাম না—দান করে দিতাম।'

'কবার দিতেন? দু'দশ টাকা দিলেই যদি চিরকালের জন্যে ওদের অভাব মিটে যেত তবে আর ভাবনা ছিল না! ফাঁকে তালে কিছু লাভ করার সুযোগ পেলে বরং ওদের স্বভাবটাই বিগড়ে যেত। ওদের আপনি জানেন না। নিজের যার রোজগার নেই অন্যে ভার কা করবে, কতকাল করবে? দেশে কি গরীবের সংখ্যা আছে।'

'তাই বলে চুপ করে বসে থাকবেন?'

কৈলাস হাসল।—'বসে আছি? সারাদিন তো খাটছি, মশায়। অতবড় একটা সংসার ঘাড়ে কতকাল ধরে কত খেটেখুটে তবে না আজ অবস্থাটা একটু স্বচ্ছল করেছি। ক্ষমতা তো তেমন নেই, কী আর হবে! কত লোক বসে বসে লাখপতি হয়, আমি জীবন পাত করে যা করলাম ছোট একটা বাড়ী করতেই ফতুর—তাও ঘরে কুলোয় না। ওদের অবস্থা দেখে প্রাণ কি কাঁদে না মশায়? কখন কি সাধ যায় না এর তিনটে টাকা, ওর পাঁচটা টাকা ছেড়ে দি? তারপর ভাবি তাতে আর লাভটা কী হবে! মাঝখান থেকে আর দশজনের কাছে আদায় করার সুদ থাকবে না। হঠাৎ কারও বিপদ আপদ ঘটল, পাঁচটা টাকা শোধ দিতে উপোস করার অবস্থা হল—তার কথা আলাদা। তাও খুব হিসেব করে আদায় বন্ধ করতে হয় মশায়! বড়লোক তো নই, নিজের কটা টাকা ফুরিয়ে গেলে দরকারের সময় দু'পাঁচটা টাকাও তো কাউকে দিতে পারবো না।'

কৈলাসকে উত্তেজিত মনে হয়। জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। হঠাৎ সুর বদলে বলে, 'আসল কথা ক্ষমতা নেই, বড় বড় কথা ভেবে করবো কি বলুন? তাতে একুল ওকুল দু'কুল নষ্ট—ছেলেমেয়েগুলির দু'বেলা পেট ভরে ভাত জুটবে না। তার চেয়ে নিজের যেটুকু শক্তি আছে কারো ক্ষতি না করে—'

কেদার বলল, 'হ্যা হ্যা জানি। বক্তৃতায় আপনারা খুব পটু। ক্ষতি করেই বা কত ছাড়েন! কবে আপনি আমায় জেলে মাগীর ঘরে যেতে নিজের চোখে দেখেছিলেন মশায়?'

অভিযোগটা কৈলাস আগাগোড়াই অস্বীকার করল, কিন্তু কেদার বিশ্বাস করল না। মুখ ফুটে অবিশ্বাসটা প্রকাশ করলে কৈলাস হয়তো কথাটা আরও খানিকটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু মুখের উপর মানুষকে ওভাবে মিথ্যাবাদী বলাও কেদারের পক্ষে বড় কঠিন।

পোষ্টাপিসের কাছে ছাড়াছাড়ি হল। কেদারের সঙ্গী একটি ছেলে মন্তব্য করল, 'চাঁই বটে লোকটা। কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন, এরকম স্বার্থপর ছোটলোক তো মানুষটা তবু নকুড়, শশী এদের কাছে ওর কী খাতির।'

কেদার বলল, 'খাতির করে, না ডরায়?'

ছেলেটি বলল, 'না, ঠিক ডরায় না,। ওকে খুব বিশ্বাস করে।'

বিশ্বাস কৈলাসকে সকলেই করে। লতাপাতা ফুল আর রঙীন কাগজে সাজান পাট খড়ির প্রকাণ্ড মঞ্চের চেয়ে ছোট একটা কাঠের টুলের উপর মানুষের যেমন আস্থা থাকে উচ্ছ্বসিত মমতা আর শুভকামনায় ভরপুর অনেক উদারচেতা-মহাপুরুষের চেয়ে স্বার্থপর কৈলাসকে সেইরকম বেশী নির্ভরযোগ্য মনে হয়। লটারীর টিকিটে লাখ টাকা পাওয়া সম্ভব বটে কিন্তু পাঁচ টাকার নোটে পাঁচটা টাকা পাওয়া যাইবে। কৈলাসের কাছে কেউ কোনদিন বিশেষ কিছু আশা করে না কিন্তু অমন তো হাজার হাজার লোক আছে যাদের কাছে কেউ কোনদিন কিছুই আশা করে না। জবরদস্তি আদায় করুক, দরকারের সময় পাঁচটা টাকাও তো সে দেয়। সব সময় নিজের সুখ সুবিধার কথা ভাবুক, অপরকে তার সুখ সুবিধা হতে বঞ্চিত করার চেষ্টা তো সে করে না। আবোল তাবোলে কথা তো সে বলে না। মানুষকে সে তো ঠকায় না। নিজের দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য তো সে পালন করে। কারও মাথায় হাত বুলিয়ে আদর না করুক কারও পাও তো সে চাটে না।

তবে লোকটা বড় স্বার্থপর, এই যা দোষ। একটু অভদ্রও বটে। সেদিন কেদারের বক্তৃতা শুনেই বোধ হয় কৈলাসের মধ্যে পরের ভাল করার জন্য একটু আগ্রহ দেখা গেল। কয়েকদিন পরে সে নিজেই কেদারের বাড়ী গেল, সবিনয়ে বলল, 'সেদিন ওদের সম্বন্ধে যা বলছিলেন, আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন তো ঘোষাল মশায়। মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছে সেদিন থেকে!'

শতরঞ্চি-বিছানো চৌকির উপর সে জেঁকে বসল, হেসে বলল, 'বিবেক মশায়, বিবেক মুখে, যে যাই বলুক, অন্যায় করছে মনে হলে বিবেক খোঁচাবেই খোঁচাবে।'

ঘণ্টাখানেক আলাপ আলোচনার পর কেদারের মুখে যখন উগ্র উত্তেজনা আর কৈলাসের মুখে গভীর অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘরে তিনজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক আর পাঁচটি কিশোর বসে ছিল, তারা সকলে একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই কৈলাসের দিকে চাইতে লাগল। কথা সে আবোল তাবোল বলেছে, অতি-পরিচিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রচলিত শব্দের অর্থ পর্যান্ত উলটে দেবার চেষ্টা করেছে, দেশের বৃহৎ ব্যাপারকে রূপ দিতে চেয়েছে ক্ষুদ্র ঘরোয়া ব্যাপারের, তবু তার কথাগুলি কি স্পষ্ট আর সহজবোধ্য। এসব বিষয়েও যে কৈলাস মাথা ঘামায়, এতক্ষন এমন তেজের সঙ্গে তর্ক

করতে পারে, কেউ তা কখনো কল্পনাও করেনি। তারপর কৈলাস বলল, 'যাকগে, ওসব বড় বড় কথা আমার মাথায় ঢুকবে না। একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে। আপনি তো মিউনিসিপ্যালিটিতে আছেন, নিজের চোখে ওদের পাড়ার অবস্থা দেখেওছেন অনেকবার, যেমন ধরুন নকুড়ের বাড়ীর সামনে রাস্তাটা—'

কেদার তাড়াতাড়ি বলল, 'চেষ্টা তো করি। একা কী করব?'

কৈলাসও তাড়াতাড়ি বলল, 'একা কেন? অন্য সকলকে বোঝাতে পারেন না? ওঁরা সব শিক্ষিত ভদ্রলোক, ওদের যদি না বোঝাতে পারেন—'

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। কেদার অবজ্ঞাভরা তামাসার সুরে বলল, 'আপনি পারেন? দেখুন না একবার চেষ্টা করে।'

কৈলাস গম্ভীরভাবে বলল, 'তাই ভাবছি। তবে ঢুকতেই যা হাঙ্গামা, ভাবতেও ভয় করে! আপনার তো সব জানাই আছে।'

কেদার আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'বলেন কি মশায়, আপনি এবার দাঁড়াবেন নাকি?'

কৈলাস সায় দিয়ে বলল, 'দেখি একবার চেষ্টা করে। আপনি এক কাজ করুন না, আপনি নিজে না ঢুকে আমায় ঢুকিয়ে দিন না?'

প্রস্তাব শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। কৈলাসের মতো স্বার্থপর মানুষের পক্ষেও কি এমন একটা খাপছাড়া প্রস্তাবকে স্বাভাবিক মনে করা সম্ভব?

সেদিন সন্ধ্যার সময় কৈলাস বাড়ীতে বসে আছে, দু'টি কিশোর তার সঙ্গে দেখা করতে এল। কৈলাস দেখেই চিনতে পারল, সকালে তারা কেদারের বৈঠকখানায় বসেছিল।

'কী মনে করে ভাই?'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম।'

তখনও নির্ব্বাচনের মাস ছয়েক দেরী ছিল। কিন্তু ধরতে গেলে সেদিন হতেই দু'জনে লড়াই সুরু হয়ে গেল। নির্ব্বাচনের মাসখানেক আগে দেখা গেল লড়াইটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রথমটা কৈলাসের বোকামিতে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল লোকটার মাথা বুঝি খারাপ হয়ে গিয়েছে। কেদারের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে তার মতো লোকের দাঁড়ানোর কোন মানে হয়? কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে দেখা গেল, কৈলাস খুব বেশী বোকা নয়। তার দিকেও অনেক সমর্থক জুটে গেছে। যতই জনপ্রিয় হোক, কেদারের শত্রুও ছিল অনেক, তারা কৈলাসকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে। কৈলাসের সবচেয়ে বেশী জুটেছে কমবয়সী সমর্থকের দল! এতকাল যারা কেদারের নামে হৈ-চৈ করছে, বডিগার্ডের মত সঙ্গে থেকেছে, তাদেরও কয়েকজন কৈলাসের দিকে ভিড়েছে।

তবে, ফলটা শেষ পর্য্যন্ত কী দাঁড়াবে বলা যায় না। কেদারের জয়লাভের সম্ভাবনাই বেশী।

এই ঘরোয়া নির্ব্বাচন উপলক্ষে সহর অনেক কাল এ রকম সরগরম হয়ে ওঠেনি। নির্ব্বাচনের অনেকদিন আগে হতেই সকলের মুখে শুধু এই আলোচনা। কৈলাসের দলের ছেলেরা প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, গরীবদের জন্য কৈলাস অনেক কিছু করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকলেও, তার উদ্দেশ্যটা যে কিছু করা প্রায় সকলেই তা বিশ্বাস করেছে। কৈলাসকে সকলে বিশ্বাস করে।

কৈলাসের দলের প্রচারকার্য্যের বিবরণ শুনতে শুনতে এবং দশজনের সঙ্গে আলাপ করতে করতে কেদার স্পষ্টই বুঝতে পারছে, এবার তার জয় পরাজয় নির্ভর করছে গরীবের জন্য তার কিছু করবার ক্ষমতায় দশজনের বিশ্বাসের উপর। গরীবদের জন্য সকলের এই অর্থহীন মাথাব্যথায় কেদারের বিরক্তির সীমা থাকে না, রাগে গা জ্বলে গিয়েছে, কিন্তু গরীবদের পাড়ায় যাতায়াতটা সে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক।

এমনিভাবে যখন দিন কাটছে, নির্ব্বাচনের আর বাকি আছে মোটে তিনটে দিন, একদিন বিকেলে ওই গরীবদের মধ্যে একটা দাঙ্গাবাধবার উপক্রম দেখা গেল। উপলক্ষটা একটু খাপছাড়া। নকুড়ের বাড়ীর কাছে একটা ফাঁকা মাঠ আছে। কেদার আর কৈলাস দুজনের দলের কর্ম্মীরাই গরীবের পাড়ায় পাড়ায় বলে এসেছিল বিকেলে যেন সকলে ওই মাঠে জমা হয়। এই মাঠে এসে কেদার ও কৈলাসের কথা শুনবার জন্য আগেও কয়েকবার তাদের ডাকা হয়েছে কিন্তু একদিন এক সময়ে দুজনের কথা শুনবার জন্য নয়!

নির্ব্বাচন নিয়ে ভদ্রলোকদের পাড়ার উত্তেজনা গরীবদের পাড়াতেও যথেষ্ট পরিমাণে সংক্রামিত হয়েছিল। বহুলোক মাঠে এসে জড়ো হয়েছে। তারপর কী ভাবে যেন অনুপস্থিত কেদার আর কৈলাসকে নিয়ে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হয়েছে।

সভা আহ্বানের ভুলটা প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে টের পেয়ে কেদার ও কৈলাস সভায় আসেনি। দুজনেই পরম উদারতার সঙ্গে অপরকে সভায় কথা বলার সুযোগটা দান করেছে। কিন্তু পরস্পরে উদারতার খবর না পাওয়ায় দু'জনের একজনও সুযোগটা গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি।

খবরের জন্য উৎসুক হয়ে কৈলাস ঘরে বসেছিল। হন্তদন্ত হয়ে নকুড় ও একটি ছেলে এসে দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনার খবরটা দিল। শুনে জুতা পর্য্যন্ত পায়ে না

দিয়ে ফতুয়া গায়ে কৈলাস ছুটে গেল কেদারের বাড়ী। ব্যাপারটা কেদারকে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'শীগগির যাই চলুন।'

'কোথায় যাব মশায়? ওই দাঙ্গার মধ্যে?'

'আপনি আর আমি গেলে দাঙ্গা বাধবে না। চলুন, চলুন, দেরী করবেন না!'

কেদার মাথা নেড়ে বলল, 'এতক্ষণে বেধে গেছে—এখন গিয়ে কী হবে!—মাঝখান থেকে মাথাটা ফাটবে শুধু। পুলিশ সামলে নেবে লাঠির ঘায়ে।

কাজেই কৈলাসও দাঙ্গা থামাতে গেল না।

শত্রু মিত্র

আদালতের বাইরে আবার দেখা হয় দুজনের, পানবিড়ি চা মুড়ি মুড়কি আর উকিল মোক্তারের দোকানগুলির সামনে। দু'জনে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। তীব্র বিদ্বেষের আগুনে যেন পুড়ে যায় দু'জোড়া চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় রসুল একটা অকথ্য কুৎসিত কথা বলে। কথাটা দামোদরের কানে যায় না, ভিতরের হিংসার ধাক্কাতেই সে হাত দুটো মুঠো করে রসুলের দিকে দু'পা এগিয়ে যায় নিজের অজান্তে, উচ্চারণ করে বিশ্রী একটা অভিশাপ, তারপর লাল কাকর-বিছানো পথ ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে হন হন করে চলতে আরম্ভ করে কিছুদূরের বড় বটগাছটার দিকে।

বটের ছায়ায় অনেক লোক। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। গাছটার গোড়ার দিকে ঘেঁষে বসে চাপা আকাশ পাতাল ভাবছিল। তার মুখের ভাবটা ভ্রূকুটিগ্রস্ত। পাশে বসে বিড়ি টানছিল দেবর মহেশ্বর। মহেশ্বরের তৈলহীন রুক্ষ চুলে নিখুঁত ভাঁজের টেরি।

দুপুরের ঝাঁঝালো চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে! বটের বিস্তীর্ণ গাঢ় ছায়া পর্যন্ত গরম। প্রতাপগড়ের বাস ছাড়বে সেই বিকেলে, আদালতের কাজ শেষ হওয়ার পর। এখানেই সময় কাটাতে হবে সে পর্যন্ত।

'ফের আসতে হবে তোমাকে?' চাপা শুধোয়।

এগার বছরের পুরনো উড়নী বাঁচিয়ে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে দামোদর বলে, 'হ্যাঁ, শালারা সময় নিল বেগাতক দেখে। সাতাশ তারিখ।'

একে দুয়ে দামোদরের অন্য সাক্ষীরা এসে সেখানে জোটে, মোট পাঁচজন। মাথার কাপড় চাপা আরেকটু টেনে দেয়। আগে অনেকবার ভেবেছে, এখন অনেকবার ভাবতে, তসরে তাকে কি ছাই মানিয়েছে কে জানে—আর কপালের প্রকাণ্ড চওড়া সিঁদুরের ফোঁটায়। এ বুদ্ধিটা বাতলিয়েছে বুদ্ধিমান কেদার উকিল। হাকিম নাকি পরম ধার্মিক। এসব দেখলে মন ভেজে। কিন্তু কই ভিজল বুড়োর মন, ওরা আব্দার করতেই তো মুলতুবী করে দিল। মরণও হয় না বুড়ো শকুনটার!

সাক্ষীরা তাদের গাঁয়েরই লোক। মামলা মুলতুবী হওয়ায় তারা খুসী না অখুসী হয়েছে ঠিক বোঝা যায় না। অহঙ্কারে শীর্ণ বুক ফোলাবার চেষ্টা করে সক্রোধে তারা ঘোষণা করে যে রসুল মিয়াকে আজ শেষ করে দিয়েছিল বড় বাঁচা বেঁচে গেছে চালাকি করে। তারা যেন সত্যই রাগ করেছে। অথচ সাক্ষী দিতে আসবার সুযোগ অনেকদিন বাড়ল বলে, আবার কিছু আদায় করা যাবে বলে, ভাবটাও ঠিক যেন তারা চাপতে পারছে না।

সাক্ষীদের মধ্যে গোঁসাই একেবারে চাক্ষুষ। গায়ের গলাবন্ধ ফতুয়াটার মতোই তার মুখ ময়লা, ঢিলে আর ছেঁড়া ছেঁড়া। সে উৎসাহে ফেলে ফেলে বলে, 'ভাবছ কেন ভায়া, তালিম দেয়া মিছে সাক্ষী তো নই যে জেরায় কুপোকাৎ হব। দিক না উকিল যাকে খুসী, বকুক না জেরা যদ্দিন পারে। নিক না সময়।'

হলধর সহজ সরল বোকা চাষী।—'আটগণ্ডা পয়সা বেশী দিতে হবে মোকে। নইলে এসবো নি কিন্তু বলে দিলাম, হাঁ।' ভুবন ঘোষ মাইনর স্কুলের মাঝামাঝি মাষ্টার। সে হঠাৎ খলখল করে হেসে বলে—'কাণ্ড বটে বাবা।' এত বেশী হেসে এরকম একটা সাধারণ মন্তব্য করায় মনে হয় সেই বুঝি ব্যাপারটার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে মাথাওলা

লোকের মতো। নইলে এমন ভীষণ কাণ্ডে তার কেন মজা লাগবে?

চাঁপার চোখে জল আসে! এরা কি নিষ্ঠুর!

হারাধন বাস্তব বুদ্ধির লোক। সে বলে, 'বলি দামোদর, বাস তো ছাড়বে ও বেলা। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে বাবা। খোরাকী বাবদ কি দেবে বলেছিলে, দাও দিকিনি, খেয়ে আসি।'

শুনে সকলের পেটেই খিদের জ্বালা চাড়া দিয়ে ওঠে, চাঁপার পর্য্যন্ত। সেই কোন সকালে গাঁ থেকে তারা খেয়ে বেরিয়েছে।

প্রতাপগড়ের একটিমাত্র বাস। প্রতাপগড়ের কাছাকাছি গিয়ে শাপুরে সবাই নামবে। দামোদরেরা বাসে উঠবার খানিক পরেই সাঙ্গোপাঙ্গো সঙ্গে নিয়ে রসুলও উঠে জাঁকিয়ে বসে। আদালতে এ পক্ষের আকস্মিক অচিন্তিত চালবাজীতে রসুলের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল, ওরা কায়দা করে দিন ফেলে চালবাজীটা ব্যর্থ করে দেওয়ায় ক্ষেপে গিয়েছিল দামোদর। খুনোখুনি হয়ে যাও কিছুই আশ্চর্য্য ছিল না। এখন সে দিশেহারা উন্মত্ত আক্রোশ আর নেই, এসেছে গভীর হিংসা আর ঘৃণা। আমি মার মরব ওকে তো মারব, এই বেপরোয়া ভাবের বদলে দুজনের মধ্যেই জেগেছে নিজের কোন ক্ষতি না করে অপরের সর্ব্বনাশ করার কামনা—এমন কি পারলে অপরের সর্ব্বনাশ থেকে নিজের কিছু লাভ করে নেবার সাধ। চাঁপা ঘোমটা টেনে ভালো করে ঢেকে ঢুকে বসে। বাসে তিনজন লালমুখো গোরা মদে চুর হয়ে ছিল আগে থেকে, মাঝে মাঝে আড় চোখে সে তাদের দিকে তাকায়। রসুলের দিকে চোখ ফেরাতে তার সাহস হয় না।

সহর থেকে বেরিয়ে রাস্তা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। পিছন আর সামনে থেকে ধুলো উড়িয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে লরী চলে যায়, শব্দ পেলেই বাস চালক কানাই গতি মন্থর করে যত পারে নালার ধার ঘেঁষে সরে যায়, লরী পেরিয়ে গেলে গাল দিতে থাকে চাপা গলায়। চাঁপা বসেছে রাস্তার ভেতরের দিকের জানালায়—লরী কিছু দূরে থাকতেই সে নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বোজে।

চোখ বুজে থাকার সময়েই একবার প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে সে ধাক্কা খেয়ে পাশের বুড়ী কে নিয়ে নীচে পড়ে যায়। বাসটাও একটু কাত হয়ে থেমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

একজন গোরা চাঁপাকে পাঁজা কোলা করে তুলবার চেষ্টা করতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। দরজা দিয়ে বেরোবার জন্য প্যাসেঞ্জারদের তখন ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। দু'তিনজন দরজা থেকে সোজা নালায় গিয়ে পড়ে। কানাই গালাগালি বন্ধ করে চেঁচায়, 'ভয় নেই, ঠিক আছে। ভয় নেই, ঠিক আছে!'

ঠিকই আছে কলটা। ডাইনের মাডগার্ডটা শুধু ভেঙেছে আর বডির খানিকটা তুবড়ে ভেতরের দিকে দেবে গেছে। আর চার দু'ইঞ্চির জন্য বাসটা উল্টে নালায় পড়েনি।

নালায় যারা পড়েছিল নামতে গিয়ে তাদের একজনের হাত মচকেছে, হয় তো ভেঙেছে। সঙ্গী জল কাদা সাফ করে দিলে বাসে উঠে সে কেবলি বলতে থাকে, 'নম্বর নিয়েছ কেউ? নম্বর?'

আরেকজন বলে, 'আরে মশায়, রাখুন। নম্বর! নম্বর নিয়ে হবে কি?'

গাড়ী ছাড়বার আগে কানাই বলে, 'শালারা! যতটুকু উচিত তার চেয়ে এক ইঞ্চি যদি সার—'

'না না, গোঁয়ার্তুমি কোরো না হে।' মাঝবয়সী মোটা-সোটা একজন প্যাসেঞ্জার বলে।

কিসের গোঁয়ার্তুমি? ভয় পেলেই ও শালারা মজা পায়। খালি জানি।

বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ক্ষেত মাঠ জঙ্গল আর আকাশে চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে পড়ার ব্যথা ও দুর্ঘটনার আতঙ্ক চাঁপার মিলিয়ে আসে—নতুন আর একটা লরীর আওয়াজ কাণে আসার সময়টা ছাড়া। ধরে তুলবার ছলে মাতাল গোরাটার অভদ্র কুৎসিত স্পর্শটাই সর্ব্বাঙ্গে ভয়ার্ত্ত অস্বস্তিবোধের মত রি রি করতে থাকে। একটা মুখ-ভাঙ্গা বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে ওরা আবার মদ খেতে সুরু করেছে। লরীর ধাক্কা লাগার সময় বোতলের মুখটা বোধ হয় ভেঙে গিয়েছিলো।

পাকুনিয়ার মোড়ে বাস আসে। আরও ২জন গোরা উঠে আসে। দু'জন চাবাকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আগের তিনজনের পাশে বসে কিচির মিচির কথা সুরু করে দেয়—একজন হাতের বোতলটা দেখায় তিনজনকে। তিনজন ঘন ঘন তাকায় চাঁপার দিকে, নতুন দু'জন মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে চোখ ফেরানোর সময়টুকু ছাড়া চাঁপার গায়েই চোখ পেতে রাখে।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একজন একতাড়া নোট বার করে চাঁপার দিকে বাড়িয়ে ধরে হাসে। দামোদর আর মহেশ্বর কটকটিয়ে তাকায়। রসুল ভ্রূকুটি করে দূরে হাত দুলোয়। চাঁপা তাড়াতাড়ি মুখ বার করে দেয় জানলা দিয়ে বাইরে। গাড়ীশুদ্ধ লোক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

রসুলের মুখের ভাবটা দেখবার এমন জোরালো ইচ্ছা দামোদরের জাগে! তার কেবলি মনে হয়, তার এই অপমানে রসুলের মুখে নিশ্চয় শয়তানী পরিতৃপ্তির হাসি ফুটেছে। তাকাবে না ভেবেও কখন যে সে তাকিয়ে বসে নিজেই টের পায় না। রসুলের মুখে হাসি নেই কিন্তু তার দিকেই সে তাকিয়ে আছে অনুকম্পা-মেশানো অবজ্ঞাভরা এমন এক মুখের ভাব নিয়ে যার অর্থ অতি সুস্পষ্ট। চুপচাপ অপমান সহ্য করার জন্য রসুল তাকে মনে করছে অপদার্থ,

অস্বস্তি খোঁচা। কানের কাছে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে দামোদরের। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

মনে মনে বলে, 'রও। টের পাবে। তোমায় যদি না আনি—' কি করলে যে এ অপমানের প্রতিশোধ রসুল পাবে সে ভেবে পায় না।

চাঁপার দিকে গোরাটার নোটের তাড়া বাড়িয়ে ধরার সবটুকু দোষ গিয়ে পড়ে রসুলের ঘাড়ে।

রসুল ভাবে, গোরাটা যদি হাত দিত মাগীটার গায়ে! কি খুসিই সে হত। তাকে জব্দ করতে চালাকিবাজী খেলার মজাটা টের পেয়ে যেত ব্যাটারা। বলবে না ভেবেও আজিজের কানে কানে কখন যে সে কথাটা বলে ফেলে। অজিজ কনুই দিয়ে তার বুকে একটা খোঁচা মেরে হাসতে থাকে।

আধখানা চাঁদ আকাশে উঠেই ছিল। দিনের আলোটা ম্লান হতে হতে এক সময় আধো জ্যোৎস্না হয়ে যায়। শা'পুরের নির্জ্জন রাস্তার মাথায় বাসটা থামলে রসুলেরাই আগে নেমে যায়।

চাঁপা নামবার সময় একজন গোরা তার আঁচলটা চেপে ধরে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে চাঁপা হুড়মুড় করে বাস থেকে প্রায় নীচে গড়িয়ে পড়ে।

আরও একটু দাঁড়িয়ে বাস ছেড়ে দেয়। তখন সেই চলন্ত বাস থেকে টুপটাপ করে নেমে পড়ে পাঁচজন গোরা।

শা'পুরের রাস্তা ধরে রসুলেরা তখন খানিকটা এগিয়ে গেছে। বড় রাস্তা থেকে শা'পুর প্রায় আধ ক্রোশ তফাতে, আঁকা বাঁকা গাছপালা ঢাকা পথ। প্রথম বাঁকটা ঘুরবার সময় মুখ ফিরিয়ে রসুল দেখতে পায়, চাঁপারা জোরে জোরে পথ হাঁটতে সুরু করেছে, তাদের কয়েক হাত পিছনে আসছে গোরারা।

বাসের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। ক্ষেত মাঠ জলা জঙ্গলের মুখর স্তব্ধতা ঝম ঝম করে চারিদিকে। তারই মধ্যে চাঁপার আর্ত্তনাদ শুনে রসুল ও তার সঙ্গীরা থমকে দাঁড়ায়।

কি হয়েছে তাদের বলে দিতে হয় না। ম্লান জ্যোৎস্নায় তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুটি মূর্ত্তি ছুটে এসে তাদের পাশ কাটিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে উধাও হয়ে যায় গ্রামের দিকে—গোঁসাই আর ভুবন ঘোষ।

হলধরও ছুটছিল, এদের দেখে সে দাঁড়ায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে 'ভাই সর্ব্বনাশ ছুটে এসো।'

অজিজ, বলে 'যা যা আচ্ছা হয়েছে।'

তখন বোধ হয় সরল সহজ হলধরের খেয়াল হয়, ওরা কারা এবং এরা কারা। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ হাঁ হয়ে যায় চাঁপার আর্ত্ত চিৎকার শোনা যায় বেশী দূরে নয়।

হাতের লাঠি শক্ত করে চেপে ধরে রসুল সঙ্গীদের বলে, 'চল যাই'।

অজিজ বলে, 'ওদের বন্দুক আছে।'

'লাঠির কাছে বন্দুক?' বলে রসুল ছুটতে আরম্ভ করে।

রাঘব মালাকর

[পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলা দেশের নর-নারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন···তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিও—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন··]

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। লাঠির ঘায়ে মাথাটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

ফুলবাড়ীর চৌমাথা থেকে নামমাত্র পথটা মাঠ জলা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে দু'ক্রোশ তফাতে মালদিয়া গিয়েছে। এই দু'ক্রোশের মধ্যে গাঁ বলতে কিছু নেই, এখানে ওখানে কতগুলি কুঁড়ে জড়ো করা বসতি আছে

মাত্র। হাটবারের দিন কিছু লোক চলাচল করে পথ দিয়ে, অন্যদিন সন্ধ্যায় পথটা থাকে প্রায় জনহীন।

নির্জন হোক, পথটা নিরাপদ। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ পথে কোন পথিকের বিপদ ঘটেনি। বছর তিনেক আগে দিনদুপুরে একজনকে পাগলা শেয়ালে কামড়েছিল শোনা যায়। কেষ্টরামের পোড়া মাদুলী আর চুম্বকপাথরের চিকিৎসাতেও নাকি বাঁচেনি। সাপটাপ হয় তো কামড়েছে দু'একজনকে ইতিমধ্যে, কুকুর হয় তো তেড়ে গেছে ঘেউ ঘেউ করে, গরু শিঙ নেড়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারো হয়নি, কারণ হলে সেটা মানুষের মনে থাকত। রাহাজানির দু'একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, কিন্তু কবে যে সে ঘটনাগুলি ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না, একেবারে ঘটেছিল কিনা তারও কোন প্রমাণ নেই। এ পথের আশে-পাশের বস্তি-গাঁগুলিতে যাদের বাস, চুরি ডাকাতি তারা যদি করে, ধারে কাছে কখনো করে না। এ পথের একলা পথিকের গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক, তাকে ভয় দেখাবার ভরসা পর্য্যন্ত ওদের নেই। ওরকম কিছু ঘটলে দায়ী হবে ওরাই। পুলিশও প্রমাণ খুঁজবে না, জমিদার কার্তিক চক্রবর্ত্তীও নয়—দু'পক্ষের শাসনে থেঁতো হয়ে যাবে ওরা, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাদের কুঁড়েগুলি, বাতিল হয়ে যাবে আশে-পাশে বাস করার অনুমতি।

একবার সদরে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গোমস্তা রাধাচরণ, সঙ্গে ছিল দু'জন পাইক। জন সাতেক লোক তাদের মারধোর করে টাকা কেড়ে নিয়ে যায়। পরে তারা ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল, ফুলবাড়ীর পাঁচজন আর মালদিয়ার দু'জন—পরে। দু'দিকের চাপে রাঘবের আর কাছাকাছি আরও তিনচারটে বস্তি গাঁয়ের মানুষেরা থেঁতো হয়ে যাবার পরে।

পথ থেকে হাঁক এলে এরা সাড়া দেয়। ভীরু লোক দাবী করলে সঙ্গে পৌছেও দিয়ে আসে এদিকে ফুলবাড়ী বা ওদিকে সড়কের মোড় পর্য্যন্ত। একলা ভীরু পথিকের ভালোমন্দের দায়িক ওরাই কিনা।

শেষ বেলায় ফুলবাড়ী—মালদিয়া নামমাত্র পথ ধরে বোঁচকা মাথায় দু'জন লোক চলেছে মালদিয়ার দিকে। বেশভূষা বোঁচকার আকার, বয়স, আর গায়ের রঙ ছাড়া দু'জনের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই—অর্থাৎ, লম্বায় চওড়ায় দু'জনেই প্রায় সমান হবে। গায়ের জোরে কিনা বলা অসম্ভব, জোরের পরীক্ষা কখনো হয় নি। রাঘব মালাকরের কোমরে একহাত একটি গামছা জড়ানো, জ্যালজেলে পুরনো গামছা। গৌতম দাসের পরনে প্রমাণসাইজ ঘরে-কাচা আধপুরনো মিলের ধুতি, গায়ে পুরনো ছিটের সার্ট, ঘাড়ের কাছে একটু ছিঁড়েছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। রাঘবের বোঁচকাটা বেশ বড়, গৌতমের বোঁচকা তার সিকির চেয়ে ছোট হবে। রাঘবের আছাঁটা চুলে পাক ধরেছে, গৌতমের ছাঁটা চুলেও তাই, তবে রাঘব পনের বিশ বছরের বড় হবে গৌতমের চেয়ে। রাঘব মিশকালো, গৌতম মেটে।

খান দশেক কুঁড়ের নামহীন গাঁয়ের কাছে এসে একটু হাঁপ ধরে রাঘবের। গতবারের চেয়ে এবারের বোঝাটা বেশী ভারি। দু'চার মিনিটের জন্য বোঝাটা একটু সে নামিয়ে রাখে।

গৌতম বলে, 'আবার নামালি? আজ তোর হয়েছে কি র‍্যা?'

'ডবল বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বলছ?' আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে এনে ঝেড়ে ফেলে রাঘব বলে, 'বাপ্‌স! কাপড়ের এত ওজন হয় জানতাম না বাপু! এত কাপড় জন্মে দেখি নি দোকান ছাড়া।'

গৌতম চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলে, 'কাপড়? কাপড় কিরে ব্যাটা? বললাম না বস্তা নিয়ে যাচ্ছি? মথুর সা বস্তা চেয়েছে চাল চালানের জন্যে?'

'গতবার টের পেইছি বাবু, কাপড়।'

'হ্যাঁ, কাপড়। তোকে বলেছে। সদরে খাঁ খাঁ করছে লোকে কাপড়ের জন্যে, বিশ টাকা দিয়ে কাপড় পাচ্ছে না একখানা, আমি নিয়ে চলেছি। ব্যাটার বুদ্ধি কত।'

রাঘবের হাসিটা বড় খারাপ লাগে গৌতমের।

'সদরেই তো বেচছো বাবু। গুদোম করেছ মালদিয়ায়। এপথে মাল আনছ মাসে দু'বার চারবার, পাঁচগড়ের পথে রোজ এদিক ওদিক চালান দিচ্ছ খানিক খানিক। মোরা বলি যে ঠাকুরবাবু পাঁচগড়ের পথে বাসে চেপে মালদিয়া যায় না কেনে, ফুলবাড়ী নেমে মজুর দিয়ে মাল নিয়ে দু'কোশ হাটে? পাঁচগড়ের পথে ছোকরা বাবুরা পাহারা দেয়, তাই তো বিপদ।

'কে বলেছে তোকে? কার কাছে শুনলি?' সভয় গর্জ্জনে গৌতম জিজ্ঞেস করে।

'কে বলবে বাবু? আন্দাজ করিছি। মুখ্যু বলে কি এমন মুখ্যু মোরা?'

গৌতম চট করে একটা বিড়ি ধরায়। একটু ভাবে। রাঘব যে বলল, মোরা আন্দাজ করিছি, তার মানে কি এই যে জানাজানি হয়ে গেছে? মোরা কারা? রাঘব আর তার আত্মীয়বন্ধু কজন, না আরও অনেকে?

'তোকে চার টাকা মজুরি দিব রঘু।'

'আজ্ঞে বাবু। তোমার দয়া।'

'তাই বুঝি বলে বেড়াচ্ছিস আমার কারবারের ব্যাপার দশজনকে? তোকে বিশ্বেস করলাম, তুই শেষে নেমকহারামি করলি রঘু?'

দশ কুঁড়ের গাঁ যেন জনহীন—কুকুর পর্য্যন্ত ডাকে না। পথের পাশে জলায় শালুক ফুটেছে আগুন্তি—দু'মাস আগে পর্য্যন্ত এই শালুকের ফসল তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বস্তি-গাঁগুলির স্ত্রীপুরুষ—অবশ্য সবাই নয়। বুক ফুলিয়ে

দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পিছনে হেলে যায় রাঘব, আবেগের ভারে ভারাক্রান্ত গলায় বলে, 'নেমকহারামি ঠাকুরবাবু? বল নেমকহারামি? হাটে সেদিন সভা করে স্বদেশীবাবুরা বললে, যে যা জানো থানায় বলবে। বলিছি থানায়? থানায় মোরা বলতে যাই নি ঠাকুরবাবু ভালোমন্দ। যা বলি তাতেই গুঁতো। বলাবলি করেছি নিজেদের মধ্যে। তোমার তাতে কি?'

'নে নে মোট তোল।' গৌতম বলে খুসী হয়ে, 'চটিস কেন? আট আনা বেশী পাবি আজ, যা।'

রাঘব নিঃশব্দে বোঁচকা মাথায় তুলে নেয়, গৌতমের সাহায্যে। গৌতম তাকে ছেঁদো দর্শনের কথা শোনায়, যে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে মেরে রাখা হয়েছে কোটি গৌতমকে বহুকাল ধরে: কি ভাবে ভালো থেকে মরলে লাভ আর কি ভাবে খারাপ হয়ে বাঁচলে লোকসান। তেজী গলায় গৌতম কথা কয়। শুনে গলা বন্ধ হয়ে আসে রাঘবের। মন তার মাথা কুটে বলে, হায় কি করিছি, হায় কি করিছি!

পরের গাঁয়ে রাঘবের ঘর, ফুলবাড়ী আর মালদিয়ার প্রায় মাঝামাঝি। এটাকে মোটামুটি গাঁ বলা যায়। খান ত্রিশেক ঘর আছে, আসল পথের সমান চওড়া পথ আছে গাঁ পর্যন্ত সাত আট রশি, নামও আছে গাঁয়ের—পত্তু। এইটুকু এসে রাঘব বোঁচকা নামিয়ে রাখে। আঙুল দিয়ে শুধু কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে খান্ত হয় না, বোঁচকার ওপর চেপে বসে বেশ আনন্দ অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, 'একটা বিড়ি দেন গো ঠাকুরবাবু!'

সাত আট রশি দূরে খান ত্রিশেক ঘরের নামওয়ালা বস্তি-গাঁ, এটাও যেন খানিক আগের দশ-কুঁড়ে গাঁ-টার মতো নিঃশব্দ, জনহীন মৃত। উলঙ্গ ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ছুটে আসে না পয়সা ভিক্ষা করতে, পথ দিয়ে পথিক কেউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, তাতে যেন কিছু এসে যায় না তাদের। পত্তু গাঁয়ের দক্ষিণে ঘন জঙ্গল, নীচু জমিতে বছরে ছ'মাস বর্ষার জল জমে থাকলে শোভাহীন বর্ণহীন বীভৎস জলজ জঙ্গল জন্মে। ঝিল্লীর ডাকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা, অন্ধকার রাত্রির ইঙ্গিত, এখনো সন্ধ্যা নামে নি। বাইরে সন্ধ্যা না নামলেও ঘরগুলির ভিতরে যে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়েছে রাঘব তা জানে! গৌতমও জানে। এ অঞ্চলেরই মানুষ তো সে। রাঘবকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশুর কান্না কানে আসায় গৌতম চমকে উঠে থেমে যায়। কে যেন চাপা দিয়েছে শিশুটির মুখে। গা ছম ছম করে গৌতমের। এই জলা-জঙ্গল, কুঁড়ে, পথ আর এই গামছা-পরা মানুষ এসব পুরনো সবকিছু যেন নতুন নতুন মনে হয়, গাঁয়ের শব্দহীন স্তব্ধতায়, মানুষের সদৃশ্যতায়, শিশুর কান্নার মুখ-চাপায়, বোঁচকায় বসবার ভঙ্গিতে।

রাঘবকে সে বিড়ি দেয়। নিজে বিড়ি ধরাবার আগেই রাঘবকে দেয়। বলে, 'টেনে নিয়ে চটপট চল বাবা, পা চালিয়ে বাকী পথটা।

মেরে দি। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, মাইরি বলছি তোকে রঘু, কালীর দিব্যি। চ' যাই চটপট। পৌঁছে দিলে তুইও খালাস। ওখানে খাবি তুই আজ। জানিস, আমার ওখানে খাবি। খেয়ে নেয়ে ফিরিস, নয় শুয়ে থাকবি।'

ঘাড় হেঁট করে রাঘব বসে থাকে বোঁচকায়, করুণ চোখের পলকে তাকিয়েই চোখ নামায়। ধরা গলায় বলে, 'বাবুঠাকুর, এ কাপড় মোদের চাই।'

'কাপড় চাই? আচ্ছা, আচ্ছা দেবখন তোকে একখানা—' গৌতম ঢোক গেলে, 'একজোড়া কাপড়। নে দিকি নি, চল দিকি নি এবার। ওঠ।'

রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌতমের পায়ে, দু'হাতে দু'পা চেপে ধরে বলে, 'আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর। কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গে। দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর কাপড়গুলো। মোদের ঘরে মেয়ে-বৌ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।'

গৌতমের ভয় করে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার ভয় খুব অল্প, তাই মন তার ভয়ের সীমা পেরিয়ে যায়। ঝাঁকড়া চুল ধরে রাঘবকে টেনে তুলে গর্জন করে সে বলে, 'হারামজাদা! গাঁজাখোর! বজ্জাত! ওঠ বলছি! মোট তোল! নন্দবাবুকে বলে তোকে জেল খাটাব ছ'মাস। ভৈরববাবুকে বলে তোকে চালা কেটে তুলে দেব দেশ থেকে। মোট তোল, পা চালিয়ে চল।'

'মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর? মা-বুন ন্যাংটো, মেয়ে-বৌ ন্যাংটো—

'ন্যাংটো তো ঘরে ঘরে···'

বলেই গৌতম অনুতাপ করে। এমন কুৎসিত কথা বলা উচিত হয়নি, রাঘবের মা-বোন মেয়ে-বৌকে এমন কদর্য্য গাল দেওয়া। দুটো মন-রাখা কি কি কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যায় এই ভীষণ কথাটা, গৌতম তাই মনে মনে স্থির করার চেষ্টা করে। বেশী নরম হলে ব্যাটা পেয়ে বসবে। বেশ লাগসই, যুতসই, ওজনসই কথা বলা চাই।

'কাপড় তবে রইলো বাবুঠাকুর।'

বলে রাঘব হাঁক দেয় গলা চড়িয়ে। মৃত পত্তুগাঁ যেন জীবন্ত প্রাণ পেয়ে কলরব করে ওঠে, কিলবিল করে বেরিয়ে আসে উলঙ্গপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ। পত্তুতে এত লোক থাকে না, অন্য সব বস্তি-গাঁয়ের লোকেরাও আজ ওখানে এসে জড়ো হয়েছিল। গৌতম প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে পালাবার উপক্রম করে। রাঘব লাফিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে।

'আর হয় না বাবুঠাকুর। বললাম দান করে দিয়ে যাও কাপড়গুলো, তা তো শুনলে না।'

'নে না কাপড়গুনো বাবা। সব কাপড় নে। আমায় ছেড়ে দে।'

'আর তা হয় না বাবুঠাকুর। দ.ন দিয়ে যেতে সে ছিল ভিন্ন কথা। কাপড় লুট হল এখন, তোমায় ছেড়ে দিয়ে মরব মোরা?'

উত্তেজিত মানুষগুলিকে রাঘব সংযত রাখে। তার ধমকে অন্য সকলের চেঁচামেচি বন্ধ হয়, কিন্তু ভয়াতুর কয়েকজনের আর্ত ও তীব্র প্রতিবাদ সে থামাতে পারে না। বুড়ো নরহরি কপাল চাপড়ে চেঁচায়, 'মারবি তুই, সবাইকে মারবি তুই রাঘব। পুলিশ আসবে সবাইকে বেঁধে মারবে, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। ওরে বাবা রে, সব্বোনাশ করলে রাঘব।'

দুটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে কান্না ধরে।

তিনজন মাঝবয়সী লোক চোখ পাকিয়ে বলে, 'মোরা এর-মধ্যি নাই, রাঘব।'

রাঘব বলে, 'নাই তো দাঁড়িয়ে রইছ কেনে? কাপড়ের ভাগ নিও না, যাও গা।'

কাপড়ের বোঁচকা আর গৌতমকে গাঁয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। রাঘবের ঘরের দাওয়ায় বোঁচকা নামিয়ে বড়দের মজলিস বসে, এবার কি করা উচিত আলোচনার জন্য। কি করা হবে না হবে সব ঠিক হয়ে আছে কদিন থেকে, গৌতমকে পুঁতে ফেলার জন্য জঙ্গলে গভীর গর্তও কেটে রাখা হয়েছে একটা, তবু একটু আলোচনা না করে তারা পারে না। কাপড়গুলি তাড়াতাড়ি বিলি করে ফেলা দরকার, বাইরের যারা তারা ফিরে যাবে যে যার গাঁয়ে, এখানকার যারা তারা যাবে যার যার ঘরে। এত লোক বেশীক্ষণ জমায়েত হয়ে থাকা উচিত নয়, কে যাবে পথ দিয়ে। কার কি চোখে পড়বে কে বলতে পারে। রাঘব থেকে থেকে গর্জ্জন করে ওঠে, ধারালো দা উঁচু করে একদম চুপ হয়ে যেতে বলে সবাইকে—গোলমাল শুনে কেউ যদি ব্যাপার দেখতে আসে পথ থেকে? তাকেও তো পুঁততে হবে বাবুঠাকুরের সঙ্গে। একটা লোক নিখোঁজ হওয়া এক কথা। বেশী লোক নিখোঁজ হলে হাঙ্গামা হবে না?

'কথা যে কইবে সে কাপড় পাবে না।'

রাঘবের গর্জ্জনের চেয়ে বলরামের এই ঘোষণায় কাজ হয় বেশী। সবাই চুপ হয়ে যায় একেবারে, যারা প্রতিবাদী ছিল তারা পর্য্যন্ত। বুড়ী পচার মা শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

গৌতমের কান্না, বিলাপ, অনুনয় বিনয়ের অন্ত ছিল না, রাঘব একবার দা'টা উঁচিয়ে ধরার পর সেও থেমে গিয়েছিল। এবার সে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, 'আমায় ছেড়ে দে বাবা তোরা। আমায় মেরে কি হবে তোদের? কাপড় পেয়েছিস, বামুনের ছেলেকে মেরে কেন মহাপাপ করবি? ছেড়ে দে আমায়।'

বলরাম বলে, 'কি করে ছাড়ি? ছাড়া পেলে তুমি গিয়ে তো পুলিশ আনবে বাবুঠাকুর।'

গৌতম পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, বাপ-মার নামে আর দেব-দেবীর নামে দিব্যি গালে, পুলিশকে সে কিছু বলবে না।

'এ কথা কি মনে থাকবে বাবুঠাকুর?'

তখন হতাশ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে' গৌতম বলে, 'শোন বলি, পুলিশকে আমি বলতে পারি না। সাধ থাকলেও পারি না।'

'পার না?'

'না। বললে আমারি জেল হবে। এ কাপড় চোরা-বাজারের মাল, পুলিশ যখন শুধোবে কাপড় পেলাম কোত্থেকে, কি জবাব দেব বল? সত্যি বললে যার কাছ থেকে এনেছি তাকে ধরবে, আমাকে ধরবে, কারবার তো ফাঁক হয়ে যাবেই, জেল হয়ে যাবে আমাদের। চোরা মাল না হলে কি এ পথে মাল নিয়ে আসি, তোরাই বুঝে ছাখ। পুলিশ কেন, তোরা কাপড় লুটে নিয়েছিস, কারো কাছে বলবার উপায় নেই আমার।'

রাঘব বলে, 'তা বটে। এটা তো খেয়াল করি নি মোরা।' সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এতক্ষণে। বাবুঠাকুরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করে ফেলে তাদের উপায় ছিল না, কিন্তু জীবন্ত একটা মানুষকে এভাবে মারতে কি সায় দেয় মানুষের মন। বাবুঠাকুর নিজেই যখন চোর, তার চোরাই মাল কেড়ে নিলেও কি করতে পারবে বাবুঠাকুর? ওকে ছেড়ে দিলে তাদের কোন ভয় নেই।

রাঘব বলে, 'তবে তুমি যাও বাবুঠাকুর। অপরাধ নিও না।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গৌতম পড়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে গলার আওয়াজ বার হয় না। কাঠের মতো শুকনো গলায় ক'বার ঢোক গিলবার চেষ্টা করে সে কোনমতে বলে, 'জল। জল দে একটু।'

'মোদের ছোঁয়া জল যে বাবুঠাকুর।'

গৌতম মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বলে, 'দে।'

জল খেয়েই সে পালায়।

পরদিন পুলিশ আসে দল বেঁধে, বিকেলের দিকে। দলিলপত্র তৈরী করে আটঘাট বেঁধে, সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে এক বেলা সময় লাগে, নইলে সকালেই পুলিশ আসত। নাথগঞ্জের গগন সা'র প্রকাশ্য কাপড়ের দোকানও একটা আছে।

তিন দিন আগের তরিখে মালদিয়া গাঁয়ের জন্য কিছু কাপড় বরাদ্দ করিয়ে নিয়ে, গৌতম মুখোপাধ্যায়কে এজেন্ট নিযুক্ত করে, যথাশাস্ত্র খাতাপত্র রসিদ ইত্যাদি ঠিক করে ফেলায় পচুগাঁয়ে লুট-করা কাপড়গুলির চোরাই মালত্বের দোষ কেটে যায়।

পচুগাঁয়ে গিয়ে পুলিশ ছাখে ধড়পাকড় ইত্যাদির চেয়েও

ঢের বেশী গুরুতর ও সঙ্গত অনেকটা কারণ উপস্থিত হয়েছে। লুট করা কাপড়ের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে জোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে গত রাত্রে। খুন হয়েছে দু'জন, আহত হয়েছে অনেক। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই।

যাকে ঘুস দিতে হয়

মোটর চলে, আস্তে। ড্রাইভার ঘনশ্যাম মনে মনে বিরক্ত হয়, স্পিড দেবার জন্য অভ্যাস নিসপিস করে ওঠে প্রত্যঙ্গে, কিন্তু উপায় নেই। বাবুর আস্তে চালাবার হুকুম। কাজে যাবার সময় গাড়ী জোরে চললে তার কোন আপত্তি হয় না কিন্তু সস্ত্রীক হাওয়া খেতে বার হলে তারা দুজনেই কলকাতার পথে মোটর চড়ে—নিজেদের দামী মোটর চড়ে-বেড়াবার অকথ্য আনন্দ রয়ে-সয়ে চেটেপুটে উপভোগ করতে ভালোবাসে।

এত বড়, এত দামী, এমন চকচকে মোটর গড়িয়ে চলেছে সহরের পিচ ঢালা পথে, শুধু এই সত্যটাই যেন একটানা শিহরণ হয়ে থাকে সুশীলার। তারপর আছে পুরনো, সস্তা, বাজে মোটর গাড়ীর চলা দেখে মুখ বাঁকানোর সুখ। আর আছে বোঝাই ট্রাম বাসের দিকে তাকিয়ে তিন বছর আগেকার কল্পনাতীত স্বপ্নজগতে বাস্তব, প্রত্যক্ষ বিচরণের অনুভূতি। ট্রামের হাতল ধরে আর বাসের পিছনে মানুষকে ঝুলতে দেখে সুশীলার মায়া হয়, এক অদ্ভুত মায়া! যাতে গর্ব বেশী। তিন বছর আগে মাখনকেও তো এমনিভাবে ঝুলতে ঝুলতে কাজে যেতে হত। স্বামীর অতীত সাধারণত্বের দুর্দশা আজ বড় বেশী মনে হওয়ার ট্রাম বাসের বাদুড়ঝোলা মানুষদের প্রতি উত্তপ্ত দরদ জাগে সুশীলার! মাখন সিগারেট ধরিয়ে এপাশে ধোঁয়া ছেড়ে ওপাশে সুশীলার দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রায় সবিনয় নিবেদনের সুরে বলে, 'কে ভেবেছিল আমরা একদিন মোটর হাঁকাব?'

সুশীলা বিবেচনা করে জবাব দেয়। সে মধ্যবিত্ত ভালোঘরের মেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাশ-করা গরীবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল। ওমা, এত ভালো ছেলের চাকরী কিনা একশ' টাকার! কত অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা স্বামীকে দিয়েছে সুশীলার মনে পড়ে। চালাকও হয়েছে সে আজকাল একটু। ভেবে চিন্তে তাই সে বলে, 'আমি জানতাম।'

মাখনের মনে পড়ে সুশীলার আগের ব্যবহার। একটু খাপছাড়া সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, 'জানতে?'

'জানতাম বৈকি। বড় হবার, টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা তোমার ছিল আমি জানতাম। তাই না অত খোঁচাতাম তোমাকে! টের পেয়েছিলাম, নিজেকে তুমি জানো না। তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমায় মরিয়া করে জিদ জাগালাম--'

'সত্যি! তোমার জন্যে ছাড়া এত টাকা—ড্রাইভার, আস্তে চালাও।'

সুশীলা তখন বলে, 'কিন্তু যাই বলো, দাস সাহেব না থাকলে তোমার কিছুই হত না।'

মাখন হাসে, বলে, 'তা ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলেও আর দাস সাহেব ফাঁপতো না। কি ঘুষটাই দিয়েছি শালাকে!'

'কত কনট্রাক্ট দিয়েছে তোমাকে!'

'এমনি দিয়েছে? অত ঘুষ কে দিত?'

গাড়ী চলছে। আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলছে। আরেকখানা গাড়ী, দামী কিন্তু পুরনো, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খানিক এগিয়ে স্পিড কমিয়ে প্রায় থেমে গেল। মাখনের গাড়ী কাছে গেলে পাশাপাশি চলতে লাগল দাস সাহেবের গাড়ীটা।

'কোথায় চলেছেন?'

'একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'

দাস সাহেবের দৃষ্টি তার মুখে বুকে কোমরে চলা-ফিরা করছে টের পায় সুশীলা। অন্দর থেকে উঁকি দিয়ে বৈঠকখানায় দাস সাহেবকে সে অনেকবার দেখেছে। লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ কুঁচকে যায়। এই মহাপুরুষটি তার স্বামীকে ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে এই দামী মোটরে চড়ার অবস্থায় এনেছেন। শ্বশুর ভাসুর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন। ইনি দেবতার সামিল। 'আপনার স্ত্রী?'

'আজ্ঞে।'

দাস সাহেবের প্রশ্নের মানে মাখন বোঝে। তার মতো হঠাৎ লাখপতি কয়েকজনকে সে জানে, যারা মোটর হাঁকায় শুধু বাজারের স্ত্রীলোক নিয়ে—বাড়ীর স্ত্রী বাড়ীতেই থাকে।

সুশীলা ভাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি। যে-রকম

উনি বুড়িয়ে গেছেন অল্পদিনে। ওঁর কাছে আমাকে নেহাৎ কচিই দেখায়। দুটি গাড়ীই ততক্ষণে থেমেছে। পিছনে অন্য গাড়ীর হর্ন সুরু করেছে অভদ্র আওয়াজ।

দাস সাহেব নেমে এ গাড়ীতে এসে ওঠে। ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হয় এ গাড়ীর পিছনে আসতে। দাস সাহেব ভেতরে ঢোকা মাত্র মাখন আর সুশীলা টের পায় এই বিকেল বেলাই সে মদ খেয়েছে।

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেন নি?'

'এই যে দিচ্ছি। শুনছো, ইনি আমাদের মিঃ দাস।'

পরনের বেনারসীর রঙের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গীতে একটু হাসে, নববধূর মতো। বৌয়ের মতোই যে তাকে দেখাচ্ছে সুশীলার তাতে সন্দেহ ছিল না। দাস সাহেব আলাপী লোক, অল্প সময়ে আলাপ জমিয়ে ফেলে। যে চাপা ক্ষোভ সুরু হয়েছিল মাখনের মনে অল্পে অল্পে তলে তলে তা বাড়তে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে একজন যখন কোথাও যাচ্ছে, বিনা আহ্বানে কেউ এভাবে গাড়ী চড়াও হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপে না—অন্তত যাদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনও মানুষটা যদি বোধ করে। বার বার এই কথাটাই মাখনের মনে হতে থাকে যে, অন্য কেউ হলে তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার কথা দাস ভাবতেও পারত না।

দাস বলে, 'চা খেয়েছেন?'

সুশীলা বলে, 'না।'

'আসুন না আমার ওখানে, চা'টা খাওয়া যাবে।'

মাখনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাস যোগ দেয়, 'সেই কনট্রাক্টের কথাটাও আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আপনাকে খুঁজছিলাম।'

মাখনের দু'চোখ জল জল করে ওঠে। সুশীলার নিঃশ্বাস আটকে যায়। আজ ক'দিন ধরে মাখন এই কনট্রাক্টটা বাগাবার চেষ্টা করছিল—প্রকাণ্ড কনট্রাক্ট, লাখ টাকার ওপর ঘরে আসবে! দাস যেন কেমন আমল দিচ্ছিল না তাকে, কথা তুললে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদকে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে আর তার সঙ্গে দাসের মহরম মহরম দেখে ব্যাপার অনেকটা অনুমান করে নিয়ে আশা এক রকম মাখন ছেড়ে দিয়েছিল। দাস আজ ও-বিষয়েই তার সঙ্গে কথা কইতে চায়! এই দরকারে তাকে খুঁজছিল!

সম্ভ্রান্ত সহরতলীতে দাসের মস্ত বাড়ী। সামনে সম্ভ্রান্ত বাগান। অনেকগুলি চাকর-খানসামা নিয়ে এত বড় বাড়ীতে দাস একা থাকে। বিয়ে করেনি, বৌ নেই। আত্মীয়-স্বজনদের সে সাহায্য করে কিন্তু কাছে রাখে না। সখ হলে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গ উপভোগ করে দু'চার দিনের জন্য, ছুটি ভোগ করার মতো।

যেই অমুক সাহেব বাড়ী নেই বলে দরজা থেকে বিদায় করে দেবার হুকুম জারি করে দাস তাদের ভেতরে নিয়ে বসায়। ঘরের সাজসজ্জা আর আসবাবপত্র তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে সুশীলা, নিজেদের বাড়ীতে এখানকার কোন বিশেষত্ব আমদানী করবে মনে মনে স্থির করে। তারপর আসে চা। একথা হতে হতে আসে কনট্রাক্টের কথা। সুশীলার সামনেই আলোচনা চলতে থাকে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে সব কথা শোনবার ও বোঝবার চেষ্টা করে, উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে। মাখনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হবার পর সুশীলার দিকে দাসের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না, কথাতেই তাকে মসগুল মনে হয়। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঘরে আলো জ্বলে স্নিগ্ধ।

তারপর দাস বলে, 'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলা দরকার। বসুন, ফোন করে আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সুশীলার দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'খালি কাজের কথা বলছি, রাগ করেবেন না।'

সুশীলা তাড়াতাড়ি বলে, 'না, না'

দাস চলে গেলে চাপা গলায় সুশীলা বলে, 'সোয়া লক্ষের মতো হবে!'

'বেশীও হতে পারে।'

'ফেরবার পথে কালীঘাটে পুজো দিয়ে বাড়ী যাব।' গলা বুজে আসে সুশীলার।

খানিক পরে ফিরে আসে দাস।

'মাখনবাবু?'

'আজ্ঞে?'

'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বললাম। আপনাকে গিয়ে একবার কথা বলতে হবে। কাগজপত্রগুলি নিয়ে আপনি এখুনি চলে যান। দুটো সই করিয়ে নিয়ে আসবেন।' দাস নিশ্চিন্ত ভাবে বসে।—'আমরা ততক্ষণ গল্প করি। আপনাদের না খাইয়ে ছাড়ছি না।' দাস একটা সিগারেট ধরায়। সুশীলাকে বলে, 'উনি ঘুরে আসুন, আমরা ততক্ষণ আলাপ জমাই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

সুশীলা আর মাখন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। পাখা ঘোরবার আওয়াজে ঘরের স্তব্ধতা গম্‌ গম্‌ করতে থাকে। মাখন আর সুশীলা দুজনেরি মনে হয় আওয়াজটা হচ্ছে তাদের মাথার মধ্যে—অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ।

তারপর মাখন বলে, 'তুমি চা'টা খাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি।'

সুশীলা ঢোক গিলে বলে, 'দেরী কোরো না'

'না, যাব আর আসব।'

গাড়ী রাস্তায় পড়তেই মাখন ড্রাইভারকে বলে, 'জোরসে চালাও! জোরসে!'

কৃপাময় সামন্ত

রঘুনাথ বিশ্বাসের আমবাগানের পাশ দিয়ে আসার সময় কৃপাময় সামন্তের সামনে একটা সাপ পড়ল। সংকীর্ণ মেটে পথ, পাশের কচুবন থেকে লেজটুকু ছাড়া সবটাই প্রায় বেরিয়ে এসেছে সাপটার, হাত দুই সামনে। পথ পার হয়ে ডাইনে আগাছার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবে। বেশ বড় সাপ, কৃপাময়ের পদক্ষেপের স্পন্দন অনুভব ক'রে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তবে সেই পলকের মধ্যেই লাঠির ঘায়ে ওটাকে মেরে ফেলা যায়। লাঠি উঁচু ক'রে কৃপাময় থেমে গেল। কেন, তা না জেনেই। নাতিকে মারবার জন্যে হাত তুলবার পর আপনা থেকে হাতটা যেমন তায় শূন্যে আটকে যায়।

ভোরে সামনে দিয়ে, এত কাছ দিয়ে, সাপ চলে গেলে বোধ হয় কিছু হয়। মঙ্গল অথবা অমঙ্গল। কৃপাময় ঠিক জানে না। চলতে আরম্ভ ক'রে সে ভাবে, চুলোয় যাক। মঙ্গল অমঙ্গলের এ সব ইঙ্গিত, সংকেত, নির্দেশ যে পাঠায় সে-ও চুলোয় যাক। সাপটাকে না মারবার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপাশোষ করতে থাকে।

বাগান পেরিয়ে পুব-পাড়ার বাড়িগুলি, কয়েকটা কাছাকাছি কয়েকটা তফাতে তফাতে, এলোমেলোভাবে সাজানো। পাকা বাড়ি চোখে পড়ে মোটে একখানা। চারিদিকে বর্ষার পরিপুষ্ট জঙ্গল বাড়ির বেড়া ঘেঁষে, ঘরের ভিটা ছুঁয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

পাকা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন চিবোতে চিবোতে ভূধর সরকার গুণে নিচ্ছিল মাচার লাউ।

'ছেলের চিঠি পেয়েছো নাকি হে সামন্ত?'

রোজ সে এ প্রশ্ন করে। রোজ কৃপাময়ের পিত্তি জ্বলে যায়।

'অজ্ঞে না। চিঠি পাইনি।'

'এত বিলম্ব করে কেন চিঠি দিতে? চিঠিপত্তর লিখতে তো দেয় জেল থেকে। না স্বদেশী বলে কাড়াকড়ি বেশি?'

'কি জানি।'

ভূধরের বুক লোমবহুল, ভুরু ঘন লোমের মোটা আঁটি। সহানুভূতির সকাতর ধীর উচ্চারণে সে বলে, 'ত্যাকো দিকি ব্যাপার। বলি, তুই একছেলে বাপের, তোর কি স্বদেশী করা পোষায়? কেন রে বাপু, বিয়ে থা করেছিস, ছেলে হয়েছে একটা, কাঁচা বয়েস বৌটার—আঁ, কি বললে?'

কৃপাময় কিছু বলেনি, ভূধরের নিজের মন কথা কয়েছে কৃপাময়ের হয়ে। এসব কথায় কৃপাময় মুখ ফুটে সায় দেয় না, দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথাটা শুধু একটু নাড়ে। ভূধর বোধ করে অস্বস্তি আর অপমান। একটু ক্ষোভ জাগে রাগ হয়। তার যে মনে পড়েছে তার ছেলে একটা নয়, যোয়ান মদ্দ পাঁচ পাঁচটা ছেলে, এটা যেন কৃপাময়েরই ব্যঙ্গ করা তাকে। সে যাবে কৃপাময়ের একমাত্র ছেলের জেলে-যাওয়া নিয়ে আন্তরিক সহানুভূতি জানাতে আর তার মনে পড়বে তার পাঁচ ছেলের কথা? এসব লোকের সঙ্গে কথা না বলাই ভাল। কতদিন সে ভেবেছে কৃপাময়ের সঙ্গে কথা বলার, গায়ে পড়ে যেচে কথা বলার স্বভাবটা ত্যাগ করবে, তবু যে কেন দেখা হলেই ওর সঙ্গে সে কথা কয়!

'মামলাটার কী হোলো সরকারমশায়?'

এ প্রশ্ন তো করবেই কৃপাময়। বড় ছেলে তার ঘুষের মামলায় পড়েছে, এখন সে মামলার কথা না তুললে ব্যঙ্গ সম্পূর্ণ হবে কেন। কড়া কথা ঠেলে আসে ভূধরের মুখে, বল ত ইচ্ছে হয়, তোমার বাহাদুরী রাখো সামন্ত—কিন্তু মুখেই আটকে যায় কথাগুলি। কেন কে জানে!

'চলছে। মামলা চলছে। সাজানো মামলা, ফেঁসে যাবে।'

কৈফিয়তের মতো শোনায়, আবেদনের মতো। তার ছেলে লোক খারাপ নয়, মামলা সাজানো। কৃপাময় বিশ্বাস করুক, মামলা সাজানো। থুতু ফেলার বদলে ভূধর ঢোক গিলে ফেলে। নিমের দাঁতনের জন্যেই নিজের থুতুটা বড় তেতো লাগে সন্দেহ নেই।

'ওরা খুব খুশি হয়েছে, না সামন্ত? গাঁয়ের লোক? খুব ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে?'

একথা ওকে আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম, ভূধর ভাবে। কৃপাময়ও তো গাঁয়ের লোক। ওরা খুশি হয়ে থাকলে কৃপাময়ও তো খুশি হয়েছে নিশ্চয়। এক মুহূর্তের জন্যে বড় অসহায়, বড় করুণ দৃষ্টিতে ভূধর তাকায় কৃপাময়ের দিকে, যে যেন সারা গাঁয়ে বিরোধী মতের, শত্রু ভাবের, ঘৃণা ও হিংসার প্রতিনিধি হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। কৃপাময় জবাব দেবার আগেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে ধাতস্থ হয়। সে ভাবটা কেটে গেলে তখন তার মনে হয় ক্ষণিকের জন্যে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, পেট গরম হয়েছিল। কেন যে বাড়ির সবাই খাও খাও ক'রে তাকে এত বেশী খাওয়ায়! আজ সাবধানে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। দাঁত মেজেই স্বর্ণসিন্দুর খাওয়া চাই।

বিরক্তি চেপে ভেবে চিন্তে কৃপাময় জবাব দেয়, 'ঢাক পিটে বেড়াবে কে?'

শুনে ভূধরের মনে হয়, কৃপাময় যেন বলতে চায়, তোমার ছেলের কীর্তির কথা ঢাক পিটে রটাবার দরকার হয় না,

সবাই জানে। কি আস্পর্দা লোকটার, এমনভাবে তার সঙ্গে কথা কয়, এমন ভাসা ভাসা উদাসীনভাবে, অবজ্ঞার সঙ্গে। আর নয়। আর একটি কথা সে বলবে না ওর সঙ্গে। নাই পেলে এরা বেড়ে যায়। কৃপাময়ের দিকে প্রায় পিছন ফিরে ভূধর এবার মাটিতে থুতু ফেলে।

কৃপাময় একটু ইতস্ততঃ করে। তার কি উচিত লোকটাকে একটু সাবধান করা? ফল হয় তো কিছুই হবে না, তবু বলতে বোধ হয় দোষ নেই। দালানের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে এক জোড়া বুভুক্ষু চোখ, ভূধরের সেজ ছেলে সুরেশ। তাকিয়ে সে আছে দালানের দক্ষিণে বাপের বাঁধানো পুকুরঘাটে, যেখানে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় কোনো মতে, কিংবা শুধু খানিকটা লজ্জা ঢেকে এসেছে গাঁয়ের ক'জন মেয়ে, না এসে যাদের উপায় নেই, নিরুপায় হয়েও ক'দিন পরে হয়তো যারা আসতেই পারবে না!

'একটা কথা আপনাকে বলি সরকারমশায়।'

'হুম্।' ভূধর ফিরেও তাকায় না।

'আপনার ছেলেকে একটু সাবধান করে দেবেন, ঘোষ-পাড়ায় যেন না যায়। সবাই ক্ষেপে আছে ওরা, কি করে বসে ঠিক নেই। বৌ-ঝি নিয়ে টানাটানি ওরা সইবে না, এবার পাড়ায় গেলে হয়তো—'

'কোন্ ছেলে? আমার কোন্ ছেলে বৌ-ঝি নিয়ে টানাটানি করে?' গর্জন করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কৃপাময়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাটে বৌ-ঝিদের নাইতে ও জল নিতে এবং উপরের ধাপে বসে সুরেশকে সিগারেট ফুঁকতে দেখে ভূধর আবার নির্জীব হয়ে যায়।

'আপনি যদি কথা দেন ছেলেকে সামলাবেন, আমি ওদের বলতে পারি। নয় তো আমি যদ্দুর জানি ছেলে আপনার খুন হয়ে যাবে।'

'ছেলেটা গোল্লায় গেছে, সামন্ত।'

কৃপাময়ের হাতের চাপে নরম মাটিতে লাঠির ডগায় টোল পড়ে কয়েকটা। গোল্লায় যাক, চুলোয় যাক। খুন হয়ে ছেলেটার নরকে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপশোষ করে।

'ওকে সহরে পাঠিয়ে দেব আজকালের মধ্যে মেজ ছেলের ওখানে।'

'সেই ভালো।'

পরামর্শ দিচ্ছে, উপদেশ! যেন, মহাজন, যেন গুরুঠাকুর, যেন মাষ্টার! ভয় দেখাচ্ছে, যেন পুলিশের দারোগা!

কৃপাময়কে সে কি ভয় করে? কোনো কারণ তো নেই ওকে তার ভয় করার! তার সম্পদ আছে, লোকজন আছে—কৃপাময় গরীব একা। ছেলের বৌ আর ছেলেমানুষ নাতিটা ছাড়া ওর কেউ নেই। ওর অর্ধেক জমি তার কাছে বাঁধা। ইচ্ছা করলে ওকে সে—

'চললে নাকি সামন্ত? একটা লাউ চেয়েছিলে, নেবে তো নিয়েই যাও আজ।'

'আজ্ঞে ঠিক চাইনি, তবে দ্যান যদি—'

'দশজনকে দিয়েই তো খাব হে। নইলে এত লাউ দিয়ে করব কি? ওটা নাও, বড়ও হবে, কচিও আছে।'

প্রথম সোনালী রোদ এসে পড়েছে মাটির পথে, মাঝে মাঝে গাছের ছায়া। বর্ষায় পরিপুষ্ট সবুজ গ্রাম। শ্যাম মাইতি আর গোকুল দাসের পোড়া বাড়ির কালো কাঠ-বাঁশ-ছাই আজও স্তূপ হয়ে পড়ে আছে, বর্ষাও ধুয়ে নিয়ে যায়নি, নতুন কুটিরও ওঠেনি। কোথায় চলে গেছে ওরা, ফিরে এসে নিশ্চয় আবার ঘর তুলবে।

কৃপাময়ের বাড়ির কাছাকাছি সোনা জেলের বৌ কাতু এইটুকু মোটা কাপড়ে তার যৌবন-উথলানো তাজা দেহটা কতটা ঢাকল কেয়ার না করে মাথায় মাছের চুপড়ি বসিয়ে তার নিজস্ব কোমরদোলানো ছন্দে হন হন করে চলে, কৃপাময়কে পেরিয়ে গিয়ে থামে। ফিরে এসে আবার তার নাগাল ধরে।

বলে, 'খাসা লাউটি বাঃ। কত নিলে গা?'

'সরকার মশায় দিলেন, কাতু।'

'ওমা, হাঁ নাকি? দুটি চিংড়ি দি তবে তোমাকে।'

চুপড়ি নামিয়ে একটা কচু পাতা ছিঁড়ে কাতু এক খাবলা চিংড়ি তুলে দেয়।

কৃপাময় বলে, 'পয়সা নেই কাতু।'

কাতু বলে, 'পয়সা কিসের? তুমি মোর বাপ। তোমার ছেলে মোকে বাঁচালে মিলিটারি থেকে। তোমায় দুটি চিংড়ি দিয়ে পয়সা নোব? ধম্মে সইবে মোর?'

কাতু আরও কিছু চিংড়ি কচু পাতায় তুলে দেয়।

'ছেলে ছাড়া পাবে কবে গো সামন্তমশাই?'

'কতবার শুধোবি কাতু? দেরী আছে, এখনো দেরী আছে।'

'মোকে বলবে, ছেলে কবে আসবে মোকে বলবে। ছেলেকে তোমার রুই খাওয়াবো, পাকা রুই, গোটা রুই আদমুণি। তোমার ছেলে যদি না মোকে বাঁচাত গো সামন্তমশাই—'

কাতুর ওথলানো যৌবনের অশ্লীলতা পর্যন্ত যেন ঢেকে যায় তার চোখ ছলছলানো মুখের মেঘে। এতক্ষণে কৃপাময় একদণ্ড তার দিকে তাকাতে পারে!

'আয়তো কাতু, খানিকটা লাউ কেটে দি তোকে। দুটি প্রাণী, এ লাউয়ের আধখানাও খেতে পারব না।'

লাউয়ের ফালি নিয়ে চলে গেলে কৃপাময় বলে ছেলের বৌকে, 'লাউ চিংড়ি তো রাঁধবে বাছা, তেল কি আছে?'

'আছে একটুখানি,' বলে কৃপাময়ের ছেলের ছেঁড়া সেলাই-করা গেঞ্জি গায়ে আর কোমরে ভাঁজ খোলা কাঁথার লুঙ্গি-জড়ানো বৌ।

'তাই রাঁধোগে তবে

বৌ নড়ে না। চোখ তুলে একবার চায়, চোখ নামিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কৃপাময়ের সামনে, গেঞ্জি-পরা লুঙ্গি-জড়ানো রোগা প্রতিমার মতো। জলভরা চোখ দেখে কৃপাময়কে একটু ভাবতে হয়। লাউ-চিংড়ি রাঁধতে বলায় তার ছেলের বৌয়ের চোখে জল আসে কেন? তার ছেলের কথা ভেবে? ছেলে তার বিশেষ করে লাউচিংড়ি খেতে ভালবাসত বলে তো মনে পড়ে না। তাছাড়া তার সামনে এ ভাবে দাঁড়িয়ে তার ছেলের কথা ভেবে বৌ চোখে জল আনত না, আড়ালে যেত।

শেষে বুঝতে পেরে কৃপাময় বলে, 'চাল বাড়ন্ত বুঝি মা? তাই তো!'

নেড়ী

দুর্ভিক্ষের প্রথম চোটটা লাগল তারার মাথায়। তারার ছিল চুলের বাহার, মাথা ভরা চিকণ কাল একরাশি চুল। মাঝে মাঝে কোন কোন মেয়ের এ রকম হয়—চাষাভূষোর ঘরেও। গোড়ায় তেল জুটতো, বাপের বাড়ীতে থাকবার সময় আর শ্বশুরবাড়ী এসে কয়েক বছর, ছেলেমেয়েগুলি জন্মাবার আগে পর্য্যন্ত। তারপর তেলের অভাবে চুল আবার রুক্ষ হয়ে গেছে। ফুলে ফেঁপে থাকে, ঝাঁকড়া জঙ্গলের মতো দেখায়। চুল বড় বেড়ে গেছে মনে হয়। সার না দিলে গগন নাইতির ক্ষেতে ভাল ফসল হয় না, দশটি ছেলেমেয়ে বিয়োবার পরেও তারার মাথায় অযত্নে চুলের ফসল ফলে থাকে অদ্ভুত, সামলাতে তার প্রাণান্ত।

তারপর এলো প্রাণান্তকর অভাবের দিন। ছারেখারে যাবার দিন। দু'দিনে দু'ফোঁটা তেল যা জুটতো তারার মাথায় দেবার, তাও গেল বন্ধ হয়ে। মাথায় জট বাঁধে, হু হু ক'রে উকুনের বংশ বাড়ে আর পাগলের মতো মাথা চুলকে চুল ছিঁড়ে তারা বকতে থাকে, 'মলাম্ রে বাবা, মলাম্। মার ভুতো, কাটারি দিয়ে কোপ মার দিকি একটা, চুকেবুকে যাক্।'

ভীত সন্ত্রস্ত ক্ষুধার্ত গগন বিবর্ণমুখে পরামর্শ করতে আসে, বাঁচন-মরণের কথাতেও তারা মন দিতে পারে না। দু'দণ্ডের বেশী স্থির হয়ে বসতে পারলে তো স্থির করতে পারবে মন! কাতরভাবে সে তাই বলে, 'কি জানি বাবা, যা যুক্তি কর। চাল বাড়ন্ত ঘরে, বুঝেসুঝে যা যুক্তি কর। দাও, বেচেই দাও।' পেটের জ্বালায় বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি কাঁদে, তারা তাদের থাপড়ে দেয়। কান্না ভেসে আসে শূন্যে এদিক ওদিক থেকে, আতঙ্কে বুকটা মুচড়ে যায় তারার, একটু সময় নড়নচড়ন বন্ধ করে নিথর হয়ে বসে থাকে। তারপর আবার হাত উঠে যায় মাথায়, জট ছাড়াতে, চুলকোতে আর উকুন মারতে। চুলের অরণ্য থেকে উকুন খুঁজে এনে দুই বুড়ো আঙুলের নখে টিপে পুট্ করে মারবার মুহূর্তটিতে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ হয়ে যায় তারার কাছে। শরীর বেশ খানিকটা শুকিয়েছে, নোলার জল কম। তবু জিভে দিব্যি আওয়াজ হয় উস্স্—উকুন মারার পুট্ শব্দের সঙ্গে।

প্রথম মড়া কান্নাটা কিন্তু তার বড়ই জমজমাট হল এই চুলের জন্যে। পাঁচনিখে থেকে মেয়ে মনা এল বিধবা হয়ে, ছেলে হারিয়ে কচি মেয়েটাকে বুকে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে। তার স্বামী মরবার পর শাশুড়ী আর এক ছেলেকে নিয়ে তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে তারা চুল ছিঁড়তে লাগল এলোপাথাড়ি চুলেরই যন্ত্রণায়, কিন্তু তার শোকের প্রচণ্ডতা দেখে সবাই হয়ে গেল হতভম্ব। এমন শোকার্ত হবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এসেছিল খানিকটা, দেহে শক্তিও ছিল না অতখানি।

তারার কোলের ছেলেটাও ছোট। মনা তার মেয়েটাকে মার কোলে তুলে দিয়ে বলে, 'একটু মাই দেমা ওকে। মোর দুধ শুকিয়ে গেছে।' তারার যে বাকী আছে বুকের দুধ শুকিয়ে যেতে! চালের হাঁড়ি ঝেড়ে সে একটু ধুলো-মেশানো গুঁড়ো বার করে, তাই ফুটিয়ে খাইয়ে দেয় নাতনীকে শুকনো পাতার আগুন জ্বেলে।

তিন দিন পরে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের জন্য তারার কান্নাটা হয় অনেক নিস্তেজ। ছেলেমেয়ে দুটো অসুখে ভুগছিল। ওষুধের অভাবে যে তারা মরল ঠিক তা নয়, আসলে মরল খেতে না পেয়ে রোগটাকে উপলক্ষ করে। থেমে থেমে তারা সুর করে কাঁদল সারাদিন।

আধপোড়া ভাইবোন দুটিকে খালে ভাসিয়ে দেবার পর সকলের সঙ্গে ভুতো বাড়ি ফিরছে। হৃদয়-পণ্ডিতের বাড়ির সামনাসামনি সে পেছিয়ে পড়ল। সকলের খানিক

পরেই সেও বাড়ি ফিরল, এইটুকু একটা মরা ছাগল ছানাকে গামছায় জড়িয়ে। ছানাটা গাঁয়ের প্রাথমিক স্কুলের মাষ্টার হৃদয় পণ্ডিতের ছাগলের। স্কুল উঠে যাওয়ায় হৃদয় এখন জোতদার পূর্ণ ঘোষালের ধানের হিসেব লিখছে।

ছাগল ছানার মাংসটা মনা'ই রেঁধে দিল নুণ হলুদ দিয়ে, বিনা তেলে। বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসে হবিষ্যিও জুটছিল না বলে ওসব রীতিনীতির কথা ভুলে গিয়ে রাঁধতে রাঁধতেই মনা খানিকটা কচি মাংস খেয়ে নিল। এই নিয়ে হাতাহাতি কামড়াকামড়িও হয়ে গেল ভুতোর সঙ্গে তার। আঠার বছরের মনা আর বিশ বছরের ভুতোর মধ্যে।

পরদিন এল হৃদয়-পণ্ডিত। সদর দাওয়ায় শুয়ে ছাগল তার মাই দেয় ছানাকটাকে, আর গলা টিপে ভুতো কিনা চুরি করে আনে সেই ছানা!

দাম দে ভাল চাস্‌তো গগন। ছেলেকে তোর পুলিসে দেব নইলে।'

'দাম কোথা পাব পণ্ডিতমশাই?'

মনাকে দেখে হৃদয়-পণ্ডিত যেন একটু আশ্চর্য হয়েই বলল, 'তুই কবে এলিরে মনা? স্বামী মরল কবে?' ছ'মাস পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে থেকে হৃদয়-পণ্ডিতের চেহারা, তাকানি, কথার ভঙ্গি সব অদ্ভুত রকম বদলে গেছে; স্কুলটা না উঠে গেল কি হত বলা যায় না। চিরকাল যে মহান দারিদ্র্যের আদর্শের শোষণে খেঁতো এবং ভোঁতা হয়ে নির্বিরোধ ভাল মানুষ সেজে ছিল, তাই হয়ত সে থাকত শেষ পর্যন্ত। পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে মিশে বাড়তি পড়তি উপায়ে টাকা কুড়োতে শিখে হঠাৎ সে মানুষ হয়ে উঠল 'ভাল' টুকুর খোলস ছেড়ে।

ছাগলছানার জন্য আর বেশী হাঙ্গামা সে করল না। ধমক দিয়ে আর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করেই ক্ষান্ত হল। কাঁটাল কাঠের পিঁড়িতে জেঁকে বসল গগনের জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে। ভিটে ছাড়া কিছুই আর নেই গগনের।

'বাঁধা রাখ। রেখে চলে যা বাপ বেটা রোজগার করতে ছুটো যোয়ান মানুষ ঘরে বসে না খেয়ে মরছিস্, লজ্জা করে না?'

যাবার আগে হৃদয়-পণ্ডিত মনাকে বলে গেল, "তুইও দেখছি চুল পেয়েছিস্ মায়ের মতো।"

মনা বলল, 'উঠেই গেল সব চুল।'

অনেকে গিয়েছে গাঁ ছেড়ে, অনেকে যাই যাই করছে, কেউ আপনজনদের ফেলে একা, কেউ সপরিবারে। ফিরেও এসেছে দু'একজন—আপনজনদের খুইয়ে। এদের কাছে শোনা গেছে, যাবার ঠাঁই নেই কোথাও। যেখানে যাও সেখানেই এই একই অবস্থা।

দিনভর পরামর্শ চলল। ভিটে বেচবে না বাঁধা দেবে, গগন আর ভুতো দুইজনেই যাবে না একজন যাবে, অথবা বাড়ীসুদ্ধ যাবে সকলেই। এবং গেলে কোথায় যাবে।

উকুনের কামড় তারা আর তেমন অনুভব করে না, বোধশক্তি আরও ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে যাওয়ায় কোন পরামর্শ-ই সে দিতে পারে না।

ভুতোকে আর দেখতে পাওয়া যায় না পরদিন। হৃদয়-পণ্ডিতের কাছে পথের সন্ধান পেয়ে সে একাই সরে পড়েছে।

গগন বলে, 'একা তোমাদের নিয়ে যাই কোথা? নিজে গিয়ে দেখি যদি কিছু হয়।'

বাড়ী বাঁধা রেখে পনের বিশদিনের খোরাক দিয়ে গগন চলে যায়। ফিরে না আসুক পনের বিশদিনের মধ্যে খবর একটা পাঠাবে আর রোজগারের কিছু অংশ।

দুটি দুটি খেতে পেয়ে তারার আবার চুলের যন্ত্রণা অনুভবের শক্তি বেড়ে যায়। তার ভরা বাড়ী কিরকম খালি হয়ে গেছে আবার বুঝতে পেরে মাঝখানের নিঝুম দিনগুলির পর আবার বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে, মনাও গলা মেলায় মার সঙ্গে। মনার মাথাতেও জট বেঁধে উকুন হয়েছে। মা ও মেয়ে বসে কাঁদে আর পরস্পরের মাথার জট ছাড়িয়ে উকুন বাছে।

খোরাক ফুরিয়ে যায়। সময় কাটে একটা মাস। গগনের কোন সংবাদ মেলে না। শোক দুঃখ ও দৈহিক যন্ত্রণাবোধ আবার ঝিমিয়ে আসে দু'জনের। মনার মেয়েটা মরে যায় দুধের অভাবে, কাঁড়া-চাল খাওয়া পেটের অসুখে। তারার কোলের ছেলেটাও মরে একই ভাবে। তারপর একে একে, এবেলা একজন আর ওবেলা একজন করে, আরও একটা ছেলে ও মেয়ে মারা যায় তারার। থাকে দুটি—মরমর অবস্থায়। দশটির মধ্যে তারার চারটি সন্তান মরেছিল—এদেশে ওরকম মরতে হয় খুব স্বাভাবিক নিয়মে—আর চারটি মরে দুর্ভিক্ষে।

হৃদয়-পণ্ডিত আসে যায়, পরামর্শ দেয়, উপকার করতে চায় কিন্তু চাল দেয় না। পেটে জ্বালা না থাকলে মানুষ কথা শুনবে কেন! বলে, 'চাল পাব কোথায়, চাল? যা বলি শোন। সদরে চল তোমরা; খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দেব। গগন যদি ফিরে আসে, তোমরাও ফিরে আসবে।'

তারা বলে, 'আপনি বাপ, যা ভাল বোঝেন করেন।'

দু'জনে রাজি হলে হৃদয় মনে মনে একটু হিসেব কষে দেখে। মনেও আসে চেষ্টাং কুতের সংস্কৃত শ্লোকটা। তাই মনাকে আড়ালে বলে, 'যা করছি সব তোরই ভালর জন্যে মনা। কিন্তু চারজনের ব্যবস্থা কি করতে পারব? খটকা লাগছে। মা না গেলে তুই যদি না যাস—গেলে কিন্তু সুখে থাকতিস্। মাছ দুধ খাবি, শাড়ী গয়না পাবি—'

'বলেছি যাব না?'

'বলিসনি? বলিস্‌নি তো? বেশ বেশ।'

তারার অজান্তেই মনাকে শাড়ী গয়না পরিয়ে মাত্র দুধ খাইয়ে সুখে রাখবার জন্য শহরে পাঠিয়ে নিজের মাছ দুধ খাবার আর স্ত্রীকে শাড়ী গয়না দেবার ব্যবস্থাটা হৃদয়-পণ্ডিত করতে পারল।

মাঝরাত থেকে শুরু করে পরের সমস্ত দিনটা মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করে দুই ছেলেকে নিয়ে তারা গেল হৃদয়-পণ্ডিতের বাড়ী।

'মেয়েটা পালিয়েছে পণ্ডিতমশায়।'

'তাই নাকি? সত্যি? ছি ছি।'

'মোকে দিন পাঠায়ে সদরে। কি হবে আর ঘর আগলে থেকে?'

খানিক চুপ করে থেকে হৃদয়-পণ্ডিত বলে, 'ওতে একটু গোলমাল হয়েছে ওতোর মা। যেখানে পাঠাব বলেছিলাম না, সেখানে আর লোক নেবে না খবর পেয়েছি।'

দুই ছেলেকে আগলে তারা ঠায় বসে থাকে দাওয়ায়। মাথায় তার কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় অজস্র উকুন। সাঁঝ বরণের অন্ধকার চাঁদ উঠে আসায় ফিকে হয়ে আসে। তারা বুঝতে পারে, তার ছেলে দুটো হৃদয়-পণ্ডিতের দাওয়ার মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের সেইখানে রেখে তারা চুপি চুপি রাস্তায় নেমে যায়। হাঁটতে আরম্ভ করে সদরের দিকে।

তারপর অনেক কাণ্ড ঘটে তারার জীবনে। মাসখানেক পরে এক হাসপাতালে আয়নায় নিজের মুখ দেখে তারা প্রশ্ন করে, 'ও কে গো?'

'দেখ ত চিন্‌তে পার কি-না। ও হল সাতাইখুনির গগনের বউ তারার মুখ।'

তারা হেসেই বাঁচে না।—'দূর! তারার মাথা ন্যাড়া হবে কেন গো? কত চুল তারার মাথায়!'

সামঞ্জস্য

ভিতরে এবং বাইরে শান্ত গম্ভীর হয়ে প্রমথ সেদিন বাড়ী ফেরে। অনেক দিন পরে আজ গভীর শান্তি অনুভব করেছে, পরম মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। ভেবেচিন্তে মন স্থির করে ফেলবার পরেই এরকম আশ্চর্য্য ভাবে শান্ত হয়ে গেছে মনটা।

সারাদিন আপিসে সে আজ কোন কাজ করে নি, করতে পারে নি। জরুরী কাজ ছিল অনেক। অন্যদিন আপিসে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে ভেতরের বিপর্য্যয়ের হাত থেকে সে খানিকটা মুক্তি পেয়েছে, কাজ যত হয়েছে দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ নিজেকে সে ভুলতে পেরেছে তত বেশী গভীরভাবে। কর্ত্তব্য-পালনের তাগিদ তার মধ্যে চিরদিনই খুব জোরালো, অভ্যাস পুরনো।

কিন্তু কাজও সব সময় ভাল লাগে নি। হঠাৎ মাঝে মাঝে কাজের প্রবল উৎসাহ কি ভাবে যেন মাঝপথে জুড়িয়ে গিয়ে ঘনিয়ে এসেছে গভীর বিষাদ ও অবসাদ। এমনও মনে হয়েছে, এভাবে আর বাঁচা যায় না।

মনে পড়েছে গীতাকে। গীতার সঙ্গে জীবনযাপনের সমগ্র অর্থহীনতাকে।

চার বছরের সংঘাত, বিরক্তি, গ্লানিবোধ আর হতাশার কবল থেকে রেহাই পাবার চরম ব্যবস্থা সে ঠিক করে ফেলেছে। গীতার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে আর সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপ্রধান, আদর্শচ্যুত শ্রীহীন জীবনযাপন করতে হবে না। অতি-বড়, অতি-পালনীয় কর্ত্তব্য পালনের গৌরবও সে অর্জ্জন করবে, আত্মবিরোধী জীবনযাপন থেকেও রেহাই পাবে। শুধু কাপড়-গয়না, ভাল-খাওয়া, আড্ডা সিনেমা নিয়ে আর বিরামহীন আব্দার, মতান্তর, অভিমান, নাকি-কান্না সয়ে অতিষ্ঠ হয়ে থাকতে হবে না। দু'চার দিনের মধ্যেই সুরু হবে আন্দোলন। আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে জেলে যাবে—গীতার নাগালের বাইরে।

গীতার হয়তো শিক্ষা হবে ভালরকম। চাকরীর মায়া না করে, ঘরসংসারের কথা না ভেবে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেশের জন্য স্বামী তার জেলে যেতে পারে, এর আঘাত হয়তো তাকে একেবারে বদলে দিতে পারে। তার জেলে থাকার সুদীর্ঘ সময়টা এ বিষয়ে চিন্তা করে করে হয়তো সে বুঝতে শিখবে জীবনের গুরুত্ব কতখানি। হাল্কা স্বার্থপর অর্থহীন জীবনের ওপর হয়তো তার স্থায়ী বিতৃষ্ণা এসে যাবে। জেল থেকে বেরিয়ে হয়তো সে সুখী হতে পারবে গীতাকে নিয়ে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আসবে। দেশ ও সমাজের কথা একটু ভাবে, পদে পদে বিরোধিতা

করার বদলে কিছু কিছু কাজ আর ত্যাগ স্বীকার করে হাসি মুখে।

পথের মানুষকে আজ তার সুখী মনে হয়। তার মতো ওদের কারো জীবনেও বিরামহীন প্রতিকারহীন সংঘর্ষ স্থায়ী রোগযন্ত্রণার মতো একটানা অশান্তি এনে দিয়েছে কিনা—প্রতিদিনের এই প্রশ্ন আজ যেন মন থেকে মুছে গিয়েছে।

একটা কথা অবশ্য প্রমথ জানে। নিজের কাছে এ বিষয়ে তার ফাঁকিবাজি নেই। দেহমন তার এমনভাবে হাল্কা হয়ে যাবার কারণ অন্য কিছুই নয়, গীতার হাত থেকে মুক্তি পাবার কল্পনাই তাকে এভাবে ভয়মুক্ত করে দিয়েছে। এ-কথাটাকে সে আমল দেয় না, এ নিয়ে ভাবে না। মুক্তিলাভের এ পথ বেছে নেবার আরেকটা দিকও তো আছে। যত অসহ্যই হোক গীতাকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে রেহাই পাবার যত সহজ, সাধারণ, হীন পথই খোলা থাক, ওভাবে সে মুক্তি পাবারও চেষ্টা করে নি, অবস্থার প্রতিকারের অন্যায় ব্যবস্থাও করে নি। স্বামী ও প্রেমিকের কর্তব্য সে পালন করে গেছে বরাবর। গীতাকে ভাল করে জেনেশুনেও ওকে ভালবেসে বিয়ে করার ভুলটা তার, সে ভুলের জন্য গীতাকে শাস্তি দিয়ে মনের জ্বালা জুড়োবার মতো অন্যায় সে কোনদিন করে নি। এ উপায়ের কথা না ভাবলে, এ সুযোগ না পেলে, চিরদিন সে এই আত্মবিরোধভরা বন্দীর জীবনটাই যাপন করত! এ গৌরব সে দাবী করতে পারে।

বাড়ীতে ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়ল ছোটভাই সুমথের কচি ছেলেটা, বারান্দায় এই অবেলায় ঘুমিয়েছে। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে একটি ছেলে হয়েছে সুমথের, চারবছরের বেশী হয়ে গেল গীতাকে সে একটি সন্তানের মা হতে রাজী করাতে পারল না! মনে মনে সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হয়ে যায় প্রমথের।

গীতা বাড়ী ছিল না। নতুন কিছু নয়, আপিস থেকে বাড়ী ফিরে গীতার সঙ্গে তার কদাচিৎ দেখা হয়। জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান করার পর সুমথের স্ত্রী তাকে চা জলখাবার দেয়, তার গম্ভীর মুখ দেখে মমতা অনুভব করে। এক সময় সুমথকে সে বলে, 'দাদার মুখ বড় ভার দেখলাম।'

সুমথ গম্ভীরভাবে মাথা হেলায়।—'যা অশান্তি! দাদা বলে সহ্য করে, আমি হলে—'

'কী করতে?'

'দূর করে তাড়িয়ে দিতাম।'

'পারতে না। তুমিও তো দাদার ভাই।'

সুমথ মুখে একটু হাসে, মনে কথাটা মানে না। সে যে দাদার ভাই এ যুক্তিটাতে নয়, সে হলেও গীতাকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারত না, স্ত্রীর এই ঘোষণাকে।

রাত প্রায় আটটার সময় গীতা ফিরে আসে। খুব জমকালো একখানা শাড়ী সে পরেছে, মুখে-চোখে আর চলনে তার উপচে পড়েছে খুসীর ভাব।

'কোথায় গিয়েছিলাম জানো?' বলতে বলতে সামনে এগিয়ে এসে প্রমথের মুখ দেখে সে মুখ বাঁকায়।—'হুঁ, রাগ করেছো তো!'

'না, রাগ করি নি। একটা কথা ভাবছিলাম। তোমার ওপর আর কোনদিন রাগ করব না।'

'তার মানে?'

'কাপড় বদলে শান্ত হয়ে বোসো, বলছি।'

'ও বাবা! তবে তো গুরুতর কথা!'

কিন্তু তার না-বলা কথাকে বিশেষ গুরুত্ব যে সে দেয় নি প্রমথ তা বুঝতে পারে। গীতা সম্ভবত ধরে নিয়েছে, সে কিছু উপদেশ ঝাড়বে, কোন কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। গীতার ফিরে আসতে আধ ঘণ্টা সময় লাগায় এই অনুমানটাই সত্য মনে হয়। নতুন কিছু তার বলবার আছে মনে করলে এতক্ষণ কৌতূহল দমন করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে গীতাকে বদলে ফেলার চেষ্টার মধ্যে যে বোকামি ছিল আজ প্রমথের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কতখানি হতাশ আর নিরুপায় বোধ থেকে গীতাকে ওভাবে সংশোধন করার উপায়টা সে অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরেছিল, ভাবতে গিয়ে আসন্ন মুক্তির রূপটাই তার কাছে আরও বিরাট হয়ে ওঠে।

আবার তার কথা শুনে গীতা কেমন চমকে যাবে ভেবেও প্রমথ বেশ আমোদ অনুভব করে।

গীতা ফিরে এসে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে টেবিল থেকে রঙীন মলাটের একটি বই তুলে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। প্রমথ যে তাকে বিশেষ কিছু বলবে বলেছিল, সে তা একেবারে ভুলে গিয়েছে মনে হয়। তাকে ডাকতে গিয়ে প্রমথ চুপ করে যায়। মিনিট পনের সে চুপ করে বসে ভাবে। তারপর শান্তভাবেই শোবার ঘরে যায়।

'তোমায় যা বলছিলাম।'

গীতা তার বিছানায় শুয়ে পড়ছিল। বই নামিয়ে হাই তুলে উদাসভাবে বলে, 'কী বলছিলে?'

প্রমথ কাছে গিয়ে বিছানাতেই বসে। গুছিয়েই সে সব কথা বলে, স্পষ্ট জোরালো ভাষায়। কিন্তু গীতার বিশেষ চমক লেগেছে মনে হয় না। কথাটাকে সে তেমন গুরুতর মনে করেছে কিনা সে বিষয়েও প্রমথের সন্দেহ জাগে।

'এই বুঝি তুমি রাগ কর নি?'

'রাগের কথা কী হল?'

'আমার জন্যে জেলে যাবে বলছ, অথচ তুমি রাগ কর নি। কবে ধমকে মেরে বলবে তোমার রাগ হয় নি।'

'তোমার জন্যে জেলে যাচ্ছি না গীতু।'

'তবে কী জন্যে? স্বদেশী করে জেলে যাবার জন্যে বুঝি

তিনশ টাকার চাকরী নিয়েছিলে, বিয়ে করেছিলে? জেলে যাবে না ছাই, এমনি করে তুমি আমায় বলতে চাও, আমায় নিয়ে কি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ।' গীতার চোখ ছল ছল করে, কী দোষ করেছি বল, মাপ চাইছি। অমন কর কেন?'

প্রমথ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ কি অভিনয়, না ন্যাকামি? ন্যাকামি হওয়াই সম্ভব। ওর স্বভাবটাই এ-রকম বিকারগ্রস্ত।

'তোমায় বলে কী হবে? তুমি বুঝবে না।'

'বুঝব না? আমি অবুঝ? বোকা? না বজ্জাত?'

প্রমথ আর কথা বলে না। শান্ত নির্ব্বিকার হয়ে চুপচাপ বসে থাকে। তাতে গীতার রাগ যায় আরও বেড়ে। একতরফা কিছুক্ষণ ঝগড়া চালিয়ে সে কাঁদতে আরম্ভ করে। প্রমথ তখনও বসে থাকে পাথরের মূর্ত্তির মতো, তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

সাত দিন পরে প্রমথ গ্রেপ্তার হয় আরও অনেকের সঙ্গে। বিচারে তার জেল হয় তিন বছরের।

জেলে প্রমথের দিন কাটে একে একে। বুড়ী মা, সুমথ ও অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুরা চিঠি লেখে, মাঝে মাঝে দেখাও করতে আসে। গীতা চিঠিও লেখে না, দেখাও করতে আসে না। বিচারের সময় সে কোর্টে আসত, আহত-বিস্ময় তার তীব্র অভিযোগ ভরা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। সুমথের কাছে সে খবর পায় যে বিচার শেষ হবার পরেই গীতা ঢাকায় তার বাবার কাছে চলে গিয়েছে। এটা প্রমথ বুঝতে পারে। কিন্তু দেখা করতে আসে না কেন একটিবার? চিঠি লেখে না কেন?

রাগ হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু এমন রাগ হবার মতোই কি বিকৃত তার মন যে, রাগ কিছুতেই কমে না, অন্তত চিঠির জবাবে দু'লাইন একটি চিঠি লেখার মতো?

প্রমথ ক্ষুব্ধ হয়, মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। এই যদি প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে গীতার মধ্যে তার কারাবরণ করার, ওর হৃদয়মনের কী পরিবর্ত্তন সে আশা করতে পারে!

কিন্তু যাই হোক, মুক্তি সে পেয়েছে। আত্মবিরোধী জীবনের তার অবসান হয়েছে চিরদিনের জন্য। বাকি জীবনটা শান্তিতে হোক অশান্তিতে হোক, সুখে হোক দুঃখে হোক, নিজের মতিগতি আর আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বাজায় রেখে কাটিয়ে দিতে পারবে।

জেলে যখন তার দেড় বছর পূর্ণ হয়েছে, হঠাৎ গীতার কাছ থেকে সে অদ্ভুত চিঠি পেল। চিঠিখানা খুব সংক্ষিপ্ত।

গীতা লিখেছে: এতদিন ভেবে ভেবে সে বুঝতে পেরেছে প্রমথ আর তার মধ্যে মনের মিল না থাকলে জীবনে তারা সুখী হতে পারবে না। তাই, নিজেকে গড়ে-পিটে প্রমথের উপযুক্ত করে তুলবার জন্য কিছুদিন সে এক শিক্ষাসদনে গিয়ে থাকবে স্থির করেছে। সে যেন কিছু না ভাবে। যথাসময়ে দেখা হবে।

বার বার প্রমথ চিঠিখানা পড়ে, তার ধাঁধা ঘুচতে চায় না। শিক্ষাসদন? এমন শিক্ষাসদন কোথায় আছে, যেখানে স্ত্রীদের গড়ে-পিটে স্বামীর উপযুক্ত করে তুলবার ব্যবস্থা আছে? সাধন ভজন জপ তপ করে নিজেকে শোধরাবার জন্য কোন সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাবার বুদ্ধি করে নি তো গীতা? অথবা মাথাটা তার খারাপ হয়ে গেছে একেবারে, পাগলামির ঝোঁকে একখানা চিঠি লিখে ফেলেছে আবোল তাবোল। নিজের দোষ যদি বুঝে থাকে গীতা, তাই যথেষ্ট ছিল। আদর্শহীন জীবনের ব্যর্থতা টের পেলে, দায়িত্ববোধ জন্মালে প্রমথ নিজেই তাকে সহজ সাধারণভাবে শুধরে নিত।

মনের মধ্যে নানা ভাবনা পাক খায়, কিন্তু নতুন একটা আনন্দ ও উৎসাহও প্রমথ অনুভব করে। তার আশা তবে একেবারে ব্যর্থ হয় নি। গীতা অন্তত এটুকু ভাবতে শিখেছে যে, মনের মিল না হলে তারা সুখী হতে পারবে না!

গীতা কোন ঠিকানা দেয় নি। প্রমথ ঢাকায় তার বাবার ঠিকানায় জবাব দেয়। লেখে যে, গীতা যেন মনে না করে সে তাকে একেবারে তারই মনের মতো ছাঁচে ঢালতে চায়। গীতার ওপর কোনদিন সে জোর খাটায় নি, কোনদিন খাটাবার ইচ্ছেও রাখে না। তাদের বিরোধিতার অবসান হলেই তারা সুখী হতে পারবে ইত্যাদি অনেক কথা।

একেবারে শেষে সে লেখে: শিক্ষায়তনের নামটা কী, গীতা কোন শিক্ষায়তনে যোগ দিয়েছে?

এ চিঠির কোন্ জবাব আসে না।

কয়েকদিন পরে সুমথ দেখা করতে এলে তাকে সে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করে। কিন্তু সুমথ গীতার কোন খবরই বলতে পারে না। গীতা তাদের কাছে চিঠিপত্র লেখেনি একখানাও।

'খবর নেব?'

প্রমথ ভেবেচিন্তে বলে, 'না, থাক।'

মাস চারেক পরে হঠাৎ একদিন প্রমথ জেল থেকে ছাড়া পায় আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে। বাড়ী পৌঁছে সে দুদিন বিশ্রাম করে, তারপর ঢাকা রওনা হয়ে যায়।

গীতার রায়বাহাদুর বাবা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে জামাইকে অভ্যর্থনা করেন, 'এসো। বসো।'

'গীতা ফেরেনি শিক্ষাসদন থেকে?'

'কোন শিক্ষাসদন?'

'ও আমায় লিখেছিল শিক্ষাসদনে যাচ্ছে। নাম ঠিকানা জানায় নি কিছু।'

রায়বাহাদুর ভুরু কুঁচকে তাকান।—'শিক্ষাসদন? ও তো জেলে।'

'জেলে?'

'ও মেয়ের কথা বোলো না। পাগলের মতো যা-তা বক্তৃতা দিয়ে সিডিসনের চার্জ্জে ছ'মাস জেলে গেছে। ফাইনের ওপর দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতাম, তা কোর্টে

ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এমন সব কথা বলতে লাগল—' রায়বাহাদুর মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করেন, প্রমথ বুঝতে পারে, ওটা আপশোষের আওয়াজ, আগে অনেকবার শুনেছে।—'বেশ মিলেছ তোমরা দু'জনে।'

আবার রেলে স্টীমারে পাড়ি দিতে হয়। এবার প্রমথের মনে হতে থাকে মুহূর্ত্তগুলি বড় বেশী দীর্ঘ। স্টীমার ও রেল বড় আস্তে চলে, সময় কাটতে চায় না।

জেলে গীতাকে দেখেই সে বুঝতে পারে তার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সে চিরদিনই ছিপছিপে, এখন বড় বেশী রোগা দেখাচ্ছে। তার চোখে চপল দৃষ্টির বদলে কেমন বিষণ্ণ হাসিভরা গাম্ভীর্য্য।

প্রমথ অনুযোগ দিয়ে বলে, 'মিছিমিছি জেলে আসবার তোমার কী দরকার ছিল বলতো গীতু? প্রতিশোধ নিতে?

গীতার গলা আরও সরু, আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। প্রমথের কথায় সে যেন খন্‌খন্‌ করে বেজে ওঠে, 'প্রতিশোধ কি? জেল না খাটলে তোমার সঙ্গে ঘর করব কী করে? আমাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই তো।'

প্রমথ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, 'তা বেশ করেছ। তবে এর বদলে যদি—'

প্রমথ তার এত বড় কাজকে সমর্থন করে না! রাগে অভিমানে লাল হয়ে যায় গীতার মুখ। 'জেলেও উপদেশ ঝাড়তে এসেছ? কটা দিন নয় সবুর করতে বেরোনো পর্য্যন্ত!'

প্রমথ ঢোক গেলে। গীতার চোখ মিট মিট করে।